পশ্চিমবঙ্গ

নববর্ষ সংখ্যা ॥ ১৪০১ বঙ্গাব্দ

শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ২৭ ॥ সংখ্যা ৩৬–৪০

প্রধান সম্পাদক : তারাপদ রায় *সম্পাদক* : দিব্যজ্যোতি মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক
মুকুলেশ বিশ্বাস

সহকারী সম্পাদক
অনুশীলা দাশগুপ্ত, মন্দিরা ঘোষাল, উৎপলেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক
তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দোপাধ্যায় *চতুর্থ প্রচ্ছদ* : যামিনী রায়

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ : চিত্তপ্রসাদ

চিত্রাঙ্কন : শ্যামল জানা

অলঙ্করণ : প্রতাপ সিংহ, তুলসীদাস বসাক, রামচন্দ্র পণ্ডিত, শ্যাম রুদ্র

দাম : ত্রিশ টাকা

মুদ্রক
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

যোগাযোগের ঠিকানা :

বিপুল চৌধুরী, বিজনেস ম্যানেজার, ৭২ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, টালিগঞ্জ
কলকাতা-৭০০ ০৩৩

শুভেচ্ছা

বঙ্গাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষবরণ উপলক্ষে রাজ্য সরকারের তরফে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলা নতুন শতাব্দীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন আমরা পুরনো শতাব্দীর মূল্যায়নের প্রয়াস নেব তেমনই আগামী দিনের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞার রূপরেখা রচনার সুযোগ গ্রহণ করব। যে-শতাব্দী আমরা সদ্য পেরিয়ে এসেছি তা ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার মানুষের কাছে নানাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সঠিক আলোকে ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশিত হওয়া বর্তমান সময়ে খুবই জরুরি। ইতিহাসের ধারায় সঠিক পথে স্থির লক্ষ্য ও আদর্শকে পাথেয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পুরনো দিনে আমাদের যা কিছু উল্লেখযোগ্য উপার্জন তাকে যেমন সংহত করতে হবে তেমনই বিগত দিনের নেতিবাচক দিকগুলির যথার্থ সংশোধন করতে হবে। রাজনৈতিক সংগ্রাম, সামাজিক সংস্কার, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনেক গৌরবময় ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে। সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ ও নতুন সময়ের দাবিপূরণ আমাদের দায়িত্ব। বহু চিন্তাভাবনা ও আদর্শের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে বাংলার মাটিতে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে এখানে। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বহু মনীষীর ভাবনায় ও কল্পনায় এখানকার মানুষের চিন্তা ও চেতনা সমৃদ্ধ। সেই সব চিন্তা ও চেতনার লালন ও সম্প্রসারণের কাজে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

বহু ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গে বাস করে থাকেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে মজবুত করতে আমরা দায়বদ্ধ। বাংলার সংস্কৃতি নানা রূপে ও নানা শৈলীতে জাতীয় সংহতি-চেতনাকে দৃঢ় করে এসেছে এবং সেই কাজই করে যাবে।

"পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে পাঠকবর্গের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, এ আশা রাখি।

জ্যোতি বসু

মুখ্যমন্ত্রী

বিষয়সূচি

পুরাতন প্রসঙ্গ

সাম্প্রতিক ভাবনা

পুরাতন প্রসঙ্গ

আসন কাঁথা। যশোর। উনিশ শতকের শেষভাগ ॥ সংগ্রহ জয়নুল আবেদিন

শ্রীজগদীশ বসাকের সৌজন্যে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নববর্ষে

[আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিনে অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন। কবি তখন ছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। নতুন শতাব্দীর নববর্ষে কবির আন্তরিক ও মানবিক উচ্চারণ আজও সমান প্রাসঙ্গিক,—''করো সুখী, থাকো সুখে, প্রীতিভরে হাসিমুখে, পুষ্পগুচ্ছ যেন এক গাছে।''

পরবর্তী সময়ে 'নববর্ষে' কবিতাটি 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

—সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ]

নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন
বর্ষ হয় গত।
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।

বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,
ক্ষমা করো আজিকার মতো।
পুরাতন বরষের সাথে।
পুরাতন অপরাধ যত।

আজি বাঁধিতেছি বসি সংকল্প নূতন
অন্তরে আমার।
সংসারে ফিরিয়া গিয়া হয়তো কখন
ভুলিব আবার।

তখন কঠিন ঘাতে এনো অশ্রু আঁখিপাতে
অধমের করিয়ো বিচার।
আজি নব-বরষ-প্রভাতে
ভিক্ষা চাহি মার্জনা সবার।

আজ চলে গেলে কাল কী হবে না হবে
নাহি জানে কেহ।
আজিকার প্রীতিসুখ রবে কি না রবে,
আজিকার স্নেহ।

যতটুকু আলো আছে, কাল নিবে যায় পাছে,
অন্ধকারে ঢেকে যায় গেহ,
আজ এসো নববর্ষ দিনে
যতটুকু আছে তাই দেহো।

বিস্তীর্ণ এ বিশ্বভূমি সীমা তার নাই,
কত দেশ আছে!
কোথা হতে কয়জনা হেথা এক ঠাঁই
কেন মিলিয়াছে?

করো সুখী, থাকো সুখে, প্রীতিভরে হাসিমুখে,
পুষ্পগুচ্ছ যেন এক গাছে।
তা যদি না পার চিরদিন,
একদিন এসো তবু কাছে।

সময় ফুরায়ে গেলে কখন আবার
কে যাবে কোথায়।
অনন্তের মাঝখানে পরস্পরে আর
দেখা নাহি যায়।

বড়ো সুখ বড়ো ব্যথা চিহ্ন না রাখিবে কোথা,
মিলাইবে জলবিম্ব প্রায়,
একদিন প্রিয়মুখ যত
ভালো করে দেখে লই, আয়।

আপন সুখের লাগি সংসারের মাঝে
তুলি হাহাকার!
আত্ম-অভিমানে অন্ধ, জীবনের কাজে
আনি অবিচার।

আজি করি প্রাণপণ করিলাম সমর্পণ
এ জীবনে যা আছে আমার।
তোমরা যা দিবে তাই লব,
তার বেশি চাহিব না আর।
লইব আপন করি নিত্য ধৈর্যভরে
দুঃখভার যত।
চলিব কঠিন পথে অটল অন্তরে
সাধি মহাব্রত।

যদি ভেঙে যায় পণ, দুর্বল এ শ্রান্তমন
সবিনয়ে করি শির নত
তুলি লব আপনার 'পরে
আপনার অপরাধ যত।

যদি ব্যর্থ হয় প্রাণ, যদি দুঃখ ঘটে—
ক-দিনের কথা!
একদা মুছিয়া যাবে সংসারের পটে
শূন্য নিষ্ফলতা।

জগতে কি তুমি একা? চতুর্দিকে যায় দেখা
সুদুর্ভর কত দুঃখ ব্যথা।
তুমি শুধু ক্ষুদ্র এক জন,
এ সংসারে অনন্ত জনতা।

যতক্ষণ আছ হেথা, স্থিরদীপ্তি থাকো
তারার মতন।
সুখ যদি নাহি পাও, শান্তি মনে রাখো
করিয়া যতন।

যুদ্ধ করি নিরবধি, বাঁচিতে না পার যদি,
পরাভব করে আক্রমণ,
কেমনে মরিতে হয় তবে
শেখো তাই করি প্রাণপণ।

জীবনের এই পথ, কে বলিতে পারে
বাকি আছে কত?
মাঝে কত বিঘ্ন শোক, কত ক্ষুরধারে
হৃদয়ের ক্ষত?

পুনর্বার কালি হতে চলিব সে তপ্ত পথে,
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

ওই যায়, চলে যায় কাল-পরপারে
মোর পুরাতন।
এইবেলা, ওরে মন, বল অশ্রুধারে
কৃতজ্ঞ বচন।

বল্ তারে—দুঃখসুখ দিয়েছ ভরিয়া বুক,
চিরকাল রহিবে স্মরণ।
যাহা-কিছু লয়ে গেলে সাথে
তোমারে করিনু সমর্পণ।

ওই এল এ জীবনে নূতন প্রভাতে
নূতন বরষ।
মনে করি প্রীতিভরে বাঁধি হাতে হাতে
না পাই সাহস।

নবঅতিথিরে তবু ফিরাইতে নাই কভু,
এসো এসো নূতন দিবস!
ভরিলাম পুণ্য অশ্রুজলে
আজিকার মঙ্গলকলস।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পুরাতন লোকাচার

অষ্টমবর্ষীয় কন্যা দান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বী দানের ফল লাভ হয়, দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলন করিয়াছেন।.

ইহাতে এপর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে ? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিকৌশলে এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্তপুরুষ পর্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদি কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্য বিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়, ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমারদিগকে এ দুরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভ দিনই বা কতকালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধহয়, কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভ দিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্বদাই লিখন পঠন ও পর্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোন সদুপায় স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কত দিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সঙ্ঘর্ষণ করিলে কতক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কত দিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহের বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবেরই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপের বিশ্বরূপে এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবদ্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তিনিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যজাতীয়েরা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কত কাল পরে মনুষ্য জাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে, যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে; বর্তমান বিবাহ-নিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতামাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালের কন্যার ভাবি সুখ দুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন

সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতর চরিত্রপরিচয়ের কথা দূরে থাকুক; একবার অন্যোন্য নয়ন-সঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতা মাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এইজন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধনে অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শরীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষদ্বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীত-শৈশব জায়া-পতি-সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলমধ্যস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সবল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না, যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য বীজ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকাল বপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতিমধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল, এবং সেই সমুদায়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যাপি প্রায় সর্বজাতিমধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসঙ্গতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিমদেশীয়েরা যখন অনাবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখনি রাজকীয় সৈন্যশ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকতাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্যভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এইজন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমারদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্ত্য লোকের সহিত আমাদিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বাল্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদ্দেশীয় বালক বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশবকালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকট তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষসমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তন্যপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরস উপদেশসুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইউরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভালক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদ্দেশ হইতে বাল্যবিবাহের নিয়ম দূরীভূত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্রসন্তানেরা স্ব স্ব কন্যা-সন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্যান্য পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ সেই কন্যাদিগের পিতামাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহনিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতামাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি; তাঁহারা স্ত্রীজাতির

শিক্ষা দান বিষয়ে যেরূপ উদ্‌যোগ করিবেন, তদ্রূপ বাল্যবিবাহপ্রথার উচ্ছেদ করণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিলে আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমতঃ বিবাহঘটিত আমোদপ্রমোদ ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ক্ষয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ, গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দশ ভুবন শূন্যময় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিতান্ত পরাঙ্মুখতা না হইয়া, বরং বারবার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগুলি অপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দুরবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখন বা সহোদরদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আত্মীয়বর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্যপরিণয়প্রথা না থাকিলে বালক বালিকাদিগের দুষ্কর্মাসক্ত হইবার সম্ভাবনা। একথায় আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়াপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদাসৎ কর্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে অসদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর কোথায়? অতএব অপক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মনুষ্যের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবা-বেদনের বিধি দৃঢ়তররূপে প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডুষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর, তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গ বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ কত শত হতভাগা কুমারী উপবাসশর্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লান মুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয়-অবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারে দৃঢ়তা জন্মে যে, যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দুমাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন-পালন শরীর সংস্কারাদি দ্বারা পিতামাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয়দ্বারা পরগৃহে বিসর্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায্য কর্ম। আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতিবিগর্হিত পাপ কার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়-বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্য পরিণয়রূপ দুর্ণয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ে আমরা অদ্যকার পত্রিকায় যাহা লিখিলাম, ইহা কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।

"বিদ্যাসাগর রচনাবলী", ১৮৫০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

['বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থভুক্ত হয়। এই খণ্ডে মোট ২২টি প্রবন্ধ রয়েছে যার অধিকাংশই 'বঙ্গদর্শন' ও অল্প কয়েকটি 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়েছিল।

—সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ]

যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিন্‌কুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্‌হিম্‌ ও ওয়াটর্লু—ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকাই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল—অসার, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?

সেই সার কথা কোথা পাইব, বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শ্‌মান্ লেথব্রিজ্ প্রভৃতি চুট্‌কিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্‌হাজ্ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা। আর মিন্‌হাজ্ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি! আর মিন্‌হাজ্ উদ্দীনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবেরা সেই মিন্‌হাজ্ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন?

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। আরিস্‌টটল্ হইতে মিল্ পর্য্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত? যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর?

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে

প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখ্‌খরীন্ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে ?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই ?

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন্ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আমরা তাহার দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা আর্য্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালীই কি আর্য্য ? ব্রাহ্মণাদি আর্য্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারাও কি আর্য্যজাতি ? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসিল ? ইহারা কোন্ অনার্য্যজাতির বংশ, ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল ? আর্য্যেরা আগে, না অনার্য্যেরা আগে ? আর্য্যেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল ? কোন্ গ্রন্থে কোন্ সময়ে আর্য্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে ? পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে, আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্য্যাধিকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত। আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আদিশূরের পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় আর্য্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নহিলে বাঙ্গালী আধুনিক জাতি।

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশূরের কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টি রাজ্য ছিল, কোন্ কোন্ রাজা, প্রজারা কোন্ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে ?

মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্ব্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্ত্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল ? রাজশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত ? রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি ? রাজস্ব কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত ? কতপ্রকার রাজকর্ম্মচারী ছিল, কে কোন্ কার্য্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোনরূপে কার্য্য সমাধা করিত ? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল ? ধান্য কিরূপ হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ত্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কিরূপ ছিল ? চৌর্য্য, পূর্ত্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল ? কোন্ কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল,—বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্ব্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য, কোন্ ধর্ম্ম কত দূর প্রচলিত ছিল ? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কত দূর প্রবল ছিল ? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক,—স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি ? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ কি কি ? তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে ? বাঙ্গালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ? সমাজভয় কিরূপ ? ধর্ম্মভয় কিরূপ ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ ? বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্য্যে পারিপাট্য ছিল ? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত ? বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল ? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি ? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার কিরূপ ছিল ? কোন্ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত ? কোম্পস্ ও লগবুক্ ভিন্ন কি প্রকারে নৌযাত্রা নির্ব্বাহ করিত ? বালী ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর উপনিবেশ ? প্রমাণ কি ? ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত ?

তার পর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখ্‌তিয়ার খিলিজি কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কি প্রকারে জয় করিয়াছিল ? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল ? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল ? অবশিষ্ট অংশের কি প্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল ? কবে লুপ্ত হইল ?

পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজ্য। পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন ? যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল ? সেটুকু কিপ্রকারে শাসন করিতেন ? আমি যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কস্মিন্ কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দুরাজগণের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত ; যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি। ইঁহারাই দীনদুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইঁহারাই রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, দণ্ডবিধান করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিতেন। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত বরগুণ্ডী, আঁজু প্রবেন্স্ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzerain মানিত। কখন কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর। কোন্ রাজবংশ কোন্ কোন্ প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কর। তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখ।

ইউরোপ সভ্য কত দিন ? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ

সভা হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া; সে কোথা হইতে?

আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্ম্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আসলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল। বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই এঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মারহাট্টা প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে কার্য্যের স্থানে কজ্জ বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্য্যের স্থানে কায্যি বলে। বিদ্যুতের স্থলে বিজ্জুলও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক—প্রথম, বাঙ্গালার অনার্য্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর স্থানচ্যুত হইল? তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খুঁজিয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্য্য ভাষা কত দূর মিশ্রিত হইয়াছে। ঢেঁকি, কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আসিল? পঞ্চম, ফারসী, আরবী, ইংরেজি কোন্ সময়ে কত দূর মিশিয়াছে?

মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর? রাজ্যও একটু অধিক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফল কি হইল? মুর্শীদ্ কুলি খাঁ তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল? জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় তাহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ছিল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্ সময়ে কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল, কিন্তু জমীদারী সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দুদিগের করগত হইল কি প্রকারে? জমীদারদিগের কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ের জমীদারদিগের এবং বর্ত্তমান জমীদারদিগের কি প্রভেদ?

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব ধর্ম্মবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।

রাজনারায়ণ বসু

বাংলার ভাষা

এদেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলন যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জনে সমর্থ হইবে? ইহা সত্য যে এতাবৎকাল পর্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছে, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাঁহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত? বর্তমান কোনো পত্র সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এদেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোনো কোনো ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই, যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পর ভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড-ভূমি দ্বারা পূর্ণ করিবেন। কোনো দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আত্ম ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্যে তাঁহারা কি পর্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? এই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারি জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে।

মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপটিক তাহা এইক্ষণকার দুই শত বর্ষ পূর্বে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধিকারকালে যে সকল নগর গ্রীকনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্বার দেশভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু সংখ্যাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংস্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসিক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এইরূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান্ জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্যরূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতিভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অনাথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিসিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশভাষা সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না—নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এ মনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।

আমারদিগের দেশ ভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্ব পক্ষ করেন, তাঁহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত পূর্বোক্ত যুক্তি সকল প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে, 'সেই বাঞ্ছিতকাল কোন্ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।' হা! ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোনো পদার্থই সমাদরযোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু নাম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চিত্তপ্রমোদকারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেন, আর আমারদিগের ইংরাজী ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ্য বোধ করেন না।—সে যে কি দুর্লভ অমূল্য রত্নাকর, তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ ইঁহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার। ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যকও বোধ করেন না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি কোন্ দেশের কোন্ স্থানে কি নগর? কোন্ বৎসরে তাহা নির্মিত হইয়াছে। তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে? তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্মভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন? এই কলিকাতা নগরীর বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ জ্ঞাত নহেন। পূর্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল? তাঁহারদিগের কোন্ বংশের কোন্

রাজা কোন্ দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্ দিন কি কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর কয় মাস পর্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছেন? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ পর্যন্ত তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম পূর্বক শিক্ষা করেন; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল? পূর্বে কোন্ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম ছিল? কি কি বিদ্যা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে, কি আক্ষেপের বিষয়। ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, জার্মাণি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রচিন বা আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন কোন্ গ্রন্থকর্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী! নেবোরের রোমান্ ইতিহাস ও থরল্ ওয়ালের গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে? এসিয়াটিক রিসার্চ ও এসিয়াটিক সমাজের জর্নেল গ্রন্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?

যাঁহারদিগের এইরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা? ইহা কি তাঁহারদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য বেদনা বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোনো মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্‌ঘাটন করেন? বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজী ও ইংরাজী বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়—প্রেমামৃত রস সাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশব কালে স্নেহমিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্যক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগী মিত্রদের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধি সহিত সুহৃদ্ মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, সম্পদ যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্বত, মৃত্তিকা পর্যন্ত আমারদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই—যে নাম চিন্তামাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে। যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে! 'কাশ্মীরের নির্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন' কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমিবাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পূর্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনোই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্ধ শ্রুত না হয় যে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী?' বীর্যবান্ গ্রীক জাতি ও জয়পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, কিন্তু অমরকীর্তি পাণ্ডুপুত্র ও যুদ্ধদুর্মদ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে। সেক্‌সপিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতিবরণীয় বটে, কিন্তু আমারদিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্যভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে। হোমর ও বর্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন, এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা ইংরাজী ও জর্মাণ, অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?

যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক উদ্দেশ্য; তথাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী-পর্বত মৃত্তিকা পর্যন্ত আমারদিগের প্রীতি পাত্র সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষা প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তনদুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য প্রকাশ করে। এই প্রকরণ লেখকের কোনো মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পর ভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্তি হয় না, এবং আত্ম ভাষার অনুশীলন বিনা কোনো দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্তী পারসিক দেশে যে পর্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্ট রূপে প্রচার ছিল, সে পর্যন্ত সে দেশে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফেরদোষী আত্মভাষাতে শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃত রসপূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোনো ব্যক্তি সুযশস্বী গ্রন্থকর্তারূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জিল ও হোরেস, এবং লিবি ও সিসিরো ইঁহারা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্মণি দেশেতে কীর্তিমান ফ্রেডারিক রাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্যন্ত সে দেশে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতাদ্বারা আপনার দেশভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থকর্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্যোদ্ভব রচনাসকল প্রকাশ করিয়া মানবজাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেশে যতদিন নর্মাণ ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, ততদিন সে দেশে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতাসকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থসকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইওরোপখণ্ডে যে পর্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্তি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম গ্রন্থসকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক সেই কালের অনুকাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন,

পোর্টুগেল, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইওরোপখণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্মভাষাতে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থসকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্মসন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত বেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমাদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা আমারদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাব সকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমারদিগের দেশভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক সম্ভব, কারণ তাহার বর্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।

More perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either.

Sir W. Jones' Worsk

অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবকগণ! আমারদিগের দেশভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোনো লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু অনেক ইংরেজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতেই তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে সর্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন ও লাক, টিউটন ও লাপ্লাস, কুবিয়র ও হম্বোল্ট প্রভৃতি সর্ববিধ শাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যাসকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ববিবেচনাতে দেশ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্তমান কালে ইউরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষাসকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যকরূপে উপার্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এ দেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকল বিদ্যার আধার ও বর্তমান দেশভাষা সকলেরও আধারস্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থানবিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ ও জার্মাণ এবং সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক ভাষা সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে পারে। এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশভাষার পাঠশালা সকল স্থাপন করা আরও প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেন্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজকার্যের অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আচ্ছাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা বিতরণে কিরূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে—জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি সংস্কারে তাহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক অজ্ঞাতে যা হইবে, সহস্র সহস্র প্রজার যুগপৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজকার্য দেশভাষাতে সম্পন্ন হইবে, আপনা হইতেই কত লোক আত্মভাষা শিক্ষাতে সযত্ন হয়েন। যদি বল গবর্ণমেন্ট এ উপায় অগ্রেই করিয়াছেন—অগ্রেই তাঁহারা শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্যে দেশভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে একশত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে। এই উভয় বিষয়েই তাহাদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে করিতে পারেন, যে তাঁহারা কেবল এ বিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় বিচারালয় সকলে বঙ্গভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সেই নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এই ক্ষণে যে ভাষাতে সেসকল বিচারালয়ের কার্য নির্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গালা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দি নহে, পারসীক নহে কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাতস্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোনো লিপি এ পর্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোনো কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারালয়ের লিপি কর্মচারী! জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয় ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের যোগ্য নহে। পূর্বোক্ত একশত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টের লেশমাত্রেও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বোক্ত ঐ একশত বাংলা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই শিক্ষা নাই এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই অথচ তাহার কার্য সফল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? একজন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা যখন গবর্ণমেন্টের আপন সন্তান, আর বাংলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্ম সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এ দেশে দেশভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেন্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র। ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন—আমারদিগের সর্বস্বের পরিবর্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যাদান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্বস্থানে পাঠশালা সকল স্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট উপায়ে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। গুরু কার্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য সিদ্ধ হইবেক। ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশভাষার উপযুক্ত শিক্ষকসকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্জ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন এবং সম্যক যত্নপূর্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক; এবং দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাধা বিরোধ আছে তখন তাহা কার্য দ্বারা খণ্ডিত হইয়া চতুর্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", ১৭৭০ শক, শ্রাবণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবযুগ

আজ অনুভব করছি, নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেছে বৃহতের দিকে, মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদঘাটন করে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা ; এই হল মানুষের ধর্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে সত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করে না, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে অথচ মিলতে পারে নি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায় নি— সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

আমি যখন জাপানে গিয়েছিলেম তখন একজন জাপানি বৌদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য, যেমন সত্য এই আকাশের আলোক ; এ তো কেবল কল্পনা নয়, ভাব নয়। আলোক একান্ত সত্য বলেই তরুলতা জীবজন্তু প্রাণ পেয়েছে, সমস্ত শ্রী সৌন্দর্য সম্ভব হয়েছে। এই আলোক যেমন সত্য তেমনি সত্য এই মৈত্রী, প্রেম। আমার অন্তরেও সত্য, বাহিরেও সত্য। তিনি বললেন, আমি জানি, এই-যে গাছপালা নিয়ে আমি আছি এ কাজ মালীও করতে পারত ; কিন্তু সে ঐ প্রেমের সত্যটিকে স্বীকার করতে পারত না ; সে কেবল তার কর্তব্য করে যেত, ভালোবাসার সত্য থেকে সে গাছকে বঞ্চিত করত। যে একটি সত্য আছে বিশ্বের অন্তরে ভালোবাসার দ্বারা আমি তার উদ্রেক করছি, তাইতে আমার কাজ পূর্ণ হয়েছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না'এর সমষ্টি ; কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরে ও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে 'না' নয়—'হাঁ'। মুক্তি তার মধ্যেই। সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার, অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঙর্থক। মানুষের জীবনে যেখানে প্রেমের শক্তি, ত্যাগের শক্তি সচেষ্ট সেখানেই সে সার্থক ; নইলে সে আপন নিত্যরূপ পায় না, পদে পদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীর্ণ হয়ে পড়ে। যেখানে সমাজের কেন্দ্রস্থল থেকে সেই প্রেম নানা কর্মে সেবায় আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই মানুষের সমাজ কল্যাণে শক্তিতে সুন্দর ; যেখানে প্রেমের অভাব সেখানেই বিনাশ।

ভারতবর্ষে এক সময়ে আর্য ও অনার্যের সংগ্রামে মানুষের সত্য পীড়িত হয়েছিল ; ভারতবর্ষ তখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। তার পরে আর-একটা যুগ এল। রামায়ণে আমরা তার আভাস পাই, তখন আর্য-অনার্যের যুদ্ধের অবসান হয়ে মিলনের কাল এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র সেই মিলনের সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন, এমন অনুমান করবার হেতু আছে। আমরা আরও দেখেছি, একসময় যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম কর্মকাণ্ড আকারে প্রধান হয়ে উঠেছিল অন্য সময়ে সে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করে বিশ্বভৌমিকতাকে বরণ করেছে। তখন এই বাণী উঠল যে, নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আত্মপীড়ন নয়, সত্যই তপস্যা, দান তপস্যা, সংযম তপস্যা। ক্রিয়াকাণ্ড স্বভাবতই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ; সে সকলের নয়, সে বিশেষ দলের অনুষ্ঠান, সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। যে ধর্ম শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলিত তাতে কার কী প্রয়োজন! অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আপনার প্রাণ আহুতি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ যে অদ্ভুত কর্ম করল তাতে কার কী এল গেল! কিন্তু, যিনি সত্যকার যোগী সকলের সঙ্গে যোগে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত ; তিনি বললেন, যা-কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালোর জন্য, তাই তপস্যা। তখন বদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। দ্রব্যময় যজ্ঞে মানুষ শুধু নিজের সিদ্ধি খোঁজে ; জ্ঞানযজ্ঞে সকলেরই আসন পাতা হল, সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে। এই কথা স্বীকার করবা মাত্র সভ্যতার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভগবদ্গীতায় আমরা এই নূতনের আভাস পাই, যেখানে ত্যাগের দ্বারা কর্মকে বিশুদ্ধ করবার কথা বলা হয়েছে, নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে বলে নি। ইহুদিদের মধ্যেও দেখি, ফ্যারিসিরা সংস্কার ও অনুষ্ঠানকেই বড়ো স্থান দিয়ে আসছিল। যীশু বললেন, এ তো বড়ো কথা নয়— কী খেলে কী পরলে তা দিয়ে তো লোক শুচি হয় না, অন্তরে সে কী তাই দিয়ে শুচিতার বিচার। এ নূতন যুগের চিরন্তন বাণী।

আমাদের যদি আজ শুভবুদ্ধি এসে থাকে তবে সকলকেই আমরা সম্মিলিত করবার সাধনা করব। আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশ্বদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত ক'রে হীন ক'রে রেখে পুণ্য বলি কাকে!

আমি এক-সময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগ্ণ হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক পাশ দিয়েই শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁল না। সেই অজ্ঞাত-

কুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্যমাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে! জাত বলে একটা কোন্ পদার্থ তাদের আছে মানব-জাতীয়তার চেয়েও তাকে বড়ো বলে জেনেছে। যদি কারো মনে দয়া আসত, সেই দয়ার প্রভাবে সে যদি তার বারুণীস্নান ত্যাগ করে ঐ মানুষটিকে নিজের ঘরে নিয়ে সেবা করত, তা হলে সমাজের মতে কেবল যে বারুণীর স্নানের পুণ্য সে হারাতো তা নয়, সে দণ্ডনীয় হত, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার ঘরে এসে রোগী যদি মরত তা হলে সমাজে সে বিষম বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে মানবধর্ম সকল নিরর্থক আচারের বহু ঊর্ধ্বে তাকে দণ্ড মেনে নিতে হবে আচারীদের হাতে!

একজন প্রচীন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয়রোগে-পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বললে, পারব না। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় রাত্রে শিলাবৃষ্টি হল; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে ম'রে প'ড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এতবড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে। মানুষকে ভালোবাসায় অশুচিতা, তাকে মনুষ্যোচিত সম্মান করায় অপরাধ! আর জলে ডুব দিলেই সব অপরাধের ক্ষালন! এর থেকে মনে হয়, যে অভাব মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো অভাব সে প্রেমের অভাব। সে প্রেমের অভাবকে হৃদয়ে নিয়ে আমরা যাকে শুচিতা বলে থাকি তাকে রক্ষা করতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে পারি নে।

আশা করি, দুর্গতির রাত্রি-অবসানে দুর্গতির শেষ সীমা আজ পেরোবার সময় এল। আজ নবীন যুগ এসেছে। আর্যে-অনার্যে একদা যেমন মিলন ঘটেছিল, শ্রীরামচন্দ্র যেমন চণ্ডালকে বুকে বেঁধেছিলেন, সেই যুগ আজ সমাগত। আজও যদি আমাদের মধ্যে প্রেম না আসে, কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মানুষের থেকে মানুষকে দূর করে রাখে, তবে বাঁচব কী ক'রে! রাউণ্ড্ টেবিলে গিয়ে, ভোটের সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে? পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই, তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের উপর চেপে বসবে না?

মানুষকে কৃত্রিম পুণ্যের দোহাই দিয়ে দূরে রেখেছি, তারই অভিশাপে আজ সমস্ত জাতি অভিশপ্ত। দেশ-জোড়া এতবড়ো মোহকে যদি আমরা ধর্মের সিংহাসনে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করে বসিয়ে রাখি তবে শত্রুকে বাইরে খোঁজবার বিড়ম্বনা কেন!

নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না, যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলছে, এখনও তার শেষ হয়নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা করে আমরা স্বাধীনতা পাব না; কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্যবস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা, কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলেছেন, যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সংকোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতো এতবড়ো সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য করে গ্রহণ করতে পারি।

৭ পৌষ ১৩৩৯ — মাঘ ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
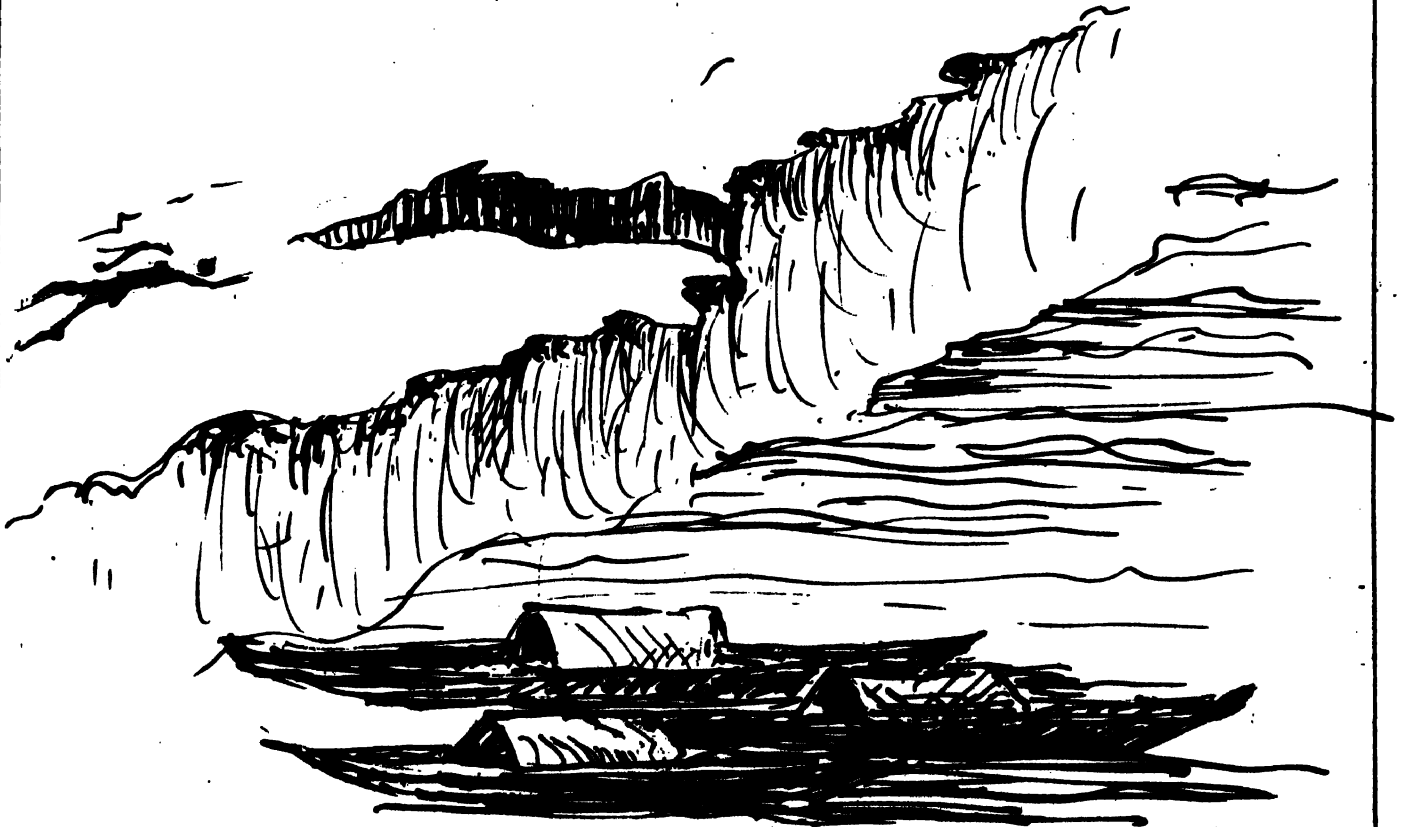
ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা

সর্বপ্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি।

ভাষামাত্রেরই একটা জন্মাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কটল্যাণ্ডের ও ওয়েল্‌সের লোকে সাধারণত আপন স্বজন-পরিজনের মধ্যে সর্বদাই যে-সব শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাকে তারা ইংরেজি ভাষার মধ্যে চালাবার চেষ্টামাত্র করে না। তারা এই সহজ কথাটি মেনে নিয়েছে যে, যদি তারা নিজেদের অভ্যস্ত প্রাদেশিকতা ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় তা হলে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে। কখনো কখনো কোনো স্কচ লেখক স্কচ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন কিন্তু সেটাকে স্পষ্টত স্কচ ভাষারই নমুনাস্বরূপে স্বীকার করেছেন। অথচ স্কচ ও ওয়েল্‌স্ ইংরেজের সঙ্গে এক নেশনের অন্তর্গত।

আয়রল্যাণ্ডে আইরিশে-ব্রিটিশে ব্ল্যাক্ অ্যাণ্ড ট্যান নামক বীভৎস খুনোখুনি ব্যাপার চলেছিল কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নি। সেদিনও আইরিশ কবি ও লেখকেরা যে ইংরাজি ব্যবহার করেছেন সে অবিমিশ্র ইংরেজিই।

ইংরেজিতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত jungle—সেই অজুহাতে বলা চলে না, তবে কেন অরণ্য শব্দ চালাব না! ভাষা খামখেয়ালি, তার শব্দ-নির্বাচন নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো-এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।

উর্দু ভাষায় পারসী ও আরবী শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের মিশল চলেছে—কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। ঘোরতর পণ্ডিতও উর্দু লেখার কালে উর্দুই লেখেন, তার মধ্যে যদি তিনি 'অপ্রতিহত প্রভাবে' শব্দ চালাতে চান তা হলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে য়ুরেশীয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন ঘরে আমরা ওই কথাই ব্যবহার করে থাকি তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসংগত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাঙালি য়ুরেশীয়কে আমরা দূরে রাখা অন্যায় বোধ করি। খুশি হব তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশীয় বাংলা হয়ে ওঠে তা হলে ধিক্কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে।

১১ চৈত্র ১৩৪০

২

আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের দেশ-ভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোনো সভ্য দেশে দেখা যায় নি। এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এত বড়ো স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জা বোধ করি। বাংলা দেশের মুসলমানকে যদি বাঙালি বলে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশপ্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না'ক'রে উপায় কি? বেলজিয়মে জনসাধারণের মধ্যে এক দল বলে ফ্লেমিশ, অন্য দল ফরাসি; কিন্তু ফ্লেমিশভাষী লেখক সাহিত্যে যখন ফরাসি ভাষা ব্যবহার করে, তখন ফ্লেমিশ শব্দ মিশিয়ে ফরাসি ভাষাকে আবিল করে তোলবার কথা কল্পনাও করে না। অথচ সেখানকার দুই সমাজের মধ্যে বিপক্ষতা যথেষ্ট আছে। উত্তর-পশ্চিমে, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সে-সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দু ব্যবহার করে থাকেন, তাঁরা আড়াআড়ি করে উর্দুভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসংগতভাবে মিশল করতে থাকবেন, তাঁদের কাছ থেকে এমনতর প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারি নে। এ রকম অদ্ভুত আচরণ কেবলই কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশে? আমাদের রক্তে এই মোহ মিশ্রিত হতে পারল কোথা থেকে? হতভাগ্য এই দেশ, যেখানে ভ্রাতৃবিদ্রোহ দেশবিদ্রোহে পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের সম্পদকে নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের সুবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে দুর্দিনে সে কথাও মানুষ যখন ভোলে তখন সাংঘাতিক দুর্গতি থেকে কে বাঁচাবে?

১৭ বৈশাখ ১৩৪১

৩

ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতাই থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথার আমদানি করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী আরবী শব্দের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজি শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করছে। ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে এই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না। ইংরেজি ভাষার দিকে তাকিয়ে দেখলে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। ওয়েল্‌স আইরিশ স্কচ ভাষা ইংরেজি ভাষার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, ব্রিটেনের ওই-সকল উপজাতিরা আপন আত্মীয়মহলে ওই-সকল উপভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে স্বভাবতই ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু যে সাধারণ ইংরেজি ভাষা তাঁদের সাহিত্যের ভাষা ওই শব্দগুলি তার আসরে জবরদস্তি করতে পারে না। এইজন্যেই ওই সাধারণ ভাষা আপনি নিত্য আদর্শ রক্ষা করে চলতে পেরেছে। নইলে ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে নিয়ত তার বিকার ঘটত। খুনখারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করে নি, : কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ওই অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ওই অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। শক্তিমান মুসলমান লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্যব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশলাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে.....।

৬।৯।৪০

[এই তিনটি পত্র বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান। প্রথম পত্রটি প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায় 'মক্তব-মাদ্রাসা'র বাংলা নামে প্রকাশিত হয়। এম এ আজানকে লিখিত। দ্বিতীয় পত্রটি আলতাফ চৌধুরীকে ও তৃতীয় পত্রটি আবুল ফজলকে লিখিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯১ থেকে 'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক পত্র তিনটি গৃহীত হয়েছে।] সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ

শিল্পী : সোমনাথ হোর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

[আচার্য ত্রিবেদীর এই ব্রতকথাটি ১৩১২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো-কান্দি গ্রামের অর্দ্ধসহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণুমন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন ; প্রস্তোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্ত্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।"

—সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ]

বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ব্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ কর্‌লেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্‌লেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরমসুখে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময় মর্ত্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়্‌তে লাগ্‌ল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য কর্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়্‌তে হ'ল। তখন বাঙলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; বাঙলায় অনাচার ঘটেছে; আমি বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেম। রাজা কেঁদে বল্‌লেন,—না মা, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি কর্‌ছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব'সে পশ্চিমদেশে কনোজে লোক পাঠালেন; কনোজ থেকে পাঁচ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ জন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাঙলাদেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। বাঙলার ধন দেখে ধান দেখে মোছলমান বাঙলায় এলেন। তখন বাঙলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাঙলায় রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতিধর্ম্ম নষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মস্‌জিদ্ তুলতে লাগ্‌লেন। অর্দ্ধেক হিঁদু মোছলমান হ'ল। হিঁদু-মোছলমানে এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস ক'রে মারামারি-কাটাকাটি করতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী ভাব্‌লেন, হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাঙলাতে গৌড়ের পাঠান-বাদশা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হোসেনশা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমার হিঁদুও যেমন, মোছলমানও তেম্‌নি; হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি-কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌ল, আমি বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেম। পাঠান রাজা কেঁদে বল্লেন—মা, তুমি যেতে পাবে না; আমি হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌ব; তদের ভাই-ভাই একঠাঁই কর্‌ব; তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বল্লেন—আচ্ছা, তাই হবে; আমি এখন থাক্‌ব; দিল্লীতে মোগল বাদশা হবেন। দিল্লীর বাদশা বাঙলার রাজা হবেন; সেই রাজা হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌বেন; তখন হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য ক'রে রাজমন্ত্রী কর্‌লেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় সিন্নি দিতে লাগ্‌ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হ'লেন। তিনি যবন ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগল বাদশা বাঙলার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগ্‌লেন। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া-বিবাদ মিটে গেল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

এইরূপে বহুদিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আলমগির। তিনি হিঁদু-মোছলমানে তফাত করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদশার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাত সমুদ্র পার হ'য়ে খৃষ্টান ইংরেজ সদাগর বাঙলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর ক'রে নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিয়েছিলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন আলমগিরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাঙলার দেওয়ান ক'রে দিলেন। বাদশার দশা দেখে বাদশাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে তারাই হ'ল বাঙলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল; কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাঙলাদেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চল্‌ল। সাগরের জাত কি না, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত্ত। তারা চোরডাকাত দমন কর্‌ল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগ্‌ল, আবার নিজের দেশ হ'তে খেলেনা এনে, পুঁতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন, তখন মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়। বাঙলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়ামানুষে শিশু সাজ্‌ল; ইংরেজের দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। সদাগর রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাঙলার প্রজা কাঞ্চনবদলে সেই কাঁচ নিতে লাগ্‌ল। দেশের জিনিষে লোকের মন উঠে না। ঝুঁটোমণির রঙ দেখে দেশের সাচ্চামণিকে অনাদর করতে লাগ্‌ল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজতে লাগ্‌ল। রাজা হাততালি দিতে লাগলেন; দেশের যত বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী বল্‌লেন—আর না, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, বাঙলার লোকের এই দশা, আমার আর বাঙলায় থাকা চল্‌লো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেন। আঁধার

রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। তখন সাত কোটি বাঙালী কেঁদে উঠ্‌ল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠ্‌ল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হ'লেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আলমগির বাদশার তক্তে ব'সে সে আপনাকে আলমগিরের নাতি ঠাওরা'ত। সে বল্‌লে, এরা বড় ঘ্যানঘ্যান্ করছে; থাক্, এদের দু-দল ক'রে দিচ্ছি; এক দিকে থাক্ মোছলমান, এক দিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই একঠাঁই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙ্গে দাও। এই ব'লে তিনি বাঙালীকে দু-দল ক'রে দিলেন,—এক দিকে গেল হিঁদু, এক দিকে গেল মোছলমান। পূবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাক্‌ল হিঁদু।

লক্ষ্মী দেখ্‌লেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চল্‌ল না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেম্‌নি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হ'ল, তখন আর আমার বাঙলায় থাকা চল্‌লে না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সে দিন বড় দুর্দ্দিন, সেই দিন রাজার হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে; দু-ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর; বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না; তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করতে চাইলেন; আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না; মা, তুমি কৃপা কর; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব; আর পুঁতুলখেলা করব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিন্‌ব না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌ব না; মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া কর্‌লেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সে দিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্য্যোগ। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হুহু ক'রে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে, মা, আমাদের রক্ষা কর। বাঙলার লক্ষ্মী যেন বাঙলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌ব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্‌তে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠলেন—জয় হউক, জয় হউক; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন; বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাক্‌বেন; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না; ঘরের থাক্‌তে পরের নিয়ো না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না; তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়্‌ছিলেন। ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হ'লেন। বাঙলার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সে দিন উনুন জ্বল্‌ল না। হিঁদু মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হলদে সুতোর রাখী বাঁধ্‌লে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

বছর-বছর ঐ দিনে বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বল্‌বে না। হাতে হাতে হলদে সুতোর রাখী বাঁধ্‌বে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকবেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই॥
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই॥
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই॥

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পর্‌বো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুল্‌বো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার হাওয়া বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙলার ঘর, বাঙলার মাঠ,
বাঙলার বন, বাঙলার হাট,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্।

বন্দে মাতরম্

অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্ব্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দূর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রা-রঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।

প্রমথ চৌধুরী

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান

[প্রমথ চৌধুরীর 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধটি মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩০ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে ৭৩ সংখ্যক গ্রন্থ হিসেবে ১৩৬০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। —সম্পাদক, 'পশ্চিমবঙ্গ']

১

বহু লোকের ধারণা যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা এ দেশে এতকাল ধরে চলে আসছে যে, আজকের দিনে সে বিরোধকে মিলনে পরিণত করবার কোনো সহজ উপায় নেই। যে বিরোধের মূল অতীতে নিহিত, আর যে বিরোধ যুগ-যুগান্তর ধরে ক্রমশ বৃদ্ধি ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছে, সে বিরোধ শুধু মুখের কথায় কিংবা কাগজের লেখায় দূর করা যাবে না।

যে বিরোধ আজকের দিনে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে মূলত তা ঐতিহাসিক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষের যে যুগকে আমরা মুসলমান যুগ বলি, সে যুগের ইতিবৃত্ত আমরা অনেকেই জানি নে। এমনকি, ভারতবর্ষের এই নিকট-অতীতের অপেক্ষা তার দূর-অতীত আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে অধিক পরিচিত। যদিচ মুসলমান-যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, হিন্দু-যুগের নেই।

এর একটি কারণ এই যে, মুসলমান-যুগের কোনো হিন্দু-ইতিহাস নেই। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন যে, এই সাত শ বৎসরের ভিতর এমন একখানিও হিন্দু-দলিল লিখিত হয় নি যার সাহায্যে এ যুগের ইতিহাস গ'ড়ে তোলা যায়; এ যুগের দলিল ফারসিতে এবং মুসলমানের রচিত।

এ কালের ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুরা ফারসি ভাষা জানেন না, এমনকি সে ভাষার অক্ষরের সঙ্গে পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় নেই। এ যুগ সম্বন্ধে আমাদের মনে যা-কিছু অস্পষ্ট ধারণা আছে, সে ধারণা আমরা লাভ করেছি স্কুলপাঠ্য টেক্স্‌ট বুক-এর প্রসাদে। বলা বাহুল্য, টেক্স্‌ট বুক কেউ পড়ে না, সকলেই তা মুখস্থ করে; আর পরীক্ষা-পাশের সঙ্গেসঙ্গেই সে বিদ্যা আমরা মাথা থেকে যত শিগ্‌গির পারি বহিষ্কৃত করে দিই। অতঃপর 'ভাণ্ডানুসারী স্নেহবৎ' অর্থাৎ তেলের ভাঁড় থেকে তেল ফেলে দিলে তার অভ্যন্তরে যেমন কিঞ্চিৎ তেল লেগে থাকে সেইরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে জড়িয়ে থাকে।

ফলে আমরা যখন ভারতবর্ষের মুসলমান-যুগ সম্বন্ধে লেখায় ও বক্তৃতায় স্নেহ প্রকাশ করি, তখন তা 'ভাণ্ডানুসারী স্নেহবৎ'ই গাঢ় হয়। এই তো গেল আমাদের হিন্দুদের কথা। আমাদের শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাদেরও যে উক্ত যুগ সম্বন্ধে কোনোরূপ বিশেষ জ্ঞান আছে তা বোধ হয় না।

তাঁদের কথা শুনে মনে হয় যে, তাঁদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষের মুসলমান, মাত্রই মোগল-পাঠানের বংশধর; যেমন অনেক হিন্দুর বিশ্বাস যে, হিন্দুমাত্রেই মুনিঋষিদের বংশধর। এ উভয় বিশ্বাসই সমান সমূলক; অর্থাৎ অধিকাংশ হিন্দুও যাদৃক্ আর্যবংশী, অধিকাংশ মুসলমানও তাদৃক্ রাজবংশী। এসব অদ্ভুত ধারণা মানুষের মন থেকে দূর করবার চেষ্টা অবশ্য পণ্ডশ্রম, বিশেষত এ যুগে। কেননা, এ যুগে বিশ্বমানবের যুগধর্ম হচ্ছে কুলজি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করা। ইংরেজরা দাবি করেন যে তাঁরা জর্মনবংশীয়, আর ফরাসিরা বলেন যে তাঁরা ল্যাটিনবংশীয়। এসব দাবির একমাত্র সুফল হচ্ছে পরস্পরের ভিতর আবার নূতন করে মানসিক বিরোধের সৃষ্টি। মানুষের পক্ষে তার origin খোঁজটা বড় সুবুদ্ধির কাজ নয়। কেননা, তাতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। পূর্বপুরুষের সন্ধানে অতীতের মাটি বেশি খুঁড়লে মানুষ নাকি আবিষ্কার করতে বাধ্য যে, আদিম নর হচ্ছে বানর। অন্তত, এই তো বৈজ্ঞানিকদের মত।

সে যাই হোক, এ কথার ভুল নেই যে মুসলমান-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণত এ যুগের শিক্ষিত হিন্দু অজ্ঞ এবং শিক্ষিত মুসলমান বিশেষজ্ঞ নন।

তার পর ঐতিহাসিকদিগের মুখে আর-একটি কথা শুনতে পাই যে, মুসলমান-যুগে বাংলার কোনো ইতিহাস নেই। বক্তিয়ার খিলিজির আগমন থেকে পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাংলা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ-মারামারি-কাটাকাটিকেই যাঁরা ইতিহাসের একমাত্র সম্বল মনে করেন তাঁদের মতে বাংলার নবাবি আমল হচ্ছে ইতিহাসবর্জিত যুগ। ফারসি-নবিশ হলেও এ যুগের বিশেষ-কোনো বিবরণ জানবার জো নেই। বাংলার ফারসি ইতিহাস খুব কমই আছে; আর যে দু-চারখানি আছে সে দু-চারখানিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অতএব ঐতিহাসিকদিগের মতে এ সাত শ বৎসর বাঙালি জাত যে বেঁচে ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের বহুকাল থেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাত। বাঙালির এতে কোনো দোষ নেই, কেননা হিন্দুমাত্রেই আত্মবিস্মৃত জাত। বাংলার বিশেষত্ব এই যে, প্রায় হাজার বৎসর ধরে বাংলা ভারতবিস্মৃত দেশ হয়ে পড়েছিল। বক্তিয়ার খিলিজির স্পর্শে এ দেশ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, আর ইংরেজের স্পর্শে তার আবার জ্ঞান হয়েছে—এই হচ্ছে ঐতিহাসিকদিগের ধারণা।

বাঙালি মুসলমান-যুগে বাংলার ইতিহাস না গড়ুক বাংলা সাহিত্য গড়েছে, এবং সেই সাহিত্য থেকে বাঙালি-জীবনের ইতিহাস না পাওয়া যাক, তার মনের ইতিহাস কতকটা পাওয়া যায়। যাকে আমরা মানবসমাজের বাহ্যঘটনা বলি তার মূলে আছে মানুষের মনোভাব, আর বাহ্যঘটনাও মানুষের মনের উপর তার ছাপ রেখে যায়। সুতরাং মুসলমান-যুগের বাংলা সাহিত্যে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাও কতকটা অনুমান করা যায়।

এই দুই জাতি এই সাত শ বৎসর ধরে পরস্পর যদি শুধু মারামারি-কাটাকাটি করত তা হলে উক্ত যুগের বাংলা সাহিত্যে তার কতকটা আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। যদিচ বাংলা সাহিত্য হিন্দুর রচিত সাহিত্য তবুও সে সাহিত্যে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর তাদৃশ বিদ্বেষভাবের পরিচয়

পাওয়া যায় না। এর থেকে অনুমান-করা অসংগত হবে না যে, যে কালে বাংলা সাহিত্য জন্মলাভ করে অন্তত সে সময় এ দেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মোটের উপর মিলে-মিশে বাস করতে শিখেছিল, এবং তাহাদের পরস্পরের ভিতর যেসব বিরোধের কারণ ছিল তার একটা আপসমীমাংসা তারা করে নিয়েছিল।

জেতা ও জিতের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় জন্মানোটা স্বাভাবিক নয়। বিশেষত যে ক্ষেত্রে জেতা হচ্ছেন যুগপৎ বিদেশী ও বিধর্মী। সুতরাং সেকালে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সম্পূর্ণ মনের মিলন যে ঘটে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ফলে এ দেশে যে একটা বড়গোছের সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আমার ধারণা, মুসলমান বাদশারা বাঙালির সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ-কোনো হস্তক্ষেপ করেন নি। অন্তত তাঁরা যে বাঙালির মনের উপর বিশেষ কোনোরকম জবরদস্তি করেন নি তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য ; ও সাহিত্য কতক অংশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেরই জের টেনে নিয়ে এসেছে, আর কতক অংশে হিন্দুসমাজে যেসকল নূতন ধর্মমত জন্মলাভ করেছিল তারই আশ্রয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবধর্ম, শাক্তধর্ম, চণ্ডীর উপাখ্যান, মনসার উপাখ্যান এই সবই হচ্ছে বঙ্গসাহিত্যের উপাদান ও অবলম্বন। এর থেকে দেখা যায় যে, মুসলমান-যুগে অন্তত বঙ্গদেশে হিন্দুসম্প্রদায় তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে। মুসলমানের ভাষাও বাংলা ভাষাকে রূপান্তরিত করতে পারে নি। আধা প্রাকৃত ও আধা ফারসি উর্দু নামক বর্ণসংকর ভাষাও বাংলাদেশে জন্মলাভ করে নি। তাই মনে হয় যে, বাঙালির জীবনে ও মনে মুসলমানধর্ম ও মুসলমান-রাজশক্তি বিশেষ কোনো শক্তি প্রয়োগ করে নি।

সাধারণত বাঙালির ধারণা যে, চণ্ডীদাসই বঙ্গসাহিত্যের আদিকবি, এবং এ বিশ্বাস ত্যাগ করবার বিশেষ-কোনো কারণ নেই। সম্প্রতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে কতকগুলি বৌদ্ধ দোঁহা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু শূন্যপুরাণ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। শুনতে পাই, এই দোঁহাবলী এবং এই পুরাণই বাংলাভাষার আদি পদাবলী ও আদি কাব্য। শূন্যপুরাণ কবে লিখিত হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেন না। উক্ত পুরাণের এক অংশে মুসলমান কর্তৃক জাজপুরের মন্দিরভঙ্গের একটি নাতিহ্রস্ব বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, এ বর্ণনা হিন্দু-যুগে লিখিত হয় নি, এবং শূন্যপুরাণের উক্ত অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত ব'লে উড়িয়ে দেবারও জো নেই। কেননা, যে ভাষার উপর ভিত্তি ক'রে উক্ত পুস্তকের প্রাচীনতা নির্ণয় করা হয়, উক্ত বর্ণনাও সেই একই ভাষায় লিখিত। সুতরাং গৌড়ের কোন্ মুসলমান বাদশা জাজপুরের হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন, যতদিন সে খবর না পাওয়া যায় ততদিন উক্ত কাব্য যে চণ্ডীদাসের পূর্বে রচিত, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

একটি বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নেই। এ কাব্য হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের লেখা এবং সেই শ্রেণী ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও ঘোর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। যদি শূন্যপুরাণের বর্ণিত ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করা যায় তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সেকালে বাংলার নীচজাতিরা মুসলমান কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিনাশ অতিশয় আহ্লাদের বিষয় মনে করত ; এককথায় তারা মুসলমানদের ব্রাহ্মণ-অত্যাচারের হাত থেকে দেশের লোকের উদ্ধারকর্তা মনে করত। উক্ত বর্ণনাটি একটু লম্বা হলেও এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। কেননা, আমার বিশ্বাস, বাংলার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে শূন্যপুরাণের পরিচয় নেই। প্রথমত ব্রাহ্মণের অত্যাচারের এইরূপ বর্ণনা আছে—

দখিন্যা মাগিতে জায়, জার ঘরে নাঞি পায়—
সাঁপ দিআ পুড়াএ ভুবন।....

বলিষ্ট হইল বড় দস বিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস।
বেদ করে উচ্চারন বের্য়াঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইয়া মম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।
এইরূপে দ্বিজগন করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।....
ধম্ম হৈলা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥....
জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন
আনন্দে ত পরিল ইজার॥....
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥

এ স্থলে বলা আবশ্যক, রামাঞি পণ্ডিতের মতে 'জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন' ইজার পরেছিলেন। উক্ত বর্ণনা থেকে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, বাংলার বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণের বিশেষ অত্যাচার ছিল এবং তারা মুসলমানদের উক্ত অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণকর্তা দেবতার অবতার মনে করত। তবে এ ঘটনা ঐতিহাসিক কি পৌরাণিক বলা অসম্ভব। এই তারিখবিহীন গ্রন্থ বাদ দিয়ে আমাদের পরিচিত সাহিত্যে আসা যাক।

চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়ে তিনি যে মুসলমান-যুগে বাস করতেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর কাব্যে আরবি ফারসি শব্দ একরকম নেই বললেই হয়, যদি দু-দশটি থাকে তো সেগুলি খুঁজে বার করতে হয়। সুতরাং চণ্ডীদাসের যুগে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর কোনো বিষম গণ্ডগোল ঘটেছিল ব'লে তো মনে হয় না। অন্তত তাঁর মৌনতা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালে হিন্দুদের মুসলমান বাদশায় কোনো অসম্মতি ছিল না, কেননা তাঁরা হিন্দুর ধর্মের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না।

চৈতন্যের প্রবর্তিত নববৈষ্ণবধর্মের সৃষ্টির সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ধর্ম নিয়ে যে বিবাদ ঘটবে, এ অনুমান সহজেই করা যায়। কেননা, এই নববৈষ্ণবধর্মে মুসলমানও দীক্ষিত হতে পারত, এবং এ সূত্রে যে মুসলমান রাজ-পুরুষদের সঙ্গে বৈষ্ণবসমাজের কতকটা বিরোধ ঘটেছিল তার প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিরোধ যে একটা বিষম গণ্ডগোলে দাঁড়ায় নি তার পরিচয়ও উক্ত সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে যেসকল ঘটনার উল্লেখ আছে সেসকল যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয় এবং প্রকৃতপক্ষে সেসকল ঘটনা যে ঘটেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। ইউরোপে যেসকল দলিলমূলে সে দেশের ইতিহাস রচিত হয়েছে, চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব-দলিলগুলিও সেই জাতীয়। সুতরাং পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি থেকে সেকালের বাংলার অবস্থা অনেকটা জানা যায়।

জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে নবদ্বীপে রাজভয়ের বর্ণনা আছে। সে সময় গৌড়ের বাদশা ছিলেন হুসেন শা, এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর হুসেন শার আক্রোশ ও অনুগ্রহের কথা শুধু চৈতন্যমঙ্গল নয়, চৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়।

কবি জয়ানন্দ বলেন যে, নবদ্বীপের কাছে পিরল্যা নামে এক বিষম গ্রাম ছিল, যেখানকার অধিবাসী ছিল সব মুসলমান। আর যেহেতু ব্রাহ্মণে

যবনে বাদ যুগে যুগে আছে সে কারণ পিরল্যাবাসীগণ গৌড়েশ্বর-বিদ্যমানে এই মিথ্যাবাদ দিল যে—

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকহ প্রমাদ হব পাছে॥...
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥

সুতরাং হুসেন শা কর্তৃক নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের কারণ political, religious নয়। এ অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান-নির্বিচারে সকল যুগের সকল রাজাই যে-সম্প্রদায় থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে সে-সম্প্রদায়কে উচ্ছন্ন দিতে কুণ্ঠিত হন না—

তোমাকে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে—

এ কথা শুনে রাজা কংসও কিছু কম জুলুম করেন নি।

ব্রাহ্মণদের উপর মুসলমানের অত্যাচারের যে বর্ণনা জয়ানন্দ দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় যে, অশ্বত্থগাছের উপর ও হিন্দুর বাজনা বাজাবার উপর সেকালের মুসলমানদেরও রাগ ছিল। উক্ত বর্ণনা থেকে দেখতে পাই যে—

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥

তার পর—

গঙ্গা স্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥

অশ্বত্থগাছের ডালকাটা নিয়ে আজও ভারতবর্ষের অপর প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের মারামারি হয়, কিন্তু কাঁঠালগাছের উপরেও যে মুসলমানদের চোট ছিল সে কথা পূর্বে জানতুম না। বেচারা কাঁঠালের যে কি অপরাধ তা বোঝা গেল না; কেননা, কাঁঠালের পাতা তো হিন্দুর পুজোয় লাগে না, তার ফুল কি ফলও তো কোনো দেবতাকে নিবেদন করা হয় না। সে যাই হোক, নবদ্বীপবাসীদের উপর এ অত্যাচার বেশি দিন চলে নি। হুসেন শা অচিরে এ অত্যাচার থামিয়ে নবদ্বীপের হিন্দুদের স্বধর্ম-পালন করতে অবাধ অধিকার দেন। জয়ানন্দ বলেন যে—

গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু।
রাজকর নাহি সর্ব্বলোক চাষ চসু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে।
রাজকরদণ্ডী হয়ে ত্রিশূল সে পরে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে।
ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ জত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥
নাট গীত বাদ্য বাজু প্রতি ঘরে ঘরে।
কলসে পতকা উড়ু মন্দির উপরে॥
পুষ্পের বাজার পড়ু গন্ধের উভার।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক যন্ত্র জয় জয় কার॥
পূর্ব্বে জেমত ছিল নবদ্বীপ রজধানী।
তার শতগুণ অধিক জেন শুনি॥
নবদ্বীপ সীমাএ জবন জদি দেখ।
আপন ইংসাএ মার প্রাণে পাছে রাখ॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান।
হাট ঘাট মানা নাঞি কর গঙ্গাস্নান॥

উক্ত আদেশ অবশ্য religious intolerance ওরফে fanaticism-এর পরিচায়ক নহে। আর বৈষ্ণবের দল যে নবদ্বীপে 'মনের হরিষে' 'নানা মহোৎসব' করেছিলেন ও 'নাট গীত বাদ্য' যে শুধু ঘরে ঘরে নয়, পথে ঘাটেও অহর্নিশি হত, তার প্রমাণ ঐ নৃত্যগীতবাদ্যের চোটে যবনের নয়, নবদ্বীপের টোলের ব্রাহ্মণের কান ঝালাপালা ও প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল।

হুসেন শার আমলে আর-এক ঘটনা ঘটে, যাতে মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে বিশেষ আঘাত লাগবার কথা। যবন হরিদাস মুসলমানধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন। এর কি ফল হয় তার দীর্ঘ বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে আছে। আমি সে বর্ণনার কতক অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, তা থেকেই সেকালে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর মনোভাবের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। হরিদাস বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করাতে—

কাজি গিয়া মুল্লুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেক সকল তাহার বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥

এ সংবাদ পেয়ে হুসেন শা 'ধরি আনিল তানে অতি শীঘ্র গতি'; হরিদাস 'আইলেন মুলুকের অধিপতি স্থান', বাদশা তাঁকে 'পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান'। তার পর—

আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি।
কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহা বংশ-জাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পর লোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥

বাদশার প্রশ্নের উত্তরে হরিদাস

বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর।
শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনী সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহার হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন॥
হিন্দু কুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনেই মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥

সরাসর এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥

হরিদাসের এ বিচার উপন্যাস কি ইতিহাস বলা কঠিন। তবে বাদশার সঙ্গে হরিদাসের এ কথোপকথন কাল্পনিক হলেও সেকালের হিন্দুর মনোভাবের এই সূত্রে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এবং—

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥

এ জ্ঞান যার মনে জন্মলাভ করেছে, তার মনে পরধর্মবিদ্বেষ কিছুতেই থাকতে পারে না। সর্বধর্মের প্রতি tolerance তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর হরিদাসের কথা শুনে যে 'সন্তোষ হৈল সকল যবন'—বৃন্দাবনদাসের এ ধারণা যে অমূলক, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। সেকালের মুলুকপতি ও তাঁর সম্প্রদায়ের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি যদি তাদৃশ বিদ্বেষ থাকত তা হলে চৈতন্যদেব তাঁর ধর্ম বাংলায় অবাধে প্রচার করতে পারতেন না। সুতরাং বৃন্দাবনদাস যা বলেছেন তা verbally সত্য না হোক, psychologically সত্য। বঙ্গসাহিত্য থেকে হিন্দু-মুসলমানের এরূপ মনোভাবের দেদার উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং এ সাহিত্য থেকে আমরা নির্ভয়ে এ অনুমান করতে পারি যে, হিন্দু-মুসলমানের যে ধর্মবিরোধের কথা আজ পলিটিক্সের ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে সে বিরোধ বাঙালি উত্তরাধিকারীস্বত্বে লাভ করে নি। কোনো কোনো ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান লেখক এই ব'লে হিন্দুদের শাসাচ্ছেন যে, হিন্দুরা যেন মনে রাখে যে, মুসলমানরা fanatic। আমরা কিন্তু বাংলা-সাহিত্য থেকে প্রমাণ পাই যে, মুসলমান-যুগে বাংলার মুসলমান ঘোর fanatic ছিল না। নিজ ধর্মে বিশ্বাস করলেই যে পরধর্মবিদ্বেষী হতে হবে—ভগবানের এমন কোনো নিয়ম নেই।

২

গৌড়ের বাদশা হুসেন শার বিচারসভায় যবন-হরিদাস কেন যে মুসলমানধর্ম ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছেন, সে বিষয়ে হরিদাসের কৈফিয়ত শুনে সভাস্থ সকল মুসলমান সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চৈতন্যভাগবতের কথা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে—

হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥

সম্ভবত হরিদাসের এই কথাটাই সকলের কাছে সুসত্য ব'লে মনে হয়—

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥

আজকের দিনে এ কথা ভরসা ক'রে বলা যায় যে, প্রায় সকল ধর্মেরই ঐ হচ্ছে মূলকথা। সুতরাং একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, ধর্মমতের সঙ্গে ধর্মমতের মূলত কোনো প্রভেদ নেই। অথচ এক ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আর-এক ধর্মাবলম্বীদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঘোর বিরোধ আছে। তার কারণ, সকল ধর্মের ভিতর যা সামান্য তা নিয়ে সকল ধার্মিকদের মধ্যে সদ্ভাব ঘটে না, কিন্তু প্রতি ধর্মের ভিতর যে বিশিষ্টতা আছে তাই নিয়েই ধার্মিকে ধার্মিকে পরস্পর-মারামারি করে। এই হচ্ছে মানুষের স্বভাব। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এ জ্ঞান যাঁর মনে উদয় হয়েছে তিনি আর ধার্মিক থাকেন না, তিনি হন দার্শনিক।

যবন-হরিদাসের মুখে ধর্মের ব্যাখ্যান শুনে সকল যবন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ব'লে তিনি যে এ বিচারে বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন তা নয়; ধর্মের সঙ্গে সব দেশেই সামাজিক আচার-ব্যবহার জড়িত থাকে, আর একালে উপরন্তু তার সঙ্গে মানুষের পলিটিকাল স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের যে বিরোধ ঘটেছিল তা হচ্ছে মূলত আচারগত; আর এ বিরোধ অনেকটা পুষ্ট হয়েছিল পলিটিকাল কারণে। সেকালে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রথমত অব্রাহ্মণের ধর্ম ছিল, তার পর সে ধর্ম তুরস্ক যবন প্রভৃতি বরণ ক'রে নিয়েছিল। অশোক ছিলেন শূদ্র, কণিষ্ক ছিলেন তুরস্ক ও মিনিন্দ ছিলেন যবন অর্থাৎ গ্রীক। রাজার ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যে সম্বন্ধ থাকবে সে কথা বলাই বাহুল্য। যবন-হরিদাসকে রাজশাসনে যথেষ্ট শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে গৌড়ের বাদশার কাছে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা থেকেই দেখা যায় যে, ধর্মমত পরিবর্তন করাটাই তাঁর প্রধান অপরাধ ব'লে গণ্য হয় নি। সে অভিযোগটি যে কি, তা একবার স্মরণ করা যাক। বৃন্দাবনদাস বলেন যে—

কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেক সকল তাহার বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥

হরিদাসের বিরুদ্ধে এ নালিশ কাজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিংবা হিন্দুদের প্ররোচনায় করেছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। চৈতন্যভাগবতের কোনো কোনো পুঁথিতে উপরের চারি পংক্তির এইরূপ পাঠ আছে—

পাষণ্ডীর গণ দেখি মরয়ে জ্বলিয়া।
দশে পাঁচে যুক্তি করে একত্রে মিলিয়া॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
কোনখানে না দেখি এমত অবিচার॥
কালি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিব যে ইহার সব বিবরণে॥
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
ভালমতে আনি শাস্তি করুক উহারে॥
এমত যুকতি করে পাষণ্ডীর গণ।
যবন রাজার স্থানে কৈল নিবেদন॥

উপরিউক্ত কথাগুলি যদি সত্য হয় তা হলে হরিদাসের উপর অত্যাচারের দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপানো যায় না। কারণ, যেসকল ব্রাহ্মণ চৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিরোধী ছিলেন, বৃন্দাবন দাস তাঁদেরই পাষণ্ড নামে অভিহিত করেন।

যদি কেউ যবন হয়ে হিন্দুর আচার করে তবে হিন্দুর আপত্তি কি? হিন্দুর আপত্তি এই জন্যে যে, হিন্দু অপর কারও আচার নিজে অবলম্বন করতে চায় না, আর অপর কাউকেও নিজের আচার অবলম্বন করতে দিতে চায় না। এ ছাড়া বৈষ্ণবদের একটি আচারের প্রতি সেকালের ব্রাহ্মণ-সমাজের ভয়ংকর আক্রোশ ছিল। হরিদাসের আচার ছিল এই যে, তিনি—

গঙ্গা স্নান করি নিরবধি হরি নাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব স্থান॥

কে কোন্ নদীতে স্নান করবে, সে সম্বন্ধে আশা করি বাংলার নবাবি আমলেও কোনোরূপ বিধিনিষেধ ছিল না। সুতরাং ধরে নিচ্ছি যে, গঙ্গাস্নানের অপরাধে তিনি রাজ-দরবারে অভিযুক্ত হন নি। তিনি যে 'হরিনাম

উচ্চ করি লইয়া বুলেন' এইটেই বোধ হয় সেকালের ব্রাহ্মণদের মতে মহা অনাচার বলে গণ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা যে উচ্চৈস্বরে নামকীর্তন করা ভালোবাসতেন না, তার অসংখ্য উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে আছে। নিম্নে তার একটি প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস এ কি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে॥

উত্তরে হরিদাস বক্ষ্যমাণ শ্লোক আবৃত্তি করলেন—

জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতিচ॥

এবং তৎপরে তার ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। সে ব্যাখ্যার ফল হল এই—

সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন॥
দরশন কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদ পথ হয় দেখি নাশ॥
যুগ শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে।
এখনই তাহা দেখি শেষে আর কেনে॥
এই রূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস বুলিয়া॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুঞি এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি তোর আগে॥

অবশ্য এরূপ উচ্চ মনোভাব কোনো ব্রাহ্মণসন্তানের যে হতে পারে আজকের দিনে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। এ যুগে আমরা সেইসব যবনকেই বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যাকর্তা-গুরু ব'লে মনে করি, যাঁদের জন্মভূমি হচ্ছে কালাপানির ওপারে। তবে আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য যে, শুধু যবন-হরিদাসের বিরুদ্ধে নয়, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের উপর অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদেরও সমান আক্রোশ ছিল। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে—

কোথায় নাহিক বিষ্ণু-ভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি বাজিয়াই মরে॥
এ বামন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামন গুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥
কেহ বলে, যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥

এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, খুব সম্ভবত 'মুলুকের অধিপতি স্থানে' যবন-হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ 'পাষণ্ডীরাই' আনেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা হরিদাসকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে তাঁদের বৈষ্ণব-হিংসা চরিতার্থ করেন। বিশেষত যখন তাঁদের ভয় ছিল যে, উচ্চৈস্বরে নামকীর্তন করলে দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে যখন ঐহিক স্বার্থের রাসায়নিক যোগ হয় তখন তা অতি মারাত্মক বস্তু হয়ে ওঠে। তা সে স্বার্থজ্ঞান পলিটিকালই হোক আর ইকনমিকই হোক।—কোনো ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অবশ্য তাঁরা আনতে পারতেন না। 'ব্রাহ্মণ হইয়া করে হিন্দুর আচার'—এ আরজি কাজীতেও পত্রপাঠ ডিস্‌মিস্ করতেন এবং সম্ভবত সেইসঙ্গে ফরিয়াদীকেও পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিতেন। যবন-হরিদাসের মুখে তাঁর ধর্মমতের ব্যাখ্যান শুনে যদিচ সভাস্থ সকল যবন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তবুও যে তিনি নিস্তার পান নি তার কারণ—

সবে এক পাপী কাজী মুলুক পতিরে!
বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ ইহারে॥
এই দুষ্ট, আর দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন কুলে অমহিমা আনিবেক॥
এতেকে ইহার শাস্তি কর ভাল মতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥

কাজী সাহেবের কাছে এ কথা শুনে—

পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিলাম পাছে আর লঘু হৈবা কেনে।

উত্তরে হরিদাস বলেন যে—

খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম॥

তার পর—

শুনিয়া তাহার বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা ইহা প্রতি॥
কাজী বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি॥...
পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
এমত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তারে॥
পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥

কাজী কাকে বলে তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু হরিদাসের বিচারে বৃন্দাবন দাসের রিপোর্ট প'ড়ে মনে হয় যে, কাজী হচ্ছেন সেই জাতীয় জীব আজকাল আমরা যাঁকে বুরোক্রাট বলি। কারণ, বুরোক্রাটের সকল লক্ষণই এই কাজীর দেহে স্পষ্ট দেখা যায়। হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর প্রধান অভিযোগ এই যে, হরিদাস 'যবন কুলে অমহিমা আনিবেক', ভাষান্তরে রাজার জাতের prestige নষ্ট করবে। দ্বিতীয় কথা হরিদাসের শাস্তি preventive হিসাবেই হওয়া কর্তব্য। কারণ, 'এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিব অনেক'। তার পর কাজীর মতে শাস্তিটে exemplary হওয়া চাই, তার নিজের কথা এই 'এতেকে উহার শাস্তি কর ভাল মতে'। তার পর কাজী রায় দিলেন যে, হরিদাসকে 'বাইশ বাজারে বেড়ি মারি' অর্থাৎ প্রকাশ্যে তার শাস্তিবিধান করতে হবে, যাতে ক'রে তার শাস্তি দেখে আর কেউ প্রাণের ভয়ে 'যবন কুলে অমহিমা' না আনতে পারে।

বাইশ বাজারে মারাটা একটা নূতন শাস্তি বটে। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, সাত ঘাটে জল খাওয়ানোই যথেষ্ট শাস্তি। তার উপর আবার বাইশ বাজারে মার খাওয়ানো একটু বেশি হয়। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মারের মাত্রাটা তেমন মারাত্মক ছিল না, কেননা, মারের মত মার দিলে এক বাজারেই হরিদাসকে পটল তুলতে হত। এ অনুমান যে সংগত, তার প্রমাণ বাইশ বাজারে মার খেয়েও হরিদাসের প্রাণবিয়োগ হয় নি, শেষটা তিনি শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। হরিদাসের সমসাময়িক কোনো ব্যক্তি যদি ইউরোপে তার ধর্মপরিবর্তন করত, তা হলে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত।

কাজী যে বুরোক্রাট তার প্রধান প্রমাণ এই যে, হুসেন শা কাজীদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিচ হরিদাসকে শাস্তি দিতে মোটেই তাঁর ইচ্ছে ছিল না। আজকের দিনেও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের বুরোক্রাটদের কথা ঠেলে ভারতবর্ষের সেক্রেটারিদের কিছু করবার শক্তি নেই। ক্ষমতা যে নেই তা তিনিই জানেন যিনি লর্ড মর্লির জীবনস্মৃতি পড়েছেন।

পূর্বোক্ত দলিলের বলেই প্রমাণ হয় যে, মুসলমান আমলে রিলিজিয়াস্ কারণে হিন্দুদের উপর তাদৃশ পীড়ন হত না, হত শুধু পলিটিকাল কারণে। আজকাল কোনো কোনো ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান নিজেদের যেরূপ ঘোর ফ্যানাটিক ব'লে প্রচার করছেন, নবাবি আমলে তাঁদের জাতভাইরা যে তদ্রূপ ঘোর ফ্যানাটিক ছিলেন তার প্রমাণ মুসলমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায় না। যে কারণে সেকালের ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণবদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কারণে কাজীরা হরিদাসের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন--প্রভুত্ব নষ্ট হবার ভয়ে।

পাঠান বাদশাহের রাজত্বকালে বাংলার কোনোস্থলে যে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর নিগ্রহ হয় নি, এমন কথা অবশ্য আমি বলতে চাই নে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে হিন্দুর উপর মুসলমান কাজীর দৌরাত্ম্যের একটি নাতিহ্রস্ব বর্ণনা আছে। উক্ত গ্রন্থ সম্রাট্ হুসেন শাহের কালে রচিত হয়। বিজয় গুপ্ত বাখরগঞ্জের লোক। তাঁর বর্ণিত ঘটনা যদি সত্য হয় তা হলে স্বীকার করতে হয়, হুসেন শাহের আমলেও হিন্দুধর্মের উপর অত্যাচার করবার প্রবৃত্তি কোনো কোনো কাজী সাহেবের ছিল। বিজয় গুপ্ত বলেন যে, হোসেনহাটি গ্রামের নিকট হাসান হোসেন দুই ভাই মুসলমান ছিল।—

> কাজিয়ানী করে তারা, জানে বিপরীত।
> তাদের সম্মুখে নাই হিন্দুয়ানী রীত॥

হোসেন-কাজীর দুলা নামক একটি শ্যালক ছিল। সে নাকি—

> যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
> হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাৎ॥
> পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
> চোপড়-চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা॥
> যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার কান্ধে।
> পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।

এসকল কথা সত্য হলেও হতে পারে। কেননা, প্রজার উপর রাজ-শ্যালকের অত্যাহিত অত্যাচার হিন্দুযুগেও যে ছিল তার প্রমাণ মৃচ্ছকটিক নাটক। আর হোসেন-শ্যালকের অত্যাচার চড়-চাপড়ের উপর তো ওঠে নি। স্বয়ং কাজী সাহেবও হিন্দুদের উপর মারপিট করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাগের যথেষ্ট কারণ ছিল। কাজী সাহেবের মোল্লাকে কতকগুলো গয়লার ছেলে মিলে অযথা প্রহার দেয়। মোল্লা তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে কাজীর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে—

> হের দেখ দাড়ী নাহি মুখে রক্ত পড়ে।
> দন্ত ভাঙ্গিয়াছে মোর চোপড়চাপড়ে॥
> পরিধান ইজার আমার দেখ সব ভাঙ্গা।
> ছাগলের রক্তে দেখ মুখ মোর রাঙ্গা॥

মোল্লার কথা—

> শুনিয়া কোপিল কাজী, চারিদিকে চায়॥
> হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
> আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥
> গোটে গোটে ধরিব গিয়া ঘতেক ছোমরা।
> এড়ারুটি খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা॥

মুসলমানী-যুগের যেসকল বাংলা রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তার মধ্যে অপর কোনো গ্রন্থে হিন্দুর ধর্মের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষের এতাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে কাজী সাহেব অসাধারণ fanaticismএর প্রমাণ দেন নি। আজকের দিনেও যদি ছোকরার দল কোনো খৃস্টান-পাদ্রীকে ওভাবে নিগ্রহ করে তা হলে একালের শাসনকর্তাদের হাতে তাদের সমান নিগৃহীত হতে হয়। তার পর কাজী হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট, সুতরাং ন্যায়ত তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ছোকরাদের ওরকম বেআইনী কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া। আর-এক কথা, এ ক্ষেত্রে হোসেনকাজী মুখে যা বলেছিলেন কার্যত তা করেন নি। কাজীর মাতা ছিলেন হিন্দুর কন্যা; এবং তাঁর কথামতই হাসান হোসেন দু ভাই হিন্দুদের মারপিট না ক'রে নিজেরা বয়েদ লেখা তাবিজ ধারণ করেন।

এ ঘটনা সম্ভবত বিজয় গুপ্তের সম্পূর্ণ মনগড়া। দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে ঐ একই ঘটনার একই রকম বর্ণনা আছে, যদিচ দ্বিজ বংশীবদন বিজয় গুপ্তের দু শ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বহুকাল পাশাপাশি বাস করবার ফলে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর ধর্মসম্বন্ধে কি মনোভাব জন্মেছিল তার পরিচয় দ্বিজ বংশীবদন জনৈক মুসলমানের প্রমুখাৎ দিয়েছেন—

> তার মধ্যে এক জন জাতি মুসলমান।
> সে বলে উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ান॥
> একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-মুসলমানে।
> যার তার কর্ম্ম সেই করে ধর্ম্মজ্ঞানে॥
> সকলের কুলাচার সৃজিলা গোঁসাই।
> পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য্য নাই॥

৩

যদিচ কবিকঙ্কণ স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে—

> উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
> ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।

তবুও তাঁর গ্রন্থে মোগলরাজ কর্তৃক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের উপর অত্যাচারের অপর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, এবং উক্ত 'রায়জাদা' ব্যক্তিটি কে? হিন্দু না মুসলমান? তাও আমরা অবগত নই। সেকালে হিন্দুও যে হিন্দুধর্মের উপর ভীষণ অত্যাচার করত তার প্রমাণ দাউদ কররানির যে সেনাপতি উড়িষ্যার দেউল দেহারা ধ্বংস করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত, রাজু নামক জনৈক হিন্দু।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সেকালের মুসলমান সমাজের আচার-ব্যবহারের একটি দেড় পাতা বর্ণনা আছে। তার কতক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। কবিকঙ্কণ বলেন যে মুসলমানরা—

ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিত পাটী,
পাঁচবেরির কর়য়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদারে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন পড়য়ে কোরাণ।
সাঁঝে ডালা দেই হাটে পীরের শিরণি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥...
আপন টোপর লৈয়া বসিল অনেক মিঞা,
ভূঞ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত।
সাবাণি লোহানি আর, লোদানি সুরয়ানি চার,
পাঠান বসিল নানা জাত॥
আপন তরফ নিয়া বসিল অনেক মিঞা
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়ে নিকা, দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরী, মুরগী জবাই করি,
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।
বখরী জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা,
দান পায় কড়ি হয় বুড়ি॥
যত শিশু মুসলমান, তুলিল মক্তব স্থান,
মখদম পড়ায় পঠনা॥

উক্ত বর্ণনার ভিতর অবশ্য বিদ্রূপ আছে, কিন্তু ধর্মবিদ্বেষ মোটেই নেই। মোল্লার উপর যে ঠাট্টা আছে, সেটিকে অনেকে মুসলমানধর্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক মনে করতে পারেন, তাই কবিকঙ্কণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের যা চরিত্র বর্ণন করেছেন সে বর্ণনাটির দু-চার ছত্র এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে,
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে,
চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥...
গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণে দণ্ডে
কুলপাঁজী করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে, সভায় বিড়ম্বে তারে,
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥

ধর্ম যাই হোক না কেন, ধর্মযাজকেরা হচ্ছে একটি ব্যাবসাদারের দল। সুতরাং যারা ধর্মের ব্যাবসা করে, কোনো সমাজের লোকই তাদের তাদৃশ ভক্তির চোখে দেখে না।

মুসলমান শিশুদের যে অনবরত পড়ানো হত, এবং মুসলমানরা যে দশ-বিশ বেরাদরে বসে অনুদিন স্বশাস্ত্রের চর্চা করত, এটা অবশ্য তাদের সভ্যতারই পরিচায়ক, আর এ সভ্যতা সেই শ্রেণীর, আজকের দিনে আমরা যাকে ডিমক্রাটিক বলি।

কবিকঙ্কণের একটি বিদ্রূপ আমার কাছে অতি অদ্ভুত লাগে। মুসলমানদের মালাজপা নিয়ে শুধু কবিকঙ্কণ নয়, ভারতচন্দ্রও বিদ্রূপ করেছেন। মালা কি হিন্দুরা জপে না? তবে মুসলমানের মালাজপায় কি দোষ হল? তারা অবশ্য রুদ্রাক্ষের কি তুলসীকাঠের মালা জপে না, জপে তসরির অর্থাৎ স্ফটিকের মালা। আর স্ফটিকের মালা যে পুরাকালে হিন্দুরাও জপতেন, তার পরিচয় কুমারসম্ভবের বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পাওয়া যায়—

অথাগ্র হস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ
সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্।
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়া মিতাক্ষরং
চিরব্যবস্থাপিতবাগ ভাষত॥ ৫ম সর্গ, ৬০ শ্লোক

আমরা হিন্দুরা জ্ঞানমার্গীই হই, ভক্তিমার্গীই হই, আর কর্মমার্গীই হই, উপরন্তু আমরা সকলেই ছুতমার্গী। ফলে যাদের আচার-ব্যবহার অন্যরূপ, তাঁদের সঙ্গে এক গ্রামে হলেও এক পাড়ায় আমাদের বাস করা চলে না। অতি পুরাতন কাল থেকে ব্রাহ্মণরা অগ্রহারে অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ পল্লীতে বাস করতেন তার প্রমাণ মহাভারতে আছে। বিদর্ভরাজ ভীম, কন্যা দময়ন্তী ও জামাতা নলের খোঁজে যেসকল ব্রাহ্মণকে দেশে-বিদেশে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বলেছিলেন যে তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের খবর আনতে পারবে তাকে 'অগ্রহারাংশ্চ দাস্যামি গ্রামং নগরসম্মিতম্'। মাদ্রাজে আজও অগ্রহার আছে এবং কোনো অস্পৃশ্য হিন্দুর ব্রাহ্মণ পল্লীর পথ দিয়ে হাঁটবার জো নেই। আজকে কেবল দেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যে সত্যাগ্রহ করবে ব'লে ব্রাহ্মণদের শাসাচ্ছে, তার কারণ তারা ঐ ব্রাহ্মণ-পথে চলবার অধিকারে বঞ্চিত। হিন্দুর ছায়া মাড়ালে হিন্দুর যখন ধর্ম নষ্ট হয় তখন সেকালে হিন্দু মুসলমান যে পাশাপাশি বাস করতে পারত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকাই তারা সুবুদ্ধির কাজ মনে করত।

ইদানীং দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাকে class area বলে অর্থাৎ স্বতন্ত্র জাতের স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা, পূর্বে সেই বন্দোবস্তই বাংলায় প্রচলিত ছিল। সে কালের অনেক গ্রন্থে এ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ বলেন—

বীরের পাইয়া পাণ, বসিল মুসলমান
পশ্চিম দিক বীর দিল তারে॥
আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজী,
খয়রাতে বীর দিল বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী, বলায় হাসন হাটী,
একত্র সবার ঘর বাড়ি॥

কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ হরিরামও মুসলমান পাড়ার প্রায় একই বর্ণনা করে গিয়েছেন। তিনি বলেন যে—

বীরের সম্মান পায়া পশ্চিম দিগেতে গিয়া
বস্যে যত মোগল পাঠান।
হাসনহাটীর মাঝে সৈদ সকল রাজে
সেকজাদা বৈস্যে পায়া পান।

এসকল বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এ দেশে মুসলমান বস্তি মাত্রেরই নাম ছিল হাসনহাটী এবং গ্রামের পশ্চিম দিকেই তারা বাস করত। অন্য সকল দিক ছেড়ে তারা যে কেন পশ্চিমদিক পছন্দ করত জানি নে, সম্ভবত ঐ দিকটা মক্কার দিক বলে।

দ্বিজ হরিরাম এবং কবিকঙ্কণের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানদের ভিতর দস্তুরমত জাতিভেদ ছিল। কবিকঙ্কণ এইসকল জাতির উল্লেখ করেছেন—১ জোলা, ২ গোলা, ৩ মুকেরি, ৪ পীঠারি, ৫ কাবারি, ৬ সানাকর, ৭ পটুয়া, ৮ তীরকর, ৯ কাগতি, ১০ কলন্দর, ১১ রঙ্গরেজ, ১২ হাজাম, ১৩ কসাই।

এসকলই ছিল নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। কারও কাজ ছিল কাপড় বোনা, কারও গোরু মারা, কারও সানা বাঁধা, কারও তীর গড়া, কারও পীঠে বেচা, কারও মাছ মারা, কারও কাগজ তৈরি করা, কারও পট আঁকা, কারও কাপড় রঙানো, কারও বলদ চালানো। তার পর 'পয়মাল' নামে অদ্ভুত জাত ছিল, যারা 'হিন্দু হয়ে মুসলমান'।

কিন্তু এসকল মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু কবিরা মোগল-পাঠান ও সৈয়দদের সঙ্গে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখান। দেশী মুসলমানদের অনেকেই নাকি 'রোজা নমাজ না করিয়া' মুসলমান, আবার এদের মধ্যে কোনো কোনো জাত নাকি—

নিরন্তর মিথ্যা কহে, নাহি রাখে দাড়ি।

মোগল-পাঠানদের কাজ ছিল শুধু যুদ্ধ করা। দ্বিজ হরিরাম তাঁদের এই বলে পরিচয় দিলেন—

কেহ বা সিপাই হয় বীর বিরাদবি বয়
পায়দল হৈয়া কেহ রহে।
কেহ বা ব্যাপার করে কেহ যায় দেশান্তরে
অনুক্ষণ কেহ যুদ্ধ চাহে॥

আমাদের ভাষায় বলতে হলে মোগল-পাঠান-সৈয়দরা সব ছিল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর জোলা-পোনারা সব ছিল শূদ্র। মুসলমানদের এই জাতিভেদ অনেকের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে। এমনকি, কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিদের মতে হিন্দুধর্মের প্রভাবে মুসলমানদের ভিতর এই জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যেসকল হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিল, কিন্তু নিজের নিজের জাতব্যাবসা ছাড়ে নি, ফলে জাতও ছাড়ে নি। তাতেই হিন্দুর অনুরূপ জাত মুসলমানদের মধ্যেও আছে। শূন্যপুরাণ প্রচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ, আর অন্নদামঙ্গল শেষ। এ উভয় গ্রন্থেই মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর দেবমন্দিরের উপর দৌরাত্ম্যের উল্লেখ আছে। আর উভয়কালেই একই ক্ষেত্রে মন্দির ভগ্ন করা হয়—অর্থাৎ উড়িষ্যায়। সেকালের বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলমান-বাদশারা দেউল দেহারা ভাঙতেন, জাজপুরে জাজনগরে ও উড়িষ্যায়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' প্রমাণ করেছেন যে, যার নাম জাজনগর, তারই নাম উড়িষ্যা। খাস বাংলার কোনো মন্দির-ধ্বংসের উল্লেখ বঙ্গসাহিত্যে নেই। এর কারণ, বোধ হয়, সেকালে বাংলাদেশে এমন কোনো মন্দির ছিল না যা কোনো বিধর্মীর চক্ষুঃশূল হত। ভারতচন্দ্র তাঁর গ্রন্থারম্ভে বলেছেন যে নবাব আলিবর্দি খাঁ—

ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিলে লইয়া হাতে প্রলয়ের শূল।
করিব যবন সব সমূল নির্ম্মূল॥

উপরিউক্ত বিবরণ পড়ে মনে হয় যে, 'History repeats itself'—এ কথা ঠিক। বাংলার শেষ পাঠান বাদশা দাউদ কররানি যে কাজ করেছিলেন, বাংলার শেষ মোগল নবাবও ঠিক সেই কাজ করেছিলেন। দাউদ কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়ও ভুবনেশ্বরে গিয়ে ধুম করেছিলেন। এসব বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে, পাঠান-মোগলদের হিন্দুর উপর ততটা বিদ্বেষ ছিল না যতটা বিদ্বেষ ছিল হিন্দু আর্টের উপর। ভারতচন্দ্র বলেন—

নন্দী মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।

কালাপাহাড় কিন্তু ভুবনেশ্বরের নন্দীর নাসাকর্ণ ছেদন করেছিলেন। সেই নাসাকর্ণহীন নন্দী আজও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দ্বার রক্ষা করছে।

দাউদ কররানি অতিশয় অপদার্থ বাদশা ছিলেন, থাকবার ভিতর তাঁর ছিল শুধু অসামান্য রূপ। আলিবর্দি খাঁ সুপুরুষ ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে কাপুরুষ ছিলেন তার প্রমাণ ভারতচন্দ্রেই পাওয়া যায়। আলিবর্দি খাঁ ভুবনেশ্বরে ধুম করবার পর বর্গীরা যখন বাংলা দেশ আক্রমণ করলে, তখন—

পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥

ভারতচন্দ্রের এসকল কথা প্রামাণ্য, কেননা, এসকল ঘটনা তিনি নিজে দেখেছিলেন, এবং আলিবর্দি খাঁর অত্যাচারের তাঁর আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একজন বিশেষ ভুক্তভোগী ছিলেন।

কিন্তু আলিবর্দি খাঁ যে উড়িষ্যা ছারখার করেছিলেন, তার কারণ আসলে পলিটিকাল। কারণ যে কি তা ভারতচন্দ্রের মুখেই শোনা যাক—

কটকে মুরসীদকুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খোদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে॥
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥

পররাজ্য জয় করতে হলে যে fire and sword-এর নির্মম ব্যবহার করতে হয়, এ কথা স্বয়ং বিসমার্ক বলে গিয়েছেন এবং পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিচারে সকল জর্মান সমান শিরোধার্য করেছেন। যদি কেউ বলেন যে, পলিটিকাল কারণে উড়িষ্যা পুড়িয়ে ছারখার করলেই তো হত, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উপর হস্তক্ষেপ করবার তো কোনোই প্রয়োজন ছিল না। এ আপত্তির উত্তর স্বয়ং ভারতচন্দ্রই দিয়েছেন। তিনি বলেন—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

ভারতচন্দ্রের কথা যে সত্য, তা জর্মানরাও সে দিন Rheimএর অপূর্ব সুন্দর গীর্জার উপর গোলা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন। আর পৃথিবীর ভিতর অদ্বিতীয় ধার্মিক ও দার্শনিক জাত জর্মানরা যে খৃস্টধর্মের বিরোধী, আশা করি, এমন কথা কেউ বলবেন না। সুতরাং আলিবর্দি যে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান আসবার সাড়ে ছ-শ বৎসর পরে, পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মনোভাব কি ছিল, তাও আমরা ভারতচন্দ্রের লেখা থেকেই জানতে পাই।

'মানসিংহে' জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদারের যে কথোপকথন আছে সেটি অবশ্য আগাগোড়া কাল্পনিক। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কালে হিন্দু-মুসলমান তর্ক করতে বসলে হিন্দু যে ভবানন্দ মজুমদারের কথা ও মুসলমান জাহাঙ্গীরের কথা বলতেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মনে রাখবেন যে, আদ্যোপান্ত অন্নদামঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সুরসংযোগে আবৃত্তি করা হত এবং সে সভায় সভাসদ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই ছিল। এ ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র এমন-কোনো কথারই অবতারণা করেন নি যা উভয় সম্প্রদায়ের সভাসদদিগের অবোধ্য কি অপ্রিয় ছিল।

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

কালিদাসের এ উক্তির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে সকল সভাজনকে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এ কথোপকথনে পরিহাস দেদার আছে। বিশেষত উভয় ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে উভয় পক্ষই নানারূপ রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন। ইংরেজি ভাষায় যাকে scepticism বলে, তার একটানা সুর এ তর্কের ভিতর আগাগোড়া রয়ে গিয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার রসিকতা এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা আমি সংগত মনে করি না।

আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে যথার্থ ধর্মমত সম্বন্ধে উভয়ের ভিতর যে বিশেষ-কোনো প্রভেদ ছিল এ তর্ক পড়ে তো তা মনে হয় না। ভবানন্দ মজুমদারের মুখ দিয়ে ভারতচন্দ্র বলিয়েছেন যে—

হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ, আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥

এ কথা আমরা অন্য কবিদের মুখেও বহুবার শুনেছি—তবে ভারতচন্দ্রের কথার নূতনত্ব এই যে, তার ভিতর ঐতিহাসিক যুক্তি আছে, আর তার পর হিন্দু-মুসলমানকে জীবজন্তুর দলে ফেলাটায় নিতান্ত আধুনিক ধরনের প্রাধান্যই ফুটে ওঠে। এ ধরনের কথাবার্তায় ভক্তির চাইতে জ্ঞানের কথা বেশি। জাহাঙ্গীর বলেছিলেন যে, হিন্দুর শাস্ত্র সয়তানবাজী ; উত্তরে ভবানন্দ বলেন যে—

ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেই সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥

অর্থাৎ কোরান যদি revelation হয় তা হলে বেদও তাই, আর বেদ যদি তা না হয় তো কোরানও তা নয়। বলা বাহুল্য যে, এ রকমের তর্ক নিতান্ত একেলে। ভারতচন্দ্র খৃস্টানধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন—

যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥

যিনি সকল ধর্মকে সমান নজরে দেখতে পারেন, বলা বাহুল্য, তাঁকে কোনো ধর্মেরই গোঁড়া ভক্ত বলা যায় না। আমার মনে হয় যে, বহুকাল পাশাপাশি বাস করবার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মনোভাব পরস্পরের মতামত সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা লাভ করেছিল। অনেকে বলবেন যে, এই সকৌতুক উদারতা সে যুগের decadent মনোভাবের পরিচয় দেয়। তা হতে পারে, কিন্তু গোঁড়ামি ও বিদ্বেষবুদ্ধির যে পরিচয় দেয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রসাদে আমরা এ সত্যের পরিচয় পাই যে, বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিরোধ যদি একটা জাতীয় মহাসমস্যা হয়ে উঠে থাকে তো সে সমস্যা আমরা উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করি নি। সমগ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে cow-killing riot এর নামগন্ধ পর্যন্ত নেই, যদিচ মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা সেকালে নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে দুই-চারটি কথা নিবেদন করিতে চাহি।

'বাঙ্গালী জাতি' বলিলে, যে জন-সমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জন-সমষ্টিকে বুঝি। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যতঃ প্রচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা-ই 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি'; এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে-সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা-ই 'বাঙ্গালা সাহিত্য'।

এখন পাঁচ কোটির অধিক লোকে বাঙ্গালা ভাষা বলে।* সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালী জাতি নগণ্য নহে। গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি—ইহাদের প্রত্যেকের অধিবাসিগণের চেয়ে বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জনগণের সংখ্যা অধিক। আমি এই বিষয়ে আমার দেশবাসিগণের ও অন্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসাবে বাঙ্গালা বলে। অবশ্য, কেবল অন্যতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভাষা হওয়ায় বাঙ্গালার বা আর কোনও ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কিছু নাই; কিন্তু সংখ্যাধিক্য উপেক্ষণীয় বস্তু নহে; এবং সংখ্যাধিক্য ভিন্ন বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবও অন্য পাঁচটি ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার একটি প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে।

এই-যে কয়েক কোটি বাঙ্গালা-ভাষী যাহারা সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া এবং বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ জুড়িয়া বাস করিতেছে এবং কিছু কিছু বাঙ্গালার বাহিরে অ-বাঙ্গালীদের দেশে গিয়াও যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পরের মধ্যে একটা ভাষা-গত স্বাজাত্য অনুভব করে। বিদেশে অন্য ভাষা-ভাষীদের মধ্যে গেলে, এই স্বাজাত্য-বোধটুকু আমাদের কাছে বিশেষ পরিস্ফুট হয়। আজ-কাল জাতীয়তা বা স্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা। যেখানে বিভিন্ন ভাষা, সেখানে ধর্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এক হইলেও, সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া কঠিন,—সম্পূর্ণাঙ্গ স্বাজাত্য-বোধ আসা এক রকম অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে এমন একাধিক জন-সমষ্টিকে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কারণে একরাজ্য-পাশে বদ্ধ করা যায়; কিন্তু দেখা যায়, ভাষা-গত বৈষম্য থাকিলে, ওতপ্রোত-ভাবে মিল হয় না। রাষ্ট্রীয় বন্ধনে সঙ্ঘ-বদ্ধ বিবিধ ভাষা-ভাষী একাধিক জন-সমষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-স্বরূপ গ্রহণ করিলে, একতার সূত্র একটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রান্তিক সত্তা বর্জন করিয়া সকলে মিলিত হইতে চাহে না বা পারে না। সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে, দেশে মাত্র একটি ভাষাকে রাখিতে হয়,—অন্যগুলিকে হয় একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা নির্জীব ও ক্ষয়িষ্ণু করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিয়াই তবে গ্রেট ব্রিটেনে রাষ্ট্রীয় 'ঐক্য ঘটিয়াছে—স্কট্ল্যান্ডের গেলিক ও ওয়েলস্-এর ওয়েল্শ্-ভাষাকে বিলোপের পথে আগাইয়া দিয়া ইংরেজির প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজি ভাষাকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটিশ একতা। ফ্রান্সেও এইরূপে দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রভাঁসাল ভাষাকে নির্জীব ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রের্তঁ ভাষাকে ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প করিয়া, ফরাসি ভাষার অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার আসনেই ফ্রান্সের রাষ্ট্র-গত একতা স্থাপিত হইয়াছে। বহুভাষাময় রুষ সাম্রাজ্যেও এই প্রকারে প্রান্তিক ভাষাগুলিকে পিষ্ট ও বিনষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়,—এক সময়ে রাজভাষা রুষের চাপে পোলীয় ভাষা, লিথুআনীয়, লেট্, এস্তোনীয়, ফিন্, আর্মানি প্রভৃতি ভাষার প্রাণসংশয় হইয়াছিল; কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যের পতন ও উক্ত সাম্রাজ্যের খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, এই সকল ভাষা যাহারা বলে তাহারা মাথা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, নিজ-নিজ ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ঐক্যের প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া, কেহ-কেহ হয়তো এগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ও ইহাদের স্থানে একমাত্র হিন্দীর অবস্থান কামনা করিবেন; কিন্তু কার্যতঃ তাহার সাধন করা অসম্ভব—এক কোটি, দুই কোটি, পাঁচ কোটি, লোকের ভাষাকে এভাবে মারা যায় না। বিশেষতঃ প্রান্তিক জনগণ যেখানে পৃথক্ প্রান্তিক সত্তা সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে এরূপ কল্পনা করাও যায় না।

এই প্রান্তিক সত্তার প্রাণ-ই হইতেছে প্রান্তিক ভাষা। এইজন্য বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা মানিয়া লইয়া, সম্পূর্ণ রূপে একীভূত রাষ্ট্রের পরিবর্তে, রাষ্ট্র-সংঘের গঠনকেই আদর্শ ধরিতে হয়। সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ হইয়াছে। রুষ সাম্রাজ্যের তাবৎ ভাষাকে এখন নিজ নিজ গৃহে স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া সমগ্র দেশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষেও দাঁড়াইতেছে তাহা-ই। The United States of India, অর্থাৎ 'ভারতবর্ষের সংযুক্ত রাষ্ট্র'—ইহা হইতেছে ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কংগ্রেস ভারতকে বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল, বিহার, হিন্দুস্থান বা সংযুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থানী মধ্যপ্রদেশ, মহাকোশল,

* উপস্থিত কালে (১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) সাড়ে সাত কোটির উপর লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। [বর্তমানে, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙলাভাষীর সংখ্যা চোদ্দ কোটির মতো।]

মারাঠী মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু, গুজরাট, অন্ধ্র, তমিল-নাড়ু, কেরল, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষাগত প্রদেশে বিভাগ করিয়াছেন। এক-একটি প্রদেশে এক-একটি ভাষা, এক-একটি ভাষা অবলম্বন করিয়া এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি; সকলেই বৃহত্তর বৃত্ত-স্বরূপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রচীন ভারতের সার্বভৌম ভারতীয় সত্তা বা সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দী ভাষাকে 'রাষ্ট্র-ভাষা' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া গিয়াছে; সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য ও অনপনেয় সম্মিলনে আধুনিক কালের এক অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে, ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশির ভাগ-ই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেই-সব বিষয়ে বাঙ্গালীদের সমতা আছে। বিশেষের উপরে ঝোঁক দিয়া সাধারণকে ভুলিলে চলিবে না—সাধারণটাই যখন প্রধান। ভারতের সমস্ত-প্রদেশ-সুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙ্গালাও তাহার অংশীদার। অন্য দেশের সমক্ষে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে বিদ্যমান এই ভারতীয়ত্বটুকু, ঈষৎ-পরিবর্তিত বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপে তত্তৎ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যায়েই পড়ে। একটি বাহ্য ও সহজ ব্যাপারেই এইটি দেখা যায়। আমাদের চেহারায় একটা সাধারণ অনন্যদেশ-লভ্য ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছে; অন্য দেশের মানুষের তুলনায়, আমাদের দেশের যে-কোনও প্রদেশের মানুষের মধ্যে এই জিনিসটি পাওয়া যায়। গায়ের গৌর-বর্ণে, কিংবা শ্যাম-বর্ণে, মুখ-চোখের সমাবেশে, চাহনিতে, চলনে, বলনে, এমন একটা লক্ষণীয় জিনিস আছে, যাহা কেবল ভারতবর্ষেরই পরিচায়ক। অত্যন্ত গৌরবর্ণ পারসী অথবা কাশ্মীরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী, খুব খাটো চেহারার এবং খুব কালো রঙ্গের সাঁওতাল, প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় জনসঙ্ঘের মধ্যে কতকগুলি extreme type অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিলে, যে-কোনও প্রদেশ হইতে হউক না কেন, সাধারণ ভারতবাসী জনকতককে ধরিয়া, তাহাদের দেহ হইতে কানের মাকড়ি, লম্বাচুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির ঘটা, মুসলমানি কায়দায় ছাঁটা গোঁফ, প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছন দূর করিয়া দিয়া, এক রকমের কাপড়-চোপড় পরাইয়া দিলে, তাহারা কোন্ প্রদেশের লোক তাহা বলা কঠিন হইবে। ইউরোপে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ-জিনিস দেখিয়াছি, আমার মতো অনেকেও দেখিয়াছেন; এদেশেও লোকে অহরহঃ দেখিতেছে। ইংরেজি পোশাক-পরা সাধারণ ভারতীয় মানুষকে, যদি বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার বাহিরে রেলে বা অন্যত্র দেখি, তাহা হইলে জোর করিয়া বলা কঠিন হয়—লোকটি কোন্ প্রদেশের; লোকটি বাঙ্গালী হইতে পারে, নাও হইতে পারে, এ বোধও আমাদের আসে। আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি—বাঙ্গালী ভারতীয়-ই বটে। বাঙ্গালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়তো চার আনা ইউরোপীয়,—তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,—এবং আটা আনা ভারতীয়; বাকি চার আনায় সে বাঙ্গালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা বিকারমাত্র,—বাকিটুকু খাঁটি বাঙ্গালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির এক অংশে আবার ইস্‌লামের প্রভাব আছে—সে প্রভাব কতটা আছে, তাহার নির্ণয় বাঙ্গালী মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই করিবেন; তবে তাহা খুব বেশি নহে; এ-বিষয় লইয়া পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এতটা কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী জাতির কথা, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, এই-সব জিনিসের ভারতীয় আধার বা পটভূমিকার কথা বাদ দিলে চলিবে না। অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক আক্রমণের চাপে আমরা মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছি; ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ঘরের মুসলমানের চাপও আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দুদের উপর অনুচিত ও অন্যায় ভাবে এখন আসিয়া পড়িতেছে—ইংরেজানুগৃহীত মুসলমানের এখনকার এই দাপট, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই হানিকর হইবে। কতকটা দিশাহারা হইয়া আমাদের এক দল উপদেশ দিতেছেন—"সামাল, সামাল, এটা আপদের সময়; কমঠ-ব্রত বা কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বাঙালীয়ানার খোলার ভিতরে হাত পা গুটাইয়া ব'সো, বাঁচিয়া যাইবে; 'ভারত' 'ভারত' বলিয়া চেঁচাইও না। বলো, 'বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়ের মা বঙ্গ-মাতার জয়'; Sinn Fein অর্থাৎ We Ourselves এই মন্ত্র জপ করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতের অর্থনৈতিক উপদ্রব ও শোষণ হইতে বাঁচ; এবং সম্ভব হইলে, এই মন্ত্র আওড়াইয়াই আরব তথা উর্দূওয়ালা পশ্চিমা মুসলমানদের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আক্রমণ হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদেরও বাঁচাও,—তাহারা খাঁটি বাঙ্গালী থাকিলে, বাঙ্গালী হিন্দু, তুমিও বাঁচিয়া যাইবে।"

কথাটা খুবই সমীচীন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার। Confusion of issues অর্থাৎ বিষয়-বিভ্রম যাহাতে না ঘটে, সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালার বুকের ভিতরে যে বৃহত্তর মারওয়াড়, বৃহত্তর উৎকল, বৃহত্তর সংযুক্ত প্রদেশ, বৃহত্তর পাঞ্জাব, বৃহত্তর ভাটিয়া ভূমি, বৃহত্তর বিহার, বৃহত্তর অন্ধ্র, বৃহত্তর কেরল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাণপণে সে সকলের অর্থনৈতিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে, এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ও প্রচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ আছে সেই যোগকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রয়োগ করিয়া, অর্থনৈতিক দিকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিক বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাইতেছে, মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের বাধা দিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে বাঙ্গালার সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, তাহা ভুলিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করিব,—কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগ ভুলিব না; নূতন সাংস্কৃতিক যোগের সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিব না; এবং আমাদের অতীতের কথার আলোচনার কালে, আমাদের জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাঙ্গালার পটভূমিকা নিখিল ভারতবর্ষকে প্রচীন ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইব না। বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুয়া মদিনা ও কমলার চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব করিব-ই,—এই অপূর্ব নারীচরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীজীবনের সৃষ্টি; কিন্তু উমা সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরব করিব না; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সীতা সাবিত্রী বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া, বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া, বাঙ্গালীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক হইয়া বিরাজ করিতেছেন;—আদি আর্য্য-ভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই থাকে না, তেমনি সীতা-সাবিত্রীকে অর্থাৎ আদি

আর্য্য-যুগের বা সংস্কৃত যুগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে বাদ দিলে, বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের কল্পনা করিতে পারি না। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতা-সাবিত্রীকে "ঘাঘরা-পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া, বাঙ্গালার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন, বা হৃদয়-সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন; তাঁহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা-পল্লী গাথাবলীর নায়িকা মলুয়া মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতা-সাবিত্রীর সত্যকার পোশাক যাহাই থাকুক (তবে প্রচীন আর্য্য যুগে মেয়েরা যে 'ঘাঘরা' পরিত না, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই), বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্য মুহূর্তে পাদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙ্গালী ধরনের সাড়ি পরাইয়া দিয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। রায় বাহাদুরের এই চেষ্টার বিশ্লেষণ এখন করিব না; কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটি শব্দ দ্বারা এই চেষ্টার বর্ণনা করা যায়—সে শব্দটা হইতেছে 'আদিখ্যেতা'—অর্থাৎ, বিশেষ এক প্রকার ভাববিলাসের আতিশয্য; এবং এই চেষ্টার মূলে, অন্যান্য মনোভাব ও চিন্তা ব্যতীত এই জিনিসটি দেখিতে পাই—আমাদের বাঙ্গালার জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা আধার-ভূমি কী কী বিষয় লইয়া, তৎসম্বন্ধে অবহিত না হইয়া, নূতন ও অনপেক্ষিত কথা (তাহা যুক্তি-সহ হউক বা না হউক) বলিয়া, sensationalism বা চমকপ্রদতার সৃষ্টি করা। বঙ্গদেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যই গড়িয়া উঠিত না—ইহাও এইরূপই sensational এবং যুক্তি-হীন কথা।

ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে, জাতীয়তা বোধও আসে না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি লইয়া অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। যে-সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির কথা পুনরুদ্ধার করা যায়, সেগুলি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা এখন হইতে মাত্র হাজার বৎসর পূর্বে নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পূর্বে বাঙ্গালা সৃজ্যমান, তখন বঙ্গদেশের ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ হিমাচল-কন্যা গঙ্গার দান; পলিমাটিতেই বাঙ্গালার উদ্ভব। বাঙ্গালা দেশের ভাষাও তেমনি উত্তর-ভারতে উদ্ভূত আর্য্যভাষা, প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। গঙ্গার মতো আর্য্যভাষার নদী বাঙ্গালা দেশেও বহিল, এই নদীর স্রোতে দেশের প্রচীন অনার্য্য ভাষা ভাসিয়া গেল—আর্য্য ভাষা প্রাকৃত এই বাঙ্গালায় আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিল; প্রাকৃতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধাত্রী-রূপে সংস্কৃতও আসিল।

মৌর্য্যরাজগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বে, বাঙ্গালা দেশে আর্য্য-ভাষার ও আনুষঙ্গিক উত্তর-ভারতের গাঙ্গ-উপত্যকার সভ্যতার বিস্তার ঘটে নাই বলিয়া অনুমান হয়। মৌর্য্য-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত রাজবংশের রাজত্ব পর্য্যন্ত—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ পর্য্যন্ত, এই আট শত বৎসর ধরিয়া, ভাষায় বাঙ্গালা দেশের আর্য্যীকরণ চলিতেছিল; এই আট শ' বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষী জনগণ নিজ অনার্য্য ভাষাসমূহকে ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে আর্য্য-ভাষা—অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত—গ্রহণ করে; উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর-ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের ইতিহাস ও পুরাণ—বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল, তাহাও বাঙ্গালায় গৃহীত হইল।

এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য—এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর-ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন এই নব-সৃষ্ট আর্য্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্ম-নীড় হইল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অনার্য্য ছিল। যেটুকু আর্য্য রক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল, সেটুকু আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য্য-মিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য্য ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটি, যাহাকে ইংরেজিতে discipline বলে, তাহা পাইল; বাঙ্গালীর অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য্য মনের—ব্রাহ্মণ্যের—এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে যখন চীনা পরিব্রাজক Hiuen Tsang হিউ-এন্ থসাঙ্ বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় যে, তখন সমস্ত বাঙ্গালা দেশটা আর্য্য-ভাষী হইয়া গিয়াছিল। তারপরে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বরেন্দ্র-ভূমিতে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, নব-সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতি নবীন এক গৌরবময় জীবনে প্রবেশ লাভ করিল। প্রথমটায় বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতেরই চর্চায় তৎপর হইলেন। তাহার পরে তাঁহারা দেশ-ভাষার দিকে দৃষ্টি দিলেন। পাল-রাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই মাগধী প্রাকৃত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে একটু বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষা, একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্য-ভাগ হইতে বৌদ্ধ গুরুদের হাতে এই স্বতন্ত্র ভাষায়, অর্থাৎ প্রচীন বাঙ্গালায়, সাহিত্য-সৃষ্টি—গান-রচনা—হইতে লাগিল।

আমাদের বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসের কাঠামো বা মূল-কথা এইরূপ বলিয়াই আমার ধারণা। আর্য্য-ভাষী বাঙ্গালী জাতির গঠনের সঙ্গে-সঙ্গে যখন বাঙ্গালী সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়, তখন কেহ বাঙ্গালীর নিজস্ব অনার্য্য সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; তখন যে-ছাঁচে বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য—রীতি-নীতি শিল্প-সাহিত্য সব-ই ঢালা হইয়াছিল, তাহা ছিল উত্তর-ভারতের বা নিখিল ভারতের সর্ব-জয়ী হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) মন,—ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, শিল্প ও সাহিত্য। যে-ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচ এখনও বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যমান। উপস্থিত কালে, অর্থনৈতিক ও মানসিক নানা বিপর্যয় এবং বিপ্লবের আগমনে, আমরা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আমাদের সমাজকে ভাঙিয়া-চুরিয়া আবার এক নূতন ছাঁচে ঢালিতে যাইতেছি।

পাল-যুগে নূতন সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতির মনের সুর, তাহার আর্য্য-ভাষার তারকে অবলম্বন করিয়া, উত্তর-ভারতের মনের সঙ্গে যেভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, মোটের উপর সে-সুরটি এখনও প্রবল ভাবে বিদ্যমান। এই এক-ই সুরে নানান্ ঝংকার শুনা গিয়াছে; কখনও বৌদ্ধ, কখনও ব্রাহ্মণ্য; ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে কখনও বৈদিক (বৈদিকের ঝংকার বাঙ্গালা দেশের সুরে চিরকালই অতি ক্ষীণ ভাবে শুনা গিয়াছে), কখনও শৈব, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণব, এবং কখনও মুসলমান সূফী। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রও এই ঝংকারের অন্যতম।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙ্গালী-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল। তারপর তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের ঝড় বহিয়া

গেল। মনে হইল, বুঝি সে-ঝড়ের মুখে বঙ্গ-বীণার বাঁধা তার ছিঁড়িয়া যাইবে, —প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতীয়তার সৌধ ভাঙিয়া পড়িবে। তখন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রান্তিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ হয় নাই—তখনকার দিনের বাঙ্গালীর সাহিত্যিক গৌরব ছিল না, বাঙ্গালী নিজেকে এক অখণ্ড ভারতেরই প্রত্যন্ত বা প্রদেশ-বাসী বলিয়া মনে করিত। যে-ঝড় কাবুল হইতে বিহার পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থানে বহিয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। তাহাকে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু এই বৈতসী বৃত্তির মধ্যেই তাহার জীবনী শক্তি অটুট রহিল। মুষ্টিমেয় তুর্কী বিজেতা ও তাহাদের পারসিক, পাঠান ও পাঞ্জাবী-মুসলমান অনুচর যাহারা বাঙ্গালায় রহিয়া গেল, তাহারা বাঙ্গালার হিন্দুর সাহায্যেই বাঙ্গালায় দিল্লী হইতে স্বাধীন এক মুসলমান-শাসিত রাজ্য স্থাপন করিল। তুর্কী ও অন্য বিদেশী বিজেতৃগণ দুই-চারি পুরুষের মধ্যেই বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উর্দু ভাষার উদ্ভব হয় নাই। উত্তর-ভারতের সঙ্গে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সে-যোগ তুর্কী-বিজয়ের পরে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানদের বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত; তাহাদের সন্তানেরা ভাষায় বাঙ্গালী-ই হইত।

প্রথম সংঘাতের পরে বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিশ্র মুসলমান এবং দেশের হিন্দু বাঙ্গালী জন-সাধারণের মধ্যে একটি সংস্কৃতি-বিষয়ক সহযোগিতা আরম্ভ হইল; মুসলমান সূফী, দরবেশ, ফকীর ও গাজী ধর্ম-প্রচারের জন্য উত্তর-ভারত হইতে এবং কচিৎ ভারতের বাহির হইতেও বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের অনেককে বল-পূর্বক মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতির ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালা দেশে যে মতের মুহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি শরিয়তি অর্থাৎ কোরান-অনুসারী ইস্‌লাম নহে। শরিয়তি মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে; বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সূফী মত-ই বেশি প্রসার লাভ করে। সূফী মতের ইস্‌লামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। সূফী মতের ইস্‌লাম সহজেই বাঙ্গালায় প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্য-যুগে তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে, যে ইস্‌লাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ-গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ইস্‌লাম ধর্ম বাস্তবিকই "মজ্‌ম 'উ-ল্-বহ্‌রৈন্" অর্থাৎ 'দুইটি সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ এনামুল্ হক্ বঙ্গদেশে ইস্‌লাম-প্রচার বিষয়ে যে মূল্যবান্ গবেষণা করিয়াছেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির একটা প্রধান দিকের ইতিহাসের উপর লক্ষণীয় আলোক-পাত দেখিতে পাইব।

তুর্কী-বিজয়ের পরে যেমন এক দিকে মুসলমান-ধর্ম-প্রচার চলিতে লাগিল, তেমনি অন্য দিকে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ-নেতৃগণ ঘর সামলাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। দেশে যখন ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হিন্দু রাজা ছিলেন, ভারতের বাহিরের দেশের প্রতি অথবা ধর্ম-গুরুর প্রতি তাকাইয়া থাকে এমন বিদেশীয় ধর্ম যখন দেশে ছিল না, তখন দেশের জন-সাধারণের প্রতি শিক্ষিত বা অভিজাত সমাজের দৃষ্টি ততটা আকর্ষিত হয় নাই। অশিক্ষিত জন-সাধারণ চিরাচরিত রীতি অনুসারে গ্রাম্য ধর্ম পালন করিত, উচ্চ বর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা পূজা যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিত; তাহাদের মধ্যে ধর্ম-পিপাসা জাগাইবার এবং মিটাইবার জন্য যোগী, সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু ছিল; তাহারা নিজেরাও নানা পর্ব-দিবস পালন করিত, সমাজের মন্থর গতির সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া তাহারাও মোটামুটি ভাবে ধর্ম সম্বন্ধে একটি ধারণা করিত। কিন্তু মুসলমান প্রচারক আসিলেন; তাঁহার পিছনে ছিল মুসলমান রাজার প্রচণ্ড শক্তি; মুসলমানের ধর্ম সহজ-বোধ্য, তাহাতে হিন্দু অর্থাৎ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সূক্ষ্ম intellectualism বা আধি-মানসিকতা নাই বলিয়াই, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে আপাতগ্রহণীয় ছিল। অবস্থা দেখিয়া উচ্চ-বর্ণের হিন্দুও সজাগ হইলেন। তখন বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের যুগ, বৌদ্ধ ধর্ম তখন তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জমান। তুর্কীদের আগমন ও মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, এবং ভারতে (বিশেষ করিয়া বঙ্গে) বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ-লাভ—এই দুইটি কাকতালীয় ন্যায়ে হইয়াছিল। জীবনী শক্তিতে হীন বৌদ্ধ ধর্ম, নব শক্তিতে জাগ্রৎ পুরাণ ও তন্ত্র-জীবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিকট পরাভূত হইতেছিল; ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অনুগামীর দল নব উৎসাহে তখন বেদ উপনিষৎ পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট নবহিন্দুধর্মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। সমাজে তখন ব্রাহ্মণ-ই প্রধানতম চিন্তা নেতা; বৈদ্য এবং কায়স্থও এ-বিষয়ে ব্রাহ্মণের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। বাঙ্গালার ক্ষাত্র শক্তি তখন কায়স্থ এবং অন্য কতকগুলি জাতির মধ্যে সজীব অবস্থায় বিদ্যমান; এবং বৈদ্য এখনকার মতো তখনও বিদ্যাবৃত্ত। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসর্বস্ব, এবং বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির বলে রাজসেবা কার্যেও নিযুক্ত। দেশের মধ্যে বাঙ্গালা প্রভৃতি লোক-ভাষা তখন সাহিত্যের উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা বুঝিয়া, উচ্চ-বর্ণের হিন্দু, সাধারণের জন্য শাস্ত্রকে উন্মুক্ত করিয়া দিতে সচেষ্ট হইলেন। তুর্কী-বিজয়ের পরে, কেরামত জাহির করেন এমন পীর ও আউলিয়াদের দ্বারা মুসলমান ধর্মের প্রচারের ফলে, উত্তর-ভারতের সর্বত্র লোক-ভাষায় হিন্দুর ধর্ম-গ্রন্থ প্রচারের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। হিন্দী-মারাঠী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে নিবদ্ধ আমাদের সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণা এইখানেই—রাজশক্তিতে শক্তি-শালী, সহজ-বোধ্যতায় প্রবল মুসলমান ধর্মের সমক্ষে, জনসাধারণের নিকটে হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম-শাস্ত্র ও ইতিহাস, তৎসঙ্গে গভীর অধ্যাত্ম-চর্চার অনুভূতি, এবং প্রাচীন উপাখ্যানাবলীর অন্তর্নিহিত রোমান্স ও উচ্চ আদর্শাবলী—এগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দিবার ইচ্ছাতেই;—কৌতূহলী বিদেশী মুসলমান রাজাদের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য মধ্য-যুগের ভারতের ভাষা-সাহিত্যের সৃষ্টি বা আরম্ভ হয় নাই।

তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের প্রথম যুগের পরে বাঙ্গালী যখন আত্মরক্ষায় তৎপর হইল, তখন কেবল সাহিত্য-রচনাতেই তাহার দৃষ্টি বা চেষ্টা নিবদ্ধ রহিল না। বাহিরের ধর্ম ও রাজশক্তির হাত হইতে দেশকে আবার স্বাধীন করিয়া দেখিবার স্বপ্নও তাহাকে বিচলিত করিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে "চণ্ডীচরণ-পরায়ণ" মহারাজ শ্রীদনুজমর্দন দেব দেখা দিলেন। ইনি সমগ্র বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজা হন, এবং যে-কার্য্য সারা উত্তর-ভারতের কোনও হিন্দু রাজা তুর্কীবিজয়ের পরে করিতে সাহসী হন নাই, সেই কার্য্য ইনি-ই করিয়াছিলেন— নিজ নামে দেশ-ভাষায় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। দনুজমর্দন দেবকে অনেকে মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত রাজা "কন্‌স্" ('কাঁশ' বা কংশ)-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। এই রাজা কংশ-ই বাঙ্গালা রামায়ণের রচয়িতা ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এইরূপ অনুমান হয়। সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু রাজা দনুজমর্দন দেব কংশ, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ ভাষায় প্রচারে উদ্যোগী;

কর্ম-চেষ্টা ও জাতীয় সাহিত্যের প্রসার, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে নিঃসন্দেহে দুই-ই সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছিল।

এইরূপে ভাষায় প্রচীন সাহিত্য প্রচারের ফলে বাঙ্গালা দেশে যাহা ঘটিল, তাহা বাঙ্গালী জাতির উত্তর-কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিস্ফুট। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কৃতে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ, সারদাতিলক তন্ত্র প্রভৃতি পড়িতেন—চৈতন্যদেবের পূর্বেকার কালে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা এই-সব সংস্কৃত পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়া আছে। এই প্রকারের ইতিহাস ও পুরাণ-গ্রন্থ ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। জন-সাধারণে ইহার স্বাদ পাইল। কথকতা—ভারত-পুরাণ পাঠ—সংস্কৃতি-প্রচার বিষয়ে দেশের এক প্রচীন পদ্ধতি ছিল। বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় পুরাণকথা, যেগুলি সংস্কৃতে লিপি-বদ্ধ হয় নাই বলিয়া ভারতের অন্যত্র সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই, সেগুলিও নবীন "মঙ্গল-কাব্য" আকারে বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। এই-সব স্থানীয় পুরাণ মধ্যে, বৌদ্ধ পুরাণও বাদ পড়িল না। এইভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শিবায়ন ও অন্য পুরাণের আখ্যায়িকার পাশে, লখিন্দর-বেহুলা কালকেতু-ফুল্লরা ধনপতি খুল্লনার কথা এবং লাউসেন ও গোপীচাঁদের কথাও বহুল ভাবে পুনঃ-প্রচারিত হইল। প্রচীন কথা ও লোক-গাথা মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল। সমাজের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংরক্ষক ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার নূতন করিয়া জ্ঞান-বল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হইল। স্বদেশে সংস্কৃত বিদ্যা মৃতপ্রায়; সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা হয় নালন্দার বিহারের মতো অন্যান্য বিহারের ধ্বংসের কালে তুর্কীর ভল্ল ও তরবারির আঘাতে নিহত হইয়াছেন, না হয় পুঁথি-পত্র লইয়া তাঁহারা নেপালে পলাইয়া গিয়া প্রাণ ও বিদ্যা উভয়েরই রক্ষা করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে তুর্কীর আগমনে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পলায়ন করিয়া পূর্ব-বঙ্গের নদী খাল বিলের দ্বারা সুরক্ষিত জনপদে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা দেশের কেন্দ্রস্থলে না থাকায় আর কার্য্যকর হইতেছিল না। তখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবটু বিদেশ হইতে সংস্কৃত জ্ঞানকে আবাহন করিয়া আনিবার জন্য বাহির হইলেন। মিথিলা সে-যুগে তুর্কীর অধীন হয় নাই। হিন্দু রাজা ছিল বলিয়া, তুর্কী-বিজয়ের পরে ধ্বংসের শতকেও মিথিলার সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্রস্থলগুলি জীবিত ছিল— বাঙ্গালীর ছেলেরা সেখানে বিশেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতি পড়িতেই যাইত। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও পক্ষধর মিশ্রের কথা আমরা সকলেই জানি। মিথিলায় যে-সব ছেলে পড়িতে যাইত, তাহারা কেবল যে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িত তাহা নহে। মিথিলার দেশভাষা মৈথিলে ঐ প্রদেশের পণ্ডিতেরা সুন্দর সুন্দর গান বাঁধিতেন। কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর (ইঁহার জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ) মৈথিল কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ বাঙ্গালী ছাত্রদের দ্বারায় বাঙ্গালা দেশে আনীত হয়, এবং সেই-সকল পদের অপূর্ব কবিত্বে বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে মোহিত হইয়া যান— বাঙ্গালা দেশে সেগুলির বহুল প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের অনুকরণও আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতির পদের মৈথিল ভাষা বাঙ্গালীর মুখে অবিকৃত থাকিতে পারিল না; এবং বাঙ্গালীর হাতে বিদ্যাপতির পদের ভাষা বিকৃত হইল, আবার বাঙ্গালা ও মৈথিল এই দুই ভাষা মিলিয়া, মৈথিলের নকলে এক অতি মধুর কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষার সৃষ্টি করিল, এই ভাষার নাম হইল "ব্রজবুলি"। বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যের অনেকখানি অংশ এই ব্রজবুলিকে লইয়া।

এইভাবে বাঙ্গালার পণ্ডিতের হাতে দুই দিকে কাজ চলিল; বাঙ্গালার সংস্কৃতির দুইটি দিক্-ই ইঁহারা পুষ্ট করিতে লাগিলেন সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার মস্তিষ্ক খেলিতে লাগিল; এবং বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা, যাহাতে বাঙ্গালার হৃদয়ের প্রকাশ হইল। এই দুই দিকেই, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-ই ছিল মূল প্রেরণা। বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনে যে ডাক ও খনার বচন ছিল, তাহা প্রচীন মুসলমান-পূর্ব যুগের সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। তুর্কী-বিজয়ের দেড়-শত দুই-শত বৎসরের মধ্যে যখন সমস্ত উত্তর-ভারতময় মুসলমান ভাব-জগতের প্রতাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের জীবনে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন সহজ-বোধ্য ভক্তি-মার্গ পুনরায় প্রকটিত হইল, 'নাম-ধর্ম' প্রসার-লাভ করিল। নাম-ধর্মের নানা সাধক দেখা দিলেন; রামানন্দ কবীর প্রমুখ উত্তর-ভারতের সন্তমার্গী সাধুগণ; বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যদেব; এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তৎশিষ্য ও অনুশিষ্য শিখ গুরুগণ।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনেকটা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবকেই আশ্রয় করিয়া পুষ্টি-লাভ করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নূতন ধারা সৃষ্ট বা প্রবর্তিত করিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার মর্য্যাদা তাঁহার হাতে ক্ষুণ্ন হয় নাই; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের গুরু-পরম্পরা, সংস্কৃত ভাষায় যে-দার্শনিক বিচার প্রকট করিলেন, যে-রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যে সকল মূল গ্রন্থ, টীকা ও কাব্যাদি রচনা করিলেন, তাহা বিদ্যা ও বুদ্ধির দিক্ হইতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির অপূর্ব সৃষ্টি; বাঙ্গালীর বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্যন্যায়ের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের এবং শ্রীকুল্লুকভট্ট, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ টীকাকার ও সংকলয়িতাদের মেধায় দেখা যায়, তেমনি ইহা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্য্যদের পাণ্ডিত্যেও দেখা যায়। আবার বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙ্গালীর হৃদয়ের, তাহার রসানুভূতির যে-পরিচয় পাই, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুপ্রেরণার ফল। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার জন-সংগীত কীর্তনগানে যে লক্ষণীয় এবং অতি বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিল, বাঙ্গালার নিজস্ব সংগীতের প্রাণ-স্বরূপ সেই কীর্তনগানও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ। ঘরমুখো বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া নতুন উদ্যমে পুরী গয়া কাশী বৃন্দাবনে গেল, জয়পুরে গেল, এবং আরও পশ্চিমে গেল;—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল। এখানেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রভাব দেখি।

বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালা-দেশ বোধ হয় আদিম অস্ট্রিক জাতি হইতে প্রাপ্ত রিক্থকেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া সভ্যতার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। গ্রামের বড়ো দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা। ইউরোপের সভ্যতা অর্থে Civilisation—যাহা civis বা নগরকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, 'নাগরিকতার ভাব' ইউরোপের polis বা নগর হইতে politics-এর উৎপত্তি। আরবদের মধ্যেও 'মদীনা' বা নগরের জীবন-যাত্রাই 'তমদ্দুন' বা সভ্যতা। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কখনও নগরের প্রাধান্য ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিল্প-সম্ভারপূর্ণ, বিরাট্ মন্দির ও অন্য গৃহে শোভিত, বড়ো-বড়ো নগর প্রচীন কাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়; যেমন, প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো দড়ো, হরপ্পা; প্রচীন কালের অহিচ্ছত্র, মথুরা, কাশী, পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা, সাকেত, গোনর্দ, উজ্জয়িনী, প্রতিষ্ঠান, ধান্যকটক (অমরাবতী), মহাবলিপুর, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি, যে-সব নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাই; মধ্য যুগের দিল্লী, আগরা, লাহোর, মদুরা, পুনা, মাণ্ডু প্রভৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে নগরাদির ধ্বংসাবশেষ যে-রূপ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সে-রূপ

ততটা পাওয়া যায় নাই; কাশী, মদুরা, পুনা, উজ্জয়িনী, লাহোর প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে নাম করা যায় এমন নগর বাঙ্গালা দেশে বেশী গড়িয়া উঠে নাই—বাঙ্গালা দেশের নাগরিক জীবন মুখ্যতঃ গ্রামের জীবনেরই একটি বিস্তৃত সংস্করণ ছিল। বাঙ্গালার নগরের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি দুই-একটির নাম মাত্র করা যায়। বাঙ্গালা দেশ ভারতের জীবনের স্রোতের এক পাশে, একটু যেন বিচ্ছিন্ন ভাবেই বরাবর ছিল। শিল্প-নগরী রূপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পশ্চিম-বঙ্গে বিষ্ণুপুর বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সময়ের বিষ্ণুপুরের হঠাৎ বড়ো হইয়া উঠার দুইটি কারণ ছিল—[১] উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব উপকূলের সহিত উত্তর ভারতের যোগ-বিধায়ক পথের উপরেই বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল; সেইজন্য উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তীর্থ-যাত্রা ও অন্য উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা যাতায়াত করিত, তাহাদের মারফত বাহিরের জগতের সহিত বিষ্ণুপুরের সংযোগ সহজ হইয়াছিল; [২] বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালা দেশের হৃদয়-স্থানীয় নবদ্বীপ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরিয়া, কতকগুলি বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কর্মী বাঙ্গালা দেশের গ্রাম্য সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বাহিরেও একটি বিরাট্ কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ যেমন একদিকে ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা, অন্য দিকে ছিল—বাঙ্গালা দেশের স্বাধীন মুসলমান নরপতির হাত হইতে মুক্ত হইয়া, মোগল সম্রাটের অধীন হওয়া। স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালা দেশ ভারতবর্ষের এক কোণে পড়িয়া ছিল, এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মতো অবস্থায় ছিল; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার তেমন কোনও যোগ ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার পক্ষে আংশিক-ভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভবপর হইল। দিল্লী-আগরার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালার পক্ষে হিতকর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা বাঙ্গালার বাহিরে আদর পাইল—বাঙ্গালার বিদ্যাধর পণ্ডিত জয়পুর নগর স্থাপন কালে সাহায্য করিলেন (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ), বাঙ্গালার পণ্ডিত ও গোস্বামীরা উত্তর-ভারতের ধর্ম-জীবনে অংশ-গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্য্যের মতকে উত্তর-ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, দিল্লী-আগরা জয়পুর-চিতোর হইতে পারস্য ও তুরস্ক পর্য্যন্ত সর্বত্র রাজদরবারে বাঙ্গালার ঢাকাই মলমলের চাহিদা বাড়িয়া গেল, বাঙ্গালার বাঁশে তৈয়ারি 'কুঁড়ে' ঘরের বাঁকা ধাঁচা, 'রেওটি' নামে রাজপুত-মোগল বাস্তু-শিল্পের মধ্যে স্থান পাইল। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, হিন্দু-যুগের অবসানের পরে, বাঙ্গালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডি প্রথম কাটাইয়া, নিখিল-ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড়ো সুযোগ পাইল। সপ্তদশ শতকে উত্তর-ভারতের লোক-ভাষা ('হিন্দী') হইতে বাঙ্গালাতে দুইখানি বই অনূদিত হইল—নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল', এবং মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ'।

দিল্লী-আগরা এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের সঙ্গে যে-যোগ নতুন করিয়া মোগল-বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ হইল, সে-যোগ আর বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এই যোগকে একটা বড় স্থান দিতে হয়।

যদিও বাঙ্গালী জাতির অর্ধেকের উপর এখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহা লক্ষণীয় যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবী, ফারসী ও উত্তর-ভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব সভ্যতা, রীতি-নীতি এবং চিন্তা-প্রণালী) বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনেও তেমন কার্যকর হয় নাই। সূফী মতের ইস্লামের সহিত বাঙ্গালী (অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু) মনোভাবের একটা আপস হইয়াছিল, সে-কথা পূর্বে বলিয়াছি। সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান (কতকগুলি বিশেষ প্রান্তে, বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত), বিশিষ্ট মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। যে দুই-চারি জন বড়ো বড়ো আলেম, মোল্লা ও মৌলবী বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে হইতেন, তাঁহারা নিজেদের আরবী-ফারসী কেতাবের মধ্যেই নিমগ্ন থাকিতেন, বাঙ্গালা ভাষার চর্চা তাঁহারা বড়ো একটা করিতেন না; ফলে, আরবী-ফারসী জগতের খবর বাঙ্গালীর কাছে বেশি করিয়া পৌঁছায় নাই। কিছু কিছু আরবী প্রার্থনা, মুসলমানি স্মৃতি-শাস্ত্রের কথা, এবং মুসলমানি ইতিহাস-পুরাণ কেচ্ছা-কাহিনী বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র। উত্তর-ভারতের এবং ভারতের বাহিরের দেশের মুসলমান সংস্কৃতির সহিত এবং কোরান-অনুমোদিত ইস্লামের সহিত বাঙ্গালী মুসলমান অতি আধুনিক কালে—বিগত মাত্র ২৫/৩০ বৎসর মধ্যে—একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নানা কারণে তাহার জীবনে সে-পরিচয় কার্য্যকর হইতেছে না।

* * * * * * *

ফরমাইশ দিয়া ইচ্ছামতো 'জাতীয় সংস্কৃতি' তৈয়ার করা চলে না। বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে যেটুকু মুসলমান প্রভাব বিদ্যমান, ধীরে-ধীরে এই পাঁচ ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া, ইস্লামগত-প্রাণ পূর্ণবিশ্বাসী আলেম মোল্লা মৌলবীদের চেষ্টাতেই হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ-কেহ যেভাবে বাঙ্গালায় 'ইস্লামি সংস্কৃতি' আনিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার মধ্যে positive অর্থাৎ সংগঠনকারী দিক্ অপেক্ষা negative অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিক্টাই প্রবল। ইঁহাদের কাছে ইস্লামীয় মনোভাব মানে মুখ্যতঃ যাহা ভারতীয়ত্বের বা হিন্দুত্বের বিরোধী; কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব ইঁহাদের চোখে 'কুফ্র্' বা বিধর্মিত্ব এবং 'শির্ক্' বা বহু-দেব-বাদিত্বেরই নামান্তর। হিন্দু বা ভারতীয় মাটিতে জন্ম—এই কথাতেই যেন কুফ্র্ ও শির্ক্-এর আমেজ লাগিয়া আছে; তাই বহু ভারতীয় বা বাঙ্গালী মুসলমান নিজেকে সৈয়দ বা আরব, অথবা ঈরানী, পাঠান, মোগল বা তুর্কী বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। বাঙ্গালী বা ভারতীয় মুসলমানদের এই আত্মমর্য্যাদাবোধ-হীনতা তাহাদের পক্ষে—এবং আমাদের পক্ষেও ঘটে—এক হৃদয় বিদারক, সর্বনাশকর ট্রাজেডি। পারস্যের মুসলমানেরা কখনও এইভাবে আত্মমর্য্যাদা হারায় নাই; ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে পারসীকেরা নিজ জাতির আভিজাত্য, তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলিতে চাহে নাই—বরং তাহাদের 'শাহ্নামা' গ্রন্থে, মুসলমান-পূর্ব যুগের পুরাণ-কথাকে তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তুর্কী মুসলমানেরা তিন চার শতকের বিস্মৃতির পরে, আবার নূতন করিয়া তাহাদের জাতির গৌরব-কথা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে—তুর্কীরা এখন আরব ও ঈরানী প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু আসিয়াছে, এ-তাবৎ তাহা বাঙ্গালীর জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রাখিয়াই আসিয়াছে। এখন কোনও-কোনও দিক্ হইতে যে নবীন প্রয়াস হইতেছে, তদ্দ্বারা ভাঙ্গন ঘটিবে—তাহার দ্বারা বড়ো একটা কিছু গড়িয়া উঠিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালী মুসলমানের প্রকৃতি এবং ইসলামধর্মী অন্যান্য জাতির মনের ও সভ্যতার প্রকৃতি ভালো করিয়া না বুঝিয়া, বাঙ্গালী মুসলমানের মনকে চালিত করিবার চেষ্টা করিলে, একটা কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুই সৃষ্ট হইবে, সত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হইবে না।

বাঙ্গালা দেশে যে-সংস্কৃতি গত এক হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যে-যে বস্তু বা অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে অবলম্বন করিয়া

তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নীচে তাহার একটা দিগদর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইতেছে।——

[১] বাঙ্গালার বাস্তব সভ্যতা——

বাঙ্গালায় খড়ের চালের কুটির; পূর্ববঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ——ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটি, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে); ইটের মন্দির; পোড়া-মাটির ভাস্কর্য্য——ইটের উপরে নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে-খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র-স্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)——ইটে-খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।

চিত্রবিদ্যা——পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), এবং অন্য প্রকারের খাঁটি বাঙ্গালী চিত্রপদ্ধতি, যথা——পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, কালীঘাটের পট, পূর্ব-বঙ্গের গাজীর পট, শরায় ছবি আঁকা——ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত; মাটির ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চাল-চিত্র আঁকা, মাটির সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র——ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে; রঙ্গীন মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল,——গ্রাম-শিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প——জাপানি সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

দাঁইহাট-কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্তি-শিল্প ও অন্য ভাস্কর্য্য, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতির দাঁতের কারুশিল্প——মূর্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙ্গালার হাতির দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পর্যান্ত পঁহুছিয়াছে); বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ——শাঁখে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙ্গালায় সোলার কাজ——খেলনা, ঠাকুরের সাজ; ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন, ঢাকার filigree work বা রূপার তারের কাজ; কলিকাতায় রূপার repousse work বা নকশা তোলা কাজ; কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলংকার শিল্প এবং বিলাতি ধরনের মীনার কাজ——এগুলির প্রভাব বাঙ্গালার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙ্গালার পিতল-কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল কাঁসা ও ভরনের বাসন, দাঁইহাট-কাটোয়ার, বনপাস-বর্ধমানের এবং ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের নানা স্থানের পিতলের বাসন; কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্তি ঢালাই; শাসপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ।

বাঙ্গালার খাদ্য-দ্রব্য——বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট শাক শুক্তানি ঘণ্ট নিরামিশ ব্যঞ্জন ও তরকারি; (বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গের) মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার কাসুন্দি, ছড়া তেঁতুল; আচার, খেজুরে'গুড়, পাটালি; মুড়ি, মুড়কি, চালের গুঁড়া, নারকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারি নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন; বীরখণ্ডি, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা, ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারি বাঙ্গালার নিজস্ব মিষ্টান্ন, নানা প্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা।

বাঙ্গালার পরিধেয়——মিহি মলমল, ঢাকার জামদানি (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল শান্তিপুর চন্দ্রকোণা ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর প্রভৃতি স্থানের) ধুতি ও সাড়ি, কুমিল্লার ময়নামতী সাড়ি, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর; বীরভূম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম; রাজসাহির মটকা, বীরভূম তাঁতিপাড়ার ও কড়িধার তসর; বিষ্ণুপুরের রেশম——কেটে', চেলি, নকশা-দার ও বুটিদার সাড়ি; অধুনা-বিলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বালুচরের সাড়ি; হিমালয়-প্রান্তের মোটা পশমি কম্বল; অধুনা-প্রচলিত বাঙ্গালার ছাপা রেশমের শাড়ি।

মেদিনীপুরের সূক্ষ্ম মাদুর, কুমিল্লা নোয়াখালি ও শ্রীহট্টের শীতলপাটি।

বাঙ্গালার নিজস্ব কৃষি-শিল্প——নানা প্রকারের ধান; পাট; বাঙ্গালার মাছের চাষ।

বাঙ্গালার নৌশিল্প——বিভিন্ন সরকারের নৌকা (এই নৌশিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত); বীরভূমের বুহিতাল, এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

[২] বাঙ্গালার অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতি——

বাঙ্গালার সামাজিক বিধি ও ধর্ম-সাধন সম্বন্ধীয়, অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার হিন্দুর সম্পত্তি-উত্তরাধিকারের রীতি——দায়ভাগ; বাঙ্গালার সামাজিকতা——বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ও মিত্র সম্মেলনের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার পূজা——দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, রাস, সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে দুর্গাপূজা; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকা-ব্রত; পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব——আটকৌড়িয়া, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাই-ষষ্ঠী, পৌষ-পার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নূতন-খাতা প্রভৃতি।

মেয়েদের আলিপনা-আঁকা, কাঁথা-সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙ্গালার লাঠিখেলা ও ক্রীড়া-কসরৎ, রায়বেঁশে' নাচ; পূজার সময় ঢাকি-ঢুলিদের নাচ; পূর্ব-বঙ্গের আরতি-নৃত্য; মেয়েদের ব্রত-নৃত্য; অন্য নানা প্রকারের নৃত্য।

বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ-মাদারের অনুষ্ঠান; নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ।

[৩] বাঙ্গালার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি——

টোল-চতুষ্পাঠী; বাঙ্গালার সংস্কৃত বিদ্যা——জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতের কীর্তি; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালিপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃত পণ্ডিতদের পরম্পরা; নৈয়ায়িক ও স্মার্তগণ; আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্য্যগণ; মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ; বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক পদ; বৌদ্ধ চর্য্যাপদ; বড়ুচণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব; কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'; ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলি সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ; শাক্ত পদ——রামপ্রসাদ; রামায়ণ মহাভারতের বাঙ্গালা রূপ; বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের উপাখ্যান——বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা; লাউসেন-কথা (অধুনা কম প্রচারিত); পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজা; বাঙ্গালার কথকতা; কীর্তনগান——কীর্তনের অভিব্যক্তি——গড়েরহাটি বা গরানহাটি, মনোহরশাহী, রানীহাটি, প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও ভাটিয়াল গান; বাঙ্গালার শ্লোক-পড়ার সুর; কবি, ঝুমুর, তরজা ও অন্য গ্রাম্য গীত; পাঁচালি; বাঙ্গালার 'যাত্রা'; জারি গান; মুসলমান মারফতি গান; মর্সিয়া গান; বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান পুঁথিপড়ার সুর; বাঙ্গালার পয়ার; পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দীগানের বাঙ্গালায় প্রচার——বাঙ্গালার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, ঢপ, খেমটা।

বাঙ্গালার সাহিত্যে——'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', চৈতন্য ও বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র-বিষয়ক পুস্তক, পদাবলী-সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্গালার কাব্যাবলী (মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি); ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু——গীতি-কবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া, ইংরেজদের আগমন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধুনা ইহার কতকগুলি বিষয় একেবারে লোপ পাইয়াছে; কতকগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং কতকগুলির আমরা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছি। ইংরেজ-আমলে বাঙ্গালা কতকগুলি নূতন জিনিসে, তথা এই প্রাচীন জিনিসগুলির অনেকগুলিতে, সমগ্র ভারতের দ্বারায় স্বীকৃত বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক কালের বাঙ্গালীর সংস্কৃতির পরিচয়-স্বরূপ বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর মধ্যে উল্লেখ করা যায়—

[১] বাঙ্গালার ব্রাহ্ম ধর্ম—রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী।

[২] বাঙ্গালায় হিন্দুধর্মের নবীন জাগৃতি—রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভূদেব, বিজয়কৃষ্ণ, হীরেন্দ্রনাথ। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া জনসেবা—ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মিশন।

[৩] আধুনিক বাঙ্গালার সংস্কৃত-চর্চা—রাধাকান্ত দেব, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পঞ্চানন তর্করত্ন, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ।

[৪] বাঙ্গালার সাহিত্য—ঈশ্বরচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণ।

[৫] বাঙ্গালার নবীন শিল্প-পদ্ধতি—ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ।

[৬] নাট্যশিল্পের প্রযোজনায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব, কি রঙ্গমঞ্চের কি চলচ্চিত্রের আধুনিক উন্নতিতে, সমগ্র ভারতে ও বিশ্বে স্বীকৃত। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অপরেশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুকুমার, শিশিরকুমার প্রভৃতির নবীনত্ব ও কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ ছিল। চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী প্রযোজকের নাম ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

[৭] রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বাঙ্গালা সংগীতের নূতন ধারা; শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং অন্যত্র উদয়শংকর প্রভৃতি বাঙ্গালী নৃত্যকলাবিদ্‌গণের দ্বারা প্রবর্তিত ভারতীয় নৃত্যের নূতন ধারা।

[৮] বাঙ্গালার সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা ও সংরক্ষণ চেষ্টা—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র।

[৯] বাঙ্গালায় আরব্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং বঙ্কিম প্রমুখ বাঙ্গালী কর্তৃক ভারত-মাতার কল্পনা। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যাত্রামোহন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু।

[১০] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের গবেষণা—আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ।

[১১] বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক সার্থক গবেষণা—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে একাধারে পাণ্ডিত্য ও কৃতকারিতার অভাব নাই, তাহা আধুনিক বাঙ্গলায় 'বাচস্পত্য' সংস্কৃত অভিধানের সংকলয়িতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং বাঙ্গালা 'বিশ্বকোষ'কার নগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

*　　*　　*　　*

প্রসঙ্গতঃ বিশিষ্ট বাঙ্গালী সংস্কৃতির কতকগুলি লক্ষণীয় অঙ্গ বা উপজীব্য বস্তু, অনুষ্ঠান ও প্রকাশের উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালার সংস্কৃতির গতির দিগ্‌দর্শনে ফিরিয়া আসা যাউক।

মোগল-যুগের মধ্যেই, বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়—পোর্তুগীস, ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার ও ইংরেজ—আসিল। ইংরেজ ধীরে-ধীরে দেশের রাজা হইয়া বসিল। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে, ইংরেজের সহিত সাহচর্য্যের ফলে, আর একবার যুগান্তর উপস্থিত হইল।

এই যুগান্তর এখনও চলিতেছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত, এই যুগান্তর ব্যাপারে আমরা চারিটি পর্য্যায় বা ক্রম দেখিতে পাই। [১] রামমোহন যুগ, [২] "ইয়ং-বেঙ্গল"-এর যুগ, [৩] বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দ যুগ, ও [৪] অতি আধুনিক যুগ, বা লড়াইয়ের পরের যুগ।

[১] প্রথম যুগে ইউরোপীয় মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয়। এই প্রথম পরিচয়ের সময়ে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন একটু সাবধানতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, একেবারে নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাহে নাই। রামমোহন এই যুগের প্রতীক। ইনি অসাধারণ-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলেও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সার কথা উপনিষৎকে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, উপনিষদেই ইহার পর্যবসান নহে,—এই বোধ আংশিকভাবে রামমোহনের ও পরে তাঁহার বহু অনুগামীদের মনে না থাকায়, রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জস্য একদেশদর্শী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্য-যুক্ত চিত্তের মানুষ না হওয়ায়, রামমোহন এ-দেশের মন যাহা চায়—তদনুরূপ ঈশ্বরে একান্তভাবে নিমজ্জিত লোকপূজিত ধর্মগুরু হইতে পারিলেন না।

[২] দ্বিতীয় যুগে বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে, ইহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা নানা উপায়ে ইউরোপীয় মনোভাব—এমন কি ইউরোপীয় রীতিনীতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালী—সমস্ত-ই ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিতে চাহিলেন। এরূপ উলট-পালট করিবার মতো সংখ্যা বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত অথবা ইংরেজি শিক্ষাকামী জনগণের মনে তাঁহারা একটি ছাপ দিয়া গেলেন।

[৩] তারপরে আসিল যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা—এই চেষ্টায় ছিল—প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাকে রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহা আত্মসাৎ করা। বঙ্কিম, ভূদেব ও বিবেকানন্দের যুগে—অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৬০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত—জীবন ধীরমন্থর গতিতে চলিতেছিল; ইউরোপীয় সভ্যতা আজকালকার মতো এতটা সর্বগ্রাসী ভাবে আমাদের সমক্ষে তখন দেখা দেয় নাই, আমাদের জীবনে আজকালকার মতো এত জটিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও আসে নাই। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধীরে সুস্থে বিচার করিবার অবকাশ ছিল, তাই আমরা বঙ্কিমে ভূদেবে বিবেকানন্দে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে হিতকর—তাহার সংহতি-শক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযোগী এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ

করিবার যোগ্য—কথা পাই; সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলিয়াই বঙ্কিম ও মধুসূদন বাঙ্গালীর জন্য এমন চিরন্তন রস-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

[৪] এখন বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে-যুগ চলিতেছে, তাহার মূল কথা হইতেছে—বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রচণ্ড আঘাত বাঙ্গালীর জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন, এবং আদর্শ-বিপর্যয়। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বনাশকর হিন্দু-মুসলমান বিরোধও এই যুগের চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক অবনতির একটা প্রধান কারণ। এখনকার কালে চারিদিক হইতে ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িতেছে। এই যে দ্রুত ভাব-বিনিময়—সংবাদপত্রের ও সাহিত্যের বহুল প্রচার, চলচ্চিত্র ও সবাক্‌চিত্র প্রভৃতির যুগে এরূপটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক অবস্থা-বৈগুণ্যে বাঙ্গালীর সামাজিক আদর্শও পরিবর্তিত হইতেছে; প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ, যাহা এতাবৎ কন্যাপণ এবং কন্যার সংখ্যাল্পতা হেতু নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, অর্থনৈতিক সংকটে বেশি করিয়া ক্লিষ্ট হওয়ায় তাহা মধ্যবিত্ত ঘরেও আসিয়া পড়িতেছে; অকৃতদার পুরুষ, ও অবীরা বা কুমারী নারী,—নূতন যুগের এই বৈশিষ্ট্য বহুশঃ বাঙ্গালী সমাজেও পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও হইবে। সহশিক্ষা-রূপ নূতন সমস্যাও আসিতেছে।

* * * *

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস এবং কৃতিত্ব বিচার করিয়া, উপস্থিত সংকট-কালে তাহার মানসিক চর্চা সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা যায়—

[১] বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ জাতি, ইহা সত্য বটে,—কিন্তু এই ভাব-প্রবণতাই তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। বাঙ্গালী লক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু সেই সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব কিছু বস্তু নহে,—তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পদ এবং কতকগুলি আখ্যায়িকা, এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধুসূদনের কাব্যাংশ, বঙ্কিমের-খানকয়েক উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ ও অন্য রচনা—মাত্র এই কয়টি জিনিস আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিতে পারি। ভাটিয়া বা মারোয়াড়ী, অথবা পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছে না; ইহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য অমনিই সিদ্ধান্ত করা হইল, বাঙ্গালী কবি জাতি, ভাব-প্রবণ জাতি, তাহার মধ্যে কর্মশক্তি নাই, তাহার উৎসাহ ও উদ্যোগের সমস্তটাই ভাবুকের খেয়ালে, কবির কল্পনায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরাও এই কথাটা যেন পাকে-প্রকারে মানিয়া লইয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে, আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ সচেতন গৌরব-বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, একটা গর্ব-সুখে আমাদের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান কার্যতঃ ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-সংগীত রূপে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মারোয়াড়ীর মতো কৃতিত্ব আমাদের মধ্যে না দেখিয়া, সকলেই আমাদের কল্পনা-শক্তিরই তারিফ করিতেছে; আমরাও সেই কথা সত্য ভাবিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতেছি,—আমাদের ব্যর্থতাকে আমরা কেবল আমাদের প্রতিকূল অবস্থা অথবা দৈব-দুর্বিপাক হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার প্রতিকারের শক্তিকে খর্ব করিতেছি। আমাদের দেশের নেতারা কেহ-কেহ সাহিত্যে, কীর্তনের গানে, আমাদের ভাবুক প্রাণের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কবিতা ও গান, ইহা-ই যেন হইল আমাদের মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। বার-বার একটা কথা শুনিয়া, সেই কথা ক্রমাগত মন্ত্রের মতো জপ করিয়া, আমরা সেই কথাটাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিক এই কথাটাই কি ঠিক? আমরা কি কেবল ভাব-প্রবণ জাতি? আমাদের মধ্যে কি জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সার্থকতা নাই—হয় নাই? আমার মনে হয়—ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা, সাহিত্য-রসে মশগুল হইয়া থাকা—ইহা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক্ মাত্র—ইহা সর্বপ্রধান দিক্‌ও নহে। প্রাচীন কালে কীর্তনের সভায় ও কবি বা পাঁচালি গানের আখড়ায়, বাউলের জমায়েতে ও মারফতি গানের মজলিসে যেমন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলে এবং বিচার-সভায় তাহার জ্ঞানের দিক্‌টা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞান-মন্দিরে বাঙ্গালী রিক্ত-হস্তে যায় নাই। ভারতের সংগীতোদ্যানে বাঙ্গালা কীর্তন একটি বিশিষ্ট সুরভি পুষ্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু নব্য ন্যায়, বাঙ্গালার সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী; বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী, এবং আধুনিক কালে বাঙ্গালার রামমোহন, বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার কেশবচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাড়াইতে ও ভারতের চিন্তাকে পুষ্ট করিতে ইঁহাদের দান কম নয়; ইঁহারা বাঙ্গালার মানসিক সংস্কৃতির অপর একটি দিক্—এবং একটি বড়ো দিক্—নিছক ভাব-প্রবণতার অত্যাবশ্যক প্রতিষেধক দিক্‌কে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর এখন জীবন-মরণ সংকট উপস্থিত; আমাদের ভাবুকতা, কল্পন-প্রবণতা সব-ই শুখাইয়া যাইতেছে এবং অন্নের অভাবে তাহা আরও শুখাইয়া যাইবে। জাতির জীবনের স্ফূর্তি, আশা, আনন্দ, উৎসাহ, জয়ের আগ্রহ না থাকিলে, সেই জাতির মধ্যে সত্যকার প্রাণবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন সাহিত্য-সৃষ্টির সাহিত্য-চর্চার চেষ্টা, কল্পনার আবাহন, ভাবুকতার সাধন,—সে যেন যে গাছের গোড়া শুখাইয়া আসিতেছে, শিকড়ে যাহার রস নাই, সেই গাছের আগডালে বারি-সেচন করা। আমাদের জীবনে ভোগ করিবার, ত্যাগ করিবার কী আছে? অর্জন করিবার, জয় করিবার কী আছে? যেটুকু আছে, তাহা তো রক্ষা করিবারও পথ পাইতেছি না। এ অবস্থায় কি প্রকারের সাহিত্য আমাদের হাত দিয়া বাহির হইতে পারে? বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিয়াছে; রসচর্চা লইয়া মাতামাতি করা এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অশোভন দেখায়। এখন প্রাণধারণের, দুর্দিনের রাত্রে কোনও রকমে টিকিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন তাহাকে সর্ব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এখন তাহার আত্মবিশ্লেষণ-কার্যে তাহাকে জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির আবাহন করিতে হইবে; যে-শক্তির পরিচয় সে দিয়াছে, সে-শক্তি তাহার আছে, এবং সে-শক্তি তাহার কল্পনা বা ভাবুকতা হইতে কোনও অংশে কম নহে।

[২] প্রত্যেক সমাজের মধ্যে দুই প্রকারের শক্তি কার্য্য করে—কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসারী, আত্মসমাহিতকারী এবং আত্মপ্রসারকারী। এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালী সম্প্রতি একটু বেশী রকম করিয়া বহির্মুখী হইতে চাহিতেছে। এখানে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া তাহাকে একটু অন্তর্মুখী করা, এখন তাহার প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুরণের দোহাই দিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ স্বাধীন গতি এই কেন্দ্রাপসারিত্বের একটি বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু সমাজ-গত সমষ্টির বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ ব্যক্তি-গত ব্যষ্টি, যদি এই রূপে মুক্ত, স্বতন্ত্র ও সংঘ-বিচ্যুত হইয়া অবাধ গতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ-সমষ্টি আর সমষ্টি-বদ্ধ থাকে না। এক কথায়, Social Discipline বা সমাজগত চর্য্যা বা নীতি বা বিনয় থাকিলে, সমাজ ও জাতি টিকিতে পারে না। এখন বাঙালীর জীবনে বাহিরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের অবাধ প্রসারের সময় ইহা নয়; একমাত্র সংঘগতভাবে অবস্থান দ্বারাই ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন ও স্বার্থ উভয়-ই রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালীর জীবনে এই রক্ষয়িত্রী

শক্তির উজ্জীবন করিতে হইবে,—আবার সমাজকে, সংঘকে, জাতিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। কিভাবে এ-কার্য্য করা উচিত, তাহা অবশ্য বিচার-সাপেক্ষ। রক্ষয়িত্রী শক্তি অর্থে নিছক গোঁড়ামি নহে। দেশ ও কালের উপযোগী ভাবে, নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে বিচ্যুত না হওয়া-ই হইতেছে সামাজিক জীবনে কার্য্যকর রক্ষণশীলতা। এ কাজের জন্য প্রথম আবশ্যক—জ্ঞান, আলোচনা, অনুশীলন; নিজের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে, এবং বাহিরের জগতের প্রগতি বিষয়ে। বাঙ্গালীকে আবার একটা বাঁধা ধরা discipline মানিতে হইবে—'ন্যায়-আঁকড়িয়া' হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে রাশ ছাড়িয়া দিলে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিতে হইবে।

[৩] বাঙ্গালী কর্মী নহে, তাহার এই একটা অপবাদ আছে। সত্য বটে, হাজারে-হাজারে লাখে লাখে বাঙ্গালী অন্ন-উপার্জনের জন্য বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালার বাহিরে যায় নাই—যেমন পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালায় আসিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, এতাবৎ বাঙ্গালীর ঘরে একমুঠা ভাতের অভাব হয় নাই। সেদিন পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের অন্নচিন্তা ছিল না। গরিব লোকে দেশে বসিয়াই পেট ভরাইতে পারিত, বা আধ-পেটা খাইয়া কোনও রকমে থাকিতে পারিত, ১৫/২০ টাকার জন্য কাঁচা মাথা দিবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না, 'রুটি-অর্জন' করিতে বাহিরে ছুটিতে হইত না। এখন সে আবশ্যকতা আসিতেছে। আমার মনে হয়। তথাকথিত ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী, কবি বাঙ্গালী এখন দরকার পড়িলে কর্মী বাঙ্গালী হইতে পিছপাও হইবে না। আবশ্যকতা পড়িয়াছে বলিয়াই ময়মনসিংহের বাঙ্গালী কৃষক এখন ঘর ছাড়িয়া আসাম প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্মা ও শ্যামে গিয়া বসবাস করিতেছে। দেখা গিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী অন্য জাতির লোকেদের চেয়ে কিছু কম কৃতিত্ব দেখায় নাই। মানুষের কর্মশক্তি আভ্যন্তর urge বা তাড়নার উপরে নির্ভর করে। বাঙ্গালীর অবস্থা-বৈগুণ্যে সে তাড়না আসিতেছে। বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া শ্রমী ও কর্মী হইতেই হইবে। 'তুমি কবি ও ভাবুকের জাতি, তোমার দ্বারা এ-সব কিছু হইবে না', এইরূপ নিরুৎসাহ-বাক্যে তাহার শত্রুরাই তাহাকে নিবৃত্ত করিবে।

[৪] বাঙ্গালীর বাঙ্গালীপনার বা বাঙ্গালীত্বের দিকে ঝোঁক দিয়া কেহ-কেহ তাহাকে অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার মনে শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মতন শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই—প্রমাণ, বাঙ্গালী পটুয়ার পট, বাঙ্গালী ছুতারের কাঠ-খোদাই, মধ্য-যুগের বাঙ্গালার ইটে-কাটা মন্দিরের নক্শা; বাঙ্গালীর নাচ অপূর্ব—প্রমাণ, বাঙ্গালীর মল্ল-নৃত্য, রায়বেঁশে নাচ, বাঙ্গালার কোনও-কোনও জেলার মেয়েদের মধ্যে বিলোপ-শীল ব্রত-নৃত্য। আমাদের দেশের গ্রাম-শিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালোবাসিব, যতটা সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিব। এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটি মনোহর অভিব্যক্তি, কিন্তু তাই বলিয়া, জগতের অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর জিনিসকে টেক্কা দিয়াছে আমাদের বাঙ্গালার এই শিল্প ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এরূপ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর মুখে হাস্যের উদ্রেক করিবে। সাহিত্যে একজন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতা অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই বলিয়া যেমন ইহা প্রমাণিত হয় না যে, বাঙ্গালী মাত্রই কবি, তেমনি একজন অবনীন্দ্র বা নন্দলাল ভারতীর নিজ হস্ত হইতে তুলিকা পাইয়াছেন বলিয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিল্প-বিষয়ে অসাধারণত্ব সূচিত হয় না।

আমরা ভারতের আর পাঁচটি জাতির মতোই একটি প্রধান ভারতীয় জাতি। আমাদের ভাবুকতা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্প-বোধ আছে; ভারতের সভ্যতার ভাণ্ডারে হাত পাতিয়া আমরা কেবল লই নাই, দিয়াছিও যথেষ্ট; আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংগীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও আবিষ্কার, আমাদের হিন্দু-যুগের ও মধ্য-যুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য্য, পট ও ইটে-খোদাই,—এ-সব গর্ব করিবার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনও-কোনও বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে, ও করিবে; এইখানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা। আমরা অনুচিত গর্ব করিতে চাহি না; তবে যে-কোনও অবস্থায় আমরা যে অকৃতকার্য্য হইব না, আমরা পূর্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শেষ এই কথা বলি—অনার্য্য এবং আর্য্য পিতৃপুরুষ ও সংস্কৃতি-গুরুদের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালীরা যে-মনঃপ্রকৃতি পাইয়াছি, তাহা নিন্দার নহে; আমাদের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিক ও ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে যে-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং রসানন্দের দিকে ঝোঁক না দিয়া, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞান ও কর্মের দিকেই বেশী করিয়া ঝোঁক দিতে হইবে—ইহা-ই আমার নিবেদন॥

রাঁচি হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃক আহূত সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ রূপে পঠিত, কার্তিক ২১, ১৩৪১ সনে, 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' ঐ নামে লেখকের একখানি প্রবন্ধ-সংকলনে পুনর্মুদ্রিত (বঙ্গাব্দ ১৩৪৫) দু'বার পুনর্মুদ্রণের পর, ১৩৬৪ সালে, 'ভারত-সংস্কৃতি' নামে লেখকের অন্য একখানি প্রবন্ধ-সংগ্রহে ছাপা হয়। বহু সংযোজন সহ 'ভারত-সংস্কৃতি'র ১৩৭০ সালের সংস্করণে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে, 'ভারত-সংস্কৃতি'তে মুদ্রিত পাঠের কিছু অংশ বাদ দিয়ে, প্রবন্ধটির সংক্ষেপিত রূপ পরিবেশন করা হ'ল।

কাজী নজরুল ইসলাম
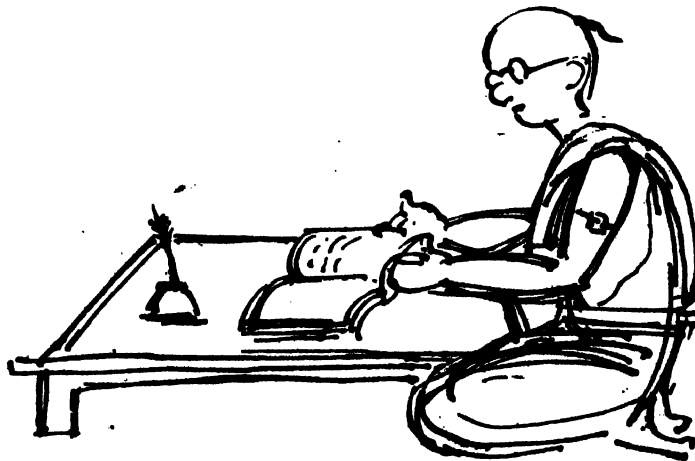
মন্দির ও মস্‌জিদ

"মারো শালা যবনদের"। "মারো শালা কাফেরদের"। আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর "প্রেষ্টিজ" রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল—দেখিলাম, তখন আর তাহারা আল্লামিঞা বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে "বাবা গো, মা গো"।—মাতৃ পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।

দেখিলাম, হত আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির কলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্ত কলঙ্করেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর?

ভবিষ্যৎ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির মসজিদ গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গুম্বজ-তলে লইয়া আসিবেন।

জানি, স্রষ্টার আপনি-মোড়ল "প্রাইভেট সেক্রেটারী"রা হ্যাট খুলিয়া, টুপি তুলিয়া, টিকি নাচাইয়া আমায় তাড়না করিবে, তবু ইহাদের পতন হইবে। ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এলকোহল পান করিয়াছে।

পুসিফুট জনসন মাতালদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বহু মার খাইয়াছেন। মুহম্মদকে যাহারা মারিয়াছিল, ঈসা মুসাকে যে সব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল তাহাদেরই বংশধর আবার মারিতেছে মানুষকে ঈসা মুসা মুহম্মদের মত মানুষকে।

যে সব অবতার পয়গম্বর মানুষের মার হইতে মানুষকে বাঁচাইতে আসিয়া মানুষের মার খাইয়া গেলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? মানুষের কল্যাণের জন্য আসিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহাদেরই মাতাল পশু শিষ্যেরা আজ মানুষের সর্ব অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিল।

যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগার, মসজিদের জিন্দানখানায়, গির্জার gaol-এ বন্দী। মোল্লা, পুরুত, পাদরী, ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডারের মত তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।

একস্থানে দেখিলাম উনপঞ্চাশ জন ভদ্র অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম—প্রায় ঐ সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মত মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে, যেমন করিয়া বুনো জংলী বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত। হিংসার কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ।

উহাদের দুই দলেরই নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাড়াইয়া কখনো টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খেপাইয়া আসিতেছে, কখনো পরটিকি বাঁধিয়া হিন্দুদেরে লেলাইয়া দিতেছে, সে-ই আবার গোরা সিপাই, গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদেরে গুলি মারিতেছে। উহার ল্যাজ সমুদ্রপারে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্রপারের বুনো বাঁদরের মত লাল।

দেখিলাম আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না।

মা কালীর মন্দির কালী আসিয়া আগলাইলেন না। মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গুম্বজ টুটিল।

আল্লার আর কালীর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানদের শিরে, "আবাবিলের" প্রস্তর বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপর।

এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি-কামানো দাঙ্গায় হত খায়রু মিঞাকে হিন্দু মনে করিয়া "বল হরি হরিবোল" বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল, এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলি খাইয়া হত দাড়িওয়াল্ সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল।

মন্দির এবং মস্‌জিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

মারামারি চলিতেছে। উহারি মধ্যে এক জীর্ণা শীর্ণা ভিখারিণী তাহার সদ্য প্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। শিশুটির তখনো নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিণী বলিল, "বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু। এইমাত্র এসেছে বাছা আমার। আমার বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই।" তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্বজননী কাঁদিয়া উঠিল। পাশের একটি বাবু বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবা এইত চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, তবু ছেলে হওয়া চাই।"

ভিখারিণী নিষ্পলক চোখে তাকাইয়া রহিল লোকটার দিকে। সে কি দৃষ্টি। চোখ দুটো তার যেন তারার মত জ্বলিতে লাগিল। ও যেন নিখিল হতভাগিনী নারীর জিজ্ঞাসা। এমনি করিয়া নির্বাক চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকিয়াছে তাহার দিকে—যে তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি যেন তার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিতে চায়, "পেটের ক্ষুধা এত প্রচণ্ড বলিয়াই ত দেহ বিক্রয় করিয়াও সে ক্ষুধা মিটাইতে হয়।"

যে লোকটি বিদ্রূপ করিল সে-ই হয়ত ঐ শিশুর গোপন পিতা। সে

না হয়, তারই একজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু অথবা তাহারই মত মানুষ একজন ঐ শিশুর জন্মদাতা।

এমনি করিয়াই রাম-পরিত্যক্ত সীতা তাহার লবকুশকে বুকে করিয়া বনে বনে ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

ঐ যে এক আকাশ তারা, উহারা ইহারই মত দুর্ভাগিনী ভুখারিণীদের চোখ অনন্তকাল ধরিয়া ভোগতৃপ্ত বিশ্ববাসীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিণী। এবার তাহার বক্ষ শূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যে দিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তার দেখিয়াছিলাম বিশ্বমাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন অমন সিক্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝিবা মরিয়া গিয়াছে তাহার শিশুর সাথে। আজও সে ভিক্ষা চাহিতেছে, কিন্তু আর সে কাতরতা নাই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যই চাহিতেছে।

আমায় সে চিনিল। আমি সেদিন তাহাকে আমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা কয়টী দিয়াছিলাম। ভিখারিণীর শুষ্ক চক্ষে হঠাৎ অশ্রুপুঞ্জ দুলিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর ছেলে কোথায়?" সে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। তাহার পর একটু থামিয়া আমায় বলিল, "বাবু, আমার সাথে একটু আসবেন?" আমি সাথে সাথে চলিলাম।

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই পাশে ডাষ্টবিন। সহরের যত আবর্জ্জনা জমা হয় ঐ ডাষ্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিণী ডাষ্টবিনের অনেকগুলো আবর্জ্জনা তুলিয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো কি একটা যেন তুলিয়া লইয়া "যাদু আমার সোনা আমার" বলিয়া উন্মাদিনীর মত চুমা খাইতে লাগিল।

এই তাহার খোকন,—এই তাহার যাদু, এই তাহার সোনা। ভিখারিণী ইহার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর শিশুটীকে আবার ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবু, ঐ পয়সা কয়টী দিয়ে সেদিন একটা খারাপ হয়ে যাওয়া বার্লির টিন কিনেছিলুম। এ কয়দিন ছেলেটাকে দিয়েছি ঠাণ্ডা জলে গুলে শুধু ঐ পচা বার্লি, আমিও খেয়েছি একটু করে—যদি আমার বুকে দুধ আসে। দুধ এল না এই হাড় চামড়ার শরীরে। এক ফোঁটা দুধ পেলে না বাছা আমার, এই তিন দিনের মধ্যে। শেষে আর বার্লিও দিতে পারলুম না, আজ সে চলে গেল। ভালই হয়েছে, বাছা আমার এবার খুব বড় লোকের ঘরে জন্মায় যেন, একটু পেটে দুধ খেয়ে বাঁচবে।"

চলে গেল ভিখারিণী আবার ভিক্ষা মাগ্‌তে।

ডাষ্টবিন হইতে ভিখারিণীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্থানের দিকে।

কাল এমনি করিয়া প্রতি বৎসর বাংলার দশ লক্ষ সন্তানের মরা লাশ বুকে ধরিয়া চলিতেছে শ্মশানের পানে, গোরস্থানের পথে।

যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিনো মন্দির আর মসজিদের ইট পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

শিশুর লাশ কোলে আমি বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিশুর লাশ যেন একটা প্রতিকার প্রার্থনা, একটা কৈফিয়ৎ তলবের মত দেখাইতে লাগিল। ধর্ম-মদান্ধদের তখন শিশুর লাশের দিকে তাকাইয়া দেখিবার অবসর ছিল না। তাহারা তখন ইট পাথর লইয়া বীভৎস মাতলামী শুরু করিয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইট পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাহার দশ লক্ষ অনাহার জীর্ণ রোগশীর্ণ অকাল-মৃত সন্তানের লাশ লইয়া উহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহারা মানুষের চেয়ে ইট পাথরকে বেশী পবিত্র মনে করে। ইহারা ইট পূজা করে। ইহারা পাথর-পূজারী।

ভূতে পাওয়ার মত ইহাদেরে মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদের মসজিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

যে দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়,—তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ—স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি।

মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামীর দরুণ ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া ওঠে—যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গমর্ত্যের সেতু—তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির মসজিদ। সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র-সূর্য-তারা জ্বলা মহামন্দিরের আঙিনাতলে।

মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটী দিয়া তৈরী করিল ইট, রচনা করিল মন্দির মসজিদ। সেই মন্দির মসজিদের দুটো ইট খসিয়া পড়িল বলিয়া তাহার জন্য দুই শত মানুষের মাথা খসিয়া পড়িবে? যে একথা বলে, আগে তাহারই বিচার হউক।

দুইটা ইটের ঋণ যদি দুইশত মানুষের মাথা দিয়া পরিশোধ করিতে হয়, তবে বাঙালী জাতির যে এই বিপুল দেহ-মন্দির হইতে দশ লক্ষ করিয়া মানুষ খসিয়া পড়িতেছে প্রতি বৎসরে শোষণ-দৈত্যের পেষণে, এই মহা-ঋণের পরিশোধ হইবে কত লক্ষ মানুষের মাথা দিয়া?

মন্দির মসজিদে চূড়া আবার গড়িয়া উঠিবে এই মানুষের পায়ে-দলা মাটি দিয়া, পবিত্র হইয়া উঠিবে এই মানুষেরই শ্রমের পবিত্রতা দিয়া, শুধু তাহারাই আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা পাইল না একটু আলো, একটু বাতাস, এক ফোঁটা ওষুধ, দু'চামচ জল-বার্লি। যাহারা তিলে তিলে মরিয়া জাতির হৃদয়হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, যাহাদের মৃত্যুর মধ্যে সমগ্র জাতি মরিতেছে তিলেতিলে।

আমি ভাবি, যখন রোগজীর্ণ জরাশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভুখারীদের দশ লক্ষ করিয়া লাশ দিনের পর দিন ধরিয়া ঐ মন্দির মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন ধসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ঐ নিরর্থক ভজনালয়গুলা? কেন সে ভূমিকম্প আসে না পৃথিবীতে? কেন আসে না সেই রুদ্র—যিনি মানুষ সমাজের শিয়াল কুকুরের আড্ডা ঐ ভজনালয়গুলো ফেলবেন গুঁড়িয়ে? দেবেন মানুষের ট্রেড মার্কার চিহ্ন ঐ টিকি টুপিগুলো উড়িয়ে?

মন্দির মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইলে হয় তার প্রতিকার, আসে তার জন্যে মুদ্রা হাজার হাজার, আসে তার জন্যে ছপ্পর ফুঁড়িয়া নেতার দল, গো-ভাগাড়ে শকুনি পড়ার মত।—শুধু দশ লক্ষ লাশের আর প্রতিকার হইল না।

মানুষের পশু. প্রকৃতির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।

সকল দেশে সকল কালে সকল লাভ লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল—ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ঐ দেখ লক্ষ অকাল মৃত্যুর লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া। তারা প্রতিকার চায়।

তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো-ভাগাড়ের পড়া শকুনির দলকে।

আমি শুনিতেছি, মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত হইতেছে ঊর্দ্ধে স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি সারা আকাশ যেন খুশী হইয়া উঠিতেছে।

রেজাউল করীম

ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দু প্রভাব

[মনস্বী রেজাউল করীমের এই প্রবন্ধটি 'সংস্কৃতি সমন্বয় : কিছু ভাবনা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ। এই সমন্বয়-ভাবনামূলক প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে রেজাউল করীম বলেছেন, " সারা জীবন সংস্কৃতি সমন্বয়ের জন্য প্রাণপণ সাধনা করেছি, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি। সেই ভাবনার স্বাক্ষর প্রকাশ লাভ করায় এই রচনা-সংকলন আমাকে গভীর আনন্দ ও পরম সন্তোষ প্রদান করেছে।"

—সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ]

ভারত বিভাগের পূর্বে মুসলিম সমাজের একটা বিরাট অংশ এই দাবী করিয়াছিলেন যে তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র জাতি, ভারতের হিন্দু ও অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের কোন জাতীয় সম্পর্ক নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া একই দেশে পাশাপাশি একই সঙ্গে বাস করা সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায় এদেশের মাটির সহিত মিশিতে পারে নাই। তাঁহাদের সংস্কৃতি আচার বিচার, ভাষা, চালচলন, সবই স্বতন্ত্র ও পৃথক। সুতরাং স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তাঁহারা এদেশে থাকিবেন, আর সেজন্যই একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তাঁহারা চাহিয়া বসিলেন। যাঁহারা এই ধরনের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা ইতিহাসকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সত্য বটে, ধর্ম ও আচার বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, কালের অমোঘ প্রভাবে ক্রম বিবর্তনের পথে ধীরে ধীরে কখনও জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে ভারতীয় তথা হিন্দু ভাবধারা প্রবেশ করিয়াছে। এই বিষয়টা লক্ষ্য করা হয় নাই বলিয়াই স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবী উঠিয়াছিল। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে দুই জাতিত্বের থিওরী অচল। ভারতীয় বহু মুসলমান ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহারা আরব, ইরান, তুরান, মিশরের মুসলমানের সঙ্গে সব বিষয়েই এক, কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভুল। এক ত নহেই, বরং বহুবিষয়েই বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে। ধর্মের দিক দিয়া সব মুসলমানই এক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া বিভিন্ন দেশে বসবাস করার জন্যে আরব, ইরানের মুসলমান এবং এদেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির স্পর্শে থাকার ফলে মুসলমান সমাজ আরবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিচ্ছেদ কেবলমাত্র ভৌগোলিক নহে—মনের বিচ্ছেদও হইয়াছে। পৃথিবীর যেখানেই সে গিয়াছে সেইখানকার জল বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সংস্কৃতিগত সমন্বয়ও হইয়াছে। ভারতেও এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। পাঠান আমলে যে সমন্বয় আরম্ভ হইয়াছিল, দাদু, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সাধকগণ যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন মোগল আমলে তাহা আরও পুষ্টিলাভ করে। পাঠান আমলে শাসকদের পক্ষ হইতে সমন্বয়ের জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই, কিন্তু মোগল আমলে শাসকগণ ভারত-আরব সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের বহু প্রকার চেষ্টার ফলে হিন্দুদের মধ্যে যেমন ইসলামিক প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ অনায়াসে মুসলমান সমাজের মধ্যেও হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল সমন্বয় সাধনের ধারা। আওরঙ্গজেব অত্যধিক ইসলাম প্রীতির জন্য সেই ধারাকে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। যখন মুসলমান সমাজের পরতে পরতে ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব প্রবেশ করিয়া ভারতীয় মুসলমানকে আরবীয় মুসলমান হইতে বহুদিক দিয়া পৃথক করিয়াছে, তখন কোন অনুদার শাসকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি বা অনুশাসন সমন্বয়ের গতিরোধ করিতে পারে না। আওরঙ্গজেব তাহা পারেন নাই। বরং ফল হইয়াছে উল্টা। রাজনীতির দিক দিয়া তিনি মোগল গরিমার সমাধি রচনা করিলেন। কিন্তু যে "খাঁটি" ইসলাম রক্ষার জন্য তিনি এতসব অনুদার পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা একটুও সফলতা লাভ করিল না। আওরঙ্গজেবের পরে তাঁহার ধর্মান্ধতার কীর্তিকলাপ দুঃস্বপ্নের মত অল্পদিনের মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের পরেই মোগল শক্তির পতন আরম্ভ হইল। এই পতন-যুগে বহু অঞ্চলে বিদ্রোহ বিপ্লব দেখা দিল। আশ্চর্যের কথা এই যে, এইসব বিদ্রোহ বিপ্লব কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হয় নাই। তাই দেখা যায় যে, কোথাও কোথাও হিন্দু রাজা মুসলমানের সহযোগিতা লইয়া মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে মুসলমান শাসক হিন্দুর সাহায্যে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা অধিকৃত না হইত, তবে দেশের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইয়া যাইত। একই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় বসবাস করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার বহু প্রমাণ আছে। রোমকগণ যখন খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিল, তখন কিছুদিন তাহাদের মধ্যে দুইটি আদর্শ সমানভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল। সত্য বটে, পৌত্তলিক রোমকগণ খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবে বাহিরের দিক দিয়া অ-পৌত্তলিক হইয়া গেল ; কিন্তু তাহারাও এমনভাবে খৃষ্টানগণকে প্রভাবিত করিল যে, চিন্তায়, ভাবে, আচরণে তাহারা মূলত রোমকই হইয়া রহিল। এমন কি বহু আচার ও অনুষ্ঠান রোমান সভ্যতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে আজিও ইওরোপের বহু ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে রোমান প্রভাব পাওয়া যাইবে। প্রোটেস্টাণ্ট বিপ্লবের সময় পিউরিটান সম্প্রদায় সেই প্রাচীন হিব্রুযুগে প্রত্যাবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সেক্সপীয়ার, মিল্টন, শেলী, কীটস, বাইরন প্রভৃতি কবিদের মধ্যে গ্রীক ও রোমান প্রভাব এত বেশী আছে যে মনে হয় তাঁহারা যেন প্রাচীন কালচারের মধ্যেই পুষ্ট হইয়াছেন। সেইজন্য একজন সমালোচক গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, 'উই আর দি চিলড্রেন অব দি গ্রীকস্।' সেইরূপ ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে এত বেশী হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে যে, আমরাও বলিতে পারি, "উই আর দি চিলড্রেন অব দি হিন্দু এরিয়ান্স।" আমরাও আর্য হিন্দুদেরই সন্তান।

আমার কথা শুনিয়া যাঁহারা চমকিয়া উঠিবেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের মুসলমানের কয়জন আরব, ইরান, তুর্কী, তাতার হইতে আসিয়াছেন ? নির্দিষ্ট কতিপয় পরিবার, কিছু সংখ্যক সৈন্য সামন্তদের

বংশধর, আর কতক কতক শাসক শ্রেণীর আত্মীয় স্বজনের অধস্তন পুরুষ ব্যতীত ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের অধিকাংশই এদেশের সন্তান। অতীতকালে তাঁহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও হিন্দু ভাবধারা ও হিন্দু সংস্কৃতি একেবারেই বর্জন করিতে পারেন নাই। আজ ভারতীয় মুসলমানদের জীবনযাত্রার মধ্যে হিন্দু প্রভাবের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের প্রভাবের অল্প চিহ্নই অবশিষ্ট আছে। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, মহম্মদ তুঘলক প্রমুখ জাঁদরেল শাসকগণ, যাঁহারা কোন অতীতে মধ্য এশিয়া আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এদেশের কোথাও তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই, মুসলিম বিজেতাগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতের জনগণের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। মুসলিম প্রভুত্বের যুগে যেসব জাতি উপজাতি, বংশ প্রভৃতির নাম আমরা শুনিতে পাই, তাহাদের কথা মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। এদেশের বহু লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এইভাবে মুসলমানগণের আরবী ও ইরাণীয় রূপ ও সংস্কৃতিকেই প্রভাবিত করিয়াছেন। বিদেশের মুসলমানগণ এদেশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, এদেশে বিবাহ করিয়াছেন, এদেশের জনগণের সহিত জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। একই প্রকার জীবিকার পথ গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতের একটা সমজাতীয় ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের পুরাতন ভূমিতে ফিরিয়া যান নাই।

ভারতের মুসলমানগণ যে সমাজ ব্যবস্থা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা হইতে বেশী পৃথক নহে। ভারতের বাহিরের মুসলমানের সহিত তুলনা করিলেই এই পার্থক্যটা ধরা পড়িবে। সাম্য ইসলামের একটি প্রধান আদর্শ। এই 'সাম্যবোধ' ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। এখানে রীতিমত উচ্চবংশ ও নিম্নবংশের মধ্যে বেশ একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই যে উচ্চবংশ ও নিম্নবংশের পার্থক্য তাহা অর্থনৈতিক ও বৃত্তিগত নহে। বংশ পরম্পরাগতভাবে অভিজাত শ্রেণী মুসলমান সমাজে সৃষ্ট হইয়াছে। মধ্যযুগে ধর্মান্তর আরম্ভ হইয়াছিল প্রবলভাবে। উচ্চবংশ আজ মুসলমান সমাজে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ হইবার প্রধান কারণ মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু প্রভাবের অনুপ্রবেশ। প্রত্যেক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রথার মধ্যে নারীসমাজ একটা বিশিষ্টস্থান অধিকার করে। আরব ইরানের মুসলিম নারীদের মধ্যে প্রচলিত বহু প্রথা ভারতের মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। আবার ভারতের মুসলিম নারী সমাজের বহু প্রথা আরব, ইরানে অজ্ঞাত। এখানকার মুসলিম নারী সাধারণত ভারতীয় নারীদের প্রথাই গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ শাড়ি অলঙ্কার, সিন্দুর ব্যবহার, সামাজিক মেলামেশার ধরন এইসবই হিন্দুদের অনুরূপ। এখনও বহু অঞ্চলের সধবা নারী কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দেয়। আর বিধবা হইলে সাদা শাড়ী পরিধান করে। নিকট প্রাচ্যের মুসলিম নারীদের প্রথা এরূপ নহে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারেও ভারতের মুসলিম নারী এদেশের হিন্দুদের মতই চলিয়া থাকে। তবে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন হিন্দুদের মত মুসলিম সধবা নারীরা শাঁখা ব্যবহার করে না। মুসলিম বিধবাগণ হিন্দু বিধবাদের মত খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না। মুসলিম বিবাহের বহু বহিরানুষ্ঠান হিন্দুদেরই অনুরূপ। গায়ে হলুদ, তেল মাখা, মাথায় তেল দেওয়া, বিবাহ বাসরের নিয়মপদ্ধতি, বরপণ প্রথা এইসব ব্যাপারে মুসলিম প্রথা হিন্দু প্রথার উপর ভিত্তি করিয়াই যেন রচিত। সামান্য একটু এদিক ওদিক হইতে পারে—কিন্তু মূলত অধিকাংশ প্রথাই এদেশের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে, বিবাহের নীতিগত পার্থক্য অবশ্য অক্ষুণ্ন আছে। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ একটা Sacrament বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মুসলিম বিবাহ হইতেছে একটা চুক্তি বিশেষ। কিন্তু ভারতের মুসলিম বিবাহের এই ধারণারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে। বিবাহটা অনেকটা Sacrament-এর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহে অশ্রদ্ধা, মেয়েদের স্বামীনির্ভরতা এই সব বিষয়ে এদেশের মুসলমানগণ ভারতীয় প্রথাই গ্রহণ করিয়াছে। মোটের উপর হিন্দু মুসলমানের বিবাহ প্রথা অনেকটা একই প্রকার।

আপাত দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্ম স্বতন্ত্র আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাক্-ইসলামিক যুগে আরবদের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল, ভারতের হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সে প্রকার নহে। প্রাচীন বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র একেশ্বরবাদের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইসলামের একেশ্বরবাদ হইতে উপনিষদের একেশ্বরবাদ পৃথক নহে। বোধহয় সেইজন্যই মুসলিমগণ হিন্দুধর্মের মূলনীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর সেইজন্য সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে সহজেই হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিতে দিয়াছিল। কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একইরূপ। মহরমের সময় এমন কতকগুলি প্রথা ও ক্রিয়াকাণ্ড হইয়া থাকে, যাহা আরবের কোথাও প্রচলিত নাই। এগুলি ভারতবর্ষেই বিকশিত হইয়াছে। শবেবরাতের সহিত শিবরাত্রির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। নবান্ন উৎসব হিন্দু মুসলমান সকলেই পালন করিয়া থাকে। মহরমের মাতমে যেমন বহু হিন্দু যোগদান করেন, সেইরূপ হোলি উৎসবে মুসলমানকেও রঙ খেলিতে দেখা যায়। মৃত্যুর পরের অনুষ্ঠানে মূল বিষয়ে পার্থক্য আছে। হিন্দুরা শব দাহ করে, আর মুসলমানরা সমাধিস্থ করে। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে মৃত্যুর পরে যেসব অনুষ্ঠানাদি হয়, তাহা যেন কতকটা একইরূপ। মৃতের আত্মার সদগতির জন্য উভয় সম্প্রদায় প্রায় একইরূপ অনুষ্ঠান পালন করে। মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট দিনে দরিদ্র ভোজন, মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, বা তাহার আত্মার মুক্তির জন্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় সমাবেশে শাস্ত্রপাঠ এইসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পার্থক্য নাই। গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অনেক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় প্রায় একইরূপ অনুষ্ঠান পালন করে। সন্তানের নামকরণ উৎসব, ক্ষীর খাওয়ান বা অন্নপ্রাশন, সন্তানের মস্তক মুণ্ডন এইসবও প্রায় একইরূপ।

পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, সেখানেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন একটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পোশাক খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলাদেশের সাধারণ পোশাক হইতেছে ধুতি। আর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ পোশাক পাজামা। বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সেই প্রদেশে প্রচলিত পোশাকই ব্যবহার করে। পোশাক দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই কে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া সাধারণত বাংলার হিন্দু মুসলমান কেহই টুপি ব্যবহার করে না। আর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে টুপি ব্যবহার করে। ভারতের মুসলমানগণ কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই আরব ও ইরানের পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এদেশের পোশাকই গ্রহণ করিয়াছে। আরবী পাগড়ি, আমামা, জুব্বা, রিদা আর বড় একটা চলে না। মধ্য এশিয়ার মোগল পোশাকও অচল হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতেই পোশাকের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিক মসুদি বলিয়াছেন :

"The mode of life of both the Hindus and the Moslems was so similar that it was difficult to distinguish one from the other."

ইহার বহুদিন পরে একজন ফরাসী পর্যটক বলেন যে, "দাক্ষিণাত্যে যেসব মুসলমান উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারা অবিকল হিন্দু

প্রথায় পোশাক পরিত।" মুসলিম বাদশাহ ও নওয়াবগণ দেওয়ালী, শিবরাত্রি, হোলি প্রভৃতি উৎসব পালন করিতেন। আর অনেকেই সেই সময় এদেশীয় পোশাক পরিধান করিতে লজ্জিত হইতেন না। আজিও দিল্লীর বহু উচ্চ বংশের মুসলমান আড়ম্বরের সহিত বসন্ত উৎসব পালন করিয়া থাকেন। সেই সময় তাঁহাদের পরিধানে থাকে বাসন্তী রঙের বস্ত্র। দিল্লীর ফুলের মেলা 'নওরোজ' প্রভৃতি উৎসব ইতিহাস বিখ্যাত। ইহা হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ উৎসবে পরিণত হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের সময় পর্যন্ত এই সব উৎসব আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হইত।

ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। একই ভাষা যখন সকল সম্প্রদায়ের ভাব প্রকাশের বাহন হয়, তখন আরও নানাপ্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই ভাষাবিভেদের মধ্যেও ঐক্য ও মিত্রতা স্থাপনে সহায়তা করে। ভারতের মুসলমানগণ আরবী ও ফারসী ভাষা এদেশে চালাইতে পারেন নাই। তাঁহারা এদেশের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে উর্দু ও হিন্দী ভাষা লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস উর্দু মুসলমানের ভাষা আর হিন্দী হিন্দুদের ভাষা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। উর্দু ও হিন্দী উভয় ভাষাই দেশের মাটিতেই জন্মিয়াছে—এদেশের ভাষা। প্রথম যুগের মুসলিম শাসকগণ তুর্কী ভাষায় কথা বলিতেন আর শাসনকার্য চলিত ফারসী ভাষার সাহায্যে। আজ তুর্কী অথবা ফারসীর কোনটাই সচল নহে। শাসকগণ এদেশের প্রচলিত ভাষার মধ্যে ফারসী ও আরবী শব্দ যোগ করিয়া তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে ভাষাটা আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। উর্দু ভারতের বাহিরে কোথাও চলে না। উর্দুর উৎস হইতেছে সংস্কৃত ও হিন্দী। ইহার বাক্যগঠন ও ব্যাকরণ-প্রণালী হিন্দীরই অনুরূপ। সাধারণত দিল্লী অঞ্চলে উর্দু ভাষা প্রচলিত ছিল। যখন প্রথমযুগে মুসলিমগণ দিল্লীতে বসবাস আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা এই ভাষাকেই গ্রহণ করেন। ইহাই কালক্রমে তাহাদের কথ্যভাষা হইয়া পড়িল। ইহার অনেক পরে কথ্যভাষা লিখিত ভাষাতে পরিণত হইল। বর্তমানে উর্দু ভাষাতে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার শব্দ আছে। ইহার মধ্যে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার শব্দ হিন্দীভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাকী তের হাজার শব্দের জন্য আরবী ফারসী ও তুর্কীভাষা দাবী করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে, বহুযুগ ধরিয়া বহু হিন্দু-মুসলমান স্বচ্ছন্দভাবে উর্দুভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করিয়া আসিয়াছে।

আবার একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দী ভাষাও কেবল হিন্দুর নহে। বহু অঞ্চলের মুসলমান স্বচ্ছন্দে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছে। শুধু হিন্দী নহে—এদেশের আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষা মুসলমানের মাতৃভাষায় পরিণত হইয়াছে। আসামী, ওড়িয়া ভাষা, পাঞ্জাবী ভাষা, গুজরাটী ভাষা, বাংলা ভাষা—তামিল ও তেলেগু ভাষাও সেই সেই অঞ্চলের মুসলমানগণ গ্রহণ করিয়াছে এবং সাধ্যমত সেগুলির পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছে। মনীষী অলবেরুণী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের সৈয়দ আলী বেলগ্রামী পর্যন্ত এই দীর্ঘযুগে বহু মুসলিম সুধী সংস্কৃত ভাষার প্রতি যথার্থ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। কবি আমির খুসরু, মালিক মহম্মদ জয়সী, খান খানান, কুতুবান, মোল্লা দাউদ, রাইসখান, মহম্মদ ইয়াকুব, ইনশাল্লাহ খান, নাজির আহমদ এইসব কবি ও সাহিত্যিক হিন্দী ভাষার সেবা ও চর্চা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত কাজের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। আরব ও পারস্যের মুসলিম লেখকগণের লিখিবার বিষয়বস্তু ও ভঙ্গিমার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এ দেশের মুসলিম লেখকগণের লিখিবার বিষয়বস্তু ও ধরন অনেকটা পৃথক। মুসলিম লেখকগণের হিন্দী, গুজরাটী, বাংলা রচনা এ দেশের হিন্দু লেখকগণের অনুরূপ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া আরব পারস্যের কোন লেখক কবিতা লেখেন নাই। অথচ এ দেশের মুসলিম লেখকগণ এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি কবিতা লিখিয়াছেন।

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা Common Culture সৃষ্টি করিবার প্রয়াস বরাবরই হইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ভাষার মাধ্যমে এই চেষ্টা হইয়াছিল। আজ যেমন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, মধ্যযুগেও সেইরূপ হিন্দু-মুসলমান লেখক ও কবিগণ সর্বত্র সমানভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইতেন। এই সাধারণ সংস্কৃতি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস কেবল ভাষার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প স্থাপত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল। গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, চিকিৎসা, দর্শন, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একটা Common Culture গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সমন্বয়ের কথাই প্রমাণ করে। ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুসলিম শিল্পীগণ একটা বিশেষ ধরনের আর্ট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সেই আর্টের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এ দেশের আর্টকে বিসর্জন দিতে পারেন নাই, অথবা অপরিবর্তিত অবস্থায় আরব ইরানের আর্টকেও চালাইয়া দিতে পারেন নাই। দুই দেশীয় আর্টের মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় হইয়াছিল। দামেস্ক, জেরুজালেম, কার্ডোভা (স্পেন) প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন আছে ভারতের মুসলিম স্থাপত্য তাহা হইতে পৃথক। ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে আছে হিন্দু ও মুসলিম আদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয়ের নিদর্শন।

চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতচর্চার মধ্যেও সমন্বয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন চিত্রকেই মোগল শিল্পীগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং তাহার উন্নতিসাধন করেন। মধ্য এশিয়া ও পারস্য হইতে বহু শিল্পী ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এদেশের উন্নত ধরনের শিল্পকার্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সুতরাং অনায়াসে এ দেশের শিল্পের মডেল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এবং হিন্দু শিল্পীদের সহযোগিতায় নূতন পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করিলেন। হিন্দু শিল্পীগণও নবাগত শিল্পীকে অগ্রাহ্য করিলেন না। একটা বিশেষ চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার শিল্পী হিন্দু না মুসলমান তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। সঙ্গীত চর্চার মধ্যেও সহজে সমন্বয় হইয়াছে। মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞগণ এদেশের নিকট নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহারাও নূতন নূতন সঙ্গীতযন্ত্র ও নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া এদেশের সঙ্গীতের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ হিন্দুসঙ্গীত ও মুসলিম সঙ্গীত বলিয়া সঙ্গীত-ক্ষেত্রে কোনও রূপ সাম্প্রদায়িকতা নাই। সঙ্গীতে পূর্ণ সমন্বয় হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাব্য সাহিত্য শিল্পস্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে সমন্বয় হইতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে কি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন সমন্বয় হইয়াছিল? ভারতের সাত শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এরূপ সমন্বয়ও কিছু কিছু হইয়াছিল। একথা সত্য যে একদল উলেমা বরাবরই প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন যে, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম একেবারে পূর্ণধর্ম—অপর ধর্মের নিকট মুসলমানের শিখিবার কিছুই নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অলবেরুণীর আদর্শ অনুসারে বহু মুসলমান পণ্ডিত হিন্দু ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই প্রচীন ধর্মের মধ্যে সারবস্তু আছে, তখন তাঁহারা হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনীষী অলবেরুণীর কথা অনেকেই জানেন। তাঁহার পরেও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলিম সুধীগণ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু মূল্যবান পুস্তক ফারসী ও আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের অনুবাদ হইতে বাগদাদের পণ্ডিতগণ নানাভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। দর্শনের দিক দিয়া আরবগণের প্রধান 'অথরিটি' ছিল গ্রীকদর্শন। কিন্তু চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান অথরিটি ছিল ভারতবর্ষ।

ইসলামে প্রতিমা পূজা নাই। আর হিন্দু সমাজে প্রতিমা পূজা প্রচলিত। প্রথম প্রথম মুসলিম সুধীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, হিন্দুদের প্রতিমা পূজা প্রাক্-ইসলামিক যুগের আরবদের প্রতিমা পূজা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, তখন তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন মুসলিম পণ্ডিত হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রতিমা ব্যবহারের যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন, তাহা উল্লেখ্যযোগ্য। মির্জা মাজহার জান জানান বলেন যে, "প্রতিমা পূজা সুফীদের জিকির পদ্ধতির অনুরূপ। আরবের পৌত্তলিকগণ যে প্রতিমা পূজা করিত, ইহা তাহা নহে। আরবগণ বিশ্বাস করিত যে, প্রতিমা নিজেই ঈশ্বর এবং তাহার অনন্ত শক্তি আছে। সুতরাং প্রতিমাই তাহাদের প্রভু। কিন্তু হিন্দুদের প্রতিমা তাহা নহে। তাহারা প্রতিমাকে ঐশ্বরিক শক্তির যন্ত্র বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রতিমাকেই ঈশ্বর বলে না। মির্জা মাজহার এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেন এবং এই কথাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দুদের পন্থায় আছে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়। তাঁহার মতে সুফী মতবাদেও এই তিনের সমন্বয় সাধিত হয়।

ভারতবর্ষে বহুদিন বাস করার ফলে হিন্দুদের পূজা পদ্ধতির বহু অনুষ্ঠান বেমালুম সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। জপমালা (তসবী), বিশেষ ধরনের সাধনার জন্য নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া, যোগীর মত ধ্যানাসন, মাছ মাংসে অশ্রদ্ধা এইসব আচার ও প্রক্রিয়া বহু মুসলিম পীর মুর্শেদ ও সাধক অনুমোদন করিয়াছেন। ইঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, বেদান্তের বহু বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতিকে তাঁহারা ইসলাম জ্ঞানেই অবলম্বন করিয়াছেন। মূল ইসলামের মধ্যে এইসব বস্তুর কোন প্রমাণ নাই। বস্তুত ভারতের সমস্ত সুফী মতবাদটাই বেদান্ত দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরনের সমন্বয় অজ্ঞাতসারে হয় নাই। দেশ ও কালের অনুরূপ করিবার জন্য জ্ঞাতসারেই বেদান্ত দর্শনের বহু আদর্শ মুসলিম সমাজের মধ্যে সুফীগণ প্রবর্তন করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের "দীনে এলাহি" এইরূপ একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা। রাজকুমার দারা শিকোহ হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্বসাধারণ লোকের সহজ পন্থায় ধর্মকে ঐক্য ও প্রেমের ভিত্তিতে গড়িবার চেষ্টা নানা সাধকের দ্বারা হইয়াছিল। তাঁহারা আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কবীর, নানক, দাদু, শ্রীচৈতন্য ও তুকারাম প্রভৃতি সাধকগণ যে নূতন ধর্মবোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আচার অনুষ্ঠানের গণ্ডী ভেদ করিয়া সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মহাত্মা দাদু সার্বজনীন ধর্মের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি উক্তি হইতে বুঝা যাইবে, তিনি ধর্ম বিষয়ে কিরূপ উদারনীতি প্রচার করিতেন :—

পাখা পাখী সংসার সব
নির্পখ বিরলা কোই
সেই নির্পখ হোয়েগা জোকে
নাও নিরঞ্জন হোই।

অর্থাৎ জগৎ জুড়িয়া দলাদলি চলিতেছে। এমন লোক অল্পই আছেন যিনি দলাদলির উর্ধ্বে। যিনি জীবনে নিরঞ্জন লাভ করিয়াছেন তিনি দলাদলি মুক্ত হইতে পারেন।

দাদুর আর একটি উক্তি লক্ষণীয় :—

যহ্ সব খেল খালিক হরি
তেরা তৈ হি এক করলীলা
দাদু জপতি জানি কর ঐসী তব
যহ্ প্রাণ পতীলা।

অর্থাৎ হে খালিক ও হরি, এসবই তোমার খেলা. তুমিই নিজেকে সর্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সকলকে ঐক্যবন্ধনে যুক্ত করিয়া লইয়াছ। দাদু বলেন যে, জগতে তোমার এই লীলা উপলব্ধি করিয়া প্রাণে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে।

কবীরের উক্তি অনেকটা এইরূপ :—

এক সমানা সকল মে
সকল সমানা তাহি
কবীর সমানা বুঝি মে
জাহাঁ দোসরা নাহি।

অর্থাৎ—সেই এক সমানভাবে বহুরূপে প্রকট হইয়াছেন। আবার সকল সত্তা তাঁহাতে লয় পাইয়া সমান হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় নাই বলিয়া কবীরের কাছে এখন সবাই সমান।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বরাবর ভারতে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলাদেশে এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা কিরূপভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার একটি উদাহরণ দিব। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম লেখক সৈয়দ আকবর "জেবলমূলক শামারবখ" কাব্যে লিখিয়াছেন :—

"বিন এ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ
ছুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুকুলে নারদ।
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবার
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচার।
পএগম্বর সকলে বন্দি করিআ ভকতি
হিন্দুকুলে দেবতা হেন হইলা প্রকৃতি।
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ
হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ।
মা হাওরা জগত বন্দম জগত জননী
হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচার মোহিনী।
হজরত রসুলে বন্দি প্রভু নিজ সখা
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা।
খোআজ খিজির বন্দম জলেতে বসতি
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি।
আছাব্বা সকলে বন্দি নবীর সভাএ
হিন্দুকুলে দোওয়াদশ গোপালে ধেয়াএ।
আউলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান
হিন্দুকুলে মুনিভাব আজ এ পুরান।
পীর মুর্শিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ
হিন্দুকুলে গুরু যেন কর এ পূজন।

একদিকে সাধক ও সুফী শ্রেণীর মহান ব্যক্তিগণ, আর অপরদিকে কবি শিল্পীগণ সকলেই বিভিন্ন দিক দিয়া ধর্মকে উদার দৃষ্টিতে দেখিবার ও দেখাইবার এবং বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্মকে কেবল বহিরাচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে শিখিলে ধর্ম সম্বন্ধে উদার ভাব জাগিতে পারে না। যে আদর্শ সে যুগের সাধক ও কবিদের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা হইতেছে ভক্তির আদর্শ। তাঁহারা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের কথা ভাবিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য দেখা যায় যে, হিন্দু সাধকের নিকট মুসলমান দীক্ষা লইয়াছে। আবার অনেক হিন্দু মুসলমান সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা যখন নিজ নিজ সমাজের সহিত মেলামেশা করিয়াছে, তখন নিজেদের ধর্মবোধ দ্বারা সমাজকে অনেকটা প্রভাবিত করিয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত কথা যে, শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট কয়েকজন

মুসলমান দীক্ষা লইয়াছিলেন। আবার কবীরের শিষ্যের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা কম ছিল না। আজমীরের হোসেনী পণ্ডিতগণের অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান আছে। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের কতকগুলি নীতির সহিত ইসলামের সাদৃশ্য আছে। রামানন্দ, দাদু, নানক, তুকারাম ইঁহারা হিন্দু-মুসলমানের আধ্যাত্মিক গুরুর মর্যাদা পাইয়াছিলেন। এইসব সাধক একটা কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রচার করিতেন যে, আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের বড় কথা নহে। তাঁহারা ন্যায়, সততা, ভক্তি, সাম্য ও সৎজীবনের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতেন। মনের সৌন্দর্য সাধন ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম সম্বন্ধে এই উদার মতবাদের কারণেই উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি শান্তির সহিত বসবাস করিতে পারিয়াছেন। অতীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোথাও কোনও রূপ ঝগড়া বিবাদ হয় নাই, একথা বলি না। কিন্তু সে যুগে ব্রিটিশ যুগের মত জঘন্য ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি জাগ্রত হয় নাই অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয় নাই।

মধ্যযুগের মুসলমানদের আদি বাসভূমি যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের জীবন-ধারার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের সুখ-দুঃখের সহিত নিজেদের জীবনকে জড়িত করিয়াছিলেন। ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য সবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলে সমস্ত জীবন-দর্শনের মধ্যে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবনযাত্রার পদ্ধতিও অনেকটা একই রূপ হইয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর সংযোগ, সহযোগিতা ও মিলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাহিরের আকারগত চালচলনগত সমন্বয় সাধন হইয়াছে। দুই-চারটি পারিবারিক শব্দ ব্যতীত কথ্যভাষার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। দুইজনের পরস্পরের কথাবার্তার মধ্যে ধর্মের পার্থক্য কেহ সহজে ধরিতে পারিবে না যাহাকে আমরা বলি কুসংস্কার (superstition) তাহা সাধারণত আদিম সংস্কারের ক্রমবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত বহু কুসংস্কার একই রূপ। এইসব কুসংস্কার হইতে বুঝা যাইবে যে কত গভীরভাবে সমন্বয়ের কাজ সফলতা অর্জন করিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দিবে আর নিবে,....যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" ইহাই হইতেছে ভারতের শাশ্বত নীতি। বহুর মধ্যে একের বিকাশ, আবার একের মধ্যে বহুর প্রকাশ, এই নীতি কেবল ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছে। ভারতের হিন্দু নরাগত মুসলমানকে ফিরাইয়া দেয় নাই। তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। সেজন্য হিন্দুকে বহু জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে। তবুও সে ভারতের শাশ্বত নীতি বিসর্জন দেয় নাই। আবার মুসলমান যখন এদেশে আসিয়াছে, তখন সেও তাহার বহুকিছু খাইবার গিরিপথের অপর পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া ভারতের বহুকিছুকে বেমালুম গ্রহণ করিয়াছে। আজ যদি সে বলে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি, তবে সাতশত বৎসরের সমগ্র ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হইবে। ভারতবর্ষ মুসলমানকে অঙ্গীভূত করিয়াছে আর মুসলমানও ভারতকে তাহার সর্বস্ব দান করিয়াছে। এই নেওয়া দেওয়ার মধ্যে ইতিহাসের জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে। রাজনৈতিক কারণে ভারত বিভক্ত হইলেও এ সমন্বয়ের ধারা কোথাও থামিবে না।

গোপাল হালদার

বাংলার কালচার

"বাংলার কালচার" কি? সাহিত্যের একজন রসজ্ঞ অধ্যাপক বলিয়াছিলেন: "বাংলার কালচার? একটা কড়া পাকের সন্দেশ ও একটা ভালো পাকের পেয়ারা দাও দিকিনি কোনো তামিলকে—খেয়ে বলবেন, 'বোধা আর ইকুয়েলি সুইট্', দুইই সমান মিষ্টি। ঠিক কথাই—অনেক কালের কালচার থাকিলে বোঝা যায় সব মিষ্টিই সমান নয়।" রসজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়ের মতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশও সায় দিবে, বাংলার কালচারের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিনিধি আর কিছু নয়—রসগোল্লা ও সন্দেশ।

পৃথিবীতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া নাম রাখিতে পারা বড় কথা নয়, ইতরজনেরা অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখে—এমনকি দেখা যাইতেছে, অধ্যাপকেরাও কেহ কেহ তৃপ্ত হন। কিন্তু নানা অধ্যাপকের নানা মত। শিল্পকলার অধ্যাপক শাহিদ সুরহাবর্দি বিলাতে নাকি তাঁহার বন্ধুদের বলিয়াছিলেন; "বাংলার বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে যা আর কারুর নেই তার নাম আড্ডা।"—মনে হয়, এমন সত্য কথা আর কখনো বলা হয় নাই;—ক্লাব, পার্টি, সভা-সমিতি, ব্যবসাপত্র—সবই আমাদের ঢিলে-ঢালা;—আড্ডা না হইলে চলে না। কিন্তু অধ্যাপকেরা একমত নহেন। নাম করিতে সাহস করি না, আর-একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন: "বাংলার বাইরে 'ভদ্রলোক' নেই—অ্যারিস্টোক্র্যাসি আছে, আর আছে কিসান; কিন্তু এমন ভদ্রলোকের সমাজ দেখেছ মেড়ো পাঞ্জাবীর দেশে?"

তিনি একেবারে মুঘল যুগের পূর্ব হইতে প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইবেন,—'সদ্-বৌদ্ধ-করণ-কায়স্থ-ঠাকুর' মহাশয়েরা কেমন করিয়া মানসিংহ, তোডরমল, মুর্শিদকুলিখাঁ প্রভৃতিদের যুদ্ধে হিমসিম খাওয়াইয়াছেন, জমাবন্দির হিশাবপত্রে সকলকে সর্ষে ফুল দেখাইয়াছেন, অবশেষে ক্লাইভ-হেস্টিংস্-এর দিনে রাজ্যে বাণিজ্যেও আপনাদের আসন পাকা করিয়া লইয়াছেন।

এই দাবীতে অবশ্য ইতিহাস কতটা সায় দিবে তাহা জানি না, তবে আমরা সবাই স্বীকার করিব যে,—বাংলা দেশের বাহিরে 'ভদ্রলোক' নাই। 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বারে বারে, অবাঙালীদের না পারিলেও, আমাদের মনে করাইয়া দেয়—আমরাই অবাঙালীর দেশের মশাল জ্বালিয়াছি, আর আমাদের সাহিত্য আছে।

এই সত্যটা কিন্তু কাহারও উড়াইবার উপায় নাই। দেশী অধ্যাপকেরা যাউন, একজন ইংরেজ অধ্যাপকও বলিয়াছেন: "বৃটিশ সাম্রাজ্যে ইংরেজি ছাড়া আর-একটি মাত্র ভাষায় এ পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, সে-ভাষা বাংলা।"

ভাষা ও সাহিত্য অবশ্যই মানস-সংস্কৃতির প্রধান বাহন। কিন্তু, সাহিত্যই কালচারের এক বা অদ্বিতীয় মানদণ্ডও নয়, আর সকল জাতির মানস-সম্পদের প্রকাশও সাহিত্যে নয়। কাহারও বা সে-জীবন রূপ লাভ করে কাব্যে-সাহিত্যে কাহারও বা সংগীতে-গানে, কাহারও বা শিল্পে-চারুকলায়, আবার কাহারও বা অপূর্ব কারুনৈপুণ্যে। মোটামুটিভাবে তবু কথাটা গ্রহণ করা যায় যে যে-জাতির সত্যই একটা সাহিত্য আছে সে-জাতির কালচার অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে; বৃটিশ সাম্রাজ্যে বাঙালীর যদি এই দাবী থাকে, তবে সেই দাবী তুলিব না কেন?

একটা তর্ক উঠিতে পারে—'বৃটিশ সাম্রাজ্যে'র কথাটা না পাড়িলেই বা ক্ষতি কি? আর সেই সাম্রাজ্যের মধ্যে কি বাংলা ভাষায়ই সাহিত্য রচিত হইয়াছে, অন্য ভাষায় হয় নাই? হিন্দীর সাহিত্য-সংসার সুবিশাল; উরদু-জগৎ সুমার্জিত ও সুসংস্কৃত; মরঠীর সাহিত্য সুদৃঢ় ও সবল; গুজরাতীর সাহিত্যও সচেতন;—ইহাদের প্রত্যেকেরই পিছনে পাঁচশত হইতে হাজার বৎসরের ইতিহাস আছে, আর তামিলের পিছনে আছে দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস। শুধু বাংলার কথা বলিয়া লাভ কি?

কিন্তু যে-হিশাবে কথাটা বলা হইয়াছে সে-হিশাব মিথ্যা নয়—সত্যই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সহিত ইহাদের তুলনা চলে না। এই হিশাবে ছাড়াও আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বাংলার সাহিত্যকে মোটের উপর মানদণ্ড হিশাবে গ্রহণ করা যায়। সেই মানদণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতির বর্তমান রূপটিও নিরূপণ করা চলে; দেখিতে পাই সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে অর্ধসামন্তের যুগে—পরাধীন জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে—ভারতীয় সংস্কৃতি কোন্ পরিণতি লাভ করিতেছে।

এই হিশাবেই বাংলার কালচার একবার বুঝিয়া দেখিবার মতো—সন্দেশ রসগোল্লা হইতে একেবারে 'ডবল ডিমের মামলেট' পর্যন্ত—সব-কিছুরই যাচাই করা দরকার। কারণ, বাংলায় শুধু এই যুগে সাহিত্যই জন্মে নাই, আরও অন্যান্য জিনিসেরও উদ্ভব হইয়াছে।

এই যুগে বাঙালী একটা নূতন চিত্রকলা আবিষ্কার করিয়াছে, নূতন নৃত্যকলার উদ্বোধন করিয়াছে, এক নূতন সংগীত-শৈলী রচনা করিয়াছে; ধর্ম ও রাষ্ট্রকর্মে তাহার আবেগের আগুন এখনো নিবিয়া যায় নাই; বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, তাহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে;—জীবনে এত ঐশ্বর্য আর ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি দাবী করিতে পারে কি?

"ভারতীয় সংস্কৃতির বর্তমান রূপ" মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায়, এই "বাংলার কালচারে।"

বাংলার সংস্কৃতি

বাঙালীর এই কালচার অবশ্য আধুনিক কালের জিনিস—এত আধুনিক যে ইহাকে "বাংলার সংস্কৃতি" বলিতে যেন বাধে—"বাংলার কৃষ্টি" বলিয়া তবু অনুবাদ করিতে পারি। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির যে-ধারা বাংলা দেশেও বহিয়া আসিতেছিল, এখনো বহিতেছে, একেবারে থামিয়া যায়

নাই—বাংলার কালচার যেন তাহার সহিত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, আর তাহা খুঁজিয়াও পায় না; এবং পায় না বলিয়াই সম্ভবত তাহার অধ্যাপক-সমাজও বলিয়া দিতে পারেন না—বাংলার কালচার কি?

"বাংলার কালচার" নূতন জিনিস, "বাংলার সংস্কৃতি" কিন্তু বহুদিনের। আমাদের যে-সাহিত্য, যে-সংগীত, যে-নৃত্যকলা ও শিল্পকলা লইয়া আমাদের এই যুগের গর্ব—এমনকি যে "ভদ্রলোক" শ্রেণী লইয়া আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক সমস্যা—তাহার জন্ম বেশী দিন হয় নাই। সে জন্মিয়াছে ইংরেজের বাংলা জয়ের পরে, সাম্রাজ্যবাদের আওতায়, প্রায় ইংরেজের তৈয়ারী কলিকাতা শহরে। কিন্তু "বাংলার সংস্কৃতি"—বাংলার মাটি বাংলার জল ও বাংলার জনজীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল হাজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে।

প্রায় হাজার বৎসর আগে "পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল।" তাহার পূর্বেকার ও পরেকার কাহিনী আমাদের জানাই আছে—তাহা ভারতীয় ইতিহাসের বড় জোর একটি গর্ভাঙ্ক মাত্র। অবশ্য পাল যুগে মোটামুটি বাঙালী নিজের একটা স্থান এই সংস্কৃতির ইতিহাসে করিয়া ফেলিয়াছিল—তখন সংস্কৃতে তাহার "গৌড়ীরীতি" গৃহীত হইল; তাহার ধীমন ও বীতপাল নূতন মূর্তি-শিল্পের প্রচলন করিল; বৌদ্ধগুরুদের হাতে মহাযান নূতন রূপ পাইল এবং দেশীয় ভাষায় গান রচনা হইতে লাগিল। এইরূপে হাজার বৎসর পূর্বে বাংলা ভাষার জন্ম হইল। তারপর মধ্য যুগের তুর্কীবিজয় ও মুসলমান আধিপত্যের দিনে বাংলার সংস্কৃতি ক্রমেই সেই ভাষার ভিত্তিতে আপনার রূপ আবিষ্কার করিতে লাগিল। বাংলার সংস্কৃতির সেই মধ্যরূপও তখনকার ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অনুচ্ছেদমাত্র— তখনও কৃষি সমাজের সুদীর্ঘ মধ্যাহ্ন; আর তেমনি সংযোগ ও সমন্বয়; সেই আউলিয়া, বাউল সূফী, দরবেশ ও নানা সম্প্রদায়ের সহজিয়া দল, সেই বৈষ্ণব মহাজন ও মুসলমান শাসকদের চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, আর তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের আত্মরক্ষার দায়ে লৌকিক রচনা—মঙ্গলকাব্য। বৈষ্ণব প্রেরণায় সেই সংস্কৃতিতে একটা প্রবল স্রোত বহিয়া গেল—বাংলা সাহিত্য, বাংলা জীবনযাত্রা একটা নিজস্বতা লাভ করিল।

কিন্তু ভুলিলে চলিবে না: "বাংলার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রাম্যজীবনকে অবলম্বন করিয়াই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এদিকে বাংলাদেশ বোধহয় আদিম অস্ট্রিক জাতি হইতে প্রাপ্ত রিক্থই রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। গ্রামের দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা।...বাংলাদেশে নাগরিক জীবন মুখ্যত গ্রামের জীবনেরই একটি বিস্তৃত সংস্করণ ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিন্দুযুগের অবসানের পরে বাঙালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডি প্রথম কাটাইয়া নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল।"

যে বাঙালী সংস্কৃতি তাই এই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ক্রমশ নানাদিকে বিকশিত হইয়াছে,—ভারতীয় সংস্কৃতির সেই পল্লীপ্রধান পূর্বপ্রত্যন্তের রূপটি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। এবং অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমরা তাহার সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে আমাদের সেই ধারাবাহিক সংস্কৃতির অবলম্বন বলিয়া ভাবিতেও যেন কুণ্ঠিত হই। কিন্তু তবু দুই এক জন সংস্কৃতির সন্ধানী বাস্তবদৃষ্টিতে উহার এই রূপ দেখিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি অবশ্য মোটেই বস্তুবাদী নন; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ। তাঁহার কথিত বাংলার সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শনীটি তাই আমাদের স্মরণীয়।[১]

সংস্কৃতি বনাম 'কালচার'

যাহাকে আমরা 'বাংলার কালচার' বলি তাহা নিশ্চয়ই এইসব জিনিস নয়। সেই তুলনায় এই বাংলার জীবন 'সেকেলে' এবং 'পাড়াগেঁয়ে' তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মনে রাখা দরকার—বাঙালী গ্রামেই থাকে। শতকরা ৯৩.৫ জন বাঙালী গ্রামবাসী; বাঙালীর অপেক্ষা ভারতে অন্যান্য প্রদেশের (বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রদেশগুলি বাদ দিলে দেখিব) অধিবাসীরা তাহাদের শহরে বেশী বাস করে। সভ্যতার "শহুরে মাপকাঠিতে" (Standard of Urbanisation) বাঙালী উচ্চে নয়—তাই, এই উপরের চিত্রকেই বাংলার চিত্র, বাংলার সংস্কৃতি, না বলিয়াও উপায় নাই। কিন্তু 'বাংলার কালচার' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই যে এই 'বাংলার সংস্কৃতি'কে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে তলাইয়া দিতেছে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহমাত্র নাই। আর তাহাতে আমাদের দুঃখও নাই। দুঃখ থাকিলেও ফল হইত না, —আর দুঃখ না থাকায়ও খুব ক্ষতি হয় নাই।

বাংলার কৃষ্টি

'বাংলার কালচার' অবশ্য 'সেকেলে'ও নয়, 'পাড়াগেঁয়ে'ও নয়—অন্য জিনিস। তাহা কি জিনিস, সে-বিষয়ে অধ্যাপকগণ একমত নন; কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চয়ই একমত যে উহা 'পাড়াগেঁয়ে' নয়, 'সেকেলে'ও নয়। দরকার হইলে অবশ্য আমরা বৈষ্ণব কবিতার নাম করিব, ফ্যাশান হিশাবে কীর্তনের উচ্চাঙ্গতা প্রমাণ করিব, এমনকি রেডিওতে ভাটিয়ালী চালাইব, ড্রয়িংরুমে পল্লী-সংগীতের চর্চা করিব, পুরানো কুলা, কাঁথা, পিঁড়া কলিকাতায় বহিয়া আনিয়া বাংলার কৃষ্টির জন্য প্রাণপাত করিব, আর কলম-ধরা আঙুলে আমাদের কন্যারা পর্যন্ত কলিকাতার সিমেন্ট-বাঁধানো সভাতলে আলপনা আঁকিতে বসিবেন—কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে বাংলার কালচার আমরা বলিব না, আর আমাদের এই প্রাণপাত পরিশ্রমেও সেই 'বাংলার কৃষ্টি' বাঁচিয়া উঠিবে না। অবশ্য আমাদের 'কৃষ্টিচর্চা'ও এই কালচারের একটা অঙ্গ—যেমন, চেল্‌সিয়ার শিল্পীদের চক্ষে নিগ্রো-আর্ট আদরণীয়, যেমন আমাদেরই শিল্পীদের চক্ষে সাঁওতাল-জীবন ও বৌদ্ধযুগ একটা সহজ বিষয়বস্তু। উহা আমাদের কালচারের সহিত এতই নিঃসম্পর্কিত ঠেকে যে, আজ বিদেশী অতিথিকে সংবর্ধনা করিবার কালে প্রথমেই মনে পড়ে আয়োজনটা 'ওরিয়েন্টাল' হওয়া চাই। তারপর অধ্যাপকের বাড়িতে পাঁতি লইতে ছুটি, "স্যার, চন্দন 'ওরিয়েন্টাল' হবে তো?" অর্থাৎ, কি আমার দেশীয়, কি আমার দেশীয় নয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি; মনে শুধু একটি খাঁটি দেশীয় ভাবই তবু নিজের অজ্ঞাতেই জাগিয়া আছে—পাঁতি লওয়া। ইহাই বর্তমান বাংলার কালচারের সহজরূপ—উহা ৯৩.৫ জনের জিনিস নয়; অথচ উহা ৯৩.৫ জনের সেই পাঁতি লইবার মনোবৃত্তি ছাড়িতে পারে নাই; উহার আসন শহর বলিতে পারি, একটিমাত্র শহর, —কলিকাতা। উহার জন্মও এই শহরের সঙ্গে অর্থাৎ ইংরেজের কর্তৃত্বে।

বাংলার কালচারের কেন্দ্র

ভারতবর্ষে ইংরেজের অভ্যুদয় তিনটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়—মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই; ইহাদের গায়ে ইংরেজ রাজত্বের তিনযুগ, ইঙ্গভারতীয় বা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির তিন স্তর, এখনো দেখিতে পাওয়া যায়।[২] যেমন, মাদ্রাজে এখনো প্রথম ইংরেজ যুগের সেই আবহাওয়া রহিয়া গিয়াছে; নূতন শিল্পযুগের হাওয়া ঠিক বহে নাই।[৩] বোম্বাইতে নবজাত 'জাতীয় ধনিক তন্ত্র' (National Bourgeoisie) 'স্বাজাত্য' (Nationalism) ও 'স্বদেশী'তে (শব্দটি বিশেষ অর্থযুক্ত) সবে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।[৪] আর কলিকাতায় খাঁটি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যাহ্ন চলিয়াছে— বণিক ও ধনিক ইংরেজ পুঁজিপতি রূপে এক বিলাতী পুঁজির (foreign capital) এবং ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার (colonial life) পত্তন করিয়াছেন। মোটের উপর ইংরেজের প্রথম উদয়

বাংলায় ; তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠা এখনো বাংলায় ; তাই ইংরেজযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোচ্চ নিদর্শন এই 'বাংলার কালচার' ; আর উহার পীঠস্থানও তাই ইংরেজের শহর এই কলিকাতা।*

এই ইংরেজি আমলের ভারতীয় সংস্কৃতিকে কিন্তু আর পূর্বযুগের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ মাত্র বলিলে চলিবে না। তাহার কারণ, এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় জীবনযাত্রার এক আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজের ভারত আগমনও সেই পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের পরিচয় দেয়—সভ্যজগতে সামন্তযুগের অবসান ও বণিকরাজের অভ্যুদয় তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। আর সেই বণিকতন্ত্রের বহু জটিল ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকের রাজত্ব লাভ হইল, তেমনি প্রধানত ভারতের ঐশ্বর্যে বিলাতে তাহার শিল্পযুগের পত্তন হইল ; আবার ভারতেও সেই শিল্পযুগের আক্রমণ-ফলে লোপ পাইল কৃষি-সমাজের গৃহশিল্প ও পল্লী-সমাজের পুরানো ছাঁচ ; দেখা দিল নূতন শাসক ও তাহার তাঁবেদার আমলা দালালের দল, দেশীয় সামন্ত রাজ, জমিদার ও তালুকদার, ফড়ে ব্যবসায়ী ও উপজীবিকাবলম্বী 'ভদ্রশ্রেণী' ; আর ইহারই সম্মেলন-ফলে ফুটিয়া উঠিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে এক নূতন ভদ্র জীবনযাত্রা ; উহারই শ্রেষ্ঠ কীর্তি "বাংলার কালচার"।

বাংলার কালচারের পর্ববিভাগ

এই কালচারেরও অবশ্য পর্ববিভাগ করা যায় ; করা উচিতও। যেমন, প্রথম পর্ব, 'রামমোহনী পর্ব' (১৮০০-১৮৪০); রামমোহনের যুক্তিবাদ(Rationalism) সেদিনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিল ; কারণ, তখন ফরাসী বিপ্লবের পরস্তরে ইউরোপে যুক্তিবাদের, উদারনীতির, রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি- স্বাধীনতার (Individualism) ও জাতীয়তার (Nationalism) বোধন চলিয়াছে। সতীদাহ নিষেধ, একেশ্বরবাদিতা, স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহন ইংরেজের সহায়তা লাভ করেন। তাঁহার চোখে ইংরেজের সংস্কৃতি এক নূতন সম্ভাবনার বাহন রূপে দেখা দিল ; ইহাই রামমোহনের যুগাবতার গণ্য হইবার শ্রেষ্ঠ দাবী এবং উহা একমাত্র দাবীও। ইউরোপের সভ্যতা যে যুগান্তরকারী হইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—ইহার অপেক্ষা বড় তাঁহার প্রতিভার প্রমাণ আর কিছুই নাই। মেকলে ও লর্ড বেণ্টিংকের প্রথম শিক্ষাপ্রস্তাবে ও নানা সংস্কারে এই রামমোহনী পর্বের জয় ও অবসান ঘটে ১৮৪০-এর পূর্বেই। দ্বিতীয় পর্বে আসিল ফোর্ট উইলিয়মের শিক্ষিত আমাদের 'ইয়ং বেঙ্গলে'র পর্ব। ইঁহারা একেবারে ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ; কিন্তু তাহাতে নিজেরাই ডুবিয়া গেলেন, দেশকে নোঙর-ছাড়াও করিতে পারিলেন না। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় নাই—ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা , ইংরেজি সমাজের উপকরণ তাহার সমাজসম্পর্ক ও জীবন হইতে উঠিয়াছে ; আর এই দেশের সমাজ, ইহার জীবনের উপকরণ, ইহার সমাজ-সম্পর্ক ইংরেজের রাজ্যাধিকারে ভাঙিতেছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের ছাঁচে গঠিত হইতেছে না,—গঠিত হইতেছে "ঔপনিবেশিক" (colonial) ছাঁচে। এই দ্বিতীয় পর্বের শেষ হইল ওয়েলেসলি ডালহৌসির সময়ে—যখন বণিকের রাজত্ব রেল লাইন পাতিয়া ব্যবসায় ফাঁদিতে ও বাড়াইতে আরম্ভ করিল। একবার যেখানে রেললাইন বসিল, সেখানে আর শিল্পযুগের আবির্ভাব ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। বিশেষত যদি আবার সেই দেশে থাকে সস্তা মজুর, প্রচুর লৌহ ও কয়লা।* অতএব, তৃতীয় পর্বে দেখা দিল ভারতীয় সমাজের সত্যকার সামাজিক পরিবর্তন এবং দেখা দিলেন মধুসূদন, বঙ্কিম, কেশব, (দয়ানন্দ), ও সর্বশেষে সেই পর্বের সর্বপ্রধান ভারতীয় নেতা বিবেকানন্দ। রেল ও শিক্ষা সংযোগের ফলে প্রথম ভারতীয় স্বাজাত্যের আরম্ভ আর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে খাঁটি সামন্ততন্ত্রের অবসানও ভারতব্যাপী এই সময়েই দেখা দিল। তাহার পর চতুর্থ পর্বে ভারতের চক্ষে বিংশশতাব্দীর উদ্বোধন ঘটে বুয়ার যুদ্ধে ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে ; তাহার স্বরূপ ক্রমপরিস্ফুট হইয়া উঠে বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ও তাহার পরে গত ১৯২৯এর পৃথিবীজোড়া অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যে ; সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়েতের জন্মে ত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়। আর গৃহমধ্যে বঙ্কিম হইতে (১৮৮৪) সে প্রেরণা আসিয়া পৌঁছায় (তিলক)-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথে (১৯০৫), উত্তীর্ণ হয় (গান্ধী)-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথে (১৯২০-৩০) এবং সর্বশেষে ১৯৩০এর পরে তাহাই আর এক নূতন পর্বের দিকে (পঞ্চম ?) অগ্রসর হয়— একরূপে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, অন্যরূপে (অস্পষ্টত পণ্ডিত জহরলালেও) প্রধানত সাম্যবাদী চিন্তায়।

দ্রষ্টব্য এই যে ইঁহাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। ভারতীয় মুসলিম জীবনযাত্রা শহরে ; মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে ও সিপাহী বিদ্রোহের আঘাতে সেই শাসকের সংস্কৃতি মূর্ছিত হইয়া পড়িল—যেমন তুর্কী আগমনে হিন্দুশাসকের সংস্কৃতি একদিন মূর্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি পল্লীগত অর্থাৎ জনগণের জিনিস। আমাদের শহরে কালচারের উদ্বোধনে সেই পল্লীকেন্দ্রিত জন সমাজের কেহই আহুত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সবে নূতন কালচরের শিহরন জাগিতেছে। এই চার পাঁচ পর্বের 'বাংলার কালচার'কে প্রায় আধুনিক ভারতীয় কালচারও বলিতে পারা যায়, বন্ধনী মধ্যস্থ নাম কয়টিই শুধু অবাঙালীর। এই কালচার যতই অগ্রসর হইতেছে ততই অবাঙালী সেই ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রাধান্য পূর্ণলাভ করিতেছে। প্রথম দিকে এই প্রাধান্য বাঙালীরই ছিল,—কেন ছিল, তাহার ঐতিহাসিক কারণই আমাদের বেশী অনুসন্ধানের বস্তু। তাহাই আসলে বাংলার কালচারের স্বরূপ, অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপ, আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া দিবে।

বাংলার কালচারের দশদিক

তাহার পূর্বে এই বাংলার কালচারের নানা দিক কয়টি আবার একবার এক নিমেষে আমরা দেখিয়া লই : —ভারতবর্ষে বণিক ইংরেজ রাজা হইলেন ১৭৫৭ হইতে। তারপর কালচারের পঞ্চপর্বের মধ্যে আমরা দেখি (১) ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ—ইহার প্রবক্তা রামমোহন হইতে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত : ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপের Reformation ও Protestantism. (২) হিন্দু জাগরণ—বঙ্কিম, বিবেকানন্দ হইতে রামকৃষ্ণমিশন ও হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত এই স্রোত বহিয়া আসিয়াছে। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় ক্যাথোলিক ধর্মের Counter-Reformation. (৩) সংস্কৃত চর্চা—রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলন, বাচস্পতির অভিধান, 'মহাভারতের' অনুবাদ হইতে এই যুগ একেবারে বঙ্গবাসীর শাস্ত্র প্রকাশের অধ্যায় ও জীবিত পণ্ডিতদের মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও গ্রীকচর্চা। (৪) সমাজ সংস্কার—রামমোহন, বিদ্যাসাগর হইতে কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ইহার প্রবক্তা ; বর্তমানে ইহার ঐতিহ্য ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য-সমাজের ও হিন্দুমহাসভার সম্বল। কিন্তু সমাজে আজ আর সংস্কারের যুগ নাই, বৈপ্লবিক সংগঠনের যুগ আসিয়াছে। এই দিকে শিল্পপ্রবর্তক ও সাম্যবাদাবলম্বী জনসমাজই সেই প্রেরণার উত্তরাধিকারী। (৫) সাহিত্য—ঈশ্বরচন্দ্র (শিক্ষা-প্রবর্তক), মধুসূদন ও বঙ্কিম প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষিতদেরই ইহা সর্বাংশে কীর্তি। ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বা মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যের সম্পর্ক সাহিত্য হিসাবে প্রায় নাই। বরং ইহার প্রেরণা—ইহার সহিত তুলনীয়ও— ষোড়শশতাব্দী হইতে ইংলণ্ডে যে সাহিত্য জন্মে তাহাই। (৬) নব শিল্প পদ্ধতি—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল হইতে স্বদেশীযুগের পরে ইহার জন্ম। ইহার সহিতও ভারতীয় প্রাচীন শিল্পধারার বা বাংলার পটুয়াদের ধারার যোগসূত্র নাই—যোগসূত্র আছে গ্রিফ ওকাকুরার, হ্যাভেলের এবং

কুমারস্বামীর। (৭) সংগীত— ওস্তাদের আসরে বাঙালীর স্থান ছিল গৌণ; তাই এইখানে যে নূতন সংগীতের ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন তাহা নূতন। উহাতে কথা ও সুরের সমন্বয় স্থাপিত হয়। ইহার রহস্যটুকু বুঝিবার মতো; জনসংগীত (Folk song) সাধারণত কথাপ্রধান। বাংলার জনসংগীতও তাহাই। বাংলার কীর্তন এই জন-সমুদ্র হইতে জন্মে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতে সেই কথার সঙ্গে সুরের নূতন সমন্বয়ে ইহা একালের বাংলায় জনপ্রিয় হইয়াছে, কিন্তু ঠিক এই বিশেষ একটি ভাষার কথার জন্যই হয়তো তাহা নিখিল ভারতীয় সংগীত-শৈলীরূপে গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। (৮) নাট্য ও নৃত্যকলা এবং হলিউডী সবাকচিত্র—বলাবাহুল্য ইহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক, ইহার প্রেরণা ও আদর্শ প্রথমত আধুনিক ইংরেজী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির, ও তাহার মার্কিন বিকৃতির। (৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা—বিশেষ করিয়া ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে, ভাষাতত্ত্বে, নৃতত্ত্বে উহা আদর লাভ করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কলিকাতার বৈজ্ঞানিকগণই ভারতীয় গবেষকের দ্বার মুক্ত করেন। (১০) রাজনৈতিক আন্দোলন—উহার উদ্বোধন প্রধানত ইংরেজি শিক্ষিতদের দ্বারা আর উহার দুইটি ধারা অন্তত আছে; একদিকে ডব্লিও. সি. ব্যানার্জি (নামেই তাঁহার স্বাজাত্যের আদর্শ পরিস্ফুট), আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ হইতে একালের ন্যাশানালিস্টরা; আর দিকে বঙ্কিম-অরবিন্দের প্রেরণা-প্রসৃত বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত বিপ্লবী ধারা,—আজ যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক চিন্তায় ও সামাজিক কর্মক্রমে (Programme) বিশ্বাসী, ও গণবিপ্লবের দিকে যাঁহারা অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন, মোটামুটি যাঁহারা সাম্যবাদের পক্ষপাতী।

বাংলার কালচারের বনিয়াদ

মোটামুটি এই যে দশদিকের বাংলার কালচার বিকাশ লাভ করিল তাহার মূল কোথায়, আর সমস্ত জড়াইয়া তাহার কোন্ রূপটি প্রকাশিত হইল—অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি—এইবার সংক্ষেপে তাহা নির্দেশ করিতে বোধহয় অসুবিধা নাই। পুনরুক্তির দোষ ঘটিলেও বলিতে হইবে—(১) ইহা ৯৩.৫ জনের কালচার নয়; (২) ইহা পুরাতন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নয়; (৩) ইহা কৃষি-প্রধান পল্লীজীবনের সংস্কৃতি নয়; (৪) ইহা মাত্র মধ্যবিত্ত ও ইংরেজি শিক্ষিতদের সৃষ্টি (এবং যেহেতু ইহারা অধিকাংশেই প্রায় হিন্দু, অতএব মুসলমানগণ ইহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই); (৫) ইহা শহরে জাত এবং শহরেই প্রায় সমাসীন; (৬) ইহা বাহিরের বণিক সংস্কৃতির আঘাতে আমাদের ক্রম-পরাস্ত কৃষি সংস্কৃতি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; (৭) ইহা প্রধানত বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে; (৮) এবং সর্বশেষে, মাত্র সামান্যাংশে আভাস দেয় সমাজগত পরিবর্তনের (রাষ্ট্রকর্মে ও সামাজিক সংস্কারে), আর জীবিকাগত বা বাস্তব উপকরণগত সংস্কৃতির যাহা ৯৩.৫ জনের কিংবা শহরের বাকী জনগণের, (মজুরের, ফেরিওয়ালার, দোকানীর, পসারীর) প্রায় খোঁজই রাখিতে চায় না

ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন

ইহার কারণ ঐতিহাসিক। ইংরেজ বণিক রাজা হইলেন, ১৭৬৫ সালে তাঁহারা দেওয়ানী লাভ করিলেন; ১৭৯৩-তে তাঁহারা দশশালা বন্দোবস্ত করিলেন এবং তাহাই পরে জমিদারী প্রথায় চিরস্থায়ী রূপ লাভ করিল; অর্থাৎ ১৮০০ শত খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার এত বড় একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল যাহা পূর্ব পূর্ব যুগে আর কখনো ঘটে নাই।[৮] প্রথমতঃ, বিলাতী কায়দায় খাজনা (Rent) ধার্য করা হইল, শস্যের পরিবর্তে 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনের চেষ্টা চলিল—পূর্বে রাজস্ব অজন্মা অনাবৃষ্টিতে বাড়িত-কমিত, কৃষকের উহাতে সুবিধা ছিল; 'মুদ্রা কর' সেই সবের হিসাব রাখে না, জমির উপর 'খাজনা' আছে, 'খাজনা' দিতে হইবে—এই তাহার হিসাব। উহা পূর্বেকার মতো 'রাজস্ব' উৎপাদনে রাজার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় না; দ্বিতীয়ত জমির মালিকানা আর কৃষকের কিংবা পল্লীগোষ্ঠীর রহিল না। ইংরেজি থিওরি মতো, উহা রাজার হইল; ইহাই বিলাতী নীতি —এই নীতি অনুযায়ী কৃষক খাজনা না দিলেই উৎখাত হয়। তৃতীয়ত, বণিক রাজা আবার মালিকানা ইজারা দিয়া দিলেন নানা খাজনা-যোগানদারদের হাতে; ইহারাই জমিদার, কার্যত জমির মালিক আজ ইহারাই।[৮] সত্য বটে আজ প্রজার খাজনা প্রায় ১৮ কোটি টাকা (ফ্লাড্ কমিশনের হিসাবে; আব্ওয়াব কম কোটি তাহা না বলিলেও চলে), আর সরকার পান ৩ কোটিরও কম; বাদবাকী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য। কিন্তু ১৭৯৩এর বন্দোবস্ত অনুসারে কথা ছিল সরকারী পাওনার (যেমন এখনকার হিসাবে ৩ কোটির) এক দশমাংশের (অর্থাৎ এখনকার হিসাবে ৩০ লক্ষের) বেশী জমিদারেরা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিবেন না। কিন্তু আজ জমিদারের নিজ আদায় মোট ৯ কোটির কম নয়— কাহারো কাহারো মতে ১৭/১৮ কোটি। অতএব 'জমিদারী' যে দেশের সম্পন্নদের নিকট একটা প্রকাণ্ড লাভের ও লোভের জিনিস হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আজ মনে হইবে, জমিদারী প্রথায় ইংরেজ বণিকরাজের বুঝি লাভ ছিল না। কিন্তু ১৭৬৫এর পরে দেশে যে খাজনা নিলামের অত্যাচার চলে আজও তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" এই দেশের Black Death! ১৭৯৩তেও ইংরাজ বণিক লাভের অঙ্ক কিছুমাত্র কমাইয়া এই ভূমি-ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহাদের হিসাব মতে মুঘল রাজত্বের শেষদিকে ১৭৬৪-৬৫এ রাজস্ব ছিল ৮,১৮,০০০ পাউণ্ড; কোম্পানি দেওয়ানী পাওয়ার সঙ্গে ১৭৬৫-৬৬তে উহা বাড়িল ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ডে; আর ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত অনুযায়ী সেই সরকারী ভূমিরাজস্ব স্থির হইল ৩০,৯১,০০০ পাউণ্ড। আর যাহাই হউক বণিকেরা মুনাফা ছাড়িয়া দেন নাই, ইহা না বলিলেও চলে।

তাহা ছাড়া তখনকার দুইটি প্রধান কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হয়—প্রথমত, বৎসরে বৎসরে বন্দোবস্ত যাহারা লইত তাহারা রায়তের উপর শত অত্যাচার করিয়াও সেইরূপ উচ্চহারে খাজনা আদায় করিয়া উঠিতে পারিত না; কাজেই সরকারী বাজেটের খাজনা বাকী পড়িত। দ্বিতীয়ত, কর্নওয়ালিস স্পষ্টভাষায়ই বলিয়াছেন, তিনি চাহিয়াছিলেন এই দেশে ইংলণ্ডের অনুকরণে একদল ভারতীয় ভূস্বামী (Land-holders) গঠন করিতে—ইহার এক কারণ তাহারা জমির উন্নতি করিবে। জমিদারেরা অবশ্য ইহার কিছুমাত্র করিলেন না। কর্নওয়ালিস চাহিয়াছিলেন—এইভাবে জমিদারদের ঘাড়ে ভারতবর্ষে চিরদিন যাহা রাজার কর্তব্য ছিল, —যেমন, কৃষির প্রয়োজনে বড়-বড় খালবিল খনন ও সংরক্ষণ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পথঘাট প্রভৃতি—তাহা চাপাইয়া দিবেন, কোম্পানি শুধু জমির মালিকানা রাজস্ব ভোগ করিবে। ইহার ফল দুইশত বৎসরে এসব জিনিস একেবারে ধ্বংস হইল, নদী-নালা বন্ধ হইল, রাজা বা জমিদার কেহই দৃক্‌পাত করিলেন না।[৯/১০] এই ভূস্বামী সৃষ্টি করার দ্বিতীয় কারণ—কর্নওয়ালিস বুঝিয়াছিলেন, তাহারা সরকারের নূতন প্রতিষ্ঠিত শাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইবে। পরে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক্ আবার এই কথাই মনে করাইয়া দেন;[১১] "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রুটি আছে সত্য; তবু ইহার দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশালী বড় একদল ধনী ভূস্বামী সম্প্রদায় তৈয়ারী হয়। ইহাতে এই একটি বিরাট সুবিধা হইয়াছে, যে—যদি বিস্তৃত গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে শাসনকার্যের নির্বিঘ্নতায় ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থে বৃটিশ শাসন বজায় রাখিবার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকিবে।"

এই ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনে কৃষি-সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইল। কারণ (১) মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে জায়গিরদার প্রায় আধা-স্বাধীন সামন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেইসব বনিয়াদী বংশের এইবার পতন হইল। (২) টাকাওয়ালা 'দেওয়ান' 'গোমস্তারা' কোম্পানির প্রভুদের কৃপায় এই মুনাফার ব্যবসায়ের মালিক হইয়া নূতন জমিদারগোষ্ঠীর পত্তন করিলেন। ইঁহাদের অর্থলোভ স্বভাবতই ছিল অপরিমিত—কারণ অনেকেই ছিলেন কোম্পানির সাহেব সুবার অনুচর, দালাল, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি; বাজারে বন্দরে সেদিন ইঁহারা ভাগ্যান্বেষণে জুটিয়াছিলেন, সেদিনকার ইংরেজি 'কুঠি'র কাঞ্চন মানদণ্ডই ছিল ইঁহাদের নিকট প্রধান; ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর পর্দবীতে উন্নীত হইবার আশা তাঁহাদের ছিল না, সেই আভিজাত্যের মানদণ্ডও তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই।[১২/১৩] শোভারাম বসাক, বতু সরকার, গোবিন্দ মিত্র প্রভৃতি (১৭৫৭) প্রধানগণ পোষ্যঅনুচর ও বাইজীর নামে টাকা মারিতে দ্বিধা করিতেন না—তাঁহাদের নীতিজ্ঞানে উহাতে দোষ ছিল না। কিন্তু কর্নওয়ালিসের কৃপায় একবার সেই অভিজাত পর্যায়েই এই শ্রেণীর স্থান পাইবার সুযোগ হইল জমিদাররূপে, অথচ মুনাফার হিসাবেও জমিদারী তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয় রহিল।

ইহারও আবার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বুঝিবার মতো। প্রথমত, যেসব পুরানোঘর পুরানো সমাজ ও বাস্তব সংস্কৃতি পোষণ করিতেন তাঁহারা লোপ পাইলেন। নূতন জমিদারেরা শিক্ষায় (অথবা উহার অভাবে), রুচিতে (উহারও অভাবে) সেই পল্লীসংস্কৃতিকে পালন করিতে পারিলেন না। নদীনালা মজিয়া চলিল, খালবিল, জল নিষ্কাশনের নালাগুলি, পথঘাট এইসবের দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা শহরের মানুষ, কাজেই পল্লীসংস্কৃতির সমাদর বুঝিতেনও না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দূরে দূরে গ্রামে জমিদারীর মধ্যে বাস করিতেন—যেমন বরেন্দ্র ভূমির জমিদারেরা—তাঁহাদেরও ক্রমেই চোখ পড়িল সাহেবদের ও কোম্পানির কায়দার দিকে। কৃষিসংস্কৃতির সর্বত্রই ক্রমশই দুর্দিন আসিল। কারণ প্রথমত নূতন নিষ্ঠুর করভার; দ্বিতীয়ত পূর্তাভাবে কৃষির অব্যবস্থা; তৃতীয়ত কৃষকের সহিত ব্যবহারে নূতন জমিদারেরা কোনো পুরাতন সম্পর্কের মর্যাদা রাখিলেন না। 'খাজনা দেও, নজরানা দেও, আবওয়াব দেও, না হইলে উৎসন্নে যাও'—অর্থাৎ বিলাতী বণিকরাজের যেমনিতর নীতি, তেমনিতর তাহাদের দালাল দেশীয় জমিদার বেনেদেরও নীতি হইয়া উঠিল। পরবর্তীকালে ইহাদের উত্তরাধিকারিগণ অবশ্য আবার পূর্বপুরুষের সেই দালালী-মনোবৃত্তি ছাড়িয়া নূতন আভিজাত্যের চর্চা করেন। ফলে তাঁহারা আবার দেশে নানা পর্যায়ের তালুকদার, জোৎদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর ও মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইংরাজ যুগের ভূমি-ব্যবস্থায় ১৮০০ সনের পূর্বে যে আঘাত পল্লীকেন্দ্রিক কৃষি-সমাজ লাভ করিল তাহা প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নয়—আর কাহারও সে-ইচ্ছাও ছিল না।

এই সঙ্গেই এই ভূমি-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফলটিও উল্লেখযোগ্য: কোম্পানির এই বেনিয়ান, মুন্সী, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান—ইঁহারা দেশের নূতন ব্যবসায়ীরূপে দাঁড়াইতেছিলেন; ইঁহারাই স্বাভাবিক বিকাশের পথ পাইলে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লক্ষ্মী লাভ করিতেন—বণিকে পরিণত হইতেন। পূর্বযুগের সওদাগরীপুঁজি (Merchant Capital) ইহাদেরই চেষ্টায় 'বণিকপুঁজি' হইবার কথা। কিন্তু বিদেশী বণিকরাজের আওতায় ইঁহারা প্রথমত রহিলেন দালালশ্রেণীর ব্যবসায়ী (Comprador) হইয়া; তারপর দেখিলেন—দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির একচেটিয়া, দেশীয়দের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ, অথচ বহির্বাণিজ্যেই আসল লাভ। তখন অন্তর্বাণিজ্যে, অর্থাৎ ব্যবসায়পত্রেও তাঁহারা আবার দেখিলেন, কোম্পানির রাজত্বে তাহার জুলুমবাজ সাহেব কর্মচারীরা বড় বড় দিকগুলি দখল করিয়া লইতেছেন; অতএব, বাধ্য হইয়াই দেশীয় ব্যবসায়ীরা অনেকটা ব্যবসায়পত্র ছাড়িয়া বাড়িঘর জমি-জমায় টাকা খাটাইতে লাগিলেন; পরের দিকে কোম্পানির কাগজও তাই ইঁহাদের নিকট একটা লোভের জিনিস হইল। এমনি অবস্থায় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাঁহাদের একই কালে মুনাফা ও আভিজাত্যের পথ করিয়া দিল তখন দেব, মিত্র, সিংহ, বসাক, শেঠ, মল্লিক, শীল সকলেই জমিদার হইতে চলিলেন। ইঁহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিলি ও সাহা ব্যবসায়ীরাও পরবর্তী সময়ে 'জমিদারবাবু' হইতে লাগিলেন। অন্যদিকে প্রদেশান্তরের ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন;—তাঁহাদেরও দুই চারিজন আবার জমিদার হইলেন—বাংলার ব্যবসাপত্র আজ তাঁহাদেরই হাতে। সেই স্থান হইতেই অন্যান্য প্রদেশের মতো এখানকার সেই অবাঙালী ধনবান ব্যবসায়ীরাও ধীরে ধীরে শিল্পপতি ও পুঁজিপতি হইতে চলিয়াছেন—অন্যদিকে বাংলার জমিদার-শ্রেণীর পক্ষে আজ তদুপযোগী শিক্ষাও নাই, পুঁজিও নাই।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি-ব্যবস্থায় দেড়শত বৎসরে বাঙালী ব্যবসায়ী আর রহিল না, বাংলার ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যান্বেষীরা বাঙালী হাইকোর্টের জজ হইতে বাঙালী পশ্চিমের কমিসেরিয়েটের জোগানদার এবং পূর্ববাংলার ব্যবসায়ী মহাজন সকলে—শিল্প-প্রচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া রহিলেন। বাঙালী 'স্বদেশী' আন্দোলন করে 'স্বদেশী' শিল্প গড়িতে পারে না।

নূতন ভূমি-ব্যবস্থার ফল একটু বিশদ করিয়াই বলা হইল—বাঙালীর পক্ষে তাহা অন্যায় নয়—কারণ, ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা জমিদার হইল, বাণিজ্যের ও শিল্পের পথে পাও বাড়াইল না; অর্ধসামন্ত জমিদারের সৃষ্টিতে পুরাতন কৃষি-সম্পর্ক পরিবর্তিত হইল, সৃষ্টি হইল মধ্যস্বত্বের; আর করভারে ও নদীনালার অভাবে, বাংলার কৃষক সাধারণ একটা চরম দুর্দশার দিকে চলিল;—তাহারই ফলে আবার দেশে উদ্ভূত হইল মহাজন বা সাউকার ও মহাজন-জমিদার শ্রেণীর; উহাদেরও টাকা ব্যবসায়ে খাটে না, খাটে শেষপর্যন্ত জমিতে বা জমির উপস্বত্ব ভোগীদের উপর।

পল্লী-শিল্পের ধ্বংস

এককথায় জমি ছাড়া টাকা খাটাইবার আর কোনো উপায়ই ইংরেজ বণিকরাজ দেশীয় বিত্তবান লোকদের হাতে রাখিলেন না। ইহাই সাম্রাজ্যবাদের সনাতন নিয়ম। ইহার সঙ্গে আবার স্মরণীয় আরও ভয়ংকর কথা—জমি ছাড়া দেশীয় শ্রমজীবীদের জীবিকারও আর কোনো পথ তাঁহারা উন্মুক্ত রাখিলেন না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই বণিকরাজ এখানকার শিল্পীদের ধ্বংস-সাধন করিতে আরম্ভ করেন। এই দিকে তাঁহাদের তখন পর্যন্ত সহায় ছিল—নিজেদের সংগঠনীশক্তি এবং নবলব্ধ রাষ্ট্রশক্তি। ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথম পাদ আরম্ভ হইতেই বিলাতের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বিলাতের ব্যবসায়ীদের তাড়নায় শিল্পযন্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগিল; সেই পাদ উত্তীর্ণ না হইতেই বিলাতের শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইল। বণিকরাজ তখন ধনিকরাজ রূপে ভারত-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন—রাষ্ট্রশক্তি ও যন্ত্রশক্তির প্রয়োগে আমাদের কৃষি-সমাজের পল্লী-শিল্প দেখিতে না দেখিতে নষ্ট হইয়া গেল। এই কাহিনী আজ এতই সুপরিচিত যে বাড়াইয়া লাভ নাই। শতসহস্র নিপুণ শিল্পী দেখিতে না দেখিতে জীবিকা হারাইল—পুরানো শিল্পকেন্দ্র শ্মশান হইল—শিল্পীর দল গ্রামে গিয়া কৃষি সম্বল করিল, জনগণের জীবিকার একমাত্র পথ উন্মুক্ত রহিল—কৃষি। আর সেই কৃষিও রাজা ও জমিদারের অবহেলায় ক্রমশই চরম দুর্দশায় পৌঁছিতে লাগিল।

এইরূপে জমির নূতন ব্যবস্থায় ও শিল্প-বিপ্লবে—এক কথায়, সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবে কৃষি-সমাজ বিনষ্ট হইতে লাগিল—অথচ বণিক-সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিল না।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ

গড়িয়া উঠিল যাহা তাহারই নাম "বাংলার ভদ্রলোক"—তাঁহাদের জন্ম ও ইতিহাসই "বাংলার কালচারে"র জন্ম ও ইতিহাস। পূর্বে তাঁহাদের শিকড় ছিল নবাবী আমলের দপ্তরখানায়, জায়গিরদার ও রাজাদের সভায় এবং আসরে। এইবার তাঁহাদের নূতন শিকড় আঁকড়াইয়া ধরিল নূতন মুনিবের নূতন সৌভাগ্যকে; কুঠিতে, কাছারিতে, আফিসে, আদালতে এবং জমিদারীতে বা জমিদারের অধীনে নানা মধ্যস্বত্বে উহার আশা ও আশ্রয় মিলিল। চোখের উপর যখন কোম্পানির রাজত্ব জাঁকিয়া বসিল, তখন পূর্বেকার আমলা-কর্মচারীরা ফারসী ছাড়িয়া নূতন ভাষা ও কায়দা-দস্তুর শিখিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। কোম্পানিরও প্রয়োজন ছিল এই কর্মচারীদের। এত বড় দেশ বিলাতী কেরানীতে চলিবে না; তাই মেকলে না বলিলেও সৃষ্টি করিতে হইত নূতন বাঙালী কেরানী; অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার দুয়ার এই মধ্যবিত্ত ভাগ্যান্বেষীদের জন্য উন্মুক্ত হইল; আর যেভাবে ইংরেজের প্রথম প্রসাদ-প্রার্থীরা "বাবু"রূপে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই দেশের ভাগ্যান্বেষীরা বুঝিতে পারিলেন— উন্নতির পথ ইংরেজের কুঠি ও কাছারির আনাচে-কানাচে; উন্নতির উপায় যে করিয়াই হউক ইংরেজের প্রসাদলাভ, আর উহার একটা সহায় ইংরেজি বাৎ, ইংরেজি কায়দা।

অবকাশের বিলাস

একদিকে বাবুর যুগ ও অন্যদিকে অবকাশরঞ্জনের প্রয়াস, সেই "বাংলার কালচারে"র প্রাথমিক নমুনা—বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির (Comprador) যুগটা তাহার অবতরণিকা স্বরূপ। সে-পর্বের ইতিহাস বিশদ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। 'ময়না', 'বুলবুল', 'আখড়াই গান', আর সর্বশেষে 'কানন ভোজন' ইহাই বাবুদের বিলাস আর তাঁহাদের উপজীব্য ব্যবসায় কিংবা চাকুরি কিংবা শহরের জীবিকার নানা রকমের সুড়ঙ্গ পথ; —বাংলার 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' আজ তাহা সকলের গোচর করিয়া দিয়াছে; 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাহার চিত্র তুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য সেই "বাবুর যুগ" চিরস্থায়ী হইয়া আছে 'নববাবুবিলাসে' (১৮২১-২৩), 'কলিকাতা কমলালয়ে', (১৮২৩) আর বাংলা সাহিত্যের চিরগৌরব 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' (১৮৬১-৬৪; ইহার চিত্রিত কাল একটু পূর্বেকার হইতে পারে—১৮৪০-৬০)। রামমোহনী-পর্ব ও 'ইয়ং বেঙ্গল' পর্ব জুড়িয়া এই বাবুর দিনই চলিয়াছিল।

তখন কেহ বা কোম্পানির কর্মচারীরূপে নানাভাবে অতুল বৈভবের মালিক হইয়াছেন (যেমন স্বয়ং রামমোহন), কেহ বা কোম্পানির সাহেবদের হৌসে বেনিয়ন হইয়া ধনে মানে বড় হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধায় সকলেই জমিদারী জাঁকাইয়া বসিয়াছেন (যেমন স্বয়ং রামমোহন)—সুখের ও সখের মধ্যে তখন ইঁহাদের অকর্মণ্য বংশধরদের 'বাবু-বিলাস' ছাড়া আর কিই বা করিবার ছিল?

অবশ্য যাঁহারা গুণবান্ তাঁহারা এই অলস দিন রাত্রি অন্যভাবে সার্থক না করিতেন তাহা নয়। তাঁহাদের 'অবকাশ-রঞ্জনী' জীবনযাত্রার হিসাব লইলে দেখিব উঁহাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন বিলাতের হুইগ্‌গণ (Whig)। টাকা,কড়ি, বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, একটু শহরের উপকণ্ঠে নিভৃত নিবাস, আর নানাবিধ অবকাশ-রঞ্জনী অনুশীলন,—পাল্কি, বেয়ারা, চোপদার, হলঘরে বড় তৈলচিত্র, ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের প্রতিলিপি— ইঁহারা যেন ইংরেজ শাসকদের নিকট প্রমাণ করিতে বসিয়াছিলেন, 'আমরা তোমাদের হুইগ্ ভূস্বামীদেরই সগোত্র।' মিথ্যা নয়, বিলাতের 'হুইগ' অভিজাতরাও অনেকেই এমনি বণিক বংশের বংশধর ছিলেন। কিন্তু বিলাতের হুইগ্‌রা ছিলেন সমাজের বিপ্লবী-শক্তি; তাঁহারা সেই সমাজে শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন। ধনিক-সভ্যতায় তাঁহারাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেন; সমাজে তাঁহাদের দায়িত্বও ছিল, অধিকারও ছিল। আমাদের অবকাশকুশল অভিজাতের পক্ষে ইঁহাদের কোনোটাই খাটিত না—ব্যবসায় ছাড়িয়া এক আধা-সামন্তযুগে তাঁহারা ঠেকিয়া গিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের আওতায় তাঁহাদের হুইগ্‌দের অনুরূপ দায়িত্বও ছিল না, অধিকারও ছিল না। এ শুধুই 'নকলের নাকাল।'

অথচ অবরুদ্ধ জীবন-চেতনা অবকাশ ক্ষেপণের আর কোনো পথই পাইল না—হয় 'বাবু-বিলাস' নয় 'অবকাশ-বিলাস'। এই অবরোধের পীড়ায়ও কিন্তু ইঁহারা স্বদেশ-প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হন নাই। কারণ ইঁহাদের নিকট বৃটিশ শাসনই সৌভাগ্যের মূল,—কর্নওয়ালিসের আশা তাই সফল হইতেছিল! রাজা রাধাকান্ত মোটের উপর রক্ষণশীল (Tory); তিনিও 'বৃটিশ রাজের বিশ্বস্ত প্রজা' বলিয়া গর্ব করিতে ব্যস্ত। সিপাহী বিদ্রোহের দিনে ভারতের পুরাতন অভিজাতশ্রেণী শেষবারের মতো আপনাদের অধিকারের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন: তখন বাংলার এই ইংরেজ-সৃষ্ট নূতন অভিজাত দল গোলাপ মল্লিকের বাড়িতে সভা করিয়া বলিতেছিলেন—অবশ্য 'হুতোমে'র ভাষায়—আমরা 'ম্যাড়া বাঙালী' আমেরিকান হইতে চাই না।

পাশ্চাত্ত্য মানস-সম্পদ

জীবনে যাহা তাঁহারা হারাইয়াছেন—যে সামঞ্জস্যহীন জীবনের মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া গিয়াছেন—সাম্রাজ্যবাদের সেই দেহ-প্রাণ-বিনাশী পীড়া এই অবকাশ-বিলাসীদের বুঝাও সম্ভব হয় নাই, আর তাহা তাঁহারা বুঝিলেনও না। বুঝিলেন তাঁহারাই যাঁহাদের মেকলে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, যাঁহাদের কোম্পানি নিজের কেরানীশালার তাগিদেই তৈয়ারী করিতেছিল। ইঁহারাই 'ভদ্রলোক' ও 'শিক্ষিত সমাজ'; ইঁহারাই শহরের এই বদ্ধজলের 'বিলাস'কে একবারের মতো বিকাশের ক্ষেত্রে উন্নীত করেন। আর ইঁহাদের সে-প্রেরণা আসে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া—যে-শিক্ষা এই দেশের সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কিত নহে, যাহা ইউরোপীয় জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভূত।

যাহাকে আমরা 'পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা' বলি তাহা আসলে বণিকতন্ত্রের দ্বারা পরিশোধিত শিক্ষা—পশ্চিমের 'বুর্জোয়া' সভ্যতার প্রণয়ন। আমাদের দেশ বাস্তবত অর্ধসামন্ত যুগ কায়েম হইয়া আছে, বুর্জোয়া যুগ বিকাশের সুযোগ পাইতেছে না; —তথাপি পশ্চিমের সংস্পর্শে আসাতে এই সময়ে আমাদের লাভ হইল এই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা। ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহ নাই; আর ইহার প্রবর্তনের জন্য প্রধান কৃতিত্ব মেকলে ও রামমোহনের। ইহার একমাত্র বাস্তব তাড়না ছিল—সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কেরানী প্রয়োজন; আর আমাদের পক্ষে প্রয়োজন—জীবনে জীবিকা, বিষয়, বিত্ত, মান।

সম্পন্ন ঘরের ব্যক্তিমাত্রই ততদিনে বুঝিয়াছে—জীবনে উন্নতি করিতে হইলে ইংরেজি শিখিতে হইবে। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিভীষিকা মোটেই তাহাদের সেই বৈষয়িক উন্নতির আশাকে দাবাইয়া দিল না। তাই, যে ধনিকতন্ত্রের দিকে আমাদের 'প্রবেশ নিষেধ' হইল, শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা সেই ধনিকতন্ত্রেরই মানসিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলাম। আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত ইহার কোনো নিকট সম্বন্ধ ছিল না। তথাপি এই শিক্ষায়, এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির রসাস্বাদনে আমরা মাতিয়া উঠিলাম—শুধু মাতিয়া উঠিলাম না, যেন একেবারে জীবনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম; আমাদের মন যেন ইউরোপীয় বুর্জোয়া-মনের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হইয়া গেল। আমরা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হইলাম—তাহাই 'বাংলার কালচার'।

এই বাংলার কালচারের পর্ব নানাদিক দিয়া আবার মনে করিবার দরকার নাই। পূর্বাপর ইহার অসামঞ্জস্যটা এখন সহজেই বুঝিতে পারি। যাহা শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়া আহরণ করিয়াছি, জীবনক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না—যে-সংস্কৃতির প্রেরণা শুধুই মানস-গত (Subjective), বস্তুগত (Objective) নয়—তাহার স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। একটা আত্মবিরোধ তাহাতে রহিয়া গিয়াছে। প্রেরণা হিশাবে ইহা সত্যই আন্তরিক (sincere), কিন্তু ইহার গোড়ায় মাটি নাই। সেই গোড়ায় একটা প্রাক্-ধনিক দিনের বালুর চড়া পড়িয়াছিল—তাহা হইতেও আমরা রসসংগ্রহ করিতে চাহিলাম, কিন্তু রসের আসল উৎস ছিল শুধু মনে। প্রাণবান্ মনীষা যেন তাই এই জীবনযাত্রায় আর কিছুতেই স্বস্তি পায় না—বিবেকানন্দ তাহারই আঘাতে দরিদ্রনারায়ণের ব্রত গ্রহণ করিলেন। "বাস্তব অবস্থার প্রতি বিপুল অসন্তোষে, জীবনে গভীর অতৃপ্তিতে, ধর্মের সূচনা হয়।"[১৪] তাই সেদিন ধর্মের পথই ছিল প্রাণবান্ পুরুষের পথ—কেশবচন্দ্র উঁহারই মধ্য হইতেই একদিকে সমাজ-সংস্কারের যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, আর দিকে সামন্ততন্ত্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন; —সমসাময়িক বাঙালী কালচারের শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপি ইহাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই বিলাতী পিউরিটান সংস্কৃতিকে সেই ধর্মের পথ দিয়াই বাহিত করিয়া দিল। আর পরবর্তী হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিয়া ভিক্টোরিয়া যুগের যুক্তিবাদ ও স্বাজাত্যবোধ এবং বিবেকানন্দের প্রেরণা প্রভৃতিকে সম্বল করিয়া এই ব্রাহ্ম-সমাজের আসল দাবীই আপনার করিয়া ফেলিল।

সামাজিক স্থান

একবার বাংলার কালচারের নানাদিককার রথীমহারথীদের নামগুলি স্মরণ করিলেই এবার বুঝিতে পারিব—ইহা তাহাদেরই কালচার যাহারা ইংরেজি বুর্জোয়া শিক্ষার রসাস্বাদন করিল; আর তাহাদের আসনও আমাদের বাংলার অর্ধসামন্ত বিত্তবানদের সঙ্গেই; আর এই মানসিক ঐশ্বর্যের জন্যই এই অর্ধসামন্ততান্ত্রিক সমাজে তাহাদের স্থান হইল সেই সম্মানিত পংক্তিতে। মধুসূদন পাইকপাড়া ও জোড়াসাঁকোর জমিদারদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন; হেমচন্দ্রেরও সে মর্যাদালাভ ঘটিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য; আর রবীন্দ্রনাথের কথা উঠেই না। জীবনে ইঁহারা কেহ ডেপুটি, কেহ উকিল, কেহ বা ব্যারিস্টার, দুই একজন জমিদার শ্রেণীর;—মোটের উপর মধ্যবিত্তের উপজীবিকাই ইঁহাদের প্রধান সম্বল (Salariat Bourgeoisie)। তথাপি এই বুর্জোয়া-প্রেরণাকে বাঙালী মধ্যবিত্ত আপনার করিয়া লইলেন আপনাদের মানসিক (Subjective) চেষ্টায়। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলার সাহিত্য পরিষদ, বাংলার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, কলেজ, হাসপাতাল, সব-কিছুই এই উপজীবিকালম্বী বাঙালী উকিল-ব্যারিস্টার ও দুই একজন অর্ধসামন্ত জমিদারের সৃষ্টি। বাংলার শিল্পপতিরা সাহেব, তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন বিলাতের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান। তাই বাঙালীর এই কালচার, এমনকি বিজ্ঞানগবেষণা পর্যন্ত মানসিক-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু তখন পর্যন্ত বাঙালী শিক্ষিত সমাজের বাস্তব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় নাই। একদিকে এই পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের মানসিক সম্পদ এবং তৃতীয়ত আপন পারিবারিক ধারারও তদনুরূপ দান—এই সকলের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রনাথে। তাই তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, শ্রেষ্ঠ মানবধর্মী কবি, —ব্যক্তি-সত্তার শ্রেষ্ঠ মহিমা তাঁহারই কণ্ঠে উদ্গীত হইল। কিন্তু তবু তাঁহারই জীবনকালে স্পষ্ট হইয়া উঠে—কত সামান্য বনিয়াদের উপর বাঙালীর এই কালচার গঠিত। উহার গোড়াকার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার' মৃত্তিকাহীন শুষ্কতা ক্রমশ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় এত বাড়িল যে কেরানী-শালায় স্থান হইল না; তখন আর তাহাদের মনে মধুসূদন-বঙ্কিম যুগের সেই প্রবল আত্মবিশ্বাসের স্থান কোথায়? সবল মানসিকতা আর টিঁকে না—তাহার পল্লী-সভ্যতা একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহার স্থান সে নিজেই ত্যাগ করিয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার আসন ধ্বসিয়া যাইতেছে, এদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিজের প্রবেশ পথও তাহার অগোচর!—যে-কালচারের গোড়ায় উপকরণগত স্থিরতা নাই, যাহার পরিবেশে সমাজগত পুষ্টি নাই, —শুধুমাত্র একটা মানসিক (Subjective) আবেগকে সম্বল করিয়া মাত্র জনকয় চাকুরের (Salariat) প্রয়াসে যাহা রূপ পাইয়াছিল সেই 'বাংলার কালচার' উনিশশত-ত্রিশের পরে তাহার শেষ পাদে আসিয়াই কি পৌঁছায় নাই?

কারণ ইতিমধ্যে তাহার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রা' ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই এক বিদেশী-পুষ্ট শিল্পযুগের (Industrialism) পত্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষ শুধু কৃষি-প্রধান নয়, আজ পৃথিবীতে সে শিল্পেও অগ্রসর; আর সেই শিল্পের সর্বপ্রধান উদ্যোগ কেন্দ্র বোম্বাই নয়, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ। এইখানেই বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদের ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি ধনিক পুঁজি (Finance Capital) শতবাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে; এণ্ড্রুইয়ুল, শাওয়ালেস্, বেগ্-ডানলপ, অক্টোবিয়াস্ স্টিল প্রভৃতি ট্রাস্ট, কার্টেল পৃথিবীময় তাহার সম্পর্ক পাতিয়াছে। তাহার প্রসারে বাংলার মধ্যবিত্ত বা বিত্তবানদের কোনো প্রসারের পথই হইল না। এদিকে ভূমি-সমস্যার ও ঋণভার সমস্যার জটিল আবর্তে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে—তাহারই এক প্রকাশ এই বাংলার কালচারের বিরুদ্ধে মুসলমান বাংলার বিদ্রোহে—আর এক প্রকাশ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তায়। ফলে বাংলার জমিদারী যাইতে বসিয়াছে, মধ্যবিত্তের অদৃষ্টে বেকারত্ব ছাড়া কিছু নাই; শতকরা পঞ্চাশজন কৃষকের আজ জমি নাই—বাংলার কালচারের ভবিষ্যৎ কোথায়? পৃথিবীব্যাপী ধনিকতন্ত্রের সংকটের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের এই হিংস্র অন্ধকারে ঔপনিবেশিক (colonial) জীবনযাত্রার তৈলহীন স্তিমিত শিখা নিবিয়া আসিতেছে—ঔপনিবেশিক কালচারের আয়ু আর কোথায়?

আধুনিক ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক জীবনে তবু বাংলার কালচারই এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ দান।

শেষবারের মতো তাহা হইলে কথাটা বুঝিবার মতো: ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা কোথায় আসিয়া ঠেকিতেছে—মনে রাখিতে হইবে; তাহার পরিবেশ আজ এইরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে ভৌগোলিক ব্যবধান ভাঙিয়া ফেলিতেছে, মানুষ প্রকৃতির উপর জয়ী হইতেছে—অথচ আত্মসংঘাত ঘুচাইতে পারিতেছে না—বিশ্ব-সংকটের মধ্য দিয়া এক বিশ্ব-সংস্কৃতির দিকে যাত্রা করিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে শেষবারের মতো ইহাও স্মরণীয়: এই হাজার বছরে যে, বাঙালী বাঙালী হইয়াছে, বাংলা ভাষার মারফত একটা স্বতন্ত্র জাতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছে—ঠিক জাতি বা Nation হইতে সে পারে নাই। কারণ বরাবরই বাংলা সুবা মাত্র, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নয়। এমনকি যে-সময়ে রাষ্ট্রবোধ জন্মিতে শুরু করিল তখন তাহার উপর সাম্রাজ্যবাদ চাপিয়া বসিয়াছে— তাহার National State গড়িবার সুযোগ নাই— ভারতীয় মহাজাতির (Multi-Nation State) সঙ্গে যোগ হারাইবার কারণ তখনো ঘটিল না। তাই পূর্বাপর ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতি বাঙালী ছাড়িতে পারে নাই— ছাড়াইয়া উঠিতেও চাহে নাই। ভারতবর্ষের প্রায় এক সীমান্তে বাংলা। সেই হিশাবে হয়তো জাতিতেও আচার-বিচারে কতকটা শিথিলতা এখানে বরাবরই রহিয়া গিয়াছে, খুব কঠিন শৃঙ্খল পাশে বাংলা আবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, বাঙালীর রক্তধারা কিংবা তাহার জীবনযাত্রা কিংবা তাহার ভাবনা-কল্পনা ভারতীয় রক্ত, জীবনযাত্রা কিংবা ধ্যান-ধারণার মতো নয়— বাঙালীয়ত্ব ভারতীয়ত্বের

তুলনায় ভিন্ন জিনিস। ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির একটি অংশ বাঙালীর জীবন— একটু বিশেষ মাত্র, যেমন বিশেষ—ভারতের মরাঠা বা তামিল বা পঞ্জাবীর জীবন ও সংস্কৃতি। "আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি— বাঙালী ভারতীয়ই বটে। বাঙালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়তো চার আনা ইউরোপীয়, —তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে, —এবং আট আনা ভারতীয়, বাকী চার আনায় সে বাঙালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার কতকটা ভারতীয়ত্বের বাংলা বিকার—বাকীটুকু খাঁটি বাঙালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙালী"।[১৮]

টীকা ও উল্লেখপঞ্জি

১। *বাঙলার বাস্তব সভ্যতা— বাঙালায় খড়ের চালের কুটীর, পূর্ববঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ; ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটী, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল); ইটের মন্দির; পোড়ামাটির ভাস্কর্য— ইটের উপরে নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)— ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।*

চিত্রবিদ্যা— পুথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), এবং অন্যপ্রকারের খাঁটি বাঙালী চিত্র পদ্ধতি, যথা— পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, শরায় ছবি আঁকা— ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত; মাটির ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চালচিত্র আঁকা, মাটির সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র— ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে; রঙীন মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প— জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

দাঁইহাটা কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্তিশিল্প ও অন্য ভাস্কর্য; মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতীর দাঁতের কাজ— মূর্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙ্গালার হাতীর দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পর্যন্ত পঁহুছিয়াছে); বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ— শাঁখে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙ্গালায় সোনার কাজ— খেলনা, ঠাকুরের সাজ, ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন ঢাকার রূপার তারের কাজ (filgree work); কলিকাতার রূপার নক্সীতোলা কাজ (repousse work); কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলঙ্কারশিল্প, এতে বিলাতীধরণের মীনার কাজ—এগুলির প্রভাব বাঙালার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙলার পিতল-কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ-খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল কাঁসা ও ভরনের বাসন, দাঁইহাটা কাটোয়ার, বনপাসবর্ধমানের এবং ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের নানাস্থানের পিতলের বাসন; কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্তি ঢালাই, শাসপুর কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ।

বাঙলার খাদ্যদ্রব্য— বাঙলা দেশের বিশিষ্ট শাকশুক্তানি ঘন্ট প্রভৃতি, নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তরকারী; বাঙালার বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গের মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি; বাঙালার কাসুন্দী, ছড়াতেঁতুল, আচার, খেজুরে গুড়, পাটালী, মুড়ী, মুড়কী, চালের গুঁড়া নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন; ক্ষীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা, ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারী মিষ্টান্ন বাঙালার নিজস্ব মিষ্টান্ন, নানাপ্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা।

বাঙলার পরিধেয়— মিহি মসলিন, ঢাকার জামদানী (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, চন্দ্রকোনা, ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও সাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ী, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর, বীরভূম, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম; রাজশাহীর মট্কা; বীরভূম তাঁতিপাড়ার কড়িয়ার তসর; বিষ্ণুপুরের রেশম, কেটে, চেলী, নকশাদার ও বুটিদার সাড়ী; অধুনা বিলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বালুচরের সাড়ী; হিমালয় প্রান্তের মোটা পশমী কম্বল; অধুনা প্রচলিত বাঙালার ছাপা রেশমের সাড়ী।

মেদিনীপুরের সূক্ষ্ম মাদুর; কুমিল্লা, নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের শীতলপাটি; বাঙালার নিজস্ব কৃষি-শিল্প— নানা প্রকারের ধান, পান, পাট; বাঙালার মাছের চাষ।

বাঙলার নৌ শিল্প— বিভিন্ন প্রকারের নৌকা (এই নৌ শিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত); বীরভূমের খুহিতাল, এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

(২) *বাঙলার অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি— বাঙালার সামাজিক বিধি ও ধর্মসাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙালার হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার রীতি— দায়ভাগ; বাঙালার সামাজিকতা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি এবং জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও মিত্রসম্মেলনের বিশেষ রীতি; বাঙালার পূজা— দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা; দোল, রাস, সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ এবং বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবনে দুর্গাপূজা; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকা ব্রত; পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব—আটকৌড়ে অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, পৌষপার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নূতন খাতা প্রভৃতি।*

মেয়েদের আলিপনা আঁকা, কাঁথা সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙালার লাঠিখেলা ও অন্য ক্রীড়া-কসরৎ; রায়বেঁশে নাচ; পূজার সময়ে ঢাকী-ঢুলীদের নাচ; পূর্ববঙ্গের আরতি নৃত্য; মেয়েদের ব্রতনৃত্য; অন্য নানা প্রকারের নৃত্য।

বাঙালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ্‌মাদারের অনুষ্ঠান; ও নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ।

(৩) *বাঙালার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি— টোল চতুষ্পাঠী; বাঙালার সংস্কৃত বিদ্যা— জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙালার সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীর্তি; বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরম্পরা; নৈয়ায়িক ও স্মার্তগণ; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ; মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ; বাঙালার আধ্যাত্মিক পদ; বৌদ্ধ চর্যাপদ; বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব; কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত; ব্রজবুলী ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলী সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ, শাক্তপদ— রামপ্রসাদ; রামায়ণ, মহাভারতের বাঙালা রূপ; দেশে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান— বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা, লাউসেন কথা (অধুনা কম প্রচলিত); পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজা; বাঙালার কথকতা; কীর্তন গান— কীর্তনের অভিব্যক্তি, —গড়েরহাটি বা গরানহাটি, মনোহরশাহী, রানীহাটি প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও ভাটিয়াল গান; বাঙালার শ্লোক-পড়ার সুর; কবি, ঝুমুর, তরজা ও অন্য গ্রাম্য-গীতি; পাঁচালী, বাঙালার যাত্রা, জারিগান; মুসলমান মারফতী গান, মর্সিয়া গান; বাঙালার হিন্দু ও মুসলমান পুথিপড়ার সুর, বাঙালার পয়ার; পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দীগানের বাঙালায় প্রচার— বাঙালার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, ঢপ, খেমটা।*

বাঙালার সাহিত্য— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য ও বৈষ্ণবভক্তগণের চরিত্র বিষয়ক পুস্তক, পদাবলী সাহিত্য, প্রাচীন বাঙালার কাব্যাবলী (মঙ্গল কাব্য) ইত্যাদি; ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ; বাঙালা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু— গীতি-কবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া, ইংরাজদের আগমন পর্যন্ত বাঙালার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।" ("জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য"— শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— পৃঃ ৩৯-৪৩);

২। *লেখকের 'শহরের রূপ ও স্বরূপ', আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসর, পৌষ, ১৩৪৮ দ্রষ্টব্য।*

৩। *লেখকের History of Madras, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 2. Nov. 9, 1940 দ্রষ্টব্য।*

৪। লেখকের *Bombay: Where it beats Calcutta, Calcutta Municipal Gazette*, Nov. 30, 1940 দ্রষ্টব্য।

৫। লেখকের *This Calcutta Culture, Calcutta Municipal Gazette*, Nov. 26, 1938 দ্রষ্টব্য।

৬। *Letter, Marx and Engels.*

৭। সুধী প্রধান রচিত "কৃষিভারতের নবরূপ" এই ব্যবস্থা বিষয়ে সদ্য প্রকাশিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

৮। ভারতবর্ষের যেখানে তালুকদারী ও রায়তোয়ারী প্রথা প্রবর্তিত হয় সেখানেও 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনে কৃষক নিঃস্ব হইল; সেকানেও মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইল; সেখানেও ক্রমশ গৃহশিল্পের বিনাশে শিল্পীরা আসিয়া কৃষকের সংখ্যা বাড়াইল; কিন্তু রায়তোয়ারী প্রদেশে 'জমি' একেবারে মুনাফার বস্তু হইল না; ব্যবসায়ীরাও জমিদার হইতে চাহিল না।

৯। *Public Works in India, Sir Aurthur Cotton, 1854.*

১০। Bengal Irrigations Committee Report, 1930.

১১। *Lord William Bentinck— Speech on Nov. 8, 1829; quoted from Speeches and Documents on Indian Policy*, Vol. I, p. 215, Ed. A. B. Keith.

১২। *Long's Selection from the Records of the Government. Nos. 354-358.*

১৩। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। "Religion begins with a tremendous disatisfaction with the present state of things, with our lives...." —Vivekananda,

১৫। 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭।

শিল্পী : সোমনাথ হোর

মেঘনাদ সাহা

একটি নূতন জীবন-দর্শন

[১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা 'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে' শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে 'কবির অনুরোধে তথায় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সম্মেলনে' তিনি ১৩ নভেম্বর একটি বক্তৃতা দেন। স্বয়ং কবি এই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞানী সাহার এই ভাষণটি ভারতবর্ষ, ২৬ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। —সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ]

কবি আপনাদিগকে তাঁহার নিজস্ব অতুলনীয় ভাষায় বহুবার তাঁহার আত্মজীবনের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আদর্শ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? এই পৃথিবীতে বহু সভ্যতা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে, বহু এ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। আপনারা যদি কোনও সভ্যতার মূল উৎস অনুসন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে প্রত্যেক সভ্যতার কার্যপ্রণালী উচ্চ জীবনের আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আদর্শই সভ্যতার গতি নির্ণয় করে এবং প্রথম হইতেই আদর্শের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। অনেক পুরাকালোৎপন্ন ধর্ম ও দর্শনের মূলসূত্র এই যে, বিশ্বজগৎ কোন সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্ট; কিন্তু 'সৃষ্টিকর্তা' সমস্ত ধর্মে একবিধ নন। প্রাচীন ইহুদীজাতীয় ধর্মশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্তা আইন ও শৃঙ্খলার দণ্ডধার। তাঁহার আদেশ যে সকলেই বাইবেল-কথিত দশটি নিয়ম প্রতিপালন করিবে এবং যাহারা তাহার অন্যথা করিবে তাহাদিগকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। আরও অনেক ধর্ম মূলতঃ ইহুদীধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল ধর্মে 'সৃষ্টিকর্তা'র রূপ ইহুদীদের সৃষ্টিকর্তা হইতে খুব বেশি তফাৎ নয়।

—'ধর্মে অসহিষ্ণুতা'—

যাঁহারা এইরূপ দর্শনের অনুসরণ করেন তাঁহাদিগকে কোনও গ্রন্থবদ্ধ নিয়ম পালন করিতে হয়। এই গ্রন্থবদ্ধ নিয়ম ভগবানের বাণী বা প্রত্যাদেশ বলিয়া গৃহীত হয়। এই সকল নিয়ম যাঁহারা রক্ষা করেন ও ব্যাখ্যা করেন তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য হন, ভিন্ন মত ইঁহারা সহিতে পারেন না।

যদি প্রাচ্যতম দেশের দিকে তাকাই তবে দেখিতে পাই—প্রাচীন চীনজাতি মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে কারিগররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি হাতুড়ি পিটাইয়া ও কুঠার দ্বারা পাহাড় কাটিয়া সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য চীনদেশে খুব বড় বড় কারিগর ও স্থপতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং চৈনিক সভ্যতায় শিল্পীর স্থান অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক উচ্চে। চীন-সমাজে সম্মানের পর্যায়—রাজকর্মচারী (Mandarins), কৃষক ও শিল্পী, বণিক ও যুদ্ধজীবী। হিন্দুর সৃষ্টিকর্তা একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগৎ, স্থাবর ও জঙ্গম, জীব এবং ধর্মশাস্ত্রাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য যাহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি করে, হিন্দু সমাজে তাহাদিগকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী, কারিগর ও স্থপতির স্থান এই সমাজের অতি নিম্নস্তরে এবং হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোন যোগাযোগ নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্পে ও দ্রব্যোৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।

প্রত্যেক সভ্যতার আদর্শেই ভুল ত্রুটি আছে এবং বর্তমানে সমস্ত প্রাচীন ধর্মাত্মক আদর্শই অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; কারণ এই সকল ধর্ম তথা আদর্শ বিশ্বজগতের যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামূলক। প্রাচীনেরা মনে করিতেন, পৃথিবীই বিশ্বজগতের কেন্দ্র, তারকাগুলি ধার্মিকলোকের আত্মা এবং সূর্য ও অপরাপর গ্রহ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মেই কল্পিত হইয়াছে যে, পূর্বে এক সত্যযুগ ছিল, তখন মানুষ পরস্পর সম্প্রীতি-সূত্রে বাস করিত এবং তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভুগিতে হইত না। এখন আমরা জানি যে, এইরূপ সত্যযুগের ছবি ভ্রমাত্মক। পৃথিবী বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিস নয়, ইহা বিরাট সূর্যের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। প্রাচীনকালে ইহা সূর্যদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে শীতলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমে পৃথিবীতে মানুষ দূরে থাকুক, কোনওরূপ জীবের অস্তিত্ব ছিল না। পরে সর্বপ্রথম অতি নিম্নস্তরের জীব উদ্ভূত হয় এবং ক্রমবিকাশের ফলে অতি আধুনিক কালে বর্তমান মানবের উদ্ভব হয়। সুতরাং ঈশ্বর ধ্যানে বসিয়া এক নিশ্বাসে সমস্ত জগৎ, মানুষ ও জানোয়ারের সৃষ্টি করেন নাই।

সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা ও পরম্পরাগত জ্ঞানরাশির উপর বর্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এই দীর্ঘ সময়ে যাবতীয় শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে অনেক নব নব প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই সকল আবিষ্কারের ফলে সমাজে বহুবার বিলম্ব সংঘটিত হইয়াছে এবং নূতন ভাবে সমাজগঠন করা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে—বহু সহস্রবর্ষব্যাপী অতীতের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার উপর বর্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ আপনার হস্ত ও মস্তিষ্ক সমানভাবে খাটাইয়া আপনাকে প্রস্তুত করে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পৃথিবী হইতে আমাদিগকে শক্তি, খনিজদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্য সম্যক্ উৎপাদন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এই যে 'জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম' ইহা শেষ হয় নাই, মাত্র সুরু হইয়াছে।

কিন্তু এই জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে আমাদিগকে শহর হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুটীর ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই সমস্ত যুক্তির অসারতা বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিকের স্বভাব সর্বদা সংখ্যার সাহায্যে চিন্তা করা। আমাদের দেশে একজন সাধারণ লোক যে পরিমাণে কার্য করে, তাহার সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকের কৃত কার্যের তুলনা করা যাউক। অনায়াসে প্রমাণ করা যায় (এবং অন্যত্র আমি প্রমাণ করিয়াছি) যে আমরা ভারতবর্ষে জন পিছু পাশ্চাত্যের কুড়িভাগের একভাগ মাত্র কার্য করি। তাহার কারণ, পাশ্চাত্য দেশে যত প্রাকৃতিক শক্তি আছে—যেমন জলধারার শক্তি, কয়লা পোড়াইয়া তজ্জাত শক্তি—তাহার অধিকাংশই কার্যে লাগান হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটা ঘোড়া মানুষের দশগুণ

কার্য করিতে সমর্থ এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্রযোগে যে শক্তি উৎপাদন করা হয়, তাহা বৎসরে মাথা পিছু একটা ঘোড়ার ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ৩৬৫ দিনের কার্যের সমান। আমাদের দেশে শক্তির অভাব নাই, কিন্তু মাত্র শতকরা দুই ভাগ কার্যে লাগান হইয়াছে। অধিকাংশ কার্যই হস্তে সম্পন্ন হয়, অতএব মোটের উপর এ দেশে লোকে মাথা পিছু ২০ গুণ কার্য কম করে। তজ্জন্য আমরা য়ুরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশের তুলনায় ২০ গুণ বেশী গরীব। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির উপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

গ্রাম্যজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমি কোনও অলীক আশা পোষণ করি না। আমি মনে করি না যে গ্রামগুলি বসতির দিক হইতে আদর্শস্থানীয়। যদি শহরবাসী লোক জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে তাহারা কেবল গ্রামের যাবতীয় সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিবে। গ্রামে ফিরিয়া গেলেই জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রামবাসীদিগের সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিবে, গ্রামবাসীরা আমাদের ভাল চোখে দেখিবে না। গ্রামবাসীগণ কি চায়? তাহারা চায় ভাল ঘরবাড়ী, পর্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্র এবং জীবনে অপেক্ষাকৃত প্রচুর অবকাশ ও প্রাচুর্য। যদি দেশে প্রচুর কার্যের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। প্রচুর পরিমাণ কার্যের সৃষ্টি করিলে দেশের যে কেবল দুঃখ ও দারিদ্র্যের সমাধান হয় তাহা নহে, আমাদিগকে আত্মরক্ষার খাতিরেও কার্যসৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতেই বৈদেশিক আক্রমণের মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি কোনও দিন এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যদি আমরা পুনর্বার বিদেশীয়গণের পদানত হইবার ইচ্ছা না করি—তবে আমাদিগকে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে হইবে। ভারতের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, তাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষিপ্রধান হইয়া থাকা উচিত। এই মত অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করি। যদি আমরা সকলেই গ্রাম্যজীবনে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীদের পক্ষে শোষণ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে যাবতীয় "চাবি-শিল্প"—যেমন শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি তৈয়ার, যাতায়াত ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় শিল্প ইত্যাদি—সমস্তই রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এবং কখনও কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের খাতিরে এই সমস্ত শিল্পকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বহির্ভূত হইতে দেওয়া হয়না। এ দেশেও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যেমন ১৯২৩ খৃঃ অব্দে চীনের উদ্ধারকর্তা Dr. Sanyat Sen চীনের জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এইরূপে দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে হইবে, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে মূলধন তুলিয়া দেশে নানাবিধ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমাদের দেশ য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।

—"রুশিয়ার অনুকরণ নয়"—

এই প্রকার দেশব্যাপী শিল্পপরিকল্পনা রুশিয়ার পরিকল্পনা নহে। যদি কোন আদর্শকে ফলবান করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে কেবল বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। রুশিয়ার বর্তমান জাতীয় জীবন খানিকটা অপূর্ণ, কারণ এখানে আদর্শে ও কার্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। যদি আমরা আমাদের সভ্যতার উৎসকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের জীবনাদর্শকে সামাজিক মৈত্রী সার্বজনীন প্রীতি ও নৈতিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের শিল্পকলা

আগে গাছ বাড়লে তবে তো তার ফল-ফুল, তেমনি আগে জাত বাড়লে তবে তার শিল্পকলা ইত্যাদি কথা তর্কের মুখে বক্তৃতার জোরে প্রায়ই শুনি এবং হয়তো বলেও থাকবো; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো যে, ফলন্ত ফুলন্ত বীজ বলে একটা পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থটিই তাল তমাল বট অশ্বত্থ হয়ে বাড়ে। মালি না থাকলেও ফলন্ত বীজ গাছ হয়ে বাড়তে থাকে আপনার রস আপনি খুঁজে নিয়ে, কিন্তু অফলন্ত বীজ যদি হয় তবে সার-মাটিতেও নিষ্ফলা রয়ে যায় সেটি।

শিশু দাঁত নিয়েই জন্মায়, শুধু দাঁত ফোটে ছেলে একটু বড় হলে; জাতির মধ্যে তেমনি জাতিটার যে সব বিকাশ ভবিষ্যতে হবে তা ধরা থাকে, কালে সেগুলো ফুটতে থাকে ভাল-মন্দ আব-হাওয়ার বশে। কোন ছেলের কথা ফোটে আগে, কোন ছেলে কথা বলে দেরিতে, কিন্তু যে ছেলে বোবা তার কথা বড় হয়েও ফোটে না, বুড়ো হয়েও ফোটে না—যতই কেন ভাল আবহাওয়ায় সে থাকুক না।

বয়সে দাঁত পড়লো চুল পাকলো, দাঁতও বাঁধালেম চুলও কালো করলেম; দুটোই প্রাণহীন জিনিষের মতো, শিকড় গাড়লো না জীবন্ত মানুষের রক্ত চালানোর ক্ষেত্রে। এইভাবে জাতীয় শিল্প সঙ্গীত কবিতার রঙ ধরানো যায় একটা বুড়ো জাতির গায়ে, কিন্তু সেই কৃত্রিম রঙ তো টেকেনা বেশীদিন এবং সেটা দিয়ে জাতির জরা এবং মরার রাস্তাও বন্ধ করা চলেনা একদিনও।

যেখানে জাতীয় জীবন বলে একটা কিছু নেই সেখানকার মানুষগুলির সঙ্গে কতকগুলো শিক্ষাগার পাঠাগার কর্মশালা ধর্মশালা আখড়া আড্ডা আশ্রম ভবন ইত্যাদি যেন তেন প্রকারেণ জুড়ে দিলেই যে ঠিক ফলটি পাওয়া যাবে এমন কোন কথা নেই। মরা আমগাছে নাইট্রোজেন বৃষ্টি করে আঁকশী হাতে বসে ফল পায় কি কেউ?

জাত দু'তিন রকমের আছে; যেমন, স্ক্রুপ্ জাত অর্থাৎ জাতে বড় গাছ কিন্তু এক বিঘতের বেশী তার বাড় নেই, ডালপালাগুলো চীনের পায়ের মতো বিষম বাঁকাচোরা, দেখতে গাছের মতো ঝাঁকড়া কিন্তু ফল দেয়না, টবে ধরা থাকে। আর এক রকমের জাত স্কোপ্ জাত, মৃত জাত, শুকনো গাছ, অনেক কালের মরা কাঠ, দেশবিদেশে পাখী কাঠবেরাল বনবেরাল কাগাবগার খোপ আর দাঁড়ের কাজ করছে। স্ক্রুপ্ জাতের সুবিধে আছে যে কোন গতিকে টব থেকে ছাড়া পেলে সে তেজে বেড়ে উঠতে পারে, স্কোপ্ জাতের সে সুবিধে নেই, খোপে খাপে ফোঁপরা কাঠ তাতে টেবিল চৌকিও তৈরি হয় না, জ্বালাতে গেলে ধুঁয়া হয়, শুধু সেটা নিয়ে দেহতত্ত্বের এবং জাতিতত্ত্বের নানা গভীর কথা সমস্ত আলোচনা করা চলে। একদিকে বাড়-হারানো বড় জাত, অন্য এক দিকে বাড়-দাবানো বড় জাত, ভারতবর্ষী জাত বলতে এদুটোর কোন্‌টা বলা শক্ত। আমি দেখি আমাদের আজকের জাতীয় জীবনটা এই দুয়ের খিচুড়ি। ছিল জাত হবিষ্যান্নজীবী, হল ক্রমে খেচরান্নজীবী। আগের জাত ভাল ছিল এখন হল মন্দ, একথা আমি বলিনে। জাতীয় জীবনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কেউ তাকে ঠেকাতে পারেনা, কালের উপযোগিতার নিয়ম মেনে তবে বাঁচে জাত। আর্যজাতি এককালে ছিল আমমাংসভোজী, তারপর খেতে সুরু করলে আমানি, এবং এখন খাচ্ছে আম আমানি দুই-ই,—একই জাত শুধু কালের পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে ভিন্ন চেহারা ধরছে। এটার জন্যে ভাবনা নেই, শুধু ভাববার বিষয় এই যে, জাতটির জীবনীশক্তির দৌড় বাড়ের দিকে, না, তার উল্টো দিকে। আজ যদি কেউ আমাকে বলে হবিষ্যান্ন ধরলেই তুমি ঠিক তোমার আগেকার তাদের শিল্পকলায় বিশুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই পেয়ে যাবে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত বিশুদ্ধ কবিতা বিশুদ্ধ সাহিত্য এবং বিশুদ্ধ কর্মকাণ্ড সমস্তই এসে যাবে দেশ ও জাতির কবলে, তবে তাকে এই কথাই তো বলবো যে, কালকের মতো হয়ে পড়ার জন্য মাদুলী ধারণ করে নিতে ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? সেকালের রক্ষাকবচ একালের জীবন-সংগ্রামে তো কাজের হবে না, সেকাল রাখলে যে একাল যায়, তার কি? নদীর জাত বাঁচাতে গিয়ে নদীর চলাচল বন্ধ করায় কোন্ লাভ? চীনদেশ ভোজন-বিলাসী, তারা তিন শত বছরের হাঁসের ডিম খেয়ে রসনা তৃপ্ত করে, কিন্তু তা খেয়ে প্রাচিন চীনের শিল্প-সম্পদ্ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করেনা একেবারেই—সখ হয় তাই খায়, সুস্বাদু বলে।

পুরোনো চাল ভাল, পুরোনো শাল ভাল, পুরোনো কাঁথা তাও ভাল, সকল ভাল জিনিষের ভাণ্ডার বলতে পারো আমাদের প্রাচীন আমলকে, তথাপি পুরোনো হয়ে যাওয়া যে ভাল একথা তো কেউ বলছেনা আমরা ছাড়া!

আজকের কালে প্রাচিন শিল্পের আদর যথেষ্ট দেখে আমরা দলে দলে কেউ বৌদ্ধযুগের মতো কেউ মোগল আমলের মতো ছবি মূর্তি গান-বাজনা ইত্যাদি করে বসি; শুধু এই নয়, পুরাণের পাতা থেকেই কেবল ছবি মূর্তি হাব ভাব ইত্যাদিও হুবহু নিয়ে কায করতে লেগে যাই। তা হলেই বা কি হবে? এই ভাবে সাময়িক আদর বা অনাদরের বিচার করে চলায় ব্যবসার-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় কিন্তু এতে করে রসবোধ জাগে না জাতির অন্তরে এবং জাতিটাও এতে করে নিজের শিল্প-সম্পদ পেয়ে ধন্য হয়ে যায় না।

জাতিটাকে যখন চৌরঙ্গী-বাতে ধরলো তখন তার হাতে পায়ে বুকে পিঠে পুরোনো ঘি মালিস করে দেখা গেল বেশ চলে ফিরে বেড়াতে লাগলো সে, তাই বলে পুরোনো ঘিয়ে লুচি ভেজে তাকে তুষ্ট ও পুষ্ট করা তো চল্লোনা, যে কবিরাজ পুরোনো ঘিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই তখন বল্লেন টাটকা গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজতে।

আজকের হাঁস তিন শো বছর আগেকার ডিম পাড়বার সাধনা করবার আয়োজন করে বসলে পরমহংস বলে তাকে ভুল করে না কেউ, তেমনি

আজকের জাত কালকের ভূত নামাতে শব-সাধনার আয়োজন করছে দেখলে তার সিদ্ধিলাভের পক্ষে সন্দেহ অনেকখানি থেকে যায়।

আজকের সঙ্গে কালকের নাড়ির সম্বন্ধ আছে। আজকের শিল্প কালকের শিল্পের উপরে বসে পদ্মাসনা শবাসনা—এটা সত্যি কথা, কিন্তু এই শবাসনার সাধনায় অনাচার ঘটলে ভূত প্রেত এসে সাধকের ঘাড় ভাঙে, সিদ্ধিদাত্রী বরদা আসেন না—এটা জানা কথা।

শবাসনার জন্যে ব্যস্ত নই, শব খুঁজছি কেবল, এতে করে' অতীতের ভূতের কবলে পড়ে কর্ম পণ্ড হওয়া বিচিত্র নয়। সাধাসাধি করে হাতে পায়ে ধরে লোককে দিয়ে কায হয়, সে সিদ্ধি কার সিদ্ধি?—যে সাধছে বা যে মারছে কেবল তারি নয় কি? আমার কথায় ভুলে বা ধমকানি শুনে যদি আজ দেশসুদ্ধ ছবি মূর্তি গড়তে লেগে যায় আমি যেমনটি চাই তেমনি করে, তবে তার ফল দেশ পাবে, না, দেশের যারা আমার কথায় উঠলো বসলো তারা পাবে? আমার খেয়াল মতো আমি লোক লাগিয়ে ঘর বাঁধলাম, সে ঘর আমার ঘর হল, আমি তার আশ্রয় পেলেম, ছায়া পেলেম, মিস্ত্রী মজুর তারা ঢুকতেই পেলে না বৈঠকখানায়। যে গুরু হাত ধরে নিয়ে গেলেন শিষ্যকে শিল্পজগতে তিনিই যথার্থ গুরু; যে গুরু ঘাড় ধরে শিষ্যকে বল্লেন, 'আমার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যেমন বলি তেমনি চল,' সে গুরু গুরুমশাই, তিনি নিজের বেতন বাড়িয়ে গেলেন ছাত্রের দৌলতে।

আগেও ছিল, এখনো আছে, এক এক শ্রেণীর লোক, জাতের কর্তা হয়ে ওঠে তারা, যার জাত নেই তাকে জাত দিতে জানে না, যে জাত ঘুমোচ্ছে তাকে জাগাতে হলে কি করা উচিত তাও জানে না, জাত মারবার ফন্দিই তাদের মাথায় ঘোরে, পাশাঙ্কুশ-হস্তে তারা যমরাজের মতো বসে থাকে জাতকে বাঁধবার পাশ আর জাতকে মারবার অঙ্কুশ দুই অস্ত্র সর্বদা উঁচিয়ে।

আগেও ছিলেন এখনো আছেন অন্য এক এক শ্রেণীর লোক যাঁরা বরাভয়হস্তে বুদ্ধদেবের মতো দ্বারে দ্বারে হেঁটে বেড়ান, সমস্ত মানবজাতির হাতে ভিক্ষা নিয়ে তাঁরা জগৎবাসীকে ধন্য করে' যান, অভয় দিয়ে নির্ভয় করেন, বর দিয়ে শক্তিমান করেন। ঘুমন্ত জাতির মুমূর্ষু জাতির আশার প্রদীপের শিখা এই সব জাগ্রত মানব-আত্মা, যাঁরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো বহন করে আনেন।

কালসূত্রে ধরা রইলো কালকের সকালের সঙ্গে আজকের সকাল, কালকের জাতির সঙ্গে আজকের জাতি, কাব্যকলা সঙ্গীতকলা শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে প্রচীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনটিও তেমনি কালসূত্রে গাঁথা রইলো—বেজোড় মুক্তা! আজকের আমাদের জাতির উপরে সবচেয়ে যে বড় দায়িত্ব তা হচ্ছে এই অতীতকালের মালায় যে বেজোড় মুক্তা দুলছে তার সঙ্গী আর একটি কালসূত্র গেঁথে যাওয়া। আমাদের জীবন কেমন জিনিষটা ধরে গেল আগেকার জীবনের পাশে এই নিয়ে আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের গুণপনা বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তেরই বিচার করবে। অতীতের পাশে আজ আমরা যাই ধরি, কাচই ধরি মাটির ঢেলাই ধরি কালে সেই আজকে ধরা তুচ্ছ জিনিষ তাও মালার একটা অংশ ধরে থাকবেই—চাঁদের কোলে কলঙ্কের মতো। পরবর্তী কেউ এসে অনুকূল সমস্ত প্রবন্ধ লিখে কিংবা মাটির ঢেলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে হয়তো আমাদের আজকের তুচ্ছ কাজ সমস্তের গভীর অর্থ বার করে ভবিষ্যতের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবে; কিন্তু এমনো লোক থাকবে সেদিন যে সজোরে এই ঘোরতর রকমে মালা মাটি করাটাকে অভিসম্পাত দিয়ে আজকের আমাদের জাতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে চলবে ক্রমাগত। এই ভাবে হয়তো, কতকাল ধরে তা কে জানে, মালা ফিরবে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে জাতিতত্ত্ববিদ্ জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয় শিল্প-সমালোচক প্রভৃতির হাতে, মাটির ঢেলার পাশে আর একটি দানা তারা গাঁথবে না, শুধু হাওয়াই গেঁথে যাবে দিনের পর দিন, তারপর হঠাৎ একদিন সারা দেশ সমস্ত পৃথিবী দেখতে পাবে হয়তো মাটির ঢেলার পাশেই আর একটি অপূর্ব সুন্দর জীবন-বিন্দু ধরা পড়েছে কালসূত্রে। এই জীবন-বিন্দু জাতীয় কোন রকম শিক্ষাগার হাঁসপাতাল ল্যাবোরেটারী লাইব্রেরী ইউনিভারসিটি কিম্বা সিটি ফাদারদের চা খাবার পেয়ালায় কিংবা আর্ট স্কুলের রঙের বাটির মধ্যে জন্মায়নি, মহাকাল একে সবার অসাক্ষাতে জন্ম দিয়েছে কোন্ এক লোকের বুকের তাতায়, তারপর একদিন সেই একটি লোকের জীবন ও বিন্দু মহাকালই নিংড়ে নিয়ে ধরেছে নিজের বিজয়মালার মধ্যে।

এই যখন হল তখন এল জাতি, বিচার করে ভেবেচিন্তে একটা মহাসভা ধূমধামে বসিয়ে সকলে জাতীয় কবি জাতীয় শিল্পী জাতীয় যে-কেউ তার মূর্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলতে বার হল এবং জাতীয় গৌরব অনুভব করায় আয়োজন সার্থক করার চেষ্টায় কোথায় ন্যাশনাল কনসার্ট, ন্যাশনাল থিয়েটার, ন্যাশনাল হোটেল আছে সেখানে বায়না দিতে ছুটলো, ও কাজটা যাতে ন্যাশনাল রকমে হয় তার জন্যে একটা রেজোলিউশান পাস করিয়ে নিয়ে খেটেখুটে অকাতরে গিয়ে নিদ্রিত হল নিজের কেল্লায়। মহাজাতি রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে, মহাকাল দৈত্যের মতো তাকে ধরতে এসে কেল্লার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, কে জাগে? রাজকুমারী সাড়াশব্দ দেন না, সাড়া দেয় যে পাহারা দিচ্ছে মহাজাতির শিয়রে। কে জাগে?—সওদাগরের পুত্র জাগে। কাল নিরস্ত হয়, আবার আসে দ্বিতীয় প্রহরে, কে জাগে?—মন্ত্রীপুত্র জাগে। তৃতীয় প্রহর যায়, কাল ফিরে এসে বলে, কে জাগে?—কোটালের পুত্র জাগে। রাত-শেষে অন্ধকার পাতলা হয়, কাল ছুটে এসে বলে, কে জাগে? কে জাগে?—রাজপুত্র জাগে?

বারে বারে এইভাবে মানবজাতি ঘুমোয়, জাতির শিয়রে জাগরণ, বসে থাকে কালের কবল থেকে তাকে বাঁচাতে, সকাল হলে এদের কায শেষ হয়ে যায়। এদের রাতের গাঁথা অসমাপ্ত মালা রাজকুমারীর ঘরের দুয়োরে পড়ে থাকে, সে মালা মহাজাতি সাহাজাদীর হাতে গাঁথা মালা নয়, সে চাহার দরবেশ তাদের জপমালা। রাজকুমারী তাকে অনেক সময় মাড়িয়ে চলে যান নিজের গরবে, হয়তো বা রাজকুমারীর দাসী পেয়ে যায় সে মালা ঘর ঝাঁট দিতে, কিংবা ঘরের দুয়োরে আলপনা টানতে বসে অথবা এমনি চলে যেতে যেতে!

বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী, ১৯৪১

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
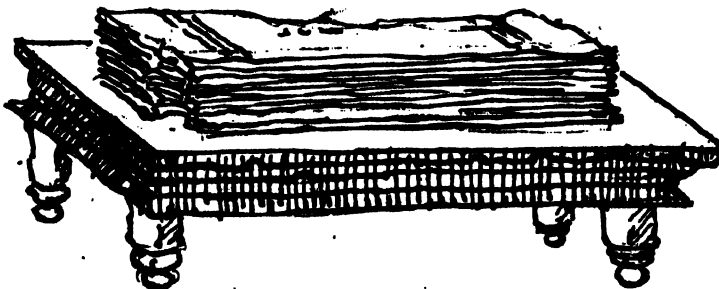
বাংলা ভাষার প্রসারচিন্তা

একদিন আশা ছিল, বাংলা ভাষা ভারত-রাষ্ট্র ভাষা হইতে পারিবে। ক্রমশঃ সে আশা নির্মূল হইয়াছে। বাঙ্গালী উদাসীন না হইলে হিন্দীর বিরুদ্ধে লড়িতে পারিত। হিন্দী-ভাষীর সংখ্যাধিক্য, এই একটি গুণ ছিল। বাংলা-ভাষী দ্বিতীয় স্থান পাইত। আর, বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার বহু যোগ্যতা ছিল। ইহার সোজা ব্যাকরণ, ইহার প্রচুর সংস্কৃতসম শব্দ, ইহার বিপুল সমৃদ্ধ সাহিত্য হিন্দী-ভাষার নাই। অনেক বাংলা পুস্তক হিন্দী ভাষান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীর তুলসীদাসী রামায়ণ ব্যতীত আর কোন পুস্তক বাংলা ভাষান্তরিত হয় নাই।

বাংলা অক্ষরশিক্ষা কঠিন না হইলে ভাল ভাল বাংলা বই অন্য প্রদেশে প্রচারিত হইতে পারিত। শুনিতেছি, "বিশ্বভারতী" রবীন্দ্রনাথের পুস্তক নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। ইহা উত্তম কল্পনা। যদি কোন বঙ্গভাষা-হিতৈষী গ্রন্থপ্রকাশক বাংলা উত্তম সাহিত্যের অন্যান্য বই নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করেন, বাংলা ভাষার প্রসার হইতে পারিবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বিষবৃক্ষ, মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস, স্বামী বিবেকানন্দের "যোগ" ও বক্তৃতা, শরৎচন্দ্রের দুই-একখানা বই নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে পারিলে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর পড়িবার সুবিধা হইবে। এই সকল বই সংক্ষেপ করিয়া লইতে হইবে এবং আবশ্যকস্থলে বাংলা শব্দের অর্থ লিখিয়া দিতে হইবে। বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক আছে কিনা জানি না। পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক চলিবে না। যিনি সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু কিংবা ইংরেজী জানেন তিনি বই পড়িয়া যাহাতে নিজে নিজে বাংলা শিখিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে বই লিখিতে হইবে। বাংলা অক্ষর পরিচয়, বাংলা পাঠ ও বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ, এই কয়েকটি বিষয় লইয়া একখানি বই, আর সংস্কৃত শব্দ না দিয়া কেবল বাংলা শব্দের একখানি ছোট কোশ চাই। আমি জানি, বর্তমানে এইরূপ পুস্তক না থাকিলেও অন্য প্রদেশবাসী বাংলা শিখিয়া বাংলা বই পড়িয়া থাকেন। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষেও এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে। দুঃখের বিষয়, বাংলা মুদ্রাকরেরা এখনও সেই পুরাতন যুক্ত-ব্যঞ্জনাক্ষর চালাইতেছেন। কলিকাতায় বাংলা-প্রসার-সমিতি আছেন। তাঁহারা সচেষ্ট হইলে বাংলা ভাষা-প্রচার কঠিন হইবে না। অন্যপ্রদেশবাসী দেখিলে বাঙ্গালী হিন্দিতে কথা কহিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যবহারের দোষ আছে। ইহা দ্বারা বাংলা-প্রচার ব্যাহত হইতেছে। অন্যপ্রদেশবাসীর সহিত বাংলায় কথা কহা উচিত।

২। বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষা

ইহার পর অন্য কর্তব্য আছে। যে যে গুণ হেতু ভারতে বাংলা ভাষার আদর হইয়াছে, যাহাতে সে সে গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাংলা ভাষার স্বরূপ পরিবর্তিত না হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের সর্বদা অবহিত থাকা উচিত। এক্ষণে বাঙ্গালী দুর্বল, ভিন্নপ্রদেশে নগণ্য। একমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর পূর্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারিবে।

বর্ষে বর্ষে নানাবিধ বাংলা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, বারমাসিক পুস্তক (Magazine) ও সামিতিক পুস্তক, এই ত্রিবিধ পত্র ও পুস্তক বর্তমানে ৩৬৯ খানি প্রচারিত হইতেছে। ভারত-পরিষদের এক প্রশ্নের উত্তর এই সংখ্যা জানিতেছি। বোধহয় বর্তমানে বাংলা-লেখক দেড় হাজার, দুই হাজার হইবেন। সমিতি-বিশেষ দ্বারা প্রচারিত পুস্তক অতি অল্প। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিজ্ঞান-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" নামক পুস্তক ও এইরূপ অন্যান্য পুস্তককে আমি সামিতিক পুস্তক বলিতেছি। ইহাদের পাঠক সংখ্যা অল্প। সংবাদপত্র অবশ্য পত্র, বাঁধা পুস্তক নয়। বারমাসিক পুস্তক (সংবাদ=সমূহ; সমূহের নিমিত্ত মাসিক পুস্তক) বদ্ধপত্র। এই কারণে আমি ইহাকে পুস্তক বলিতেছি। সংবাদপত্র ও বারমাসিক পুস্তক দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারিত হইতেছে। এমন বিষয় নাই যাহা বাংলা ভাষার দ্বারা জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হয় না। বাংলা গল্পের বই অগণ্য। প্রতি বৎসর নূতন নূতন গল্পের বই ছাপা হইতেছে।

বর্তমান লেখকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত। কেহ কেহ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রবীণ; কেহ বা সর্বদা ইংরেজী সাহিত্য, সংবাদপত্র, বারমাসিক ইত্যাদি পড়িয়া থাকেন। ইঁহাদের বাংলা শিক্ষার অবসর হয় না। কেহ বা বাল্যকালে সংস্কৃত ভাষা অল্প শিখিয়াছিলেন, এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন ভাবেন নাই। এইরূপ স্থলে তাঁহাদের রচনায় ইংরেজীর অনুকরণ আসা বিচিত্র নয়। শব্দ বাংলা, কিন্তু প্রকাশ বাংলা নয়। উদাহরণ দিতেছি।

ভদ্রতা শিক্ষার উপর 'নির্ভর করে'। পরিশ্রমের উপর সাফল্য 'নির্ভর করে'।

আপনার উপস্থিতি 'প্রার্থনীয়'।

বৌদ্ধ যুগে নারীর 'স্থান'। শিশুশিক্ষায় শিল্পের 'স্থান'। এম-এ পরীক্ষায় প্রথম 'স্থান' অধিকার করিয়াছে।

হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্মের 'দান'। বাংলাসাহিত্যে ইসলাম সংস্কৃতির 'দান'।

সভার কার্য 'সাফল্যমণ্ডিত করিবেন'।

'ভাষার কার্য হইতেছে মনের ভাব প্রকাশ করা'।

আচার্য যদুনাথ সরকারের বয়স ৭৮ বৎসর 'পূর্ণ হওয়ায়' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'পক্ষ হইতে' তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। 'এই উপলক্ষ্যে' আমরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা 'সমবেদনা জানাইতেছি'।

মাতৃভাষার 'মাধ্যমে' শিক্ষাদান।

'দৃষ্টিকোণ' পরিবর্তন করিতে হইবে। মাতৃভাষা শিক্ষার 'বাহন'।

'কাজে যোগদান, গানে যোগদান, প্রার্থনায় যোগদান'। ইত্যাদি।

মনে মনে এই সকল বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ না করিলে অর্থবোধ হয় না। এই সকল উদাহরণের বাক্যের ভাব বাংলা ভাষায় অক্লেশে প্রকাশ করিতে পারা যায়। এইরূপ বাক্য বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে না।

কেহ কেহ ঋজু পথে চলিতে পারেন না। ঋজু ভাষায় ভাবপ্রকাশ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ভাষা জটিল হইয়া পড়ে। কেহ বা বাগ্‌ভঙ্গি না করিয়া, কেহ বা একই বিষয় ঘুরাইয়া পাঠককে অকারণ কষ্ট না দিয়া লিখিতে পারেন না। ইংরেজী সংবাদপত্রের ভাষা ফাঁপা। বাংলা সংবাদপত্রেও তাহার অনুকরণ ঘটিতেছে; কিন্তু যিনি যাহাই লিখুন রচনায় প্রসাদগুণ ও মাধুর্য না থাকিলে পাঠক পড়িতে ইচ্ছা করেন না।

> "সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
> ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি॥"

বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ এখানে স্পষ্ট হইয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও এইরূপ। আরও পুরাতন বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমন মধুর। ইংরেজী আমলেও প্রথম প্রথম বাংলা ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল পদ্যের ভাষা নয়, গদ্যের ভাষাও বাংলা ছিল! সেকালের সংবাদপত্রের ও পত্রপ্রেরকদিগের ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল 'সীতার বনবাস' লেখেন নাই। 'কথামালা' লিখিয়াছিলেন। বাল-পাঠ্য-পুস্তকে কথামালার ভাষার লালিত্য কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় নানাবিধ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কয়খানি ইতিহাসের ভাষায় মাধুর্য আছে? কালী সিংহের মহাভারত পড়ুন, তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য ও লালিত্য কয়খানা বাংলা ইতিহাসের বইতে আছে?

কেহ কেহ মনে করেন, রচনায় মৌখিক ভাষার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বর্ণনার বিষয় অতিশয় সুবোধ্য হয়। ইহা এক বিষম ভ্রম। হইতেছে স্থানে হচ্ছে, করিতেছে স্থানে কচ্ছে, দেখিয়াছিলাম স্থানে দেখেছিলাম, লিখিলে বাক্য সুগম হয় না। বাক্য ছোট ছোট হইলে কচ্ছে হচ্ছে কটু শোনায়, পড়িতে ইচ্ছা হয় না। 'মহান্ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে'—এখানে 'গড়ে' পীড়িত করিতেছে। তদুপরি 'মহান্' প্রতিষ্ঠান শুনিলে হতাশ হইতে হয়। কেহ কেহ 'বলে চলে গেল' লিখিয়া মনে করেন ভারি সোজা ভাষা লিখিলেন। কিন্তু এই ভাষা পড়িয়া বুঝিতে হইলে অন্ততঃ দুইবার পড়িতে হয়। কেহ কেহ 'ব'লে চ'লে গেল' লিখিয়া পাঠককে সাবধান করিয়া দেন, 'বলে চলে' নয়, 'বলিয়া চলিয়া' বুঝিতে হইবে। ব ও চ-এর পরে উৎকলা (') লেখার কোনও যুক্তি নাই। হইত স্থানে হ'ত, হইল স্থানে হ'ল; উৎকলা হ-এর পরে ঠিক বসিয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে হয়, একটি ই লুপ্ত বা গ্রস্ত। সেই নিয়মে "চ'লে ব'লে" পড়িতে হয় "চইলে বইলে"। ইহা কি পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিতের "চইল্যা বইল্যা"? করিয়া, সংক্ষেপে আমরা বলি কর্যো, 'কইর্যো' বলি না। এখানে কর্যে' লিখিলে বুঝি য-ফলা গ্রস্ত হইয়াছে। কবিকঙ্কণে 'র‍্যান্ধা বাড়া' আছে। তখনকার উচ্চারণে ঠিক বানান হইয়াছে। এখন আমরা বলি, 'রেঁধে বেড়ে'। উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক বানান করি।

সেদিন "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ কর্তৃক বিতরিত" একখানা 'কথাবার্তা' নামক পত্রে 'খাদ্য পরিস্থিতি' পড়িতেছিলাম (১৯শে জানুয়ারী)। "অসামরিক সরবরাহ সচিব প্রদেশের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন, মাথা পিছু দু সের চালের বরাদ্দ যদি চালিয়ে যেতে হয় তবে সরকার এ-বৎসর যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছেন অহলেও পঞ্চাশ হাজার টন চাল ও গম ঘাটতি পড়বে।" আর একখানি 'কথাবার্তা'য় (১৬ই ফেব্রুয়ারী) পড়িলাম, "সৌন্দর্য্য জিনিসটা স্বাস্থ্যের ওপরই বেশী নির্ভর করে। আয়ত টানা টানা দুটি চোখ, সুঠাম টিকোলো একটি নাক এবং ফ্যাকাশে রকমের ফর্সা রঙের অধিকারী মানুষটিকেও ঠিক সুন্দর বলা চলবে না—জ্যোতিহীন চোখের গড়ন যত ভালোই হোক সে চোখ, স্বাস্থ্যের লক্ষণযুক্ত উজ্জ্বল চোখের তুলনায় কম সুন্দর," ইত্যাদি। এইরূপ ইংরেজী-বাংলা ভাষার পাঠক সহজে পাওয়া যাইবে না। মুসলিম-লীগ-মন্ত্রিত্বকালে "জানবার কথা" নামে একখানা পত্র বিতরিত হইত। তাহার ভাষা মন্দ ছিল না; পড়িতে ও বুঝিতে পারা যাইত। তাহাতে চিত্রে একজন গ্রামবাসী স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রসূতিতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইত। কিন্তু লোকটিকে ম্যালেরিয়া-ভোগী, প্লীহারোগী দেখাইত। 'কথাবার্তা'য় একখানি চিত্র আছে; সে চিত্রের মর্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। এক ঘরের উঠানে এক বৈঠক হইয়াছে। এক কথক এক মুসলমানকে কি বলিতেছে। একজন উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছে। একজন ঊর্ধ্বজানু হইয়া বসিয়াছে। আর, দুইজন মারোয়াড়ীর একজন গা ভাঙ্গিতেছে, আর একজন বোধ হয় তাহার নিজের ধান্ধা ভাবিতেছে। এক দ্বারপিণ্ডে দণ্ডায়মানা নারীও শুনিতেছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কথাবার্তার শ্রোতা পাওয়া যাইবে কি? এমন অশিষ্ট বাঙ্গালী আছে কি যে এক ভদ্রলোকের পাশে ঊর্ধ্বজানু হইয়া বসে? এখানে ভাষা দেখিতেছি, সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ ছাড়িয়া দিলাম।

অনেকদিন পূর্বে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় এক বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এক গল্প পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক গল্প নয়। গবর্মেন্টের এক বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে, কেন তত খরচ হইয়াছে, তাহার যুক্তি দেখান হইয়াছে। প্রচারক ঠিকই বুঝিয়াছেন, গল্প না হইলে কেহ পড়িবে না। ঔষধ তিক্ত, মধুমিশ্রিত না হইলে কেহ সেবন করিবে না। কিন্তু ব্যাপারটি হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পের পরে স্বাস্থ্য-বিভাগের এক বিজ্ঞাপন আছে। অনাড়ম্বর বিজ্ঞাপন, কিন্তু কাজের হইয়াছে। "স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে অমুক ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বেঙ্গল গবর্মেন্টের নামগন্ধও নাই।

দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন, জ্ঞানপ্রচার করুন, কিন্তু জ্যেঠামি করিবেন না। কেহ কাহারও জ্যেঠামি সহিতে পারে না। দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা ভাষার ভঙ্গিমা, গল্পের ছলনা পাঠকের বিরক্তি সঞ্চার করে। পাঠককে মূর্খ, নির্বোধ না ভাবিলে কেহ জ্যেঠামি করে না।

এতদিন বাংলা ভাষার বাগ্‌রীতি প্রসন্না ছিল। যথা—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। কিছুকাল হইতে আর দুই রীতি আবির্ভূত হইয়াছে। (১) প্রচণ্ডা। যেমন জ্বর-বিকারে রোগীর হাত-পায়ের আক্ষেপ হয়, ইহা সেইরূপ। যথা—ফুটেছিল হাড় একদা এক বাঘের গলায়। (২) প্রলীনা। যেমন অবসন্ন দেহে ক্লান্তি আসে, দেহ সোজা থাকে না, এলাইয়া পড়ে, ইহা সেইরূপ। যথা—এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, একদা।

প্রচণ্ডা ও প্রলীনা রীতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু যেখানে সেখানে প্রচণ্ডা রীতি দেখিলে রঙ্গমঞ্চে ভীমসেনের গর্জন মনে হয়। কেহ কেহ প্রলীনা রীতিতে কবিত্ব দেখিতে পান। বাস্তবিক, কবিত্ব নয়, জ্যেঠামি। যথাস্থানে যথাযোগ্য শব্দ বিন্যাস দ্বারা চিন্তা ও মনের ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে রচনা সার্থক হয় না। বাঙ্গালা দেশকে গল্পরূপ ভূত পাইয়া বসিয়াছে। গল্প নয়, কিন্তু বহির নাম গল্প রাখা হইতেছে। গীতার গল্প, চণ্ডীর গল্প, রামায়ণের গল্প, কালিদাসের গল্প, শরীরের গল্প ইত্যাদি নাম হইতে বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালী পাঠক গল্প পড়িয়া পড়িয়া তরলমতি হইয়া পড়িতেছে। যে রচনা বুঝিতে হইলে ধীরে ধীরে পড়িতে হয়, প্রত্যেক শব্দ বুঝিয়া যাইতে হয়, তাহা পাঠকের প্রীতিকর

হয় না। প্রত্যহ লঘু আহার করিলে দেহের পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়, গল্প পড়িয়া পড়িয়া পাঠকের চিত্তও তরল হয়। পরে গল্প পড়িতেও তাহার ধৈর্য থাকে না। গল্প-লেখক কত স্থানে কত অলঙ্কার আনিয়াছেন, মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ভাষার বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু পাঠক এ সকল বিষয় লক্ষ্য করেন না। তিনি গল্পের বহির পাতা উল্টাইতে থাকেন, আর তারপর কি, তারপর কি, খুঁজিতে থাকেন। এক বিশেষ কারণে আমাকে এক গল্পের বই পড়িতে হইয়াছিল। লেখক মহাশয় ভাষা চাতুর্যে ও ইতিহাসজ্ঞানে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ৪।৫টি গল্পের সমষ্টি, পড়িতে দুই দিনে চারি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। সেই বই এক বি-এ পাস তরুণ দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়াছিল। গল্পের এই পরিণাম লেখক মহাশয়েরা অবগত আছেন কিনা জানি না।

বিষয় যাহাই হউক, ভাষা ভুল থাকিলে পাঠক বিরক্ত হন। ভুল অনেক প্রকার হইতে পারে। শব্দের বানান ভুল, প্রয়োগ ভুল, অর্থ ভুল, এবং বাক্যের ব্যাকরণ ভুল, বারমাসিক পুস্তকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সে রকম ভুল লেখকের পুস্তকেও ঘটে। দুই-এক খানা বারমাসিকের পাতা উলটাইতে উলটাইতে কতকগুলি ভুল দেখিয়াছি। উদাহরণ দিতেছি।

সংবাদপত্র-প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা বঙ্গের সর্বত্র লৈখিক ভাষার সমতা আসিয়াছে। শব্দের বানান দ্বারা শব্দের রূপ স্থির থাকে। উচ্চারণ সর্বত্র সমান নয়, হইতে পারে না। কোথাও অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-উচ্চারণ প্রচুর, কোথাও নাই। কোথাও ড় ঢ় অক্লেশে উচ্চারিত হয়, কোথাও হয় না। সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল্ হইলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভাষা এক সামাজিক উপায়। ইহার একরূপতা রক্ষা না হইলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কালান্তরে অল্পে অল্পে পরিবর্তন হইলে সামাজিক অপর ব্যবস্থার তুল্য ভাষা-ব্যবস্থাও সমাজের হিতকর হয়। শব্দের বানান হঠাৎ পরিবর্তন করিলে কিম্বা কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা গণের উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান পরিবর্তন করিলে ভাষা-বিপ্লব ঘটে। যেমন জীবজাতির পরিণাম শ্রেয়স্কর কারণ তদ্দ্বারা সে দেশ ও কালের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তেমন ভাষার হয়, ভাষার যাবতীয় অঙ্গেরও হয়। ব্যাকরণ ভাষার পরিণাম স্বীকার করিবেন, কিন্তু বিবর্তন স্বীকার করিবেন না। ব্যাকরণ পরিণামের সূত্র রচনা করিবেন, ভাষার রূপ বাঁধিয়া দিবেন, কোশে সে সূত্র অনুযায়ী শব্দের বানান, অর্থ, প্রয়োগ পাওয়া যাইবে। কদাচিৎ বহুল প্রয়োগ রক্ষা করিয়া এই তিনেরই ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু সাধারণতঃ ভাষাকে রক্ষণশীল হইতেই হইবে।

এতকাল জানিতাম, ক বর্গের অনুনাসিক ঙ, চ বর্গের ঞ, ট বর্গের ণ, ত বর্গের ন, প বর্গের ম, এবং য র ল ব শ ষ স হ, এই আট অবর্গ বর্ণের অনুনাসিক ং (অনুস্বার)। এখন দেখিতেছি অনুনাসিক ঙ স্থানে ং লেখা হইতেছে। পূর্বে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে কোন কোন শব্দে ং লেখা হইত। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে আমি একখানা বইতে 'সংখ্যক' লিখিয়াছিলাম। মুদ্রাকর আমার বানান কাটিয়া 'সঙ্খ্যক' করিয়াছিলেন। তৎকালে সংখ্যা, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংক্ষেপ বা সংক্রান্তি, ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি শব্দে ং দেখা যাইত। সংস্কৃত পুস্তকে ক বর্গের পূর্বে একটা শব্দেও থাকিত না। এখনও থাকে না। পাঁচ-সাত বৎসর হইতে নব্য লেখকেরা অনুনাসিক ঙ বর্জন করিয়া সকল শব্দেই ং লিখিতেছেন। শংকা, কলংক, মংগল, সংগীত, সংঘ ইত্যাদি শব্দের বহু প্রচলিত ঙ স্থানচ্যুত হইতেছে। ইহার একটি কারণ, ক-এর মস্তকে শয়ান ঙ অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং সকলে লিখিতেও পারেন না। গ অক্ষরের মস্তকে ঙ পরস্পর যুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলে ঙ্গ লিখিতেও পারেন না। তাঁহারা স্পষ্ট ঙ লিখিয়া পাশে ক কিম্বা গ স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারেন। ঙ্খ, ঙ্ঘ, সেইরূপই লেখা হইয়া থাকে। দিঙ্‌নির্ণয়, দিঙ্‌মুখ শব্দেও ঙ স্পষ্ট। এইরূপ ঙ্ক, ঙ্গ লিখিলে ং লিখিবার কোন হেতু থাকে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে, কিম্বা বাংলা ব্যাকরণে ঙ স্থানে ং, এই বিকল্প বিধি নাই। বিকল্প বিধির দোষ এই, লেখককে অকারণ ভাবনায় পড়িতে হয়। কেহ দিল্লী যাইতেছেন; কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, দিল্লী যাইবার আর এক পথ আছে। তখন তাঁহাকে ভাবিতে হয়, তিনি কোন্ পথে যাইবেন। বুদ্ধিমান্ হইলে "মহাজনো যেন্ গতঃ স পন্থাঃ," অর্থাৎ বহুজন যে পথে গিয়াছে সেই পথই ধরিবেন। 'বাংলা', এই বানান ঠিক। কিন্তু বাংলা লিখিবার কি যুক্তি আছে? বঙ্গ হইতে বঙ্গাল, বঙ্গালা, বাঙ্গালী। অপর প্রদেশে আমরা বঙ্গালী নামে পরিচিত। তাঁহারা বাঙাল জানেন না। প্রায় সাত কোটি বাংলাভাষীর কয় জন 'বাঙলা বাঙালী' উচ্চারণ করিতে পারেন? সত্য কথা বলিতে কি, 'বাঙালি' দেখিলে আমি 'বাঙআলী' পড়ি। কারণ, বাঙন (বামন), শাঙন (শ্রাবণ), কুঙার (কুমার), কাঙর (কামরূপ), "পাখীজাতি যদি হঙ, পিয়াপাশে উড়ি যাঙ," "ধামসা ধাঙ ধাঙ" ইত্যাদি উদাহরণে ঙ অক্ষরের উচ্চারণ স্পষ্ট হইয়াছে। সুখের বিষয়, সকলে "বাঙলা বাঙালী" লেখেন না।

সংস্কৃত যে সকল শব্দে অনুনাসিক আছে, বাংলা রূপান্তরে সে সকল শব্দে চন্দ্রবিন্দু লেখাই বিধি। যেমন, দন্ত দাঁত, অঙ্ক আঁক। দুই-একটা ব্যতিক্রম আছে। যেমন, লম্ফ লাঁফ নয়, লাফ। কিন্তু দেখি, বিমান 'ঘাঁটি'। ঘট্ট হইতে ঘাট, ঘাটি, ঘাটিয়াল বা ঘেটেল, ঘাটোয়াল শব্দ আসিয়াছে; একটাতেও চন্দ্রবিন্দু নাই। নূতন কলসীতে জল চুইয়া পড়ে, 'চুঁইয়া' পড়ে না। ভাত চুইয়া যাইতে পারে। জোয়ার-'ভাঁটা' নয় 'জোয়ার-ভাটা'। সংস্কৃত খুজ ধাতু হইতে বাংলা খুজ ধাতু। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য লোক 'খুজি, খোজাখুজি' বলে, 'খুঁজি, খোঁজাখুঁজি' বলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটি হইবে 'বোঝার উপর শাগের আটি' (বাংলা শাগ ও সংস্কৃত শাক এক দ্রব্য নয়)। কিন্তু, আমের আঁঠি, পায়ের আঁঠু।

অন্তঃস্থ-ব (ব) পরে থাকিলে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। হয়। কারণ ং অবর্গবর্ণের অনুনাসিক। এইরূপে সংস্কৃতে 'কিংবা', 'বশংবদ', 'সংবাদ' লিখিত হয়। কিন্তু বাংলায় অন্তঃস্থ-ব উচ্চারিত হয় না। আমরা বর্গীয়-ব জানি। ম ইহার অনুনাসিক। সেই হেতু লিখি, সম্বৎসর, সম্বরণ, সম্বলিত, সম্বাদী, সম্বর্ধনা। পূর্বে 'সংবাদ' ছিল না, সম্বাদ ছিল। কিম্বা, বশম্বদ এখনও আছে। কিংবা, বশংবদ লেখা পাণ্ডিত্যমাত্র।

ইংরেজী and-এর নানারকম বাংলা বানান দেখিতে পাই। এণ্ড বানান প্রচলিত ছিল। কিন্তু atom শব্দের বাংলা বানান য়্যাটম, অ্যাটম, এ্যাটম, এইরূপ দেখি। আমি এ্যাটম লেখা সঙ্গত মনে করি। কিছুদিন হইতে 'মাস্টার', 'স্টেশন' দেখিতেছি। কিন্তু আমরা বলি, মাষ্টার, এষ্টেশন, ষ্টীট; এই বানানই ঠিক। ইংরেজী কি অপর ভাষার শব্দের উচ্চারণ আমরা সে সে ভাষা অনুযায়ী করি না। আমরা ইস্তেহার, গোমস্তা, খোসামোদ, তমশুক, নোটিশ, পুলিশ ইত্যাদি বলি ও লিখি! এ পর্যন্ত কেহ আমাদের উচ্চারণ-দোষ ধরেন নাই।

সেদিন দেখিতেছিলাম, কেহ লিখিয়াছেন, 'তাদেরকে পাঁচ টাকা দিও'। 'তাদেরকে' 'আমাদেরকে' ইত্যাদি স্থানবিশেষের গ্রাম্য প্রয়োগ শুদ্ধ ভাষায় চলিতে পারে না। 'তাদের বলে ধরে এনো'। এই বাক্যের কি অর্থ হইবে কে জানে? সে বল্লো, আমি যাবো, দেখবো; সে যেতো, দেখতো; দেখলো, হলো, ইত্যাদি বারমাসিকের পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। 'মশারা জলে ডিম পাড়ে', 'গাছেরা রোদে পাতা মেলিয়া দেয়', এইরূপ ভাষা দেখিলে মনে হয় বাংলা প্রেসে প্রুফ-রীডার অর্থাৎ প্রুফ-শোধকও নাই। থাকিলে, সাধু ভাষার ওপর, ভেতর, বের ইত্যাদি স্থান বিশেষের ভাষা দেখিতাম না। "তাদের ভেতর কেহ সাহসী ছিল না", "দশদিনের ভিতর দেখা করিবে", "ছোট বেলায় দেখিয়াছি", "অনেকগুলি বই পড়িতে হয়", "সব কিছু বাকি আছে", "অনেক কিছু করিবার আছে", "তাদেরকে

ডাক" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থান বিশেষের ভাষা, বাংলা নয়। "একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন", "একটা ভয় বোধ করিলেন" ইত্যাদি প্রয়োগ ইংরেজী না বাংলা, বুঝিতে পারা যায় না। হাজার হাজার ছাত্র পরীক্ষা 'দিতেছে'। কেহ পাস 'করে', কেহ ফেল 'করে'। কেহ ট্রেন মিস 'করে'। কাহারও হার্ট ফেল 'করে'। এইরূপ ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, লেখকেরা চিন্তা করেন না। ছাত্রেরা পরীক্ষা 'দেয়' না নেয়? ছাত্রেরা আপনাদিকে পাস করে ফেল করে, না, পরীক্ষক করেন? বাংলা ভাষায় ইংরেজী ক্রিয়াপদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। হার্ট ফেল হয়, ট্রেন মিস হয়, কেহ পাস হয়, কেহ ফেল হয়, ইত্যাদি। পরীক্ষকেরা পরীক্ষা দেন, ছাত্রেরা তাহা গ্রহণ করে।

আমরা বাংলা ভাষার গৌরব করি। যাহাতে সে ভাষা স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ না করে, লেখক মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নূতন শব্দ আসুক, দেশী বিদেশী শব্দ ও ভাব আসুক, তদ্দ্বারা বাংলা-সাহিত্য পুষ্ট হইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে, বাংলা ভাষার ধাতুর সহিত, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের সহিত মিশিতেছে। নচেৎ অন্য প্রদেশের পাঠকের নিকট বাংলা ভাষা অপাঠ্য হইয়া থাকিবে।

৩। ইংরেজীর বাংলা

বঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্রের বিস্ময়কর ক্ষমতা জন্মিয়াছে। কেহ সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন; পরদিন সকাল বেলায় দেখি দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার বাংলা ভাষান্তর বাহির হইয়াছে। বক্তৃতার পরেই বাংলা অনুবাদ হইয়াছে; রাত্রে রাত্রে ছাপা হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ, কেহ সন্ধ্যাবেলা বাংলায় বক্তৃতা করিলেন, পরদিন প্রাতে সে বক্তৃতা ইংরেজীতে পড়িতেছি। ইংরেজী যেমন তেমন ভাষা নয়, আর বক্তৃতাও এক বিষয়ে নয়। অনুবাদ কোথাও কোথাও ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা অনুবাদকের ক্ষমতার লঘুতা হয় না।

দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও বাংলা অনুবাদক ভাবিবার সময় পান না। অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিতেছেন। অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটাইতেছেন। দেখি, গণ-পরিষদ্, গণতন্ত্র, গণশিক্ষা, গণসমিতি। 'গণ' শব্দ সংস্কৃত এবং ইহার সংস্কৃত অর্থ বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত আছে। যেমন, বালকগণ, অর্থাৎ বালক নামে যে গণ (group বা genus) আছে তাহাকে বুঝায়। অতএব 'জন' শব্দের পরিবর্তে 'গণ' বলিতে পারি না। লৈখিক ভাষায় ভ্রম একবার প্রবেশ করিলে তাহার সংশোধন অতিশয় দুঃসাধ্য হয়। যাঁহারা পুস্তক রচনা করেন ও বারমাসিক পুস্তকে প্রবন্ধ লেখেন তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিবার অবকাশ পান। তাঁহাদের ভুল নিন্দনীয়, স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরেজী ভাষা অতিশয় সমৃদ্ধ। তাহার তুলনায় বাংলা কিছুই নয়। দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিভাষা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য সংসারযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নাম এবং দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার ভেদ বাচক শব্দ এত আছে যে, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার শতাংশও নাই। Plan, Scheme, Design, Project শব্দগুলির অর্থ এক নয়। কিন্তু বাংলায় এক 'পরিকল্পনা' আশ্রয় লইয়াছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষার শব্দ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা সে সুযোগ পাইতেছি না। হঠাৎ নদীর বন্যার মত নানাজাতীয় ভাব ও ক্রিয়া-বাচক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষার প্রসার করিতে হইলে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন ও রচনা করিতে হইবে। কয়েকজন বিজ্ঞ এই কর্মে রত থাকিলে অল্পে অল্পে বাংলা ভাষার বর্তমান দৈন্য দূরীভূত হইতে পারিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বাংলা ভাষার পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইতে পারেন।

ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দুই প্রকারে রচনা করিতে পারা যায়। (১) শব্দান্তর; (২) শব্দের ভাবানুবাদ। যে শব্দ দ্বারা ইংরেজী শব্দের ভাব রক্ষিত হয় সেই শব্দই শুদ্ধ। ইংরেজী Use শব্দের বহু অর্থ আছে। বাংলায় সর্বত্র 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হয় না। আমরা ভাত খাই, কাপড় ও জুতা পরি; চশমা পরি, গাড়ীতে চড়ি ইত্যাদি স্থলে 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা হয় না। এইরূপ প্রত্যেক শব্দের ভাবানুবাদ করিয়া লইতে হয়। এখানে কয়েকটা ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিচার করিতেছি।

Situation—পরিস্থিতি শব্দটি মন্দ নয়, কিন্তু অনাবশ্যক। অবস্থা শব্দ বহু প্রচলিত। Food Situation-খাদ্য পরিস্থিতি॥ অর্থাৎ বলিতেছি, খাদ্যের অবস্থা। কিন্তু বলিতে চাই, অন্নকষ্ট।

Damodar Valley Project —দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা॥ ইহা অপেক্ষা 'দামোদরের আড়বাঁধ প্রযুক্তি' ভাল মনে হয়। Plan—উপায়-কল্পনা, উপায়-সন্ধান। Ten Year Plan দশ বৎসরের উপায় নির্দেশ। Scheme, আমি প্রকল্প করিয়াছি।

Inflation—মুদ্রাস্ফীতি॥ মুদ্রা স্ফীত হইবে কেমন করিয়া? মুদ্রা শূন্যগর্ভ হইলে স্ফীত হইতে পারিত। Inflation মুদ্রাবাহুল্য। কলিকাতায় হিন্দীভাষী বাংলা ভাষার রূপান্তর ঘটাইতেছেন। কাপড় ধোলাই, মদ চোলাই, কাগজওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদি বাংলা শব্দ নয়। 'চাহিদা' কোথা হইতে আসিল? শব্দটির বাংলা রূপ দিলে চাহ (প্রার্থনা) + তি = চাহতি, বা চাহতা হইতে পারে। Demand and Supply, চাহতি ও যোগানি, চলিতে পারে।

Vitamin—খাদ্যপ্রাণ॥ ইহা এক অদ্ভুত আবিষ্কার। খাদ্যের প্রাণ, না খাদ্য-রূপ প্রাণ, না আর কিছু? আশ্চর্যের বিষয়, বালকের পাঠ্যপুস্তকেও বহুকাল হইতে 'খাদ্যপ্রাণ' চলিয়াছে। কে এই শব্দের জনক জানি না। নিশ্চয়, তিনি ডাক্তার নহেন। তিনি জানেন, প্রাণ সুলভ নয়, দুই এক আনায় কিনিতে পাওয়া যায় না। বহুকাল পূর্বে আমি পাললীয় (পলল হইতে পালো, Carbohydrate), পলীয় (পল মাংস, protein), স্নেহ (fat), পার্থিব (mineral), এই নাম চতুষ্টয় প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এইরূপ শব্দের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভাইটামিন শব্দের 'পোষ', এই নাম রাখা যাইতে পারে।

Basic Education—বুনিয়াদী শিক্ষা॥ ইহা আর এক আশ্চর্য শব্দ। বনিয়াদী ঘর জানি, বুনিয়াদী ঠাট জানি। বনিয়াদী (বাংলায় বুনিয়াদী নয়) সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Basic Education সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নয়। বনিয়াদী শিক্ষা বলিলে বুঝি, যে শিক্ষার বনিয়াদ বা মূল আছে। কিন্তু Basic Education তাহা নহে। যে শিক্ষা প্রথম বা আদ্য, যাহার পরে অন্য শিক্ষা আসে, সেই শিক্ষা বুঝায়। অতএব Basic Education প্রাথমিক শিক্ষা বা আদ্যশিক্ষা। এই শিক্ষার রূপ কি হইবে, বিদ্যাশ্রয়ী অথবা কলাশ্রয়ী হইবে, সে কথা ভিন্ন। গান্ধিজীর শিক্ষাপ্রকল্পে এই প্রশ্নের একটা উত্তর ছিল। তিনি চাহিতেন, শিশুকে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণ শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাকে আধার করিয়া শিশুকে সুশীল ও জ্ঞানবান্ করিতে হইবে। শিশু বুঝিবে, সে এমন দ্রব্য নির্মাণ করিতেছে যাহা লোকে চায় ও কেনে। অর্থাৎ, তাহার মনে এমন ভাব জাগাইতে হইবে যে সে মানুষ হইয়াছে। সে চরকায় সূতা কাটিবে কি শাগপালা রুইবে তাহা শিক্ষক বিবেচনা করিবেন। ছাত্রছাত্রীদের নির্মিত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে। তাঁহার প্রকল্পে ইহাও উদ্দেশ্য ছিল।

Scheduled Caste—তপশীলী জাতি॥ 'অনুন্নত জাতি' এই সংজ্ঞায় উদ্দিষ্ট জাতি বুঝিতে অসুবিধা হইত না। ব্রিটিশরাজ Scheduled Caste বলিয়া এই নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'অনুন্নত' সংজ্ঞা অপেক্ষা 'তপশীলী' আরও অবজ্ঞা-জনক। এই নামে বুঝায়, এই জাতি হিন্দুসমাজের

বহির্ভূত। মহাত্মা গান্ধীর "হরিজন" সংজ্ঞা করুণা প্রকাশ করে। বঙ্গদেশে ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য, এই পাঁচ জাতিতে হিন্দুসমাজ বিভক্ত। 'সামান্য জাতি' Common People; এই সংজ্ঞা নির্দোষ মনে হয়।

Chief guest of a meeting—সভার প্রধান অতিথি॥ দশ বার বৎসর হইতে সভায় বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত chief guest বা guest-in-chief নামক এক নূতন পদের আবির্ভাব হইয়াছে। সভা করিতে গেলে একজন উদ্‌বোধক চাই। তিনি সভাপতি নহেন। আর একজন Guest চাই, তিনি সভার উদ্দেশ্যের ও কৃতকার্যের প্রশংসা করিবেন। বোধহয় পূর্বকালে মাগধ সূত বা ভাটেরা এই কর্ম করিতেন। তাঁহারা বৃত্তিভোগী ছিলেন! Chief guest বৃত্তিভোগী নহেন; তিনি ভাটক পান না, তিনি অবৈতনিক বক্তা। তিনি যাহাই হউন, অতিথি নহেন। যতদিন বঙ্গদেশে অতিথিশালা, অতিথিসেবার নিমিত্ত ভূমি আছে, ততদিন সভার প্রধান বক্তা অতিথি হইতে পারেন না। আমি জানি, পূর্ববঙ্গে গৃহে অভ্যাগত, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদি সকলকেই অতিথি বলা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইঁহাদিগকে অতিথি বলিলে ইঁহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইবেন। Chief guest আমন্ত্রিত।

Pre-Historic—প্রাগৈতিহাসিক॥ পণ্ডিত শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রবাসীতে এই প্রাক্‌ শব্দের অপপ্রয়োগ দেখাইয়াছিলেন। তিনি আরও কতকগুলি শব্দের ভুল ধরিয়াছিলেন। যেমন, অর্ধবাৎসরিক। কিন্তু কার কথা কে শুনে? ইতিহাসের পূর্ব যুগে, চৈতন্যদেবের পূর্বে, লেখাই ঠিক।

গঠনমূলক কর্ম, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ইত্যাদির 'মূলক' বর্জন করিলে বাংলা পুষ্ট হয় না। গঠনমূলক কর্ম, গঠন কর্ম ভিন্ন আর কি? বাধ্যতামূলক শিক্ষা, Compulsory Education, আমার মতে আবশ্যক শিক্ষা বলা ভাল।

বস্তুতান্ত্রিক, এই নবনির্মিত শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র বুঝি। চরক আয়ুর্বেদতন্ত্র, আর্যভট জ্যোতিষতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। শাক্ততন্ত্র প্রসিদ্ধ। তন্ত্র শব্দের প্রথম অর্থ তাঁতের টানা। তাঁতে যেমন টানা পড়িয়ান দিয়া বস্ত্র নির্মিত হয়, সেইরূপ, যে শাস্ত্রে সূত্রের পরম্পর যোগদ্বারা কোন বিদ্যা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সে শাস্ত্রের নাম তন্ত্র। তন্ত্র Systematic Knowledge, System না থাকিলে তন্ত্র বলা চলে না। এই মূল অর্থ হইতে তন্ত্র শব্দের বহুবিধ অর্থ আসিয়াছিল। সেখানেও System অন্তর্নিহিত আছে। বস্তুতন্ত্র বলিলে কি অর্থ দাঁড়ায়, বুঝিতে পারি না।

এইরূপ নূতন নূতন অসংখ্য শব্দ রচিত হইতেছে। ইংরেজী শব্দের ভাবার্থ লক্ষ্য রাখিয়া নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইবে। শব্দান্তররীতি গ্রহণ করিলে বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ইংরাজীতে অনুবাদ না করিয়া যে নবরচিত শব্দ বুঝিতে পারা যায় সেই শব্দই টিকিবে। যেমন প্রতিক্রিয়াশীল যে অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে শব্দ হইতে সে অর্থ আসে না। নৈতিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, পাঠ্যজীবন, কর্মজীবন, কবিজীবন, জাতীয় জীবন ইত্যাদি এক জীবনে কত অতিদেশ করা যাইবে? অনুকরণদ্বারা কোন ভাষা শক্তিশালী হইতে পারে না।

৪। সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা

ভারত স্বাধীন হইবার পর পশ্চিমবঙ্গরাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন, অতঃপর বাংলাভাষায় রাজকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশ পালন করা সোজা নয়। অসংখ্য রাজকর্মচারী, অসংখ্য পদ, এযাবৎ আমরা ইংরেজীতে শুনিয়া আসিতেছি। এখন হঠাৎ বাংলা শব্দ কোথায় পাওয়া যাইবে? এক পরিভাষাসংসদ আবশ্যক পরিভাষা নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার প্রথম স্তবক দেড় বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ শব্দ উত্তম হইয়াছে। সংসদের বিদ্যাবত্তা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়।

এই স্তবকে প্রায় আটশত শব্দ আছে। তন্মধ্যে প্রায় চল্লিশটি ফার্সী ও চল্লিশটি ইংরেজী। অর্থাৎ সাতশতের অধিক শব্দ সংস্কৃত। পরিভাষা যে সংস্কৃত হইবে, ইহাতে নূতন কিছুই নাই। বাংলা ভাষাই ত সংস্কৃত ভাষার এক প্রাকৃত রূপ। কিন্তু প্রথম চিন্তা আসিতেছে, এত যত্নের পরিভাষা টিকিতে পারিবে কি? দেখিতেছি, ভারতরাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী অথবা উর্দু-হিন্দী হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। তখন মন্ত্রী মহাশয় উজীর হইবেন কি আর কিছু হইবেন, গবর্ণর থাকিবেন কি সুবেদার হইবেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়তঃ সকল প্রদেশে Judge, Magistrate, Commissioner, Superintendent of Police ইত্যাদি অসংখ্য পদ থাকিবে। উচ্চ পদের একই নাম না থাকিলে এক প্রদেশের বার্তা অন্য প্রদেশে বুঝিতে পারা যাইবে না। কথাটা দাঁড়াইতেছে, পদের নামের অথবা অধিকৃতের নামের সমতা কে রক্ষা করিবে? এই ক্ষমতা ভারতরাষ্ট্রের আছে, রাষ্ট্রের অধীন রাজ্যের নাই। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হইলে পরিভাষার যে আকার হইত, হিন্দুস্থানী বা উর্দু-হিন্দী হইলে সে আকার থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ রাজত্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব ও লক্ষণ আমাদের অন্তরে বাহিরে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। উচ্চশিক্ষিতেরা আধা-ইংরেজ, বাংলায় ভাবিতে পারেন না। বাংলায় কিছু লিখিতে হইলে প্রথমে ইংরেজীতে লেখেন। শিক্ষিত মহিলা ইংরেজী শব্দ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বেশে তাঁহার ভূষণে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রকটিত আছে। ফলে কি দাঁড়াইবে, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তথাপি সংসদ-কৃত পরিভাষা সম্বন্ধে দুই পাঁচটা টিপ্পনী করিতেছি।

সপ্তশতাধিক সংস্কৃত শব্দের মধ্যে 'সরকার' শব্দ 'হংসমধ্যে কাকো যথা' হইয়াছে। বহুকাল হইতে 'সরকারী' শুনিয়া আসিতেছি, যেমন, সরকারী রাস্তা, সরকারী উকিল, সরকারী ডাক্তার ইত্যাদি। কিন্তু সরকার যে কে, তাহা অব্যক্ত থাকিত। গ্রামে পাঠশালার গুরুমশায় সরকার, কলিকাতায় বাজার সরকার, শিপ সরকার ইত্যাদি আছে। পরিভাষাসংসদ রোক সরকার, আদায় সরকার, করিয়াছেন। ইহাদের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিরূপ মানাইবে?

অনেক কাল পূর্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক ভদ্রলোকের ছেলে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। কারার এক বিধি ছিল, কর্তাকে দেখিলে কয়েদীকে দাঁড়াইয়া "সরকার সেলাম" বলিতে হইত। ছেলেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। এখানে 'সরকার' অর্থে প্রভু, এবং তাহাই সরকার শব্দের মূল অর্থ। আর এক অর্থ প্রদেশ; যেমন, ভারতের উত্তর সরকার। গ্রামবাসী গবর্মেণ্ট জানে বুঝে, কিন্তু সরকার অদ্যাপি শুনে নাই। কোন কোন সংবাদ পত্রে সরকার শব্দ দেখিয়াছি, এই পরিভাষা প্রকাশের পর হইতে এই ব্যবহার দেখিতেছি। পূর্বে গবর্মেণ্ট (গবর্ণমেণ্ট নয়) লেখাই রীতি ছিল। সরকার শব্দে আর এক গুরুতর আপত্তি আছে। এই শব্দের সহিত Govern, Governor, Governing body ইত্যাদির কোন সংস্রব নাই। রাজকার্যে সরকার শব্দ একক থাকিবে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে না।

মহামহিম (His Excellency) গবর্ণরকে 'দেশপাল' বলিলে তাঁহাকে অপর নানাবিধ 'পালে'র এক পাল, অর্থাৎ রক্ষক মনে হয়। কোট্টপাল (কোতোয়াল), দিক্‌পাল (দিগার, বর্তমান চৌকিদার), ঘট্টপাল

(ঘাটোয়াল) ইত্যাদি শব্দের অর্থে রক্ষক। আর পরিভাষাসংসদ অনেক প্রকার 'পাল' আনিয়াছেন। পরিষৎপাল Speaker of an Assembly, নগরপাল Commissioner of Police, বনপাল Conservator of Forests ইত্যাদি। ভূপাল নৃপাল শব্দে রাজা বুঝি, কিন্তু নামে তাঁহারা একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা নহেন। গবর্ণরকে রাজা না বলিলে কাহার মন্ত্রী, কাহার রাজস্ব, রাজপুরুষ, রাজকর্মচারী, রাজভৃত্য, রাজমার্গ, রাজকোষ ইত্যাদি? স্বরাজ, রামরাজ, ব্রিটিশরাজ, রাজনীতি, রাজভাষা ইত্যাদি শব্দ কোথায় পাই? রাজা বলিতে না পারিলে দেশপালক বা রাজ্যপালক বলা যাইতে পারে। কলিকাতা কি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নয়? নগর অনেক আছে, কলিকাতাকে শুধু নগর বলিলে চলিবে না। Police Commissioner নগরপাল, না রাজধানীপাল? Government রাজ, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। রাজকার্য, রাজকীয় কার্য, Official business. Non-official business লৌকিক কার্য। সরকারী শব্দ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অন্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস হইবে।

Minister মন্ত্রী, ঠিক। কিন্তু Secretary সচিব না হইয়া 'কর্মসচিব' কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। সচিব সহায়, তিনি নিশ্চয় কোন কর্মের নিমিত্ত নিযুক্ত। কেহ অকর্মসচিব থাকিলে অন্যকে কর্মসচিব বলিতে পারা যাইত। বাংলা ভাষায় সাচিব্য শব্দও গ্রামে প্রচলিত আছে। সেখানে অর্থ, ক্রেতার সাহায্য। যেমন, গুড় সাচিব্য হইয়াছে, অর্থাৎ গুড়ের দাম কমিয়াছে।

Home Department—স্বরাষ্ট্র বিভাগ॥ কিরূপে হইল? রাষ্ট্র বলিলে ভারতরাষ্ট্রই বুঝিতেছি। যেমন রাষ্ট্রভাষা। পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র, না রাজ্য? Home Minister কি করেন জানি না, বোধ হয় দেশশাসন তাঁহার মুখ্য কর্ম। অতএব Home Department শাসনবিভাগ বলা সঙ্গত।

Engineer—(Civil and Irrigation) বাস্তুকার॥ ইহা চলিতে পারে না, ভুলও হইয়াছে। বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রগ্রাহী Engineer তিনি 'সর্বকর্মবিশারদ, সূত্রদণ্ডপ্রপাতজ্ঞ, মানোন্মানপ্রমাণবিৎ' ইত্যাদি। যাহাতে লোকে বাস করে তাহা বস্তু বা বাস্তু। যে ভূমিখণ্ডে বাস করে তাহা বাস্তু। তদুপরি নির্মিত যাহা কিছু, সে সব বস্তু, Structures, এইরূপে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বাস্তু শব্দের অর্থ গৃহ, ক্ষেত্র, আরাম, সেতুবন্ধ, তড়াগ ও আধার করিয়াছেন। এই সকলের নির্মাণের নাম শিল্প ছিল। তদনুসারে শ্রীসুকুমার শিল্পরত্ন নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যাহারা নির্মাণ করে তাহারা শিল্পী। শিল্পী চতুর্বিধ,—স্থপতি, সূত্রগ্রাহী, তক্ষক ও বর্ধকী। প্রতিমা-নির্মাণ ও চিত্রকলাও শিল্প। শুক্রনীতি-সারেও সেই অর্থ। যথা—"প্রাসাদ প্রতিমারামগৃহবাপ্যাদি সংকৃতিঃ," যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার নাম শিল্প শাস্ত্র। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে, যেমন বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, শিল্পজীবী নয় জন,—কর্মকার, স্বর্ণকার, কাংসকার, চিত্রকার ইত্যাদি। উত্তর-ভারতে, যেমন আলমোড়ায়, শিল্পকার শব্দ প্রচলিত আছে। যেখানে শিল্পকার অর্থে বঙ্গদেশের ছুতার। অতএব Engineer শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। Engineer নানাপ্রকার আছেন। Mechanical Engineer, Chemical Engineer, Electrical Engineer ইত্যাদি সকল Engineerই শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। বাস্তুকার নামে আর এক আপত্তি আছে। বাস্তু শব্দের প্রচলিত অর্থ, গৃহ নির্মাণযোগ্য ভূমি। এই অর্থ অমরকোশে আছে, অন্য অর্থ নাই। বাস্তুকার বলিলে বুঝাইবে, যিনি গৃহনির্মাণযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করেন।

এই সঙ্গে Industry শব্দেরও একটা প্রতিশব্দ চাই। Industry কেবল শিল্প নহে। Agricultural Industry, Fishing Industry, Mining Industry প্রভৃতিকে শিল্প বলিতে পারি না। শিল্প বস্তুনির্মাণে। কিন্তু কৃষিকর্মে শিল্প কোথায়? Industry কেবল manufacture নয়, occupation business বা tradeও বুঝায়। সংস্কৃতে অবিকল 'ব্যবসায়'। ব্যবসায় কেবল বাণিজ্য নয়। আমরা Trade অর্থে ব্যবসা বা ব্যবসায় বলি বটে, কিন্তু manufactureও বুঝি। Manufacture অর্থে কলা পদ প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিদত্ত পদার্থের রূপান্তর-করণের নাম কলা। শুক্রনীতিসারে কলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কলা অসংখ্য। যেমন, কাচকলা glass manufacture, বস্ত্রবয়ন কলা textile Industry ইত্যাদি। Cottage Industry শব্দের সংস্কৃত নাম কৌটকলা। পাণিনিতে কৌট শব্দ আছে। কৌটতক্ষ স্বাধীন ছুতার। কলা art. Manufacture মাত্রেই art. সমুদ্র-জল শুকাইয়া লবণ পৃথক করা একটা art, শিল্প নয়। নৃত্য-গীত-বাদ্য শিল্প নয়, কলা। Fine art ললিতকলা না বলিয়া কান্তকলা বলিলে ভাল হয়।

Labour—শ্রম॥ এখানে Labour শব্দ দ্বারা নিশ্চয় Labourer বা Labouring class উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলেই শ্রম করি, আমরা সকলেই শ্রমিক, কিন্তু Labourer নই। বাংলায় বেরুনিয়া শব্দ প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, অদ্যাপি বাঁকুড়ায় আছে। ভরণীয় শব্দ হইতে বেরুনিয়া; wages ভরণ। কাজেই যে ভরণ করে সে ভর্তা, employer ধনিক ও ভৃতিক, দুইটি শব্দ একত্র না পাইলে, ভৃতিক যে labourer, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভৃতি, ভাতা pension, allowance ইত্যাদি। ভূমি, ভর্তা, ভৃতিক বা ভরণীয়, এই তিন ভ কার পণ্য-উৎপাদনের ত্রিপাদ। ইহাদের সহিত সামাযোগ (organization) পাইলেই পণ্য-উৎপাদন চলিতে থাকে। কিন্তু বাংলায় ভর্তা শব্দ চলিবে না। অতএব ধনিক ও ভৃতিক, অথবা ধনিক ও শ্রমিক, রাখাই ঠিক হইবে। কর্মী worker, কার্মিক workman, কারু Artisan.

Librarian—গ্রন্থাগারিক॥ গ্রন্থপাল বলা ভাল।

৬০।৭০ বৎসর পূর্বে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবাণু ইত্যাদি নাম চলিতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞান দ্রুত বাড়িতেছে। এখন এ সকল শব্দ আমাদের জ্ঞানের অনুগামী হইতেছে না। রাজাজ্ঞা দ্বারা এইরূপ নাম বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য হইবে না। Chemist প্রাণরসায়নী॥ পড়িলে প্রাণরসায়নী বটিকা মনে আসিবে। শ্রুতিরসায়নী ভাষা, নেত্ররসায়নী শোভা বলা অপ্রচলিত নয়। শুধু রসায়ন বলিলে আয়ুর্বেদের রসায়ন মনে হয়। রসায়নবিদ্যা বলিলে রস (পারদ) হইতে কোন রকমে টানিয়া Chemistry বুঝাইতেছে। তেমনই পদার্থবিদ্যা না বলিয়া শুধু পদার্থ বলিলে অন্য অর্থ হইয়া যায়। Physicist অর্থে পদার্থী বলাও চলে না। প্রাণ কি কোন বস্তু যে তাহার রসায়ন থাকিবে?

Pathology—বিকারতত্ত্ব॥ ঠিক মনে হইতেছে না কিসের বিকার? বোধহয় রোগতত্ত্ব। Pathogenic রোগজনক।

Professor—অধ্যাপক॥ অধ্যাপক টোলের। তাঁহারা ধনবানের শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হন। তাহাদের এই সামান্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করা উচিত হইবে না। এতকাল Professor শব্দে অধ্যাপক চলিতেছিল বটে কিন্তু এক্ষণে রাজানুমোদিত হইয়া উপাধিস্বরূপ হইতেছে। অমুক কলেজের অধ্যাপক বলা যে কথা, অধ্যাপক অমুক বলা সে কথা নয়। Professor অধিশিক্ষক।

Lecturer—উপাধ্যায় ॥ উপাধ্যায় বৃত্তিভোগী ছিলেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষা শিখাইতেন না। Lecturer বরং অন্ত্যাশিক্ষক, Secondary School teacher মধ্যশিক্ষক, Primary School teacher আদ্যশিক্ষক।

Post and Telegraph—প্রৈষ ও তার—Postmaster General মহাপ্রৈষাধিকারিক ; বড় ডাক কর্তা—প্রৈষ শব্দ চলিবে না, ঠিকও হয় নাই। ডাক শব্দ রাখিতেই হইবে। কিন্তু Post office, Post master কই ? Post office ডাকঘর ; Post master ডাক কর্তা ; Post master General ডাকের অধিকর্তা।

দেখিতেছি কয়েকটা সামান্য শব্দও পারিভাষিক হইয়াছে। যেমন, Bearer, বাহক, বেহারা ॥ Bearer বাহক বটে, কিন্তু বেয়ারা নয়, বেহারা। Peon পিয়ন, চাপরাসী ॥ সকল পিয়ন চাপরাস রাখে না। যাহারা চাপরাস রাখে, তাহারাও পিয়ন নামে তুষ্ট হয়। Bottle washer বোতল ধাবক ; কুপী ধাবক ॥ এই শব্দে সংস্কৃত প্রীতির আতিশয্য হইয়াছে। আমি বলি বোতল-ধুইয়ে। Telegraphic—তারিক ॥ এখানে বাংলা শব্দে সংস্কৃত ইক প্রত্যয় হইয়াছে। যদি এইরূপ শব্দ চলিতে বাধা না হয়, তবে Constable পাহারওয়ালা না হইয়া পাহারী (প্রহরী) হইতে পারে। Gasman গ্যাসী। যেমন, দপ্তরী, কাগজী ইত্যাদি।

Officer অধিকারিক ॥ কিন্তু office কই ? বোধহয় এই শব্দের প্রতিশব্দ অধিকার। যদি তাহাই হয়, তবে officer অধিকারী করিলে দোষ কি ? কিন্তু অধিকার শব্দ এত অধিক প্রচলিত যে তদ্দ্বারা office বুঝাইবে না। Government office রাজকার্য, রাজকার্যালয়। officer কার্যচারী কর্মচারী শব্দ বহু প্রচলিত। Clerk করণিক না করিয়া করণী করিলে ভাল হয়। সংস্কৃত করণ = কায়স্থ = Clerk আছে।

এইরূপে তালিকার শব্দ বিচার করিবার অবসর নাই, স্থানও নাই। সামন্তরাজ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যাইবে। উড়িষ্যায় দেখিয়াছি রাজার ব্যবহর্তা, চলিত ভাষায় বেঅর্তা, আছেন। তিনি রাজার Secretary, ছামুকরণ অর্থাৎ সম্মুখকরণ রাজার জমাখরচ লেখেন। গঁতাঘর Treasure house, সংস্কৃতগ্রন্থ ধন শব্দ হইতে গঁতা। বাঁকুড়ায় গঁতাইত রাজার Store keeper, ইত্যাদি।

পরিভাষাসংসদ সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া মনে মনে আশা করিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত হইবে। কিন্তু বহু প্রচলিত কোন কোন ইংরাজী নাম রাখিতেই হইবে। বিশেষতঃ সে-সকল সংস্কৃত শব্দ হ্রস্ব নয়, সুখোচ্চার্য নয়, সুবোধ্য নয়, সে সকল শব্দ চলিবে না।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৬

সাম্প্রতিক ভাবনা

অন্নদাশঙ্কর রায়
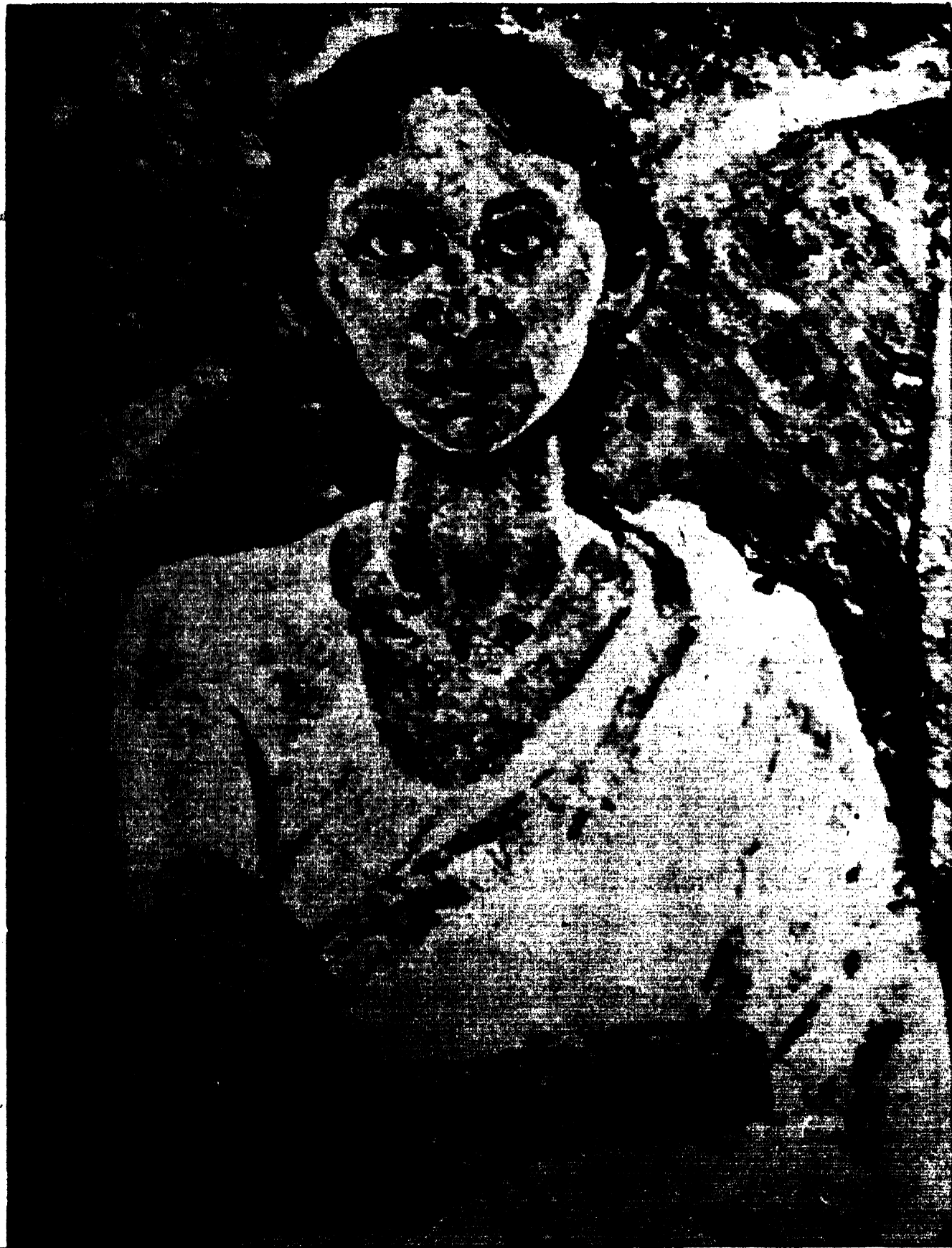
দুই শতাব্দী

পিতাপুত্রের বা গুরুশিষ্যের পরম্পরার মতো পূর্বের শতাব্দীর সঙ্গে পরের শতাব্দীরও একটি পরম্পরা থাকে। পরম্পরাসূত্রে বিংশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দীর কাছ থেকে কতকগুলি আইডিয়া আর আইডিয়াল পেয়েছে। যথা, ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রাসি, সোশিয়ালিজম, সেকুলারিজম, বিবর্তনবাদ, বিপ্লববাদ। এগুলি বিভিন্ন দেশে পরীক্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে। দেশ অনুসারে বিচিত্র হয়েছে। মাটি অনুসারে যেমন ফুল বা ফল।

ন্যাশনালিজম ভারতে এসে প্রথমে বোঝায় হিন্দু ন্যাশনালিজম। তারপরে বেঙ্গলি ন্যাশনালিজম। তারপরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম। তারপরে মুসলিম ন্যাশনালিজম তথা পাকিস্তানি ন্যাশনালিজম। তারপরে বাংলাদেশি ন্যাশনালিজম। পরিশেষে শিখ ন্যাশনালিজম তথা খালিস্তানী ন্যাশনালিজম। শেষেরটা এখনও সফল হয়নি, কিন্তু কে জানে হয়তো একবিংশ শতাব্দীতে সফল হবে।

তেমনই, মার্কসবাদ একপ্রকার রূপ নেয় রুশদেশে। যে দেশে সোভিয়েট বলে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু পার্লামেন্ট বলে অন্য একটা প্রতিষ্ঠান ছিল না। মার্কসবাদ ব্রিটেনে সফল হলে পার্লামেন্টারি রূপ নিত। পার্লামেন্টকে নস্যাৎ করে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত না। ভারতে হয়তো পঞ্চায়েতী রূপ ধারণ করত, কিন্তু ইতিমধ্যে পার্লামেন্ট এসে মাটি দখল করেছে। আমাদের মার্কসবাদীরা এর প্রভাব থেকে মুক্ত নন। সফল হলে তাঁরা পার্লামেন্টকেই মার্কসবাদের বাহন করবেন বলে মনে হয়।

তবে পার্লামেন্ট এ দেশে এখনও শিকড় পায়নি। কেন্দ্র রাজ্যগুলিতে কথায় কথায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করে। নির্বাচন বছরের পর বছর পিছিয়ে যায়।

সেকুলারিজম বলতে এক এক দল বোঝে এক এক জিনিস। যারা ঈশ্বর মানে না তারা ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি ব্যবহার করে না। তাদের মতে সেকুলার স্টেট হবে ধর্মবিরহিত রাষ্ট্র। যেমন ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন। অপর দৃষ্টান্ত কমিউনিস্ট চীন। কংগ্রেস ততদূর যেতে রাজি নয়। কংগ্রেস নিরীশ্বরবাদীদের ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে বাধ্য করে না, তাঁরা তার বদলে সত্যপাঠ করেন। আর সকলে ঈশ্বরের নামে শপথ নেন। এটা গত শতাব্দীতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বীকৃত হয় ব্র্যাড্‌ল যখন বার বার নির্বাচিত হয়ে বার বার ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে নারাজ হন। তখন থেকে আমাদের আদালতেও ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে নিরীশ্বরবাদীরা বাধ্য নন। তাঁরা সত্যপাঠ করেন।

পাশ্চাত্য দেশেও বিবর্তনবাদ মেনে নিতে বহু লোক অনিচ্ছুক। তাদের বলা হয় ফান্ডামেন্টালিস্ট। তারা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর নিজের আদলে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন। ডারুইন বলেন কিনা বাঁদরের আদলে! বাইবেলকে বিশ্বাস করবে না বিজ্ঞানকে? নিশ্চয় বাইবেলকে।

রাজার ধর্মই রাজ্যের ধর্ম। এটাই চিরকালের প্রচলিত নিয়ম। রাজতন্ত্র যে সব দেশ থেকে উঠে যায় সে সব দেশে রাজধর্ম থাকে কার ইচ্ছায়। সর্বসাধারণের ধর্ম যদি এক হয়ে থাকে তবে সর্বসাধারণের ইচ্ছায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায় হলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি অবিচার ঘটে। সংখ্যালঘিষ্ঠ তখন দেশ ছেড়ে পালায়। দেশের অর্থনীতি বিনষ্ট হয়। তখন ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে স্থির করতে হয় যে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কোনও রাষ্ট্রধর্ম নেই। তেমন রাষ্ট্র ধর্মরাষ্ট্র নয়। তা বলে সে রাষ্ট্র ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধীও নয়।

এই যে নতুন তত্ত্ব এটা প্রথমে শোনা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পূর্বেই অনুসৃত হয় আমেরিকার সদ্য স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর বিপ্লবী ফ্রান্সে। বিস্তর টানাপোড়েনের পর আরও অনেক রাষ্ট্রে। আমাদের এই ভারত রাষ্ট্রেও।

কিন্তু এখনও আমাদের হিন্দুরাষ্ট্রবাদীদের মানসিক পরিবর্তন হয়নি। তাঁরা আমাদের প্রজাতন্ত্রী সংবিধানের মাথায় একজন রাজাকে বসিয়ে দিতে পারছেন না। দাবিদার পাঁচশো জন দেশীয় রাজা। তাঁরা মুকুটহীন। তার মানে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের রাজনীতিক হিন্দুরাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হবেন ও তাঁর ধর্মই হবে রাষ্ট্রধর্ম। আর সেই সুবাদে ভারত রাষ্ট্র হবে হিন্দু রাষ্ট্র।

এরূপ রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা থাকতে পারে না। প্রত্যেকটি সাধারণ নির্বাচনই হবে এক একটি ওয়ার অব সাকসেশন। রাজা মারা গেলে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু রাজা অপুত্রক হলে ঘোর বিবাদ বেধে যায়। দত্তক পুত্রকে রাজভ্রাতারা মানতে চান না। ব্রিটিশ আমলে বড়লাটরাই হস্তক্ষেপ করে নিষ্পত্তি করতেন। আজকের ভারতে নিষ্পত্তি করবেন কে, যদি খোদ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনই বিতর্কিত হয়।

ধরেই নেওয়া গেল যে অহিন্দুরা কোনও পক্ষে নয়। কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে সিংহাসনের জন্যে লড়াইয়ে জনমত দু-ভাগ বা তিন ভাগ হয়ে যেতে পারে। তখন কি দেশ দু-ভাগ কি তিন ভাগ হবে!

রামচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পর রামরাজ্যও দু-ভাগ হয়ে যায়। লব আর কুশ ভাগাভাগি করে নেয়। গোটা হিন্দুশাসিত যুগটাই বহু রাজ্যে বিভক্ত রাজতন্ত্রের যুগ। তামিলনাড়ু ও অসম চিরকালই দিল্লি বা পাটলিপুত্রের রাজচক্রবর্তীদের এলাকার বাইরে ছিল। অথচ তখনকার দিনের আফগানিস্তান ছিল তাঁদের কারও কারও সাম্রাজ্যের অঙ্গ। সেখানকার প্রজারা ছিল হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ। সুলতান মামুদের রাজত্বে যারা বাস করত তাদের অধিকাংশই হিন্দু বা বৌদ্ধ। তেমনই সুলতানি আমলে বাংলায় যারা বাস করত তারাও ছিল হিন্দু বা বৌদ্ধ।

আগামী শতাব্দীতে বাংলাদেশ কি হিন্দুশূন্য হবে? হওয়া বিচিত্র নয়। সাতচল্লিশ সালে হিন্দু সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা তিরিশ। অর্ধ শতাব্দী যেতেই সংখ্যানুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা দশ। এই হারে কমতে থাকলে

শতকরা এক হতে আর তিরিশ বছরও লাগবে না। সেই একজন বোধহয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ। যেমন ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের হিন্দু। বাদ বাকি মুসলমান।

সেকুলার স্টেট হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ। আমাদের রাষ্ট্র সেকুলার বলেই এ দেশে এত বেশি মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ বাস করে। একে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করলে কয়েক দশকের মধ্যে এ দেশ ধর্মীয় সংখ্যালঘুশূন্য হবে। তারা বিদ্রোহী হয়ে ভারতকেই খণ্ড খণ্ড করবে। কাশ্মীর হবে মুসলিম রাষ্ট্র, পাঞ্জাব শিখ রাষ্ট্র, নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরাম খ্রিস্টান রাষ্ট্র। মেঘালয়ও তাই। গোয়াও তাই। হিন্দুদের মধ্যেও তো শাক্ত বৈষ্ণব আছে। অসমের ইতিহাসে শাক্ত বৈষ্ণব কলহ বিদেশি ও বিধর্মী হস্তক্ষেপ ডেকে আনে। প্রথমে বর্মী, পরে ব্রিটিশ।

আমার নাতি বলে, "তুমি কি নৈরাশ্যবাদী"? আমি তার প্রশ্নের উত্তরে বলি,"বাংলাদেশের সবাই মুসলমান হলেও সবাই বাঙাল থাকবে। ওরা আমাদের জাতভাই। ভাষার জন্যে ওরা প্রাণ দিয়েছে। দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। ওদের উন্নতিতে আমাদেরও উন্নতি। আমি আশাবাদী।"

তবে আমাদের নীতিতে আমরা দৃঢ় থাকব। একজন মুসলমানকেও ভারত ছাড়তে বলব না। মুসলমানের সংখ্যানুপাত মোটের উপর একই রকম আছে। তাদের প্রধান অভিযোগ চাকরি-বাকরিতে বাছবিচার নিয়ে। কেবল ধর্মাচরণ নিয়ে যেটুকু অসুবিধে আছে সেটুকু মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে কিংবা গো কোরবানি নিয়ে। তবে মসজিদ ভঙ্গ একটা গুরুতর ব্যাপার। এর পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতেই হবে। পুনর্নির্মাণ বড় শক্ত বিষয়।

আজকাল বাংলাদেশ থেকে মুসলিম কন্যারা এসে হিন্দুদের বাড়িতে কাজের মেয়ে হচ্ছে। অনেকে স্বনামে, অনেকে ছদ্মনামে। বোম্বাইতে, দিল্লিতে এদের সংখ্যা হাজার হাজার। সে দিন কলকাতার এক বন্ধু বললেন যে তাঁর পাড়ায় সীতা বলে একটি মেয়ে কাজ করত। একদিন এক অচেনা পুরুষ এসে তাকে রাবেয়া বলে ডাকে। কী সর্বনাশ। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের জাতধর্ম গেল। সীতাকে বনবাসে পাঠানো হল। দিনকয়েক বাদে ব্রাহ্মণী কেঁদে বলেন সীতাকে খুঁজে আনতে। সীতাকে বলা হল সে রান্নাঘরে ঢুকতে পারবে, কিন্তু ঠাকুরঘরে নয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণী তার হাতে খাবেন, কিন্তু ঠাকুরকে খেতে দেবেন না।

বোম্বাইতে আমার এক আত্মীয়ার বাড়িতে মরাঠা মেয়েরা সব কাজ করবে না, করলে অসম্ভব মাইনে চাইবে। বাংলাদেশের মুসলিম মেয়ে ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, রান্না করে, বিছানা পাতে, সেবা করে, দিনরাত খাটে, কিন্তু মাইনে যা নেয় তা মরাঠাদের চেয়ে ঢের কম। তাই জাত-ধর্ম যায় না, শিকেয় তোলা থাকে।

এই অনুপ্রবেশকারীদের গৃহস্থরা কেউ বিদায় করতে রাজি নয়, এদের পক্ষ নিয়ে হিন্দুরাষ্ট্রবাদীদের বাধা দেয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এদেরই মতো লক্ষ লক্ষ মেক্সিকান বা পোর্টোরিকান কাজের লোক আছে। সবাই জানে, কিন্তু চোখ বুজে থাকে। জার্মানি ভরে গেছে তুর্কী, পোল, রোমানিয়ান ও যুগোস্লাভ কাজের লোকে। নয়া নাৎসীরা মেরে তাড়াতে চায়, জনসাধারণ বিদেশিদের পক্ষ নেয়। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সরকারকে অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে।

আগামী শতাব্দীতে এটাও হবে আমাদের ভাবনার বিষয়। যেখানে প্রাকৃতিক সীমান্ত বলে কিছু নেই, কৃত্রিম সীমান্ত কেবল মানচিত্রেই আবদ্ধ সে দেশে অনুপ্রবেশ রোধ করতে যাওয়া আলো-বাতাসের প্রবেশ বন্ধ করার মতো অসম্ভব। কাঁটাতারের বেড়া ইত্যাদি কোনও কাজের নয়। ডিপোর্টেশনের জন্যে আদালতের সাহায্য নিতে হবে। আদালত চাইবে পুলিশি তদন্ত। পুলিশ কী করে বলবে সীতা মেয়েটি হিন্দু নয়, মুসলমান। আর তার জন্মস্থান কোচবিহারের একটি গ্রামে নয়, রংপুরের একটি গ্রামে। সত্যমিথ্যা যাচাই না করে আদালত রায় দেন না। যেহেতু ধর্মে মুসলমান সেহেতু বাংলাদেশি নাগরিক এটা কুযুক্তি। যেহেতু হিন্দু সেহেতু ভারতের নাগরিক এটাও কুযুক্তি। আদালত সীতাকে পুলিশ হেফাজতেও রাখবেন না, জেল হেফাজতেও না, জামিনে খালাস করবেন, জামিন হবে সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনও একজন। সীতা তাঁকে বিরিয়ানি রেঁধে খাওয়াবে। চাইকি মোরগ মোসল্লম।

আদালতের হুকুমে যদি বা ডিপোর্ট করা গেল তবু বাংলাদেশ সরকার স্বীকার করবেন না যে সে আসলে রাবেয়া ও রংপুরের মেয়ে। তাঁরা তাকে ঢুকতেই দেবেন না। সে যেন একটা ফুটবল। এপার থেকে ওপারে কিক করে পাঠালে ওপার থেকে কিক খেয়ে এপারে পড়বে। ওপারের আদালতও হয়তো বলবেন যে সীতা ওরফে রাবেয়া বাংলাদেশের নাগরিক বলে প্রমাণিত হয়নি। তার কোনও আত্মীয় তাকে দাবি করছে না। সে পানিকে জল বলে। চেরাগকে পিদিম বলে। অতএব সে হিন্দু।

অমন যে ফরাসি ও জার্মান, যাদের মধ্যে নেপোলিয়নের সময় থেকে হিটলারের সময় পর্যন্ত মারামারির সম্পর্ক, তাদের মধ্যে এখন গলাগলি বন্ধুতা। যাতায়াতে পাসপোর্ট লাগে না, ভিসা লাগে না, একখানা আইডেনটিটি কার্ডই যথেষ্ট। দু-পক্ষই আগ্রহের সঙ্গে ইকনমিক কমিউনিটি গড়ে তুলছে। আরও দশটা দেশ তাদের সাথী। আরও কয়েকটা দেশ যোগ দিতে পারে। মানুষ চিরকাল মানুষের শত্রু থাকে না। ক্যাথলিক প্রটেস্টান্ট তো হিন্দু-মুসলমানের চাইতেও বেশি নরহত্যা করেছে, সম্পত্তি ধ্বংস করেছে। কেই বা সে সব কথা মনে রাখতে চায়। একবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানও বিংশ শতাব্দীর ঝগড়াঝাটি ভুলে যাবে। ধর্ম ভাগ হয়েছে, সমাজ ভাগ হয়েছে, দেশ ভাগ হয়েছে, কিন্তু লোক পুরোপুরি ভাগ হয়নি, হবেও না। হিন্দুরাই মুসলমানদের ছেড়ে দেবে না, মুসলমানরাই হিন্দুদের জড়িয়ে ধরবে। ভাষাও একটা শক্তি। সংস্কৃতিও একটা শক্তি। এ সব শক্তিও সক্রিয়।

আমি তা হলে নৈরাশ্যবাদী নই, আশাবাদী। তবে আমিও মনে করি দুই বাংলা ফের জুড়ে যাবে না, আলাদাই থাকবে। এটা নৈরাশ্যবাদ নয়, বাস্তববাদ। হল্যান্ড-বেলজিয়ামকে নেপোলিয়ন জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পতনের পর জোড় খুলে যায়। সম্প্রতি তারা লুকসেমবার্গের সঙ্গে মিলে বেনেলুক্স জোট গড়ে তুলেছে। ভবিষ্যতে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলে ভাপাবা জোট গড়ে তুলতে পারে। সেটাই বোধহয় ইতিহাসের বিধান।

আপাতত আমাদের কাজ খারাপকে আরও খারাপ হতে না দেওয়া। বরঞ্চ খারাপকে ভালো করতে উদ্যোগী হওয়া। তার মানে সীতাকে আপনার করে নেওয়া। সে হিন্দু হবে না, হওয়া উচিতও নয়। কিন্তু সে আমাদেরই একজন হতে পারে, হতে চায়ও। কেন আমরা তাকে পুলিশের হাতে সঁপে দেব। কেনই বা হিন্দু মৌলবাদীরা তাকে গায়ের জোরে ধরে নিয়ে ওপারে চালান করে দেবে।

সীতা ভোট দেবার অধিকার চায় না, বেঁচে থাকার অধিকার চায়। সেটা মানবিক অধিকার। যারা নিজেদের জন্যে মানবিক অধিকার প্রত্যাশা করে তারা অন্যদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

সীতা থাকতে আসেনি। সে মা-বাবাকে দেখতে মাঝে-মাঝে বাংলাদেশে যায়। ফিরে আসার সময় দালালদের মারফত রক্ষীদের জলপানি দেয়। পাসপোর্ট-ভিসা লাগে না। ভারতের জনসংখ্যা সত্যিই তো বাড়ছে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জুজুর ভয় মিছে।

লন্ডনে দেখেছি আইরিশরা দিব্যি কাজকর্ম করছে। যেতে-আসতে ও থাকতে লেশমাত্র বাধানিষেধ নেই। কয়েক বছর আগেও ভারতীয়দের বেলাও বাধানিষেধ ছিল না। মাত্রা ছাড়িয়ে না গেলে বাধানিষেধ আরোপ করা হত না। যারা যায় তারা থাকতেই যায়। আপত্তির কারণ সেটাই। মানবিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার দুই স্বতন্ত্র জিনিস। নাগরিক অধিকার দিতে ভারত সরকার অসম্মত। সীতাকে রেসিডেন্ট পারমিট নিতে হবে।

এবার বলি বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের কথা। যারা চলে এসেছে তারা হিন্দুত্ব রক্ষা করেছে, কিন্তু সবাই তো পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই পায়নি, ঠাঁই পেলেও জীবিকা পায়নি। যারা অন্যান্য রাজ্যে বসতি করেছে তারা বাঙালিত্ব হারিয়ে ফেলছে। তাদের ছেলেমেয়েরা হিন্দি তো শিখছেই, তা ছাড়া একটি আঞ্চলিক ভাষাও শিখছে। নয়তো স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। কোথাও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। যদি বা তার একটা কিনারা হল তার পরে দেখা গেল শিক্ষক আছে, ছাত্র বা ছাত্রী নেই। তারা বরং ইংরেজি শিখবে, তাতে লাভ আছে।

সব হিন্দু ওপার থেকে এপারে চলে আসুক এই যাদের পলিসি তারা হিন্দুকে রাখবেন, কিন্তু বাঙালিকে মারবেন। ভগবান বাঙালিকে তার বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

ষাট বছর আগে আমি সপরিবারে উত্তর ভারত ভ্রমণে যাই। কিন্তু দিল্লি থেকে ফিরে আসি। পাঞ্জাবে যাইনে। কারণ সে প্রদেশ ছিল তখনই সাম্প্রদায়িক বিরোধে উত্তপ্ত। অথচ তার তুলনায় তখনকার অবিভক্ত বঙ্গ শীতল। লোকাল বোর্ড নির্বাচন, ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচন দুটোই ছিল যৌথ নির্বাচন।

হিন্দুর ভোটে মুসলমান ও মুসলমানের ভোটে হিন্দু নির্বাচিত হতেন। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী তিনটে জেলাই ছিল মুসলিমপ্রধান। অথচ তিনটে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা ছিলেন হিন্দু। কিন্তু দৃশ্যটা বদলে যায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নির্বাচনের পর থেকে। সে সব নির্বাচন স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির। মুসলিম লিগ তা সত্ত্বেও কৃষক প্রজা পার্টির মুসলমানদের হারিয়ে দিতে পারেনি। সেই পার্টির সভাদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন। যেমন জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনীকুমার দত্ত। তাই সেটা একটা সেকুলার পার্টি।

পাকিস্তানকে নির্বাচনের ইস্যু করার ফলে মুসলিম লিগ দশ বছর বাদে বিজয়ী হয়। কিন্তু নেতারা কেউ এমন কথা বলেননি যে পাকিস্তান হলে হিন্দুরা সবাই দেশত্যাগ করবে বা মুসলমানরা সবাই সে দেশে জড়ো হবে। লোকবিনিময় শব্দটা প্রথমে উচ্চারণ করেন জিন্না সাহেব। নোয়াখালির প্রতিক্রিয়ায় বিহারে দাঙ্গা বাধার পর। কিন্তু সেই একবারই। পাকিস্তান প্রাপ্তির পর সেই তিনিই হিন্দুদের অভয় দেন। তাঁর কথা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সকলেই পাকিস্তানি নাগরিক। ধর্ম যার যার ঘরোয়া ব্যাপার।

তা সত্ত্বেও পাঞ্জাবে লোকবিনিময় ঘটে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। পটভূমিকা উত্তপ্ত ছিল অনেক আগে থেকে। যেটা সে প্রদেশে স্বাভাবিক ছিল সেটা বঙ্গ প্রদেশে অস্বাভাবিক। তাই লোকবিনিময় গোড়ার দিকে ছিল স্বেচ্ছাকৃত ও ব্যক্তিগত। তাকে সমষ্টিগত করে তোলা হয় ক্ষেপে ক্ষেপে। খুব কম মুসলমান যায়, খুব বেশি হিন্দু আসে। এর নাম বিনিময় নয়। বিতাড়ন বা বর্জন। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লিগ সরকারের পতনের পর যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। হিন্দুর ভোটে মুসলমান নির্বাচিত হয়, মুসলমানের ভোটে হিন্দু। আরও পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তখন সে দেশ হয় ধর্মনিরপেক্ষ। হিন্দুদের চলে আসার কোনও কারণই থাকে না। তা সত্ত্বেও কতক হিন্দু চলে আসে। সেটা অবশিষ্ট হিন্দুদের স্বার্থের পরিপন্থী। তারা আরও সংখ্যালঘু হয়ে যায়। হতে হতে শতকরা দশজন। কী করে তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে। এই একরোখা নীতির পক্ষে যাঁরা আছেন তাঁরা চান এপার থেকে মুসলিম বিতাড়ন। সেটা ভারতের নীতি নয়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ।

দেশভাগ হয়েছে, প্রদেশভাগ হয়েছে, কিন্তু লোকভাগ পুরোপুরি হয়নি, হবেও না। এইখানে দাঁড়ি টানতেই হবে। সম্ভব হলে স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতে হবে। হিন্দুরা ফিরে যাবে, মুসলমানরা ফিরে আসবে। উভয় রাষ্ট্রই হবে ধর্মনিরপেক্ষ।

সুধী প্রধান

শতাব্দীর নাট্য আন্দোলন

শতাব্দীরও জন্মকাল আছে। গত শতাব্দীর নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আরও ষাট বছর পিছিয়ে যেতে হবে। যখন ইং ১৮৩১ খ্রিঃ ৩১শে সেপ্টেম্বর একটি সভায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইউরোপীয় নাট্যশালার আদর্শে Hindu Theatrical Association গঠন করেন। এই সভার তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রথমটিতে বলা হয় যে প্রচলিত প্রমোদের রুচিবিকারের জায়গায় এই থিয়েটার একই সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষার উপায়-স্বরূপ ব্যবহৃত হবে। ডিরোজিও সম্পাদিত 'East Indian' পত্রিকায় এই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের সংবাদ দেওয়া হয়। 'সমাচার পত্রিকা'ও সংবাদটি প্রকাশ করে লেখে "ঐ নর্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়দের রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যেসকল নাটকের ক্রিয়া হইবে সেসকলই ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়"। এক ইংরেজ শিক্ষকের অধীনে শিক্ষালাভ করে হিন্দু থিয়েটার ইংরেজি ভাষায় 'Julius Ceaser'-এর অংশবিশেষ আর অনূদিত 'উত্তররামচরিত' ১৮৩১ খ্রিঃ ২৮শে ডিসেম্বরে অভিনয় করে। পাঠকদের লক্ষ করতে বলি শেক্সপীয়র ও ভবভূতির এইরূপ সহ-অবস্থান বেশিদিন ছিল না, থাকতে পারেও না। ভারতীয় ধনীকশ্রেণীর সঙ্গে ব্রিটিশের যে দ্বন্দ্ব পরবর্তী যুগে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করতে বাধ্য করেছিল সে সংগ্রামের সাংস্কৃতিক ইঙ্গিত এখান থেকেই পাওয়া যায়।

সে যুগে কলকাতার থিয়েটারের প্রধান ক্ষেত্র ছিল সাহেবদের থিয়েটার। এই থিয়েটারে দু-একটি বাঙালি অভিনেতাও যোগ দিয়েছে। কিন্তু দর্শক প্রধানত ছিলেন, ইউরোপীয়রা ছাড়াও ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার ও উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক। আমি ইচ্ছে করেই ১৭৯৫ খ্রিঃ রুশব্যবসায়ী ও সমাজতত্ত্ববিদ গেরাশিম লেবেডফের থিয়েটারের কথা আলোচনা করিনি। যদিচ তিনি বাংলায় অনূদিত বিলাতি নাটক টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করিয়েছিলেন। কারণ লেবেডফ সম্পর্কে আলোচিত, বাংলা ভাষায় প্রচলিত যে নাট্য-ইতিহাসগুলি বাজারে বিক্রয় হয় তা ভুলে ভরা এবং সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। আমি আশা করি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নাট্য আকাডেমি এ কাজ করবে।

ওই যুগের কলকাতার থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইংরেজের তৈরি নতুন জমিদারশ্রেণী। তারা ইংরেজি নাটকের সঙ্গে ইংরেজিতে অনূদিত সংস্কৃত নাটকের সেইগুলিই বেছে নিয়েছিলেন যেগুলিতে তাঁরা ইংরেজ দর্শকদের বলতে পারতেন যে নানা বিষয়ে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের বিষয়ে ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্য কম প্রগতিশীল নয়। উত্তররামচরিত বা কলহনের রাজতরঙ্গিণীর বিষয়বস্তুতে তা প্রমাণ করা গিয়েছিল। জমিদাররা সেযুগে একই সঙ্গে ইংরেজের তোষণ এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নিজেদের সংঘটিত করার চেষ্টা শুরু করেছিল। পাইকপাড়ার জমিদার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বাসভবনে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীকুমার রায় প্রমুখ পঞ্চাশ জনের উপস্থিতিতে ১৮৫১ সালে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। হেতুনির্দেশ করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয় সম্পত্তির ভোগদখলের অধিকার ও মালিকানার ওপর ইংরেজ আইনের অযথা হস্তক্ষেপ ও বিচার বিভাগের কিছু কিছু কর্মচারীর পক্ষপাতমূলক আচরণ ইংরেজ শাসন সম্পর্কে আশাভঙ্গের কারণ হয়ে উঠেছে। অতএব তার প্রতিরোধ করে দেশের উন্নতিবিধান করা সবার উদ্দেশ্য। এর দেড় মাসের মাথায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা তৈরি হয় যার সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সভাপতি রাধাকান্ত দেব অর্থাৎ প্রগতিপন্থী ও রক্ষণশীল---উভয় দলই এখানে মিলিত হলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সেযুগের থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক।

বিদেশি ভাষায় নাটক করার থেকে বাংলা ভাষায় নাটক করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাবান্বিত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা বারবার দাবি জানায়। এই যুগে ১৮২২ সাল থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত রচিত বাংলা নাটক হল 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী', 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুকসর্বস্ব' এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। ১৮৫২ সালে যোগেন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন', ১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটক ছাপা হয়।

১৮৫৩ সালেই ভারতে যুগান্তকারী ঘটনা---রেলপথ নির্মাণ ও টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনা শুরু হল। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার আদেশ দেওয়া হল এবং কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হল। বড় বড় সরকারি বাড়ি, পথঘাট নির্মাণ ও জলনিকাশের জন্য খাল কাটার ব্যবস্থা হল। এইসব কাজে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর চাকরিতে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পেল। ফলে দেশীয় রাজাদের বাইরে যে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী কলকাতা শহরে জমা হল তারা বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে যে সামাজিক আন্দোলন চলছিল সেইসব আন্দোলনের বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' থেকে শুরু করে ১৮৭২ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও 'জামাইবারিক' পর্যন্ত শতাধিক নাটক রচিত হয়েছে যার মধ্যে মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' রয়েছে। নীলদর্পণের বিষয়বস্তু ছাড়া এইসব নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বিধবা-বিবাহের পক্ষে এবং শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা এবং চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলা প্রভৃতির বিরুদ্ধে অর্থাৎ মৌলিক বাংলা নাটক শুরু থেকেই সমাজবিপ্লবের সহায়করূপে দেখা দিল।

কাজেই ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ছবি বাংলা নাটকে প্রথম প্রতিফলিত হয় এবং জমিদারগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা ওইসব নাটকের মঞ্চায়ণে

হ্রাস পেতে থাকে। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'কৃষ্ণকুমারী'কে জমিদারগোষ্ঠী প্রভাবিত মঞ্চশালায় করতে দেওয়া হয়নি। এর জন্য মধুসূদন নাটক লেখাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিছু লোকের চাপে পড়ে মধুসূদনের পূর্বোক্ত দুটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে নাট্যকারের আদর্শ এবং মঞ্চায়ণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জোড়াসাঁকোর নাট্যশালা ১৮৬৫ সালের ১৫ জুলাই 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন যে হিন্দু-নারীর অসহায় অবস্থা এবং পল্লীগ্রামে জমিদারদের অত্যাচার বিষয় অবলম্বনে ভাল নাটক পেলে প্রতিক্ষেত্রে ২০০ টাকা করে পুরস্কার দেবে। বিচারকদের মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং দ্বিতীয়টির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জী ছিলেন। এই বিজ্ঞাপনের ফলে রামনারায়ণ 'নবনাটক' রচনা করেন এবং পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু গ্রাম্য জমিদারদের অত্যাচার-সংক্রান্ত নাটকের কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবু এই মঞ্চ মধুসূদনের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' মঞ্চস্থ করতে সাহস পায়নি।

'নবনাটক' যখন ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বছর ছিল। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ দর্শক ছিলেন। এ নাটকটি নয়বার অভিনীত হয়। এইসব অভিনয় দেখার পর বাংলা পেশাদার নাট্যমঞ্চের অন্যতম স্রষ্টা নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী বলেছিলেন যে অভিনয় সম্পর্কে তাঁর যা কিছু দেখবার, শুনবার ও জানবার বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি পরবর্তী ইতিহাসে দেখাব যে আরও কতরকমের শিক্ষা তাঁকে পেতে হয়েছিল এবং কী মূল্য দিয়ে।

১৮৬৭ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসনের অভিনয় হয়। সুরাসেবন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অপব্যয় এবং অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটক নিয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়ে এই নাটক। কিন্তু এই নাটক ছিল পাথুরিয়াঘাটার 'বুঝলে কিনা'-র জবাব এবং নাটকে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বিদ্রূপ করা হয়। এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী অভিনেতা হিসাবে এবং ধর্মদাস সুর স্টেজ ম্যানেজার হিসাবে দেখা দেন। এই অভিনয় অত্যন্ত সফল হয়েছিল। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন উপস্থিত ছিলেন এবং আনন্দে বলে উঠেছিলেন—'মিত্তিকে রে বাবা, মিত্তিকে'। অর্থাৎ এঁর কাছে আগের সব অভিনয় একেবারে মাটি। অর্দ্ধেন্দুর কিন্তু ঘরছাড়া হতে হল। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মা ছিলেন তাঁর পিসি। শৌরীন্দ্রমোহনকে বিদ্রূপ করে যে চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছিল—অর্দ্ধেন্দু সেই চরিত্রে অভিনয় করতেন। বাবা বারণ করলেও কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হলেন না।

এই প্রসঙ্গে বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের কথা বলতে হয়। ১৮৬৮ সালে এই দলের 'সধবার একাদশী' অভিনয়ে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র উপস্থিত ছিলেন এবং 'জীবনচন্দ্রে'র ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় দেখে উচ্চপ্রশংসা করেন। এই দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। এঁরা 'সধবার একাদশী' ও লীলাবতী' অভিনয় করে অত্যন্ত সুনাম পান। গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন যে দীনবন্ধু, অর্দ্ধেন্দুর 'জীবনচন্দ্র' দেখে তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পাননি—'লীলাবতী'র 'হরবিলাস' দেখে একেবারে চমৎকৃত হলেন—মুখে প্রশংসা আর ধরে না।

এই লীলাবতীর দল শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পেশাদার মঞ্চ সৃষ্টি করে—যার নেতৃত্বে ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। গিরিশচন্দ্রকেও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভাল রঙ্গমঞ্চ ছাড়া পেশাদার মঞ্চ তৈরি করতে রাজী হননি এবং প্রথম দিন নীলদর্পণের যে অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখররা করেন ছদ্মনামে তার যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন। আসলে গিরিশচন্দ্র তখন একটি বিলাতি কোম্পানিতে বুক-কীপারের কাজ করতেন। 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে অভিনয় করতে হলে প্রথমেই এই সাহস তাঁর থাকার দরকার ছিল যে সাহেবদের দিক থেকে বাধা এলে তিনি তা গ্রাহ্য করবেন না। দ্বিতীয়ত তিনি চাকরি ছাড়তে প্রস্তুত হবেন। তেমন অবস্থা তখন গিরিশচন্দ্রের ছিল না। কাজেই অর্দ্ধেন্দু যদি গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে শুরু করা মনস্থ না করতেন তা হলে পেশাদার মঞ্চ তৈরি করতে আরও কতদিন দেরি হত তা আজ বলা সম্ভব নয়। যাই হোক্, নীলদর্পণের পর 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় ছাড়াও মুস্তাফী সাহেবের 'পাকা তামাশা' অভিনয় করে অর্দ্ধেন্দু বিদেশি সাহেবের বাঙালিবিদ্বেষের মুখের মত জবাব দেন। গিরিশচন্দ্র অবশ্য কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয়ের সময় এই দলে যোগ দেন। কেবল অভিনেতা হিসাবে নয়, দলের অন্যতম ডিরেক্টর হিসাবে। কিছুদিনের মধ্যেই দলে বিরোধিতা শুরু হয়। টাকা-পয়সা নিয়ে এবং নেতৃত্ব নিয়ে। শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র ও ধর্মদাস সুর ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম ও তার সাজ-সরঞ্জাম দখল করে নিলেন। অপর পক্ষে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'হিন্দু ন্যাশনাল' নাম নিয়ে পৃথক থিয়েটার গঠন করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভাল, সেই জাতীয় জাগরণের যুগে সাহেবদের থেকে পৃথক করে যেসব কাজ করার চেষ্টা হয়েছিল তাদের গায়ে 'ন্যাশনাল' লেবেল লাগাবার একটা প্রবল চেষ্টা ছিল। পেশাদার থিয়েটার যাঁরা প্রথম করেছিলেন তাঁদের একাংশ এবং পরবর্তী কালে তাঁদের কিছু লোক হিন্দু ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল প্রভৃতি নাম নেয়। থিয়েটার পাকাপাকিভাবে প্রতাপ জহুরী থেকে মনমোহন পাঁড়ে পর্যন্ত, যাঁরা থিয়েটার নিয়ে ব্যবসা করেছেন ভিন্ন ভিন্ন নামে যথা—স্টার, মিনার্ভা, কোহিনূর, মনমোহন—এঁরা ন্যাশনাল নাম বর্জন করলেন। এই যুগে একই সঙ্গে দলের মধ্যে নেতৃত্ব ও অর্থ নিয়ে দল ভাঙাভাঙির একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় ছিল। তেমনই ছিল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক নাটকাভিনয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন। অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' নাটক (গায়কোয়াড়ের সিংহাসনচ্যুতি-বিষয়ক), 'গজদানন্দ' ও 'যুবরাজ' নামক প্রহসন (সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস্ হিসাবে ১৮৭৬ সালে কলকাতায় এলে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখার্জী তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন এবং মুখার্জীগিন্নিসহ অন্যান্য মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এতে কলকাতার বাঙালি-সমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছিল), এ ছাড়া উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সরোজ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'—নাটকদ্বয়ে যথাক্রমে গোরাসৈন্য ও ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। যার তুলনা সেযুগের ভারতের অন্য কোনও নাটকে ছিল না। 'নীলদর্পণ', 'চা-করদর্পণ' থেকে এই নাটকগুলি ব্রিটিশ-বিরোধিতার যে পরিচয় দিয়েছিল, তার ফলে ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনটি বর্তমান ভারতের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এলাহাবাদের হাইকোর্ট এ কথা ঘোষণার পরও ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড থেকে উঠে যায়নি। যাই হোক এর জন্যে অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর প্রমুখ আট জনের একমাসের সাজা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্রের সাহায্যে হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পান। তাই আমরা দেখি যে প্রথম যুগে নেতৃত্ব ও অর্থ নিয়ে দলাদলির মধ্যেও পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতারা জাতীয় জাগরণের সহায়ক হিসাবে কাজ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পরবর্তী যুগে নাটক রচনা ও অভিনয়ে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু তারও সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বৎসর অতিক্রান্ত হলে (১৮৭২-এর

৭ ডিসেম্বর) ন্যাশনাল এবং গ্রেট ন্যাশনাল—দুটি দলই ১৮৭৩ সালের একই দিনে একত্রে তারা সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান করে। ওই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার মনমোহন বসু। ইনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে গানে, নাটকে, কবিতায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার চিরস্থায়ী প্রমাণ রেখে গেছেন। তাঁর বক্তৃতার কয়েকটি অংশ আজকের দিনেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেব। বাঙালি যুবকরা ইচ্ছা করলে যে কত ভাল কাজ করতে পারে, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: ''বাঙালীর সম্মুখে যদ্যপি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না পড়ে (বিশেষ প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ যে প্রতিবন্ধকতা রাজকীয় পরাধীনতা পরাজয় করতে অক্ষম) তবে বাঙালি সকল কর্মেরই যোগ্য, তাহাতে অনুমাত্রই সন্দেহ নাই।...তৎসঙ্গে 'জাতীয়' নাম ধারণও সামান্য সংবিবেচনার কার্য নহে। এই নামটি গ্রহণ করাতে এই রঙ্গভূমিটি সাম্প্রদায়িক না হইয়া সাধারণের স্নেহস্থলরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে। এই নামটি সম্প্রদায়ের বিশেষণ হওয়াতে হিন্দুমাত্রেই, বিশেষত বঙ্গীয় হিন্দু, (তন্মধ্যে আবার সুশিক্ষিত বঙ্গীয় হিন্দুমাত্রেই) ইহাকে আপনাদের যৌতো আনন্দভূমিরূপে ভাবিয়া ইহার প্রতি মহা অনুরাগী হইয়াছেন।'' এর পর তিনি বাংলা নাটকে গান সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে ভারত ইউরোপ নয়। এদেশে জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কোন না কোনভাবে গীতবাদ্য হয়ে থাকে। মনমোহনবাবু বারবর্ণিতা নিয়ে অভিনয় করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত বিভক্ত দুটি দলের নেতাদের কাছে আবেদন করেন, ''যেন জাতীয় নাট্যসমাজরূপে মহোচ্চ-উপাধির কার্য্য করিতে ত্রুটি না করেন—যেন স্বদেশের কু-রীতি, কু-নীতি, কু-প্রথা, কু-ব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল যত্ন না হয়—আবার যেন সেই কু-রীতি প্রভৃতি দূরীভূত করিতে গিয়া অপক্ষের অন্তিম সীমায়, অর্থাৎ একেবারে স্বদেশে পূর্ব্ব সর্ব অতি মন্দ, ইউরোপীয় সকলই উত্তম, আমাদের যত রীতিনীতি সবই অধম, সকলই সংস্কার, পরিবর্তন, বা মূলোৎপাটনের যোগ্য, এইরূপ অতি-গমনশীল ভয়ঙ্করবুদ্ধির লোনাপানি খাইয়া রুগ্ন না হইয়া পড়েন।...যেন কুরসিকতা ও ভণ্ডরসিকতা অধিকাংশ লঘুচেতা শ্রোতৃবর্গের আপাতত ভাল লাগে বলিয়া কুরসিক লেখকদিগকে উৎসাহ না দেন—যেন যর্থাৎ সৎ কবি, সুরসিক, সুভাবুক নাট্যকারগণকেই আপনাদের প্রিয় লেখক ও প্রিয় নিয়ন্তা করিয়া তোলেন—যেন মাদকোন্মত্ততাদিরূপ সামাজিক পাপে আপনাদের কাহাকেও লিপ্ত হইতে না দেন এবং যাহাতে দেশমধ্যে ছোট বড় তাবৎ লোকে যেসব পাপের প্রতি ঘৃণা করে, এমন তেজস্বী, যশোস্বী ও মনস্বী অভিনয় দ্বারা যথার্থই স্বজাতির পরম হিতৈষী নটসমাজরূপে সভ্য অবনীতে পরিচিত হইতে পারেন।'' মনমোহন বসুর এই বক্তৃতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে প্রথম যুগের নাট্যশালার কাছে প্রগতিশীল বাঙালির কী চাহিদা ছিল। তখনকার দিনে সামাজিক উন্নতি বলতে তাঁরা যা বুঝতেন আশা করেছিলেন জাতীয় নাট্যশালার নাটকে তারই প্রতিফলন দেখতে পাবেন। মনমোহনবাবু বারাঙ্গনা নিয়ে অভিনয় করার বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু সেইযুগে (বাং ১২৮৮, ২৩শে কার্তিক) সোমপ্রকাশে বিজয়লাল দত্ত নামে এক পত্রলেখক জাতীয় নাট্যশালার পরিচালকদের কাছে আবেদন করেছেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমারীর যোগদান তাঁরা দৃষ্টান্তস্বরূপ করুন যাতে বাড়ির পুত্রকন্যা দ্বারা অভিনয় করানো যায়। কাজেই মনমোহন বসু যে কারণে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন সেই একই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পেশাদার মঞ্চের নাট্যাভিনয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান। বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করার ব্যাপারে তিনি ইতিমধ্যেই রক্ষণশীল সমাজের কাছে যথেষ্ট নিন্দাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে পেশাদার নাট্য-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করা সম্ভব হয়নি।

নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন থিয়েটার-ব্যবসায়ীদের পক্ষে 'শাপে বর' হল। নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে গেলে পুলিশের ছাড়পত্র ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ দূর করে। কেবল ব্রিটিশ-বিরোধিতা নয়, সামাজিক সমস্যা নিয়ে যে বিরোধ—মঞ্চকে তার থেকে রক্ষা করার ভার উক্ত আইন কিছু পরিমাণে নিয়েছিল।

১৮৭২ সালে অর্থাৎ পেশাদার মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজের চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তদের সঙ্গে বাংলার তুলনা করে যে তথ্য পেশ করা হয় তাতে জানা যায় যে বাংলার সংখ্যা অনেক বেশি। আবার তেমনি বাংলায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অনেক বেশি। এরা বিদেশি ভাবধারাকে আত্মস্থ করে মধুসূদনের কাব্য, দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভা এবং বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টির বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। কাব্য ও উপন্যাসের তুলনায় নাট্যাভিনয়ের বাজার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কারণ Audio visual নাটক প্রতি শো'তে কমপক্ষে সহস্র মানুষ দেখতে পায় অথচ কোনও বইয়ের সহস্র কপি বিক্রি কোনও মামুলি কথা ছিল না।

সে যুগের কলকাতা শহরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্য প্রমোদ বিতরণের ব্যবসাতে অর্থলগ্নি করার জন্য আর যে জিনিসটি প্রয়োজন ছিল—তা হল নাট্য-আন্দোলনের উপর থেকে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্বকে পৃথক করা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাট্যাভিনয়কে উৎসাহ দিচ্ছিলেন—রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুজাতীয়তাবাদ—সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষিত শ্রেণীর মনকে ঘুরিয়ে দিলেন। ফলে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মনে হল—''হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইবে।'' গিরিশের এই পরিবর্তনের জন্য কেবল রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দায়ী করা উচিত নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেশের তরুণদের মনে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের (militant nationalism) বীজ বপন করছিলেন, তখন গিরিশ তাঁর নাটকগুলিতে কেবল ধর্মের প্লাবন নয়—সে যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সকল প্রগতিমূলক চেষ্টার—(রাজনৈতিক ও সামাজিক) অন্তঃসারশূন্যতার চরিত্র সৃষ্টি করছিলেন। নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর গিরিশ মানস গ্রন্থে লিখেছেন: ''গিরিশের নাটক ক্ষুদ্র মধ্যচিত্ত জীবনের প্রতিবিম্ব নয়, কয়েক সহস্র বৎসরের পুরাতন আচারের পুনরাভিনয়, ভারতীয় মানুষের সমগ্র অতীতের সারাংশ, তার শাস্ত্রবদ্ধ আচারের পুনর্ব্যাখ্যা।''

'মায়াবসান' নাটকে গিরিশ, বলতে গেলে কলকাতার গোটা শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে নতুন যুগের কালাসাহেব হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন। তাঁর কথায়, ''এঁরা না থাকলে বড় বাড়ি হতো না, পরের বিষয় ঘরে আসত না, ঘর জ্বালান, গ্রাম লুঠ চলত না, প্রজায়-জমিদারে ঝগড়া বাঁধত না, ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি হতো না, ভাইপো বিষ খাওয়াত না। এরা নূতন সাহেব, কালা সাহেব, লাল সাহেব ভাল লাগে না। সাহেবী কোট, সাহেবী হ্যাট, সাহেবী খাওয়া, সাহেবী চাল, সাহেবী ছেলের বাপ, সাহেবী দেশে বাড়ি—সাহেব ধ্যান, সাহেব জ্ঞান, সাহেব মন, সাহেবী প্রাণ—সব সাহেবী—শুদ্ধ কালা রংটুকু ঢাকতে পারেননি। এঁরা নূতন সাহেব, পূজা খাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।'' সে যুগে এই ধরনের কথা বহু ব্রিটিশ প্রশাসক বাঙালির রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মীদের সম্পর্কে বলেছেন। বঙ্গভঙ্গের নায়ক লর্ড কার্জন যে চিঠি বিলাতে ভারত সচিবের কাছে লেখেন তাতে প্রায় একই ভাষায় লেখা আছে বাঙালি বাবুরা কলকাতায় বড়লাটের প্রাসাদ দখলের স্বপ্নে মশগুল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৮৮০ থেকে পরবর্তী সময়ে—গিরিশের মৃত্যুকাল পর্যন্ত পেশাদার মঞ্চ প্রায় বিনা বাধায় লগ্নিকারীদের সঙ্গে গিরিশকেও প্রচুর অর্থ দিয়েছিল। যদিচ ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি তাঁকে সিরাজ-উদ্দৌল্লা, মীরকাশিম ও

ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি নাটক লিখে 'হবু সাহেবদের' সাহায্যের ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়েছিল। কারণ প্রথম দুটি নাটক ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেয়।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অমর দত্ত প্রতিষ্ঠিত নাট্যমন্দির পত্রিকায় শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু 'বাংলার রঙ্গালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চারটি থিয়েটার জনসাধারণের চিত্তজয়ের কাজ বেশ ভালভাবেই করছে।—কিন্তু থিয়েটারের মুখ্য উদ্দেশ্য যে লোকশিক্ষা তা বাংলা থিয়েটারে হচ্ছে না বলেই তাঁর ধারণা ; কারণ "যেখানে অর্থের সহিত সম্বন্ধ সেখানে আদর্শের অনুসরণ সম্পূর্ণভাবে ঘটিয়া ওঠে না। ব্যবসা চালাইতে হইলে ক্রেতাকে সন্তুষ্ট রাখা অগ্রে কর্তব্য। অর্থনীতির এই মূলমন্ত্রের বশবর্তী হইয়া রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষকে দর্শকের রুচি অনুযায়ী নাটকাভিনয় করিতে হয়।" এই অর্থে গিরিশবাবু পেশাদার থিয়েটারের সব থেকে প্রধান ব্যক্তি। কারণ তিনি বাংলা থিয়েটারকে ব্যবসায়ের পথে চলতে আদর্শগত ও সংগঠনগতভাবে সাহায্য করেছিলেন। আর ব্যবসায়ীরা বাংলার পেশাদার মঞ্চের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে 'নরকে' পরিণত করেছিল। এ কথা মনমোহন বসু অপরেশ চন্দ্র মুখার্জীকে বলেছিলেন। কাজেই গিরিশ-পরবর্তী যুগ বাংলা মঞ্চে ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে যতটুকু সামাজিক প্রগতির কথা বলা যায় তার চেষ্টা যাঁরা করলেন তাঁরা কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত এমনকি বিলেত ফেরত ভদ্রলোক। এ প্রসঙ্গে বিলেত ফেরত ডি এল রায় এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নাম প্রণিধানযোগ্য। ব্রিটিশের আইনকে অতিক্রম করে গৈরিশী অধ্যাত্মবাদের পরিবর্তে জাতীয় জাগরণের জন্য ঐতিহাসিক নাটক লিখতে লাগলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এইসব নাটকে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানকে শত্রুপক্ষ করা হয়েছে কিন্তু ধর্ম হিসেবে নয়, শাসক হিসেবে। দ্বিতীয়ত টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে অধিকাংশ বিষয়বস্তু নেওয়ার ফলে ইতিহাসও সবসময় রক্ষিত হয়নি। কিন্তু তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের পক্ষেও সংলাপ রচনা করেছেন। এবং তাঁর কোনও কোনও নাটক যেমন সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নাটকের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলির মধ্যেকার দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যেই ধর্মের কথা আসে। দ্বিজেন্দ্রলালের বস্তুবাদী ইহলোকসর্বস্ব মন ধর্মাদর্শ ও দেবদেবী চরিত্রের অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান বা আগ্রহপরায়ণ ছিল না। এখানেই গিরিশ যুগের ভক্তি আশ্রিত নাটকের থেকে তাঁর পার্থক্য। বলতে গেলে বুর্জোয়া মূল্যবোধ পেশাদার মঞ্চের নাটকে উপস্থিত করার ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন বলেই ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তাঁর নাটক পেশাদার মঞ্চ ও তার বাইরে নাট্য-আন্দোলনে প্রাধান্য পেয়ে এসেছিল। মনে রাখতে হবে ১৯০৮ সালে জামশেদপুরে টাটার বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং বোম্বাই শহরের সুতাকলের শ্রমিকরা বাল গঙ্গাধর তিলকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যক্রিয়া গিরিশ এবং দ্বিজেন্দ্র'র পথ ধরেছিল কিন্তু তাঁর কয়েকখানি নাটক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্যে নাট্য-আন্দোলনের ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। একটির নাম 'রঘুবীর' এবং অন্যটি 'আলমগীর'।

'রঘুবীর' নাটকে মুসলিম নবাব কন্যাকে একটি মুসলিম অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নবাবের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এবং তার পালিত ভীল রঘুয়ার ক্রিয়াকলাপ। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রঘুয়াকে শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসাবে তৈরি করেছিলেন। রঘুয়া শেষ পর্যন্ত হিংসার পথে অত্যাচারীকে পরাস্ত করে এই নাটকের ঘটনা ও সংলাপ স্মরণ করিয়ে দেয় মানিকতলার বোমার মামলার নেতা অরবিন্দের উক্তিকে—"প্রয়োজনে সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে।"

নাট্য-আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সামাজিক নেতৃত্বের অবসান হলেও বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে জার্মানির থেকে অস্ত্র সংগ্রহ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানোর যে চেষ্টা রাসবিহারী বসু থেকে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ করেছিলেন—তা নানাভাবে বাংলা সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করেছিল। অজস্র স্বদেশি সংগীত রচনা ও গাওয়া ছাড়া কেবল 'রঘুবীর' নাটকই নয়—রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলি—অচলায়তন থেকে মুক্তধারা পর্যন্ত—বাঙালিকে দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগের প্রেরণা দিয়েছে। পেশাদার মঞ্চের বাইরে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের বাধা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ নাট্য ক্ষেত্রে যে কাজ করে গেছেন—তার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। মনে রাখা দরকার জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের পর কংগ্রেস আন্দোলন নরমপন্থীদের হাতে চলে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গরমপন্থী তিলক থেকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্রিটিশের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় রাসবিহারী বসু—বাঘা যতীনের দলে সঙ্গে তাল মিলিয়ে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙতে সশস্ত্র এবং রক্তাক্ত সংগ্রাম করা এবং ফাল্গুনীতে লিখেছেন—'জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দখল করে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব-বসন্তের উৎসবের আয়োজন করার নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। বাংলা সন-তারিখ মেলালে আশ্চর্য হতে হয় বাঙালির রাজনৈতিক বিপ্লব প্রচেষ্টার সুরের সঙ্গে ওই সময়ের নাট্য রচনার দৃষ্টিভঙ্গির কী মিল। ১৮৭৫-৭৬ সালে উপেন্দ্রনাথ দাস 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' লিখে এবং অভিনয় করিয়ে ভারতের নাট্য-সাহিত্যে বাঙালির যে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ১৯১১-১৭ সালে তাতে নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন। এমনকি ১৯২১ সালের যে গান্ধী পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কোনও কোনও বিষয়ে বিরুদ্ধে থেকেও রবীন্দ্রনাথ—'মুক্তধারা' নাটকে গোপনে চাষের জলের স্রোতরুদ্ধকারী বাঁধ ধ্বংস করা—'সাবতাজ' করার পথকে মহিমান্বিত করলেন।

স্বীকার করতেই হবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে—বাংলার একটি নিজস্ব পদ্ধতি ছিল—যার ইতিহাস মানিকতলার বোমার মামলা থেকে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মামলার মধ্যে প্রকাশ হয়েছে।

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীযুগের পাশে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যুগ শুরু হয়। মেদিনীপুরে মাতামহ কৃষ্ণকিশোর আচার্যের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর সখ্যতা এবং শহীদ ক্ষুদিরামের দলকে কৃষ্ণকিশোরের পরিবার নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শিশির পেশাদার নষ্ট হওয়ার আগেই ক্ষিরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' দুইবার অভিনয় করেছেন—এ সংবাদ আমরা পেয়েছি। ত্রিশ দশকে এই নাটক অভিনয় করার সময় একজন ব্রিটিশ জেলাশাসক তাঁকে বলেন যে নাটকটিতে গুপ্তহত্যার পক্ষে বলা হয়েছে। রঘুয়ার ভূমিকায় যাঁরা শিশিরকুমারকে প্রৌঢ় বয়সের অভিনয়ে দেখেছেন কী আবেগ তিনি সৃষ্টি করতেন। তারপর 'আলমগীর' অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি। ক্ষিরোদপ্রসাদ নাটকটির আদিনাম দিয়েছিলেন 'ভীম সিংহ' কিন্তু সম্পাদনা করতে গিয়ে শিশিরকুমার নাম বদলিয়ে 'আলমগীর' করলেন—মুসলিম শাসনের যুগে সব থেকে সমালোচিত ঔরঙ্গজেবের চরিত্র নিয়ে। গান্ধীজি তখন কংগ্রেস-খিলাফৎ ঐক্য তৈরি করেছেন মহম্মদালি ও শওকৎআলি ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে। গোঁড়া ঔরঙ্গজেব দোবারী গিরিপথে আটকা পড়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে সত্যাশ্রয়ী ভীম সিংহের হাত থেকে জল খেলেন এবং রাজসিংহকে বললেন—তাঁদের দুজনের সাক্ষাৎ আগে ঘটলে ভারতের ইতিহাস বদলে যেত। শিশিরকুমার কখনও প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নাটক করেননি বলে এ যুগের তরুণ সমালোচকরা তাঁর অবমূল্যায়ন করেন।

তাঁরা বোধকরি জানেন না যে তিনি কোনও ব্যবসায়ীর অধীনে থিয়েটার চালাতেন না। তিনি তাঁর কোনও নাটক পুলিশের পরীক্ষার জন্য পাঠাতেন না। তিনি ১৯২৪ সালে যখন নিজ মঞ্চের উদ্বোধন করেন—সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম। শিশিরকুমার তাঁর বন্ধু কংগ্রেস নেতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও তুলসীচরণ গোস্বামীকে নিয়ে থিয়েটার কোম্পানি করেছিলেন। শিশিরকুমারের নাটক নির্বাচনগুলি বিচার করলে দেখা যাবে এই শতাব্দীর বিশ দশক থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেনিয়াতন্ত্রের যৌথ আক্রমণে বাঙালির দুরবস্থার বিবরণ। গান্ধী ও জওহরলালের পরিবর্তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসু, শিশিরকুমারের প্রিয় ছিলেন। দেশবন্ধু 'বেঙ্গল প্যাক্ট'—যার দ্বারা হিন্দু-মুসলিম মিলনের একটি পথ সারা ভারত চালাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুভাষচন্দ্র ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের ঐক্যের যে সব প্রস্তাব করেছিলেন—শিশিরকুমার তার পক্ষে ছিলেন।

শিশিরকুমারের শেষ গুরুত্বপূর্ণ নাটক 'তখত্-এ-তাউস'-এর বক্তব্য ছিল—দিল্লীর সিংহাসনে যারা বসে তারা নষ্ট ও দুষ্ট হয়। শিশিরকুমারের মঞ্চে গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' অভিনীত হয় এবং তিনি নিজে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ করে বাংলার পেশাদার নাট্যশালাকে নতুন পথে চলার সুযোগ করে দেন।

এই যুগে নাট্যকার মন্মথ রায় ও শচীন সেনগুপ্তের নাম অবশ্য উল্লেখ করতে হবে। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' দিয়ে পৌরাণিক নাটকের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার যুগ শেষ হয়েছিল বলা যায়। পুলিশের দ্বারা সংশোধিত হয়ে কিছুদিন এই নাটক পেশাদার মঞ্চে চলে। সেই তুলনায় শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান পায়। ইংরেজ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেনিয়া-জমিদার নেতৃত্ব ভারতকে তথা বাংলাকে ভাগ করলেও নাট্য-আন্দোলনে বাঙালি যে ঐতিহ্য ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদকর্মে তৈরি করেছে—তা চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে গণনাট্য আন্দোলনও প্রধানত অবিভক্ত বাংলার সৃষ্টি। নাট্য-আন্দোলনে আবার সামাজিক নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু হল—তার সঙ্গে যুক্ত হল দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্য ঐতিহ্য, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মৈত্রীর ঐতিহ্য। বিভিন্ন পেশায় শ্রমজীবী মানুষ নাটকের বিষয়বস্তু হল। কেবল ভারত নয়—পৃথিবীর যেখানে মানুষ স্বাধীনতার সংগ্রাম করছে তাকে বিষয়বস্তু করে বাংলা ভাষায় নাটক লেখা হয়েছে এবং কলকাতা ও মফস্বলে অভিনীত হয়েছে। পথনাটিকা, পোস্টার নাটিকা, ছায়া নাটক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাবে ভারতের অনেক রাজ্যে নাটকের আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং কিছু ভাল নাটকও হচ্ছে। কিন্তু কলকাতার দর্শকের প্রশংসা না পেলে—সেই সব দল তৃপ্ত হন না। তাই প্রতি বছরে পশ্চিমবাংলার বাইরের দল কলকাতায় এসে অভিনয় করেন।

আমাদের দেশে দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি বলে নাট্যাভিনয়ের সামাজিক গুরুত্ব দেড়শ বছর আগে সমাজের প্রগতিশীল মানুষ বুঝেছিলেন এবং তদনুযায়ী পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ফলে জনসাধারণের চেতনা যুগোপযোগীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আইন করে ইংরেজ তার কণ্ঠরোধ করে, মুনাফার জন্য ব্যবসায়ীরা তাকে প্রমোদ ব্যবসায়ে পরিণত করার চেষ্টা করে। স্বাধীন ভারতে নতুন করে মুক্ত বাজারের মাহাত্ম্য সংস্কৃতির গণমাধ্যমগুলিতে মুখরিত হয়েছে। শতাব্দীর নাট্যসাধনার ঐতিহ্যে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।

কান্তি বিশ্বাস

শতবর্ষের আলোকে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা

বাংলার ললাটে গৌরবের জয়টীকা এঁকে দিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতা এবং শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ মারাঠা কুলরবি গোপালকৃষ্ণ গোখেল একদিন বলেছিলেন, "বাংলা আজ যা ভাবে বাকি ভারতবর্ষ আগামীকাল তা-ই ভাববে।" রাজকীয় আইনসভায় (ইম্পিরিয়্যাল লেজিস্‌লেচার) ১৯১০ এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দু-দুবার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে—কিন্তু দেশময় শিক্ষাপ্রিয় মানুষের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। আর পরিপূর্ণরূপে সমর্থ হয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ভারতবাসী সম্পর্কে যে কুৎসিত মনোভাব পোষণ করত জনসমক্ষে তা নগ্নভাবে প্রকাশ করতে। সারা দেশের মধ্যে তিনিই যে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে এতখানি উদ্যোগী হয়েছিলেন তা নয়। বরদা রাজ্যে দেশীয় রাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আম্রলি তালুকে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পরে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বরদা রাজ্যে এই সুযোগ প্রসারিত করেছিলেন। কিন্তু তা ছিল একটি দেশীয় রাজ্যের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ। জ্যোতি বা ফুলে প্রথম সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তুলেছিলেন তারও আগে। মহামতি গোখেলই প্রথম যিনি দেশব্যাপী এই সঙ্গত দাবিকে কার্যকরী করার জন্য আইনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিধেয়ক উত্থাপন করেছিলেন। দেশের শিক্ষা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন। বাংলার মাটিতে কিসের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন যার জন্য সুদূর মহারাষ্ট্রনিবাসী এই মনীষী বাংলাকে এমন দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন? চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালি তথা ইউরোপে যে রেনেসাঁর উন্মেষ ঘটেছিল ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে সে জাতীয় কোনও মৌলিক পরিবর্তন না হলেও উনবিংশ শতাব্দীতে যে এক নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল এ-বিষয়ে কোনও বড় রকমের মতান্তর নেই। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে ওই সময়ে যে অনেক সমাজসংস্কারক ও চিন্তাশীল মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল এটাও বাস্তব সত্য। এর ফলে দেশের পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে এক নতুন পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল—এটাও ইতিহাস স্বীকৃত। কিন্তু তার মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এখানে যে অর্থবহ ভাবতরঙ্গের উত্থান ঘটেছিল সে কথাও সর্বজনবিদিত। এবং তার জন্যই গোখেল অনুপ্রাণিত হয়ে উৎসাহভরে বাংলার এই অগ্রগমনের কথা দেশবাসীকে অবহিত করতে বাংলার সম্পর্কে এই অনন্যসাধারণ মন্তব্য করেছিলেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলা, বিহার, ওড়িশার স্বাধীনতা সূর্য কার্যত অস্তমিত হয়। পরে পরাধীনতার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করে তোলে। কয়েক দশকের মধ্যেই বাংলার চেতনার বৈকল্য ও আদর্শের আড়ষ্টতা কাটতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকে এক ইতিবাচক পরিক্রমার পরিচয় পাওয়া যেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে চিন্তা ও চেতনার জগতে বাংলার নবযাত্রার বহু নিদর্শন ফুটে উঠতে থাকে। এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিভাত হয়। উইলিয়ম অ্যাডম তিন খণ্ডে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তা থেকেও শিক্ষায় বাংলার অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৫ সালের ১ জুলাই তিনি তাঁর প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ওই বছর ২৩ ডিসেম্বর দ্বিতীয় এবং ১৮৩৮ সালের ২৮ এপ্রিল তাঁর তৃতীয় ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রতি গ্রামে একটি করে এবং বড় গ্রামে একাধিক পাঠশালার অস্তিত্বের কথা ওই প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়। জনসংখ্যার প্রতি ৪০০ জনের জন্য গড়ে একটি করে পাঠশালা এবং ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের প্রতি ৬৩ জনের জন্য একটি পাঠশালা শিক্ষাদান কাজে নিযুক্ত ছিল বলে মন্তব্য করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবেদনের যথার্থতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তবে ওই সময়ে বাংলা যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অগ্রণী প্রদেশ ছিল—এ বিষয়ে কোনও মতপার্থক্য দেখা যায়নি। পরে প্রকাশিত সরকারি তথ্যেও বারংবার বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক অগ্রবর্তীর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০২ সালে সারা ভারতবর্ষে কলা বিভাগে কলেজে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় অর্ধেক ছিল বাংলায়। ৩০৯৭টি ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১,৪৮১টি ছিল শুধু এই প্রদেশে। প্রতি জেলায় গড়ে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল বাংলায় ৩০টি, মাদ্রাজে ২০টি, বোম্বাইতে ১৭টি এবং সংযুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) ৪টি। বাংলায় গড়ে ১০৪.৩ বর্গমাইলের মধ্যে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। মাদ্রাজে ৩৮০ বর্গমাইলে একটি। বোম্বাইতে ৩৯৩.৪ বর্গমাইলে একটি এবং সংযুক্ত প্রদেশে ৫৬৭.৫ বর্গমাইলে একটি করে ওই বিদ্যালয় ছিল। অন্যান্য প্রদেশে স্কুল-কলেজ প্রধানত বড় শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বাংলার বড় শহরের বাইরে গ্রামীণ এলাকাতেও এই সকল বিদ্যায়তনের ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান নবাবদের নিকট হতে ব্রিটিশ রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিল—সে জন্য মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ ছিল খুবই সন্দিগ্ধ। আবার মুসলমানদেরও ব্রিটিশের প্রতি স্বাভাবিক কারণে একটি জাত-ক্রোধ ছিল। এর ফলে ব্রিটিশ আমলের আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের একটা অনাগ্রহের মনোভাব ছিল সুস্পষ্ট। সে জন্য ১৯০৩-০৪ সালে বাংলার কলেজে কলা বিভাগে (এফ এ) ৮০০৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৪৬৩ জন। বি এ ক্লাসে ২৮৪ জনের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ৭৩ জন এবং এম এ ক্লাসে ৭৯ জনের মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৫ জন।

বঙ্গাব্দের ইতিবৃত্ত নিয়ে কোনও আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমার এখানে নেই। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বঙ্গাব্দকে আমরা বর্তমানে কতটুকু

কাজে লাগাই সে আলোচনায়ও যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। বাংলার অধিবাসী এবং বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গাব্দের সম্পর্ক নিরূপণের কোনও চেষ্টাও এখানে করতে চাইছি না। কিন্তু যেহেতু বঙ্গাব্দ একটি শতাব্দী অতিক্রম করে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করছে—সে জন্য একটু পিছন ফিরে তাকাতে চাই। বিদায়ী চতুর্দশ বঙ্গাব্দ কী দিয়েছে আমাদের শিক্ষা জগৎকে? পিছনে ফেলে আসা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীদিনের চলার পথকে করতে চাই আলোকিত। তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসে এই প্রবন্ধ।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চতুর্দশ বঙ্গাব্দ যাত্রা শুরু করেছিল। তার পথ চলার মাঝামাঝি সময়ে গোলামির শিকল ছিঁড়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। স্বাধীনতার পরে ৪৭টি বছর পার হয়ে গেছে। চতুর্দশ বঙ্গাব্দের অর্ধেকের কিছু বেশি কেটেছে পরাধীন দেশে—বাকি স্বাধীন ভারতে। গত একশ বছরের বাংলার শিক্ষা-ইতিহাস পরিষ্কার দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে—পরাধীন ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলায় এবং স্বাধীন ভারতের খণ্ডিত বাংলায়।

ব্রিটিশ এ দেশের মানুষকে শিক্ষিত করার কণামাত্র সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে প্রসারিত করারও বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য ওদের ছিল না। সস্তায় এবং কার্যকরীভাবে প্রশাসন চালানোর স্বার্থে ইংরেজ সরকার এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর পরিণতিতে এ দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা লোকশিক্ষা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকে। আর সরকারি ব্যবস্থার আধুনিক শিক্ষারও প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ার ফলে সেই শূন্যতা পূরণ হয় না। তার ফলে নিরক্ষরতা ও চেতনায় পশ্চাৎপদতা জগদ্দল পাথরের মতো এ দেশের উপর চেপে বসতে থাকে। ১৮১৩ সালের ভারতীয় সনদে শিক্ষার যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছিল এবং পরে ১৮৩৫-এ মেকলের মাইনুট, কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠা (১৮৪২), ১৮৫৪ সালের উড্স্ ডেসপ্যাচ, ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশন, এবং আরও কিছু কিছু ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করলেও তা সীমিত গণ্ডির বাইরে আসেনি। এই শিক্ষায় না ছিল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা—না ছিল গণতান্ত্রিক চরিত্র। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব ঘটে এই বাংলায়। সে জন্য অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রসারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা এবং পরে রবীন্দ্রনাথের ১৮৯১-৯২ সালে লিখিত "শিক্ষার হেরফের" থেকে শুরু করে পর পর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও শিক্ষা আন্দোলনের কারণে বাংলার শিক্ষা-চিত্রে এক বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। ভীত ব্রিটিশ ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভেঙে দিয়ে বাংলার জাগরণকে স্তব্ধ করতে চেষ্টা করে। এতে বিপরীত ফল—বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘটে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পাল্টা একটা সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত করার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ১৪ আগস্ট বাংলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। স্কুল, কলেজ এমন কী কারিগরি শিক্ষার পর্যন্ত ব্যবস্থা থাকে এই স্বতন্ত্র বে-সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায়। বাংলার এই উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত দেখে ভারতের কোনও কোনও রাজ্যেও একই অনুকরণে শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে শিক্ষার বিষয় প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারে আসে। ওই আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে গান্ধীজির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন। তার ফলশ্রুতিতে নিযুক্ত হয় জাকির হোসেন শিক্ষা কমিটি। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে শিক্ষা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশের সঙ্গে কয়েকটি গুরুতর মতপার্থক্যের জন্য ৭টি প্রদেশেরই কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। দুঃখের বিষয় এই তিন বছরেও প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলি শিক্ষা সম্পর্কে কোনও কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে ১৯২৬ সাল থেকে বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নে কংগ্রেস দলের ভূমিকা ছিল পুরোপুরি শিক্ষা-বিরোধী। ১৯৪০ সালে সার্জেন্ট পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দেশে অস্থির অবস্থা থাকার জন্য এ বিষয়ে বিশেষ কিছু অগ্রগতি হতে পারে না। এর মধ্যে ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বি-খণ্ডিত হল—আমরা স্বাধীন হলাম।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সকল প্রদেশের উপরে। ব্রিটিশ শাসনের পরে অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়েও বাংলার শিক্ষার ঐতিহ্য অন্য প্রদেশের তুলনায় উন্নত। ব্যতিক্রম ছিল শুধু কেরালা। ইউরোপীয় মিশনারিদের আগমনের ফলে এবং ধর্ম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার অঙ্গ হিসাবে আধুনিক শিক্ষায় কেরালার স্থান ছিল সকলের উপরে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫১ সালে যে প্রথম লোক গণনা হয় সেখানে একটি শিক্ষা-চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন দেশের মোট ১৭টি রাজ্যের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল সব থেকে বেশি কেরালায়—৪০.৭ শতাংশ। পশ্চিমবাংলার স্থান ছিল দ্বিতীয়—২৪.০ শতাংশ। ১০ বছর পর ১৯৬১ সালের লোক গণনায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান নেমে হল পঞ্চম। ঐতিহ্যবাহী বাংলায় শিক্ষার এই অধোগতি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলল ১৯৭১ সালের আদমশুমারি পর্যন্ত। শুধু সাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে বাংলার যে কৌলীন্য বা আভিজাত্য ছিল তা শোচনীয়ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিশেষ করে সাতের দশকে। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সময়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বিশেষ করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল কথা বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পরে কংগ্রেস সরকার ও দল তার ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুরু করল। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন শুরু করল। কমিশনের পর কমিশন বসানো হতে থাকল। কিন্তু তাদের সুপারিশগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকার্যকর করে রেখে দেওয়া হতে থাকল। কেন্দ্রীয় বাজেটে ২ শতাংশের বেশি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কখনও হল না—যদিও একাধিক শিক্ষা কমিশন কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করার কথা বলেছিল। সংবিধানে শিক্ষা রাজ্য তালিকায় ছিল। কোনও রাজ্য এ বিষয়ে কিছুটা উদ্যম দেখানোর ফলে কিছুটা এগিয়ে যেতে পারল। কিন্তু দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের। ১৯৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই রাজ্য বাজেটের ১২ শতাংশের বেশি শিক্ষার বরাতে কখনওই জোটেনি। এই রাজ্যেও স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি এবং ১৯৫৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তাতেও শিক্ষার মৌলিক অবস্থার এমন কোনও হেরফের হয়নি। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার জায়গায় জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন, শিক্ষাকে জীবনমুখী করা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো এবং শিক্ষাকে একটি গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রদান—এ সম্পর্কে আলোচনা ও প্রতিশ্রুতির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তার রূপায়ণ হয়েছে নামে মাত্র। মাতৃভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। শিক্ষায় মানুষের যে মৌলিক অধিকার আছে—তা মর্যাদা পায়নি। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করা এবং তার মানবিক মূল্যবোধকে তীক্ষ্ণ করার বিষয়টি শুধু অবহেলিতই নয়—তার অবনমন ঘটেছে। ব্রিটিশের আমল এবং তারও পূর্ব থেকে নারী শিক্ষার বিষয়টিকে বিপজ্জনকভাবে অবহেলা করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও নারী শিক্ষা কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গসহ রাজ্য সরকারগুলির (কেরালা ব্যতিক্রম) নিকট থেকে ন্যূনতম সুবিচার পায়নি। সুবিচার পায়নি সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের মানুষও।

স্বাধীন ভারতে বাংলার এই ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করার দায়িত্ব অর্পিত হয় ১৯৭৭ সালে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের উপর। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের সাহায্যে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা থেকে যুগ্ম-তালিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় বাজেট এবং পর্যায়ক্রমে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি হয় সেখানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের হার হ্রাস পেতে থাকে। স্বাধীন দেশে গণ-শিক্ষার যে আশার কথা মানুষ মনে মনে পোষণ করত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকল। এই আঙ্গিকে বাঁধা-ধরা ক্ষমতার চৌহদ্দির মধ্যে থেকে একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে শিক্ষার যে বিশেষ কিছু করা অতীব কঠিন—সে কথা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। তথাপি শিক্ষা-পিপাসু মানুষের সহযোগিতা নিয়ে গত ১৭ বছরে এই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রতি সুবিচার করার জন্য রাজ্য সরকার অনেকগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেশের মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন উৎসাহমূলক প্রকল্প প্রবর্তন করে এতদিন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের বিদ্যায়তনের অঙ্গনে আনার ব্যবস্থা করেছে। এই কাজ করতে গিয়ে রাজ্য বাজেটের এক-চতুর্থাংশ অর্থ শিক্ষা বাবদ ব্যয় করতে হচ্ছে। ভারতের আর কোনও রাজ্য বাজেটের এত বৃহদাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে না। গত ১৭ বছরে এই রাজ্যে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত যে হারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্য কোনও রাজ্যে কিংবা এই রাজ্যে পূর্বে তার কোনও নজির নেই। মাতৃভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমগ্র দেশের সামনে এক অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সর্বভারতীয় শিক্ষা সংস্থার বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার মানের বিচারে এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বারে বারে প্রমাণিত হচ্ছে। নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে সারা দেশের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতিও এই রাজ্যের শিক্ষা ভাণ্ডারে জমা পড়েছে। সাক্ষরতা আন্দোলনের ফলে রাজ্যের ৬টি জেলাকে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন পূর্ণ-সাক্ষর জেলার মর্যাদা দিয়েছে। গত ৩ বছরে রাজ্যের সাক্ষরতার হার প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে পশ্চিমবাংলাকে। স্বাধীনতা অর্জনের পর পশ্চিমবাংলা শিক্ষায় হয় পশ্চাদ্গামী এবং ৩০ বছরের মধ্যে দেশের ৯টি শিক্ষায় পশ্চাৎপদ রাজ্যের মধ্যে একটি—এই বেদনাদায়ক অগৌরবের কলঙ্ক বরণ করতে বাধ্য হয়। ২০০১ সালে আদমশুমারিতে ভারতে শিক্ষায় শীর্ষস্থানীয় রাজ্য কয়েকটির মধ্যে পশ্চিমবাংলা যে স্থান পাবে—তথ্য প্রমাণে এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আত্ম-সন্তুষ্টির কোনও অবকাশ নেই। ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে দৃঢ়তর সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে হয়। জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন তথা কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার প্রতি উদ্বেগজনক দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন ঘটাবে এখন পর্যন্ত তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। অথচ দরিদ্র এই দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে—রাষ্ট্রসংঘের একাধিক সমীক্ষায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার যে দ্রুত লয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং আগামীদিনে তার গতি যে হারে বাড়বে তাতে শিক্ষা ও গবেষণার যথোচিত সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে যে কোনও দেশ উন্নতির কক্ষপথ থেকে ছিটকে দূরে নিক্ষিপ্ত হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বাংলার শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষাপ্রিয় মানুষের একটি বড় সামাজিক দায়িত্ব আছে। নিজ রাজ্যে শিক্ষাকে সকল আবিলতা থেকে উদ্ধার করে তাকে শৈবালমুক্ত করে শিক্ষার তটিনীকে বেগবান স্রোতস্বিনীতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালাতে হবে—তার জন্য হয়তো কিছু কঠিন অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে—সেই সঙ্গে নিখিল ভারতের শিক্ষাপ্রেমী মানুষের সামনে একটি অর্থবহ ইতিবাচক কর্মসূচির রূপরেখা উপস্থিত করতে হবে। বাংলার প্রতি মহামতি গোখেলের নিবেদন করা অর্ঘ্যের মর্যাদা যে দিতেই হবে। বঙ্গাব্দের নবশতাব্দীর শুভ সূচনায় এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

নেপাল মজুমদার
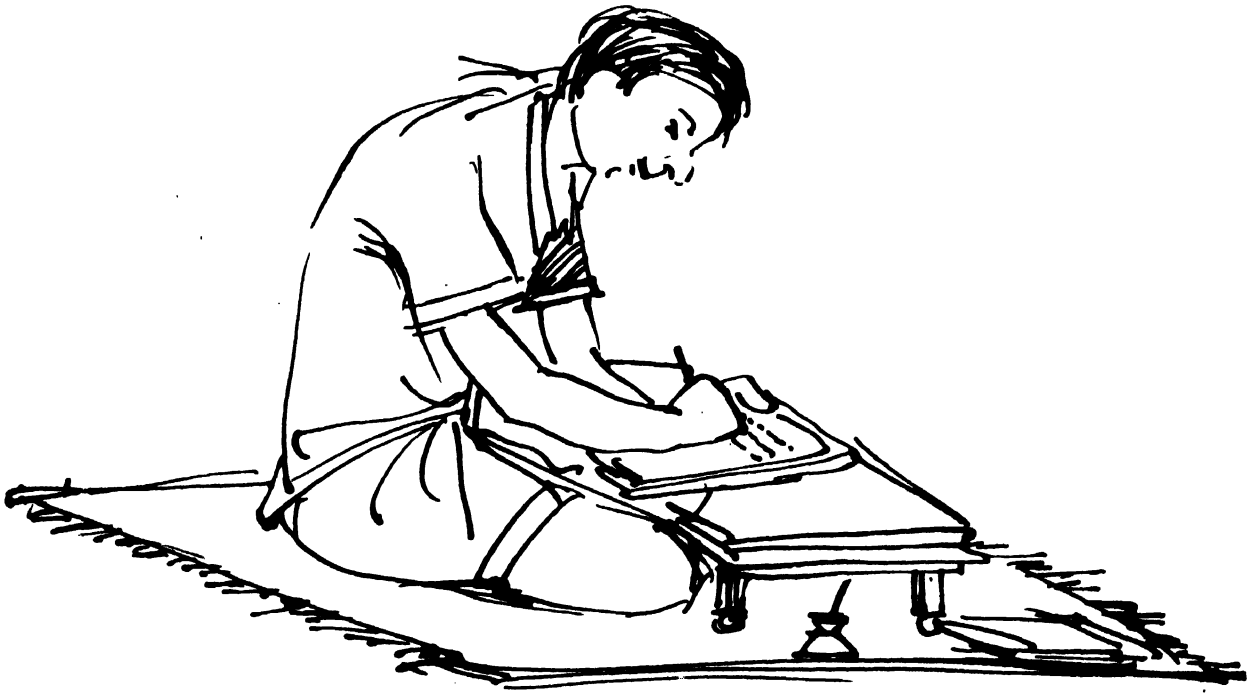
যুক্তবঙ্গে মাতৃভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজ

'একুশে ফেব্রুয়ারি' শুধু 'বাংলাদেশে'রই নয়,—দুই বাংলারই, বস্তুত, সমগ্র বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। বস্তুত, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের আন্দোলন সেখানকার গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের সূচনা এবং প্রাণশক্তি দান করে শেষ পর্যন্ত তাকে জয়যুক্ত করেছে। রাষ্ট্রসংঘে বিশ্বের অন্যান্য ভাষার পাশে বাংলা ভাষাও যে আজ তার পূর্ণ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারও সূচনা হয়েছে, ওই একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

হাল-আমলের অনেকের ধারণা, দেশবিভাগের পরে, পঞ্চাশের দশকেই বুঝিবা বাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা বাংলা অর্থাৎ মাতৃভাষা ও সাহিত্যের জন্য প্রথম লড়াই শুরু করলেন।—যেন দেশবিভাগের আগে যুক্তবঙ্গের মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষার স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে যথোচিত সচেতন ছিলেন না বা থাকলেও এ সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন বা নীরব ছিলেন। বলা বাহুল্য, এ ধারণাটা আদৌ ঠিক নয়। বাংলা ভাষা শুধু হিন্দুদেরই নয়—বাংলার বিশাল সংখ্যক মুসলমানেরও মাতৃভাষা এবং এ-ভাষার জন্য তাঁরা যে কোনও মূল্য দিতে রাজি, এ-কথা গত বিশ এবং তিরিশের দশক হতে অবিভক্ত বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে অগ্রসর অংশটি বার বার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, এ-কথাটাও স্মরণ রাখা দরকার। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনার স্থান ও অবকাশ এখানে নেই। এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এখানে শুধুমাত্র কয়েকটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তথ্যের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

ঐতিহাসিক 'বঙ্গভঙ্গ' ও স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ই প্রায় সারা বাংলা জুড়ে যে ব্যাপক স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল, তাকে বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি এবং কূটকৌশলের অন্ত ছিল না। জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের পাশাপাশি উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বা বিরোধ-সংঘর্ষেরও সূচনা হয়, তারই ফলে। এই পর্বেই—১৯০৬ সালেই 'মুসলিম লীগ' ও 'হিন্দু মহাসভা' দলের জন্ম বা প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাৎ স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই উগ্র সাম্প্রদায়িক দলগুলি সংগঠিত হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ১৯৪৬ সালের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন পর্যন্ত এই দুটি পরস্পরবিরোধী ধারাই পাশাপাশি চলতে থাকে।

এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ যে দিক থেকে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল তা হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার দিক থেকে। বৈজ্ঞানিক রাজনীতিক ভাবাদর্শ এবং বৈজ্ঞানিক নব নব চিন্তা —সব কিছু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সাময়িক পত্র ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন করার ব্রত তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ, বিশেষ করে তার প্রগতিশীল অংশটি বাংলা ভাষা-সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে এই ধারাটিকে পরিপুষ্ট করার মহান ব্রত নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। **'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'** এবং তার মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র উদ্ভব বা আবির্ভাব হয়, এই মহান সংকল্প ও ব্রত নিয়ে। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ এবং সাহিত্যিক অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং মুহম্মদ মোজাম্মেল হক ছিলেন পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক। স্মরণ রাখা দরকার, এই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'তে নজরুলের 'মুক্তি' শীর্ষক (প্রথম ছাপা) কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল কলকাতায় এসে ৩০ নং কলেজ স্ট্রিটের এই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী আব্দুল ওদুদ ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেছিলেন। মুসলমান সাহিত্য সমিতি বা তাঁদের পত্রিকাটি যে একান্ত বা বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান ছিল না তা, বলাই বাহুল্য। প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা এবং মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবা এবং গবেষণাচর্চার ক্ষেত্রে সে কালে এই সাহিত্য সংস্থা এবং পত্রিকাটির একটা গৌরবজনক ভূমিকা ছিল। এই সাহিত্য সমিতির অফিসেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কবি কান্তি ঘোষ ও ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সেকালের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের যাতায়াত ও আড্ডা জমত। এই সাহিত্য সমিতির অফিসের একটি ঘর হতেই নজরুলের বিখ্যাত **'ধূমকেতু'** পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'মোসলেম ভারত' এবং দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা এবং পরবর্তীকালে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টির মুখপত্র 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' পত্রিকাতেও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, নজরুল, কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ, শামসুদ্দীন হুমায়ন, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ সাহিত্যিকরা প্রগতিশীল চিন্তা এবং ধ্যান-ধারণার জন্য এবং বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মিলন ঐক্যের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ও পাঠকেরা তা জানেন। এই প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' গ্রন্থে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

১৯৩২ সালে ম্যাকডোনাল্ডের 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড' বা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র ঘোষণার (১৭ আগস্ট) এবং 'পুণা চুক্তি' (২৫ সেপ্টেম্বর) সময় থেকে সারা ভারত জুড়েই সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ এবং বিরোধ-বিদ্বেষ ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে।

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩০ সালে, এলাহাবাদে 'মুসলিম লীগ'-এর অধিবেশনে সভাপতি প্রখ্যাত উর্দু কবি মহম্মদ ইকবাল তাঁর ভাষণে দাবি

করেন, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন মুসলমান রাজ্য গঠন করতে হবে। তিনি অবশ্য তখন বাংলার নাম করেন নাই। তবে স্বভাবতই মুসলমানদের ধর্ম-সম্প্রদায়গত ভাষা হিসেবে উর্দুর সপক্ষে দাবি ওঠে। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই উত্তর প্রদেশে সরকারের প্ররোচনায় হিন্দি-উর্দুর বিরোধ-বিদ্বেষ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। স্যার আব্দুর রহিম, খাজা নাজিমুদ্দীন, মৌলানা আকরম খাঁ প্রমুখ বাংলার মুসলিম লীগের নেতারা তিরিশের দশক হতে 'প্রদেশ নির্বিশেষে ভারতীয় মুসলমানের ভাষা হবে উর্দু—এই দাবিতে সোচ্চার হতে থাকেন।

স্মরণ রাখা দরকার, তখন 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' চলছে। ১৯২৯-এর মার্চেই মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ 'মুসলমান সাহিত্য সভা'র কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল নেতারা বিচারাধীন কারাবন্দী। এমন একটা সংকট মুহূর্তে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র নেতারা বাংলা ভাষাসাহিত্যে বাংলার মুসলমানদের জন্মগত অধিকার এবং তার প্রয়োজনীয়তা কতখানি এই প্রশ্ন নির্ণয়ের জন্য এক সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন পূর্ব বাংলার প্রখ্যাত কবি কায়কোবাদ। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ ভাষণে বলেন, ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি চর্চার জন্য বাংলার মুসলমানদের আরবি-ফারসি পড়া বা শিক্ষাচর্চার প্রয়োজন থাকলেও আরবি-ফারসি এমনকি উর্দুও তার ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে না—বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা বাংলা আর এই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই এখানকার মুসলমানরা আত্মপ্রকাশ ও উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবে আর তাতে করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।

তিনি বললেন—*(প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৯ ॥ পৃ. ৫৯৯-৬০১)*:

"বাংলার মুসলমানের ধর্ম্ম-ভাষা আরবী; ফারসী এবং উর্দ্দূ ও প্রায় সেই পর্য্যায়ভুক্ত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে উর্দ্দূভাষা শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে গৌণ প্রয়োজন। মুখ্য প্রয়োজন হইল মাতৃভাষার ভিতর দিয়া নিজেদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলা।

"বঙ্গভাষা যে বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর দ্বিমত নাই। অন্ততঃ অধিকাংশ বঙ্গীয় মুসলমানই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। অল্পসংখ্যক যাঁহারা করেন না, তাঁহারা এখনও উর্দ্দুর স্বপ্নেই বিভোর হইয়া আছেন। দীর্ঘ নিদ্রার পর তাঁহারা মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়া উঠেন, এবারও সেইরূপ-কিছু আয়োজন দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে ভয় বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির নিয়মকে উল্টাইয়া দিয়া উর্দ্দু কোনরূপেই বাংলার মুসলিম জনসাধারণের ভাষা হইতে পারিবে না। উহা কয়েকজন ভাব-বিলাসীর ভাষা হইতে পারে, ইহার বেশী কিছু নয়।

"আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, **বাংলা ভাষা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, আমাদের জন্মভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুসলমানেরও ভাষা। ইহার উপর হিন্দু-মুসলমান সকলের তুল্য অধিকার।** আজ হয়ত কাহারও কাহারও নিকট মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার—বাংলা সাহিত্য-সাধনার কোন মূল্য নাই,—কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন ইহার দেহে মুসলমানের দেওয়া অলঙ্কার দেখিয়া কেহ আর শিহরিয়া উঠিবেন না; হয়ত সেদিন মুসলমানের পরিচর্য্যার ফলে বাংলা ভাষা নবজীবন লাভ করিবে, উহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শের ছাপ, আমাদের ভাবের ছাপ, আমাদের সাধনার ছাপ দীপ্যমান হইয়া উঠিবে।—আমি সে আশার স্বপ্ন দেখি।

"আমার মাতৃভাষার পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী মুষ্টিমেয়কে আমি বলিতে চাই, আমার মায়ের যে-ভাষা, যে-ভাষায় আমি প্রথম কথা বলিতে শিখিয়াছি, যে-ভাষা আমি প্রাণমন দিয়া শিক্ষা করিয়াছি, যে-ভাষায় আমি গল্প করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি—বন্ধুবান্ধবের সহিত মন খুলিয়া নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়াছি,—গীত গাহিয়াছি, কবিতা লিখিয়াছি, সেই অমৃতোপম ভাষা আমার মাতৃভাষা না হইয়া বাংলার বাহিরের একটি ভাষা যে কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

মুসলমান বাঙালিদের মাতৃভাষার সেবা সম্বন্ধে অতঃপর তিনি বলেন :—

"একথা অবিসংবাদিত সত্য যে মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য এক প্রকারের বাংলা ভাষা এবং বাঙালী হিন্দুর জন্য আর এক প্রকারের বাংলা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান, আমি তাঁহাদের কেহ নহি। **আমি বাংলার হিন্দু এবং বাংলার মুসলমানের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই। আমি ভাষার দিক দিয়া মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কোনই প্রয়োজন অনুভব করি না।** ভাষার দিক দিয়া না করিয়া, ভাবের দিক দিয়া, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিলেই চলিতে পারে এবং মুসলমান হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজনও কম নয়। আমি একথা বলিতেছি না যে, সুষ্ঠু ভাবপ্রকাশক আরবী-ফারসী শব্দ বাদ দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অস্পষ্টভাবপ্রকাশক দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমার বক্তব্য এই যে, বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাহিত্যের দিক দিয়া সকল প্রকার সাধনা করিতে হইবে। আমার নিবেদন এই যে, আমরা যেন বাংলাভাষাকে অস্বাভাবিক না করিয়া তুলি। বাংলা-সাহিত্যের বুকে ইস্‌লামী ছাপ ফুটাইয়া তুলিতে হইলে ভাবের দিক দিয়াই উহার বিকাশ করিতে হইবে, প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলন দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না। আমরা যাহা রচনা করিব, তাহা যেন আমাদের প্রতিবেশীরাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সে-বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা আমাদের রচিত ভাষা বা সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা বা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

"বাংলা দেশ যে আমাদের মাতৃভূমি, এ-বিষয়ে বোধ করি এখন আর কোন শিক্ষিত মুসলমানের সংশয় নাই। **এই মাতৃভূমির ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত।** ইহাকে যাঁহারা খণ্ডিত করিতে চান, আমি তাঁহাদের রুচির এবং দেশপ্রেমের প্রশংসা করিতে পারি না। আমার ভরসা আছে, মাতৃভাষাকে দ্বিধাবিভক্ত না করিয়াও আমরা আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিব। উহা বজায় রাখাই আমাদের কাজ, —ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করা নয়।

"বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির প্রথম যুগে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে ইহার পরিচর্য্যা হয় নাই। ইহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন তাঁহারা, যাঁহারা বাংলার স্বভাবকবি ছিলেন। সে-কালের বাংলার মুসলমান নবাবগণ এই পরিচর্য্যার প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ বাঙ্গালীর খাঁটি সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই সাহিত্যের ভিতর দিয়াই এখন জাতির মনের কথা আত্মপ্রকাশ করিবার পথ পাইয়াছে। দেশের সাহিত্য দ্বারাই যে দেশবাসীর প্রাণ-শক্তি উপচিত হয়, ইহা কে না স্বীকার করিবে?"

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি খান্ সাহেব সৈয়দ এমদাদ আলী, অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, অধ্যাপক মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা প্রমুখ অনেকেই সম্মেলনে তাঁদের সুচিন্তিত ভাষণ পাঠ করেন।

সাহিত্য শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকদের বিভিন্ন দিকে সাহিত্যসাধনার পর্যালোচনার পর কিছুকাল আগে উর্দু ভাষার প্রতি হঠাৎ তাদের অত্যধিক ঝোঁক পড়ার ফল যে কী হয়েছিল তার উল্লেখ করে বলেন, বাংলা ভাষার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি পড়ার ফল যে শুভ হবে এ বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েই নয়,—বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত মূল্যবান সব বক্তব্য রেখেছিলেন এই সম্মেলনে।

ইতিহাস শাখার অধিবেশনে অধ্যাপক জহরুল ইসলাম মুসলমান গবেষকদের সমস্ত সংস্কার ও সংকীর্ণতা দূর করে বাংলা ভাষায় সত্যনিষ্ঠ বা তথ্যনিষ্ঠ রচনার আহ্বান জানিয়ে তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেন :

"তবে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে কেহ যেন কোন সংস্কার-বশীভূত না হন। আমি মুসলমানকে ইতিহাস লিখিতে আহ্বান করিতেছি—মুসলমান রূপে নয়, ঐতিহাসিক রূপে। তাঁহারা মুসলমানের ইতিহাস লিখিতে পারেন—মধ্যযুগের মনোভাব লইয়া নয়, থুকিদিদিসের উচ্চ আদর্শ লইয়া, ইবনে খালদুনের ভাবে প্রণোদিত হইয়া। আমীর আলী সাহেব, খোদাবখ্শ্ সাহেব আমাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন— আমি আপনাদিগকে সে আদর্শ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। **মুসলমানের বা হিন্দুর ইতিহাস আছে; মুসলমানী, হিন্দুয়ানী ইতিহাস বলিয়া কিছুই নাই। যাহা কিছু সত্য তাহাই ইতিহাস।** ইতিহাসের উচ্চ আদর্শ আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের সত্যনিষ্ঠা আপনাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুক, আপনারা পুনর্ব্বার ভারতে ইতিহাস-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন, ইহাই আমার খোদার দরবারে আরজ। .

"ইতিহাস লেখার অন্ত নাই। আকবর বা আওরংজেব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিবে চিরকাল। প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড ন্যায় হইয়াছিল কি অন্যায় হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে সুসভ্য জগতে বিতণ্ডা চলিতেছে এখনও। **ঐতিহাসিক সত্যও দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। সেই ভয়ে সত্য-নিরূপণের চেষ্টা ব্যাহত করিলে চলিবে না। ইতিহাস সত্যেরই গাথা গায়।** এই সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সদোষ মানব আপন জীবনকে ধন্য জ্ঞান করে।"

এই সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় হয়েছিল, দর্শন-শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজেমুদ্দীন আহমদের ভাষণটি। মধ্যযুগীয় নানা ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারে আবদ্ধ 'পাষাণপুরী' হতে মুসলমান তরুণ ও যুবসম্প্রদায়কে মুক্তমন ও মুক্তবুদ্ধি নিয়ে স্বাধীন চিন্তার পথে অগ্রসর হবার আহ্বান জানালেন তিনি। বস্তুত ইউরোপীয় রেনাসাঁসের আলোতেই তিনি সেদিন বাংলার তরুণ ও উদীয়মান মুসলমান সমাজকে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়ে তাঁর ভাষণের উপসংহারে *(প্রবাসী-মাঘ ১৩৩৯ ॥ পৃ. ৬০১)* বলেন :

"ইমাম গজ্জালীর মৃত্যুর পর আটশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইসলামে স্বাধীন চিন্তার আর আবির্ভাব হয় নাই। যাহা-কিছু দর্শন আলোচনা হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মমূলক। চিন্তার স্বাধীনতার সহিত ইসলাম হইতে কর্ম্মের সজীবতাও বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানের কর্ম্মজীবন এখন গতিহীন, লক্ষ্যহীন ও স্পন্দনহীন। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের অন্তঃসারলুপ্ত অনুষ্ঠানগুলি কুসংস্কার ও অজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে এক দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ-প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছে। বাহিরের মুক্ত আলো ও বাতাস হইতে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বর্ত্তমানে জগতের সর্ব্বত্র এক মহাজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সত্য, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের কুলবধূগণ সহস্র সজ্জায় সজ্জিত ও সহস্র বর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। মানবতার প্রাভাতিক সাহানায় আকাশ-বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। সজাগপ্রাণ উদ্যোগী পুরুষ যাহারা, মুক্তবুদ্ধির চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া তাহারা বধূবরণে ছুটিয়া চলিয়াছে। আজ বিজয়লক্ষ্মী তাদেরি অঙ্কে, বিজয়মাল্য তাদেরি গলায়। আর হতভাগ্য মুসলমান আমরা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত কুসংস্কারের পাষাণ-পুরীতে আবদ্ধ। বাহিরের কর্ম্ম-কোলাহল আমাদের কর্ণে পৌঁছায় না। যুগের ডাকে আমাদের প্রাণ সাড়া দেয় না। এ নিদ্রার কি অবসান নাই?"

এর প্রায় বছরখানেক পরে মহামান্য আগা খাঁ কলকাতায় আসেন। তিনি ছিলেন মুসলমানদের খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। তিনি নিজেকে আলীর বংশধর বলে দাবি করতেন। বস্তুত মুসলমান সমাজে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। বাংলার কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যরা তাঁকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করলে, তিনি বাংলার সমগ্র মুসলমান সমাজের উদ্দেশে বাংলাকে মাতৃভাষা জ্ঞানে বরণ করে তাকে সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে তাঁর ভাষণের এক জায়গায় *(বিচিত্রা-চৈত্র, ১৩৪০ ॥ পৃ. ৩৮০)* বলেন :

"শুধু ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের জন্য নয়, বাঙ্গালীদের বহুমুখী প্রতিভার জন্যই বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে বাংলা ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান দেশ বলিয়া গণ্য হইবে। বিশেষ বিবেচনা সহকারেই আমি জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান মুসলিম দেশ বলিয়াছি।...

"বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষ করিয়া প্রাচীনপন্থীদের অনেকের মনে নিজেদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে গৌরববোধ নাই। ভারতের বহির্ভূত অন্যান্য দেশের এবং বঙ্গেতর ভারতীয় প্রদেশ সমূহের মুসলমানদিগের সহিত তাঁহাদের রক্ত এবং ভাষার সম্বন্ধ আছে, এই কথা অনেকেই গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করেন। **কিন্তু সমগ্র মুসলমান জগতে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের এবং তাঁহাদের ভাষা বলিয়া বাংলাভাষার বিশিষ্ট স্থান থাকা উচিত ছিল।** পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে অধিক সংখ্যক মুসলমান বাস করেন এবং অন্য যে কোনো ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষা অধিক সংখ্যক মুসলমান মাতৃভাষা স্বরূপে ব্যবহার করেন। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে প্রতি ২০ জনে ৩ জন মুসলমান বাঙ্গালী এবং সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রতি ৫ জনে ২ জন মুসলমান বাঙ্গালী। **নিজেদের ভাষা এবং দেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ আরও দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইলে সমগ্র মুসলিম জগতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বর্ধিত হইবে এবং তাঁহাদের আত্মোন্নতির পথও অধিকতর সুগম হইবে।"**

স্মরণ রাখা দরকার, আগা খাঁ ছিলেন 'সারা ভারত মুসলিম লীগ' দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ১৯১৫-১৬ সালে তিনি দলের স্থায়ী-সভাপতির পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেও তিনি ছিলেন ভারতের মুসলিম সমাজে সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় নেতা। কিন্তু সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ অধিনায়কের এই আহ্বানেও বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের মনে তেমন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না পরন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবিষ শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা ভাষা সাহিত্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণকেও কলুষিত করতে উদ্যত হয়।

১৯৩৬-এর মাঝামাঝি নাগাদ মৌলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মোহাম্মদী' পত্রিকাও, 'দৈনিক আজাদ' এবং ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পাদিত দৈনিক 'তক্‌বীর'-এর মত কয়েকটি পত্রিকায় উগ্র ও জঙ্গী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং প্ররোচনা সৃষ্টির চেষ্টা শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মৌলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মোহাম্মদী' পত্রিকাটির জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৩) সংখ্যাটি বিশেষ ইউনিভার্সিটি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কৃতিকে সুকৌশলে মুসলমান ও অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করবার চেষ্টা করছে, তা এই সংখ্যার বিভিন্ন রচনায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিনী' এবং 'গান্ধারীর আবেদন' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব যে কতখানি এই দোষে দুষ্ট তাও বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহকারে বোঝাবার চেষ্টা হয়।

এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি মর্মাহত হয়েছিলেন রবীন্দ্রজীবনীর পাঠক মাত্রেই তা জানেন। এর জবাবে কবি দৈনিক এবং সাময়িক পত্রে এই ধরনের সাহিত্যরসবোধহীন দুষ্ট রচনার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে এক দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ বিবৃতি দেন। ইতিপূর্বে তা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে *(দ্র: 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ'—৪র্থ খণ্ড)*।

শুধু তাই-ই নয় মুক্তমনা এবং প্রগতিশীল মুসলমান সাহিত্যিকরাও তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হলেন। মুষ্টিমেয় এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্যিকদের আক্রমণ যে কতখানি নীচে নেমে গিয়েছিল তা 'দৈনিক তক্‌বীর'-এর পূর্বোক্ত রচনার (৩০শে আষাঢ়) অংশবিশেষ পাঠ করলেই বোঝা যাবে। 'তক্‌বীর'-এর ইউনিভার্সিটি সংখ্যায় ওই রচনার এক জায়গায় লেখা হয় :

"রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বাহবার লালসা মুসলিম মনকে কুঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। মুসলমানের ঘরে যেগুলি প্রতিভার জন্ম হইয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশই এরূপ বাহবা দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায় সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। হুমায়ুন কবীর ও নজরুল ইসলামের মত প্রতিভা আজ কেন সমাজ সংগঠনমুখী নহে? আব্দুল ওদুদ, আব্দুল কাদির, জসীমউদ্দীন ও বন্দে আলীকেই বা সমাজ কেন সম্পূর্ণভাবে পাইতেছে না? এসব বুঝিতে কাহারও বাকি নাই।"

বলা বাহুল্য, এ ধরনের হীন আক্রমণও বিনা প্রতিবাদে চলতে পারে না। এম আহ্‌মদ নামে জনৈক মুসলমান সাহিত্যিক 'তক্‌বীর'-এর এই আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করে *(আনন্দবাজার পত্রিকা-১৭ শ্রাবণ ১৩৪৩/ আগস্ট ১৯৩৬)* তাঁর বিবৃতির এক জায়গায় তিনি লিখলেন :

"এখানে 'তক্‌বীর'-এর হীন ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে, হিন্দু সমাজের বাহবার লোভেই কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আব্দুল ওদুদ, জসীমউদ্দীন, বন্দে আলী, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বিশেষ নীতিতে সাহিত্যচর্চা করে থাকেন। কিন্তু 'তকবীর'-এর একথা বুঝবার সামর্থ্যই নাই যে, সেই 'বিশেষ নীতিটি' হচ্ছে সাহিত্যের চিরন্তন নীতি। সাহিত্যিক চিরদিনই Freelance. সাম্প্রদায়িকতার দোষ তাঁর দৃষ্টিকে কলুষিত করতে পারে না। মুসলমান সমাজেরও যাঁরা সত্যকার সাহিত্যিক, তাঁরা সাহিত্যের নিত্যকারের আদর্শেই উদ্বুদ্ধ; হিন্দু বা মুসলমান জনসাধারণের প্রশংসা, অপ্রশংসা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বা পরিবর্তনে কোন কাজই করে না। সাহিত্যিক ধর্মকে 'তকবীর' যদি বুঝতে পারতেন, তবে রবীন্দ্রনাথের উপর মারমুখো হতে তাঁর নিশ্চয়ই বাধতো।"

পরিশেষে আহ্‌মদ সাহেব লিখলেন :

"একথা বলার দরকার করে না যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যতালিকার বিরুদ্ধে 'মোহাম্মদী' সঙ্ঘের যে প্রতিবাদ, তার পিছনে মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর সামান্য সমর্থনও নেই। 'মোহাম্মদী'র যুক্তিচাতুর্য অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমান সাধারণের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকেই শাণিত করে তুলছে। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পাঠ করলে দেখা যায় যে মফঃস্বলের নানা ধর্মসভার মৌলবী-মোল্লারা 'মোহাম্মদীর' অভিমতকে সমর্থন করে প্রস্তাবাদি পাশ করেছেন। দেশের অভ্যন্তরে ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে 'মোহাম্মদী' সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াবার যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তার পরিণাম যে ভয়াবহ তা স্বীকার করতেই হবে।"

স্মরণ রাখা দরকার, মৌলানা আকরাম খাঁ ছিলেন বাংলাদেশে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং তিনি ছিলেন 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র সম্পাদক।

এর অনতিকাল পরেই নতুন শাসন-সংস্কার (১৯৩৫) আইন অনুযায়ী আসন্ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ ও উত্তেজনা প্রবল হতে থাকে। ১৯৩৭-এর জানুয়ারির শেষভাগেই নির্বাচন-পর্ব শেষ। নির্বাচনের ফলাফল ও সকলে অবগত আছেন। বাংলায় মন্ত্রিত্ব গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস ফজলুল হক সাহেবের প্রসারিত হস্তকে প্রত্যাখ্যান করলে পর, হক-সাহেব শেষপর্যন্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীশচন্দ্র নন্দী, স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে নিয়ে এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

মন্ত্রিত্ব গঠনের কিছুদিন পরই ব্যবস্থাপক সভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রী' ও 'পদ্ম' প্রতীক চিহ্নের বিরুদ্ধে কয়েকজন মুসলমান সদস্য তুমুল হট্টগোল ও আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এবারও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্রসঙ্গ তুলে কয়েকজন সদস্য তীব্র সমালোচনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। আর এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের বিরুদ্ধেও মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতারা জেহাদ ঘোষণা করলেন। এমনকি এই সংগীতের রচয়িতা 'সাহিত্যসম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সাহিত্যও বাদ পড়ল না। কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে স্তূপীকৃত 'আনন্দমঠ'-এর 'বহ্ন্যুৎসব করে তাঁরা বন্দেমাতরম-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করবার চেষ্টা করেন।

সেদিনের মুষ্টিমেয় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মুসলমানের উন্মত্ত তর্জন-গর্জন এবং দাপাদাপির বিরুদ্ধে অন্তত কয়েকজন মুক্তবুদ্ধির মুসলমান বুদ্ধিজীবীও যে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন, এটাই সবচেয়ে গৌরবের কথা। রেজাউল করীম সাহেব ছিলেন, সেদিনের সেই স্বল্পসংখ্যক মুক্তবুদ্ধির নির্ভীক মুসলমান যুবকদের অন্যতম। ১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) **'আনন্দমঠের বহ্নি উৎসব'** এই শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' রেজাউল করীম এই উন্মত্ত মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে লিখলেন :

'সেদিন বাংলার রাজধানী কলিকাতার বুকে হকপন্থী মুসলমানদের এক মহতী সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত অথবা 'কুখ্যাত' পুস্তক আনন্দমঠের মহাসমারোহে বহ্নি-উৎসব হইয়া গেল। সভাজগৎ স্তম্ভিতচিত্তে দেখিল, ভারতের একটি সুবৃহৎ নগরে, বহু শিক্ষিত ও সাহিত্যসেবকের সম্মুখে ও সম্মতিক্রমে এমন একটি অনাচার হইয়া গেল **যাহা বর্বরতায় মধ্যযুগের ধর্মান্ধ জ্ঞান-বৈরীদের সমস্ত অত্যাচারকে পরিম্লান করিয়া দিল।** সাহিত্যসেবক, কবি ও লেখকগণ, সাহিত্যমেদী ও পাঠকগণ কিরূপ মত্ত উল্লাসে করতালি দিতে দিতে এই বহ্নিউৎসব উপভোগ করিলেন তাহা দেখিবার বস্তু বটে! আনন্দমঠ সাজান হইল, পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল—সেই অগ্নি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর তাহারই চারিদিকে কবি, লেখক, সাহিত্যিকগণ আইনসভার সদস্যগণ এবং মুসলিম বাংলার তরুণ প্রতিনিধিগণ আনন্দে করতালি দিতে দিতে সেই দৃশ্য পরম সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিলেন এবং কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, মুসলিম বাংলার নবযুগ আসিয়াছে, মুসলমানদের দুঃখদুর্ভাবনার আর কোনো কারণ নাই। **এই গণতন্ত্রের যুগে যখন চারিদিক হইতে ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী উঠিতেছে, স্বাধীন চিন্তার বিকাশের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে—সেই যুগে এইরূপ একটা অকল্পনীয় ঘটনা কেমন করিয়া সংঘটিত হইল, তাহা যখন চিন্তা করি তখন লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইয়া যায়।.....''**

পরিশেষে কবি গোলাম মুস্তাফার মতো কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিককে এমন একটা ধর্মান্ধ উন্মাদনায় শিকার হয়ে পড়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন :

..."ধর্মান্ধ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ দেখিয়া আমাদের তত দুঃখ হয় নাই, কিন্তু 'বুলবুল'-এর মৌলবী হবিবুল্লাহ ও কবি গোলাম মুস্তাফাকে এই জঘন্য আন্দোলনের মধ্যে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া আমরা মুসলমানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। .....**সাহিত্য কি শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে বলির পশুর মত এইভাবে নিহত হইবে?** আশা করি মুসলিম সাহিত্যিকগণ ইহার প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হইবেন।"

এই সময় 'পদ্ম' ও 'শ্রী' সমস্যায় মুসলমান' শীর্ষক রচনায় *('দেশ'-৪র্থ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা)* রেজাউল করীম সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রতীক চিহ্নের ব্যাখ্যা করে এ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনায় মুসলমানদের জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করলেন।

এই রকম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরিশেষে আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তথ্যের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। সে ঘটনাটি হচ্ছে কলকাতার এক মহতী সাহিত্য সভায় বাংলা ভাষা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় সভাস্থ-প্রায় সমস্ত মুসলমান শ্রোতা ও দর্শক মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা-রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন।

নানা দিক থেকেই ঘটনাটি খুবই স্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণও। **'বঙ্গীয় মুসলমান সমিতি'**-র উদ্যোগেই রবিবার ৩১ মার্চ (১৯৪০) প্রখ্যাত কবি ইকবালের স্মরণসভা আহ্বান করা হয়েছিল, কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। কথা ছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আজিজুল হক স্বয়ং এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্যার আব্দুর রহমান সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করেন। সভায় কবি অমিয় চক্রবর্তী এবং বেন আজিব আহ্মদ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকও বলার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সভাপতি সিদ্দিকী সাহেব অবাঙালি বক্তারা বাদে সকলকে উর্দুতে বলার নির্দেশ দেওয়ার প্রতিবাদেই সভাতে প্রচণ্ড গণ্ডগোল বাধে। **'কলিকাতায় কবি স্যার একবালের স্মৃতিসভায় হট্টগোল : বাংলা বনাম উর্দু লইয়া বিক্ষোভ সৃষ্টি'**—এই শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' *(১৯ চৈত্র ১৩৪৬ ।। ১ এপ্রিল, ১৯৪০)* এই সভার যে দীর্ঘ বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তা উদ্ধৃত হল :

"দার্শনিক কবি স্যার মোহম্মদ একবালের স্মৃতিদিবস উদযাপনের জন্য 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র উদ্যোগে গত রবিবার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সালার খান বাহাদুর এম আজিজুল হক সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় প্রথমে মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকি, এম এল এ কিছুক্ষণের জন্য সভাপতিত্ব করেন।

"কবি অমিয় চক্রবর্তী, মিঃ বেন আজিব আহ্মদ ও মৌলানা মুস্তাফিজ একবালের বাংলায় কবির কাব্যালোচনার পর মিঃ হাফিজ ইসাকের উর্দুতে বক্তৃতাকালে বাংলায় বলার জন্য সভায় হট্টগোল বাধে।

"সভাপতি সিদ্দিকি বলেন যে, উর্দু ভাষার কবি একবালের স্মৃতিসভায় উর্দুতে বক্তৃতা হইবে এবং তিনি সভাপতি হিসাবে অবাঙ্গালী বক্তাদের ইংরাজী বা অন্য ভাষায় বক্তৃতা দিবার অনুমতি দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু কোনো বাঙ্গালী মুসলমান বক্তাকে তিনি এই সভায় বাংলায় বক্তৃতা করিবার অনুমতি দিবেন না। তিনি আরও বলেন যে, যাহারা উর্দু জানেন না তাঁহারা সভা হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন। সভায় অবাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল না বলিলেই চলে এবং বহু মুসলমান ছাত্র সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ সিদ্দিকির কথায় সভায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

"মিঃ হাফিজ ইসাকের বক্তৃতার পর সভায় কিছু বলিবার জন্য অনেক ছাত্র সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সভাপতি অন্য কোনও বক্তাকে বক্তৃতা দিবার অনুমতি দেন না এবং স্বয়ং উর্দুতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কোনো কোনো বক্তা স্যার মোহাম্মদ একবালের কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশের প্রশ্ন সভায় উত্থাপন করিয়াছেন কিন্তু একবালের কবিতা বাংলা ভাষায় অনূদিত হইবার নহে। বাংলার মুসলমানরা যদি একবালের কবিতা পড়িবার বাসনা করেন তবে 'বাচ্চা'দের ভালো করিয়া উর্দু পড়াইতে হইবে। অতঃপর তিনি বলেন যে প্রার্থনা করার সময় হইয়াছে বলিয়া সভা ১৫ মিঃ মুলতুবী থাকিবে।"

উল্লেখযোগ্য হট্টগোলের সময় এম এ ক্লাসের ছাত্র আজিজুর রহমান আহত হন। সভাপতি সভাস্থল ত্যাগ করার কিছুক্ষণ করেই পুনরায় সভা শুরু হয়। পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দিয়ে পূর্বোক্ত বিবরণে লেখা হয়েছে :

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সম্পাদক মিঃ হবিবুল্লা বাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র উদ্যোগে সভা আহূত হইয়াছে এবং সমবেত জনমণ্ডলীর অধিকাংশই বাঙ্গালী, অতএব এই সভায় বঙ্গ ভাষার অধিকার অবিসম্বাদিত। বঙ্গভাষা আজ বিশ্বের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বঙ্গভাষাই বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা (করতালি ও হর্ষধ্বনি)। তিনি আরও বলেন যে, সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে না বলা এবং বাংলা ভাষাকে অপমান করা একই কথা। তবে বাংলার মুসলমানগণ এত ক্ষুদ্রচেতা নহেন তাঁহারা অন্য কোনো ভাষাকে অপমান করিবেন। আমরা উর্দুকে শ্রদ্ধা করিব কিন্তু মাতৃভাষার উপরে তাহাকে আসন দিতে পারিব না।"

'মিঃ আজিজুর রহমান (আহত ছাত্র) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'যে নির্যাতন আজ আমাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা সমস্ত বাঙ্গালীর নির্যাতন। অবাঙ্গালীর শোষণ ও অত্যাচার বাংলা আর কতদিন সহ্য করিবে ?'

"মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন কাজি সাহিত্যরত্ন (বয়স ৯২) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, বাঙ্গালী আরবী উর্দু ইংরাজি যে ভাষাতেই পাণ্ডিত্য লাভ করুন না, তাঁহারা চিরদিন স্বপ্ন দেখিবেন বাংলায়। মাতৃভাষাই মানুষের প্রাণের ভাষা। মিঃ মহম্মদ সুলতান, হবিবুল্লা বাহার ও মিঃ এ সবুর একবালের কতকগুলি কবিতার বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন। মিঃ মোজম্মেল হক, মিঃ মহম্মদ আলি, মিঃ আব্দুল সাদেক প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।"

সন্দেহ নাই, এই ঘটনায় যাঁরা সবচেয়ে আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। সভাস্থলে সেদিন তিনি সমস্ত ঘটনাটি গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন। উগ্র ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ-বিষ যখন দেশের সব কিছুকে বিষাক্ত করতে উদ্যত হয়েছে, সেই সময় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র উদ্যোগে এক শ্রেণীর মুক্তবুদ্ধির স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ যে মাতৃভাষা বাংলার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে এমন বলিষ্ঠ কণ্ঠে ও দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন, এটা খুবই আশা ও আনন্দের কথা। কয়েকদিন পর ৩ এপ্রিল (১৯৪০, অনবধানবশত এপ্রিলের জায়গায় মার্চ লিখেছেন) অমিয়বাবু সেই আশা ও আনন্দের সংবাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন :

188 Rash Behari Avenue
Ballygunge, Calcutta.
৩ মার্চ্চ ১৯৪০

শ্রীচরণ কমলেষু,

সেদিন মুসলমান সভায় গিয়ে এই কাণ্ড। খুব ভালো লাগল যে বাঙালী মুসলমান—সাহিত্যিক ছাত্র এবং সাধারণ আপিস-দোকানের কত লোক—বাংলা ভাষা ছাড়তে কিছুতেই রাজি নয়। কবি ইক্‌বালের নামে সাহিত্যসভা, সেখানে আমাদের সকলের স্থান, সভাপতি জোর করে রাজনীতি ঢোকাবেন।

ঠিক এই সময়ই সারা ভারত-মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের দাবি উত্থাপিত ও গৃহীত (২৩-২৪ মার্চ, ১৯৪০) হয়।

পরবর্তী ঘটনা প্রায় সকলেরই সুবিদিত। যে উদ্দাম ধর্মান্ধতা ও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে রক্তস্নান করে শেষ পর্যন্ত গোটা দেশটাই দু-ভাগ হয়ে গেল, সে মর্মান্তিক ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা। ক্ষীণকণ্ঠে হলেও তারই মধ্যে অপর ধারাটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সংখ্যায় অল্প হলেও এঁরা সুস্থ এবং সংস্কারমুক্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ধারাটি বহন করে চলেছিলেন। '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তো হঠাৎ বা আকস্মিক কিছু একটা ব্যাপার নয়। চারদিকের অন্ধকার ও ভয়াবহ দুর্যোগ এবং ঝড়ঝাপটার মধ্যে এইসব মুক্তবুদ্ধির মানুষ অতি সন্তর্পণে দীপশিখাটি

বুকের মধ্যে আড়াল করে বহন করে চলেছিলেন, অল্পকাল পরে তা পূব-বাংলার কোটি কোটি মানুষের মনে আলো জ্বালিয়ে দিলে। সোনার ফসল, একুশে ফেব্রুয়ারি। স্বদেশপ্রেম এবং মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা—যা ফল্গুধারার মতো অলক্ষ্যে সকল মানুষের মনে নিয়তই বয়ে চলেছে ; বন্দুক-সঙ্গীন এবং গায়ের জোরে তাকে নিষ্পিষ্ট করার চেষ্টা করলে, মানুষ তাকে পায়ে-পায়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের জন্মগত মৌলিক অধিকারকে তার আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবেই। একুশে ফেব্রুয়ারি সেই সত্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।*

188 Rashbehari Avenue
Ballygunge, Calcutta
৩রা [illegible]
১৯৪০

২

শ্রীকরকমলেষু

সেদিন মুসলমান সভায় গিয়ে
এই কথা — খুব ভালো লাগল যে
বাঙালী মুসলমান — সাহিত্যিক
[illegible] এবং সুধীজন অধ্যাপক-লেখকদের মত
লোক — বাংলাভাষা ছাড়তে কিছুতেই
রাজি নয়। কবি ইকবালের দেশে
সাহিত্যসভা, যেখানে আমাদের
সকলের মুখ, মনোভাব জোর করে
রাজনীতি ঠেকালেন।

এসব এখন ভালো হলেই একবার
আপনাকে দেখতে চাই — অবশ্য আপনি থাকবেন
কিনা জানি না, কারণ কয়েকদিন এদিকে
আসতে পারিনি।

এখনো এখানে ফিরিনি [illegible]
পারেনি।

কদিন রবীন্দ্র মিশনের লোকদের
কাছে শুনলাম — বেলুড় এবং এখানে।
উঁকে বলে সভায় সভাপতি থেকে
কাছাকাছি এসেছেন। অনেকদিন তাঁর ওঁদের
কাছে ভূমিকা শুনতে পেয়েছি — ক্বচিৎ
বড়ো একটা ভূমিকা অনেকখানি কুসংস্কৃত
অনুকরণ এ কথা বলবারই অপেক্ষা নেই।
কিন্তু মূলেই একটা ভাবে অনেক অনুষ্ঠান
এবং ব্যক্তিগত ধর্ম — যেমন দেখি
কুমারস্বামী বিশ্বাস করেন "সতীদাহ" [প্রথার]
Quarterly তে লিখেছেন)। Edward Thompson
অবশ্য সব কিছুর মেলেনা কিন্তু কুমারস্বামীর
সতীদাহে আধ্যাত্মিক উৎসাহ বোধ করি যে
উনি সমালোচনা লিখেছিলেন তা খুবই ভালো
লেগেছিল। বেলুড়ে তাদের কালীপুজো, দুর্গোৎসব
এবং মাটির প্রতিমা বিশুদ্ধ হিন্দু। তা ছাড়া

(অমিয় চক্রবর্তীর পত্রখানি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে) ;
এই প্রবন্ধে মুদ্রিত সব বড়ো হরফেই লেখকের।

অমিয়কুমার হাটি

শতবর্ষের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিবর্তনে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য ও অঙ্গীকার

একটি বঙ্গশতাব্দী অতিক্রান্ত হল (১৩০০-১৪০০ সাল, ইংরেজি ১৮৯৩-৪-১৯৯৩-৪)। এর আগে হয়েছে নব্যবঙ্গের উদয়। সেই নব্যবঙ্গের তিন দীক্ষাগুরু ছিলেন রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও। বাঙালির ওই নবজাগরণে সে আর কিছু না পাক, পেয়েছিল মানবতাবোধ। সতীদাহ প্রথা দূর হয়েছিল, প্রচলিত হয়েছিল বিধবা বিবাহ। মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশের লগ্ন বেয়ে এসেছিলেন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। উজ্জ্বল সব জ্যোতিষ্কের আলোকিত করা পথ। কিন্তু হয়েছে ছন্দপতন। এসেছে মর্মান্তিক আঘাত। ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত বহমান। সব থেকে বড় ঘটনা হল স্বাধীনতা লাভ। সব থেকে বড় বেদনার জায়গাও সেইটা—ভারত ভাগের সঙ্গে বাংলা যে দ্বিখণ্ডিত। পরিপূর্ণ শক্তি, স্বাতন্ত্র্য রইল না—স্বাধীনতার স্বাদ হল পানসে। শতবর্ষের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিবর্তনে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য ও অঙ্গীকারের এই হল প্রেক্ষাপট।

গত একশ বছরে সারা পৃথিবীতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের হয়েছে অসাধারণ উন্নতি। (১) সেই অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা বা বাঙালির অবদান কতটুকু, তার বিচার-বিশ্লেষণের তথ্যনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকবে এই প্রবন্ধে। (২) গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কতকগুলি—গড়ে উঠেছে কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ, আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এ সব ইতিহাস আলোচনা করা হবে। (৩) পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামোটি তুলে ধরা হবে। (৪) ভেষজ শিল্পের হালটাই বা কী? (৫) বিগত শতাব্দীতে প্রখ্যাত কয়েকজন চিকিৎসককে পেয়ে মহিমামণ্ডিত হয়েছে বাঙালির ঐতিহ্য। তাঁদের স্মরণ-মনন হয়ত আমাদের সাময়িক অবক্ষয় রোধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। (৬) চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্কের মধ্যেই বা কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে? (৭) চিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত চেতনার উন্মেষ কতখানি হয়েছে আমাদের সমাজ-জীবনে? (৮) বাংলা এবং বাঙালীর ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে চিকিৎসা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ রূপরেখাই বা কী? এ সব নিয়েও আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

বিগত শতকের চিকিৎসা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। প্রতিটি প্রসঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিশদ আলোকপাতের দাবি রাখে। চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সাহিত্যসেবীদের সমবেত প্রচেষ্টা ও গবেষণায় কালটিকে যথার্থভাবে ধরে রাখতে পারলে আগামী দিনের চলার পথ কিছুটা মসৃণ হতে পারে। এই রূপরেখা আঁকা তখন সার্থক হয়ে উঠবে।

আন্তর্জাতিক স্তরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাংলা ও বাঙালির অবদান

কলেরা

(১) রবার্ট কক্ (১৮৪৩-১৯১০) কলেরার বীজাণু আবিষ্কার করেন ইজিপ্টে, এর পর কলকাতায় এসে তিনি তাঁর আবিষ্কারের নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছিলেন:

কলেরা সে সময় মহা-মহামারী আকারে ছড়াত। নিম্নবঙ্গ বেশি রকম আক্রান্ত হত। কলকাতাতেও অনেক লোক প্রতি বছর কলেরায় মারা যেত। ১৮৫৪ সালে কলকাতায় কলেরায় ভুগে মারা গিয়েছিল ৩০৮২ জন।[১] তখন ইংল্যান্ড-আমেরিকাতেও কলেরা হত। ১৮৫৪ সালের লন্ডনে অন্তত ১৪০০০ লোকের কলেরা হয়েছিল, মারা গিয়েছিল ৬১৮ জন। গোটা আমেরিকাতেও উনবিংশ শতাব্দীতে অন্তত তিনবার কলেরা মহামারী হানা দিয়েছিল।[২] উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে বছরে ২-৮ লক্ষ লোক কলেরায় মারা পড়ত, কলকাতায় প্রতি হাজারে কলেরায় মরত ২.৯১ জন।[৩] তখনও পর্যন্ত কলেরার কী কারণ, সেটা জানা ছিল না। রবার্ট কক্ নামে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক ১৮৮৩ সালে ইজিপ্টে কলেরার বীজাণু আবিষ্কার করেন। অনেকে সেটা স্বীকার করতে চান না। জার্মান কলেরা কমিশনের নেতা হিসাবে কক্ কলকাতা আসেন ১৮৮৪ সালে এবং কলকাতায় প্রতিটি কলেরা রোগীর জল পরীক্ষা করে কলেরার বীজাণু পান ও তাঁর আবিষ্কারের নিশ্চিত প্রমাণ দেখান। সেই সূত্রে কলেরার বীজাণু আবিষ্কারের সঙ্গে কলকাতার নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। কক্ নোবেল পুরস্কার পান ১৯০৫ সালে।

এরও ১৭ বছর আগে বাংলায় কলেরা নিয়ে দীর্ঘদিন কর্মরত এন সি ম্যাকনামারা নামে এক মিলিটারি চিকিৎসক বলেছিলেন যে এক ধরনের জীবিত কোনও কিছু যা কলেরা-রোগীর মলে আছে, তার থেকে কলেরা হয়। কিন্তু তিনি কোনও নিশ্চিত প্রমাণ দেখাতে পারেননি। অনুমান করেছিলেন মাত্র।[৪] রবার্ট কক্ তা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেন, দেখান যে 'ভিব্রিও কলেরি' নামক বীজাণু থেকে কলেরা হয়।

(২) কলেরার চিকিৎসায় হাইপারটনিক লবণজলের ব্যবহার

কলেরার চিকিৎসায় লবণজলের ব্যবহার প্রথম করা হয়েছিল সাংহাই-এ, ১৮৭৫ সালে।[৫] কিন্তু তখন নর্মাল স্যালাইন ব্যবহার করা হত, তাতে মৃত্যুহার ছিল ৬৩ শতাংশেরও উপরে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে লিওনার্ড রজার্স প্রথম হাইপারটনিক স্যালাইন দিয়ে কলেরা রোগীর

চিকিৎসা শুরু করলেন ১৯০৮ সালে। এতে মৃত্যুহার অনেক কমল (৩২.৬%)। দেখা যায় এ চিকিৎসা খুবই ফলপ্রদ, অনেক লোক জীবন ফিরে পায়। ১৯১৫-১৭ সালে এই চিকিৎসায় মৃত্যুহার আরও কমে দাঁড়ায় ১৯%-এ।[৪]

(৩) কলেরা এনটেরোটক্সিনের প্রকৃতি নির্ণয়

কলেরা বীজাণুর এনটেরোটকসিনের অস্তিত্ব নিয়ে বহু সংশয় ছিল। এনটেরোটকসিনের অস্তিত্বের প্রথম দাবি করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ শম্ভুনাথ দে। এই এনটেরোটকসিন কলেরা যে সব ক্ষতি করে তার জন্য দায়ী। পরে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল স্বীকার করেন যে তাঁর এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশিরা এ নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানে মাতেন।

(৪) ভারতে কলেরা বীজাণুর অন্য একটি ধরন অনুসন্ধান

প্রসঙ্গত রবার্ট কক্ যে বীজাণু আবিষ্কার করেছিলেন, তা ছিল ধ্রুপদী কলেরা। কিন্তু কলেরা বীজাণু অনেক ধরনের হতে পারে। নানা পরীক্ষায় সেটা জানা যায়। কতকগুলি মারাত্মক কলেরা বীজাণুর এ রকম একটি ধরন হচ্ছে ভিবরিও এল-টর (vibrio el-tor)। ফিলিপাইনস প্রভৃতি অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। দারুণ ক্ষতিকারক। ভারতে এল-টর কলেরার অস্তিত্ব প্রথম কিন্তু কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় কলকাতাতেই ধরা পড়ে ১৯৬৪ সালে, এসেছিল মায়নামার (বার্মা) থেকে।[৫,৬]

ম্যালেরিয়া

(১) যুগান্তকারী আবিষ্কার—মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায়

কলকাতার পি জি হাসপাতালে ম্যালেরিয়া গবেষণায় কর্মরত চিকিৎসক স্যার রোনাল্ড রস (১৮৫৭-১৯৩২) এই আবিষ্কার করেন। রসের জন্ম ভারতের আলমোড়ায়। তাঁর বাবা ছিলেন ভারতবর্ষে বৃটিশ সেনাদলের অফিসার। রস ইংল্যান্ড থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। তার পর তাঁকে পাঠানো হয় ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত গবেষণার দায়িত্ব দিয়ে। যদিও ম্যালেরিয়া ও মশা কোনটাই রসের তেমন জানা ছিল না, তা হলেও খুব অল্প সময়ে সাফল্যলাভ করলেন। ১৮৯৭ সালে সেকেন্দ্রাবাদে অ্যানোফেলিস মশার পেটের ভিতর ম্যালেরিয়া পরজীবীর অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন। কিন্তু স্বস্তিতে কাজ করতে পারলেন না। বদলি হলেন কলকাতায়। সময় কম। ২/১ বছরের মধ্যে কালাজ্বর নিয়ে সমীক্ষা করতে যেতে হবে আসামে। তখন কলকাতায় মানুষের ম্যালেরিয়াও তেমন ছিল না। চড়ুই পাখির ম্যালেরিয়া নিয়ে কাজ শুরু করলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি দেখালেন, ম্যালেরিয়া হয়েছে যে চড়ুই-এর, তাকে মশা যদি কামড়ায়, তা হলে সেই মশার শরীরে ম্যালেরিয়া পরজীবী সংখ্যায় বাড়ে। তার দশদিন পর ঐ মশা অন্য নীরোগ চড়ুইকে কামড়ালে তার ম্যালেরিয়া হয়। মশার লালাগ্রন্থিতে ম্যালেরিয়ার পরজীবীও (স্পোরোজয়েট) খুঁজে পেলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রথম প্রমাণ করলেন, মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায়। চড়ুই পাখির ম্যালেরিয়া পরজীবীর নাম প্লাসমোডিয়াম রেলিকটাম (এর থেকে মানুষের ম্যালেরিয়া হয় না)। যে মশা এই পাখির ম্যালেরিয়া ছড়ায় অর্থাৎ প্লাসমোডিয়াম রেলিকটাম ছড়ায়, তার নাম কিউলেকস কুইনকুইফেসিয়েটাস। ওই বছরেই ইতালিতে তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে একদল বিজ্ঞানী (গ্রাসি, বিগনামি ও ব্যাসটিয়ানেলি)[৭] দেখালেন মানুষের ম্যালেরিয়া ছড়ায় অ্যানোফেলিস মশা। কলকাতায় বসে রস যে অনন্য আবিষ্কার করলেন, তার জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯০২ সালে।

(২) বানরের নতুন ম্যালেরিয়া পরজীবী আবিষ্কার

১৯৩২ সালে কলকাতায় স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের দুই চিকিৎসক ডাঃ নোলস ও ডাঃ দাশগুপ্ত প্লাসমোডিয়াম নোলেসি নামে বানরের (ম্যাকাকা আইরাস) এক ধরনের ম্যালেরিয়া আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের গুরুত্ব রয়েছে দুটি কারণে। প্রথমত এই ম্যালেরিয়ায় মানুষ সংক্রামিত হতে পারে, এ হচ্ছে মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষে রোগ ছড়ানোর একটা উদাহরণ। দ্বিতীয়ত এই আবিষ্কারের পর ম্যালেরিয়ার ওষুধ বের করার ব্যাপারে বাঁদরের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সুবিধা হয়েছিল। কারণ কোনও ওষুধ বাজারে ছাড়তে গেলে বাঁদরের উপর পরীক্ষা করার দরকার হয় একটি স্তরে। সারা পৃথিবীতে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

কালাজ্বর

(১) কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার

কালাজ্বরও ছিল অভিশাপ। বাংলা-বিহার-আসাম-মাদ্রাজে বহু লোক এই রোগে ভুগে মারা যেত। কোনও ভাল ওষুধও ছিল না। ম্যানসন[৮] প্রথমে এক ধরনের অ্যান্টিমনি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন, ডি ক্রিস্টিনা ও ক্যারনিয়া[৯] ১৯১৫ সালে কালাজ্বরের চিকিৎসায় টারটার এমেটিক (একটি অ্যান্টিমনি সমন্বিত ওষুধ) ব্যবহার করেন। ভারতে রজার্স[১০] সম্ভবত প্রথম টারটার এমেটিক ব্যবহার করেন। যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে।[১১] তবে এই ওষুধটিও ততটা কার্যকর ছিল না, রোগটা সারতে অনেক সময় লাগত, অনেক বেশি ইঞ্জেকশন দিতে হত, নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিত। অনেক সময় রোগটা সারতও না এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলেও।

স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী (১৮৭৫-১৯৪৬) সম্পূর্ণ এককভাবে গবেষণা চালিয়ে বের করলেন কালাজ্বরের অব্যর্থ ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন। এটাও অ্যান্টিমনি থেকে তৈরি হল, কিন্তু প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্যরকম। ভারতের আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে একটি সাংঘাতিক পরজীবীঘটিত রোগের বিরুদ্ধে এইরকম পুরোপুরি কার্যকর ওষুধ আবিষ্কার করা অত্যন্ত গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়।

এবং যেভাবে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন সেটাও উল্লেখযোগ্য। ছিল না কোনও আধুনিক গবেষণাগার। আলোও অপ্রতুল। জায়গা কম। ক্যাম্পবেল হাসপাতালের একটি ছোট ঘরে লণ্ঠনের আলোয় কাজ করতেন, নানা রকম রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। এতে প্রমাণ হয়, ইচ্ছা যদি থাকে, তা হলে যে কোনও অবস্থাকেই মানুষ কাজে লাগাতে পারে।

এবং তাঁর জ্ঞানও ছিল অগাধ। সেকালের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সুচিকিৎসক তো ছিলেনই, তিনি ছিলেন রসায়নেরও খুব ভাল ছাত্র।

তাঁর গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯২০ সালে। কালাজ্বরের অব্যর্থ এই ওষুধটি তৈরি করে সাফল্য লাভ করলেন ১৯২২ সালে, মাত্র দু-বছরের মধ্যেই। তিনি আবিষ্কার করলেন যে ইউরিয়া স্টিবানিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, এবং যে যৌগ তৈরি করছে, তার গুণ অসাধারণ, কালাজ্বরের চিকিৎসায় ফলপ্রসূ যা তিনিও আগে আশা করতে পারেননি।

ইউরিয়া স্টিবাসিন, ইউরিয়া ও স্টিবামিনের একটি যৌগ, তৈরি হল পি অ্যামাইনো ফিনাইল স্টিবিনিক অ্যাসিডের সঙ্গে ইউরিয়ার মিলনে যার সঙ্কেতচিহ্ন $NH_2CO. NH. C_6H_4Slo. OH. ON_4$. এতে অ্যান্টিমনি আছে ৩৫%।

এই ওষুধের কতকগুলি সুবিধা : (১) ১-২ সপ্তাহের মধ্যে রোগীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি (২) তাৎক্ষণিক সুস্থ হয়ে যাবার হার ৯০-৯৫% (৩) কোনও বিষক্রিয়া বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু নেই (৪) শরীর এ ওষুধ সহ্য করতে পারে। (৫) সম্পূর্ণই সেরে যায়—রোগ আর ফিরে

আসে না। (৬) অন্য ওষুধ অকার্যকর হলে এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলে সারে। ইউরিয়া স্টিবামিনের চেয়ে অন্য কোন ভাল ওষুধ তখন আর কিছু ছিল না।

ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরের নানা জায়গাতেও ওষুধটি তখন বহুল ব্যবহৃত হত। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনদান করেছে ডঃ ইউ এন ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত এই ওষুধটি। এমনই ছিল ওষুধটির উচ্চ গুণগত মান যে, ওষুধটি আবিষ্কারের অল্পকালের মধ্যে এর উপর প্রশংসাসূচক ১৫টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল দেশি ও বিদেশি বিজ্ঞান পত্রিকায়। তিনিই প্রথম কালাজ্বরের চিকিৎসায় রসায়নের পরিভাষায় পেন্টাভ্যালেন্ট অ্যান্টিমনিয়ালস ব্যবহার করেছিলেন, পরে অন্যান্য বিজ্ঞানীও সেই পথে এগিয়েছেন।

এখন নতুন করে কালাজ্বর দেখা দিয়েছে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফর্মুলাটা হারিয়ে গেছে। ওই ওষুধ থাকলে এখনকার ওষুধে (সোডিয়াম অ্যান্টিমনি গ্লুকোনেট) সব সময় সারছে না এমন রোগীরা ভাল হয়ে যেত বলে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা।

(২) কালাজ্বর থেকে উদ্ভূত চামড়ার একটি অসুখের বর্ণনা

কালাজ্বর সম্পূর্ণ সেরে যাবার পর কারও কারও (২-২০% ক্ষেত্রে) চামড়ার একটা অসুখ হয়। সেটাকে বলে পোস্টকালাজ্বর ডার্মাল লিসমানিয়াসিস। এ ধরনের অসুখের প্রথম বর্ণনা দিয়েছিলেন স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী। তিনিই প্রথম এটা দেখেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেন। কালাজ্বর হলে চিকিৎসা না করলে রোগী মারা যায়। কিন্তু এই পোস্টকালাজ্বর ডার্মাল লিসমানিয়াসিস-এ চামড়ার রঙের বদল ঘটে বা চামড়ায় গুটি বেরোয়, রোগী মারা যায় না, তবে রোগটা ছড়াতে সাহায্য করে স্যান্ডফ্লাই নামে এক ধরনের পোকার মাধ্যমে। এর চিকিৎসাতেও ইউরিয়া স্টিবামিন ছিল অত্যন্ত কার্যকর।

(৩) গবেষণাগারে কালাজ্বরের পরজীবীর উৎপাদন

রোগনির্ণয়ে বা কালাজ্বর নিয়ে গবেষণায় কিম্বা প্রতিরক্ষামূলক কোনও কাজে কালাজ্বরের পরজীবী (লিসমানিয়া ডোনোভানি) গবেষণাগারে উৎপাদন করলে সুবিধা হয়। কলকাতাই প্রথম গবেষণাগারে কালাজ্বরের পরজীবীর উৎপাদন বা কালচারের পথ দেখেছে। রজার্স এই কাজে সফল হন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে।

এই সূত্রে বলে রাখা ভাল যে কালাজ্বরের পরজীবী প্রথমে আবিষ্কার করেন লিসম্যান, ইংল্যান্ডে, ১৯০৩ সালে, একজন সৈনিকের রক্ত পরীক্ষা করে। সেই সৈনিকটি দমদমে রোগাক্রান্ত হয়েছিল। কালাজ্বরের আর এক নাম তাই দমদম ফিভার।

(৪) কালাজ্বরের বাহিকা পতঙ্গ স্যান্ডফ্লাই

ভারতে কালাজ্বরের বাহিকা পতঙ্গের বৈজ্ঞানিক নাম ফ্লেবটোমাস আর্জেন্টিপেস। এই পতঙ্গ চেনার আগে তেমন কোনও ভাল পদ্ধতি ছিল না। সে সময় জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ অ্যানানডালে। তাঁর সহকর্মী ছিলেন ব্রুনেট। তাঁরা পতঙ্গটিকে চিহ্নিত করে পতঙ্গটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন। তখন অবশ্য কী করে কালাজ্বর ছড়ায়, তার কোনও ধারণা ছিল না এবং এই নতুন নামের স্যান্ডফ্লাই যে কালাজ্বরের বাহিকা সেটাও জানা ছিল না।

(৫) কালাজ্বরের বাহিকা হিসাবে স্যান্ডফ্লাইকে চিহ্নিতকরণ

কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের তিন বিজ্ঞানী নোলস, নেপিয়ার ও স্মিথ ১৯২৪ সালে উপরে উল্লিখিত ফ্লেবটোমাস আর্জেন্টিপেস স্যান্ডফ্লাইকে কালাজ্বরের বাহিকা বলে চিহ্নিত করেন। তাঁরা কালাজ্বরের রোগীর গায়ে ওই স্যান্ডফ্লাই বসালেন। স্যান্ডফ্লাই রক্ত খেল। তারপর ওই স্যান্ডফ্লাই-এর শরীরের ভিতর কালাজ্বরের পরজীবীর বৃদ্ধি লক্ষ করলেন। পরে ১৯৪২ সালে ওই ধরনের সংক্রামিত স্যান্ডফ্লাই যখন স্বেচ্ছাসেবীর রক্ত খেল, তখন দেখা গেল তাদের কালাজ্বর হল। সেটা প্রমাণ করেন স্বামীনাথ, সর্ট ও অ্যান্ডারসন, আসামে। এইবার প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হল যে কালাজ্বরের বাহিকা ফ্লেবটোমাস আর্জেন্টিপেস। আজ পর্যন্ত ভারতে ওই এক ধরনের স্যান্ডফ্লাই রোগটি ছড়ায়।

(৬) গবেষণাগারে কালাজ্বর রোগ নির্ণয়ে নানা পদ্ধতি আবিষ্কার

রক্ত পরীক্ষা করে পরোক্ষভাবে নানা [illegible] কালাজ্বর রোগ নির্ণয় পদ্ধতি যেমন অ্যালডিহাইড টেস্ট, অ্যান্টিমনি টেস্ট ও কমপ্লিমেন্ট ফিকসেশন টেস্ট বের করেছিলেন কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চিকিৎসকবৃন্দ। এখন অবশ্য এর থেকেও কোনও কোনও জটিল পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সে সব দিনে রোগ নির্ণয়ে এই সরল পদ্ধতিগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

ফাইলেরিয়া

(১) রক্তে ফাইলেরিয়া কৃমির জীবনচক্রের একটি স্তর মাইক্রোফাইলেরিয়া আবিষ্কার

১৮৭২ সালে টিমথি লিউইস কলকাতায় প্রথম সংক্রামিত মানুষের প্রান্তিক রক্তে (peripheral blood) ফাইলেরিয়া কৃমির (উচেরেরিয়া ব্যানক্রফটাই) জীবনচক্রের একটি স্তর মাইক্রোফাইলেরিয়া আবিষ্কার করেন। এর আগে অবশ্য হাভানায় (১৮৬৩) ফরাসি শল্যচিকিৎসক ডারমারকে হাইড্রোসিল থেকে নেওয়া রসে এবং ব্রাজিলে ডাঃ উচেরার (৪ আগস্ট, ১৮৬৬) এক রোগীর দুধের মত সাদা প্রস্রাব থেকে মাইক্রোফাইলেরিয়া পেয়েছিলেন।

তবে টিমথি লিউইস-এর আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণে। প্রথমত প্রান্তিক রক্ত পরীক্ষা করে বলা সহজ কৃমির সংক্রমণ হয়েছে কিনা। দ্বিতীয়ত প্রান্তিক রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়া থাকলে তার শীঘ্র চিকিৎসা দরকার, তা না হলে কিউলেকস মশা ওই রক্ত খেলে মশার পেটের ভিতর কৃমিগুলির জীবনচক্র কিছুটা অতিবাহিত হবে এবং ওই রোগ ছড়াবে।

(২) ফাইলেরিয়া কৃমির পুরুষ ও স্ত্রী খুঁজে পাওয়া

১৮৮৭ সালে লিউইস কলকাতায় এক রোগীর অণ্ডকোষের লসিকা থেকে ফাইলেরিয়া পুরুষ ও স্ত্রী কৃমি বের করেন। অবশ্য তার একমাস আগে 'ল্যানসেট' পত্রিকায় জোসেফ ব্যানক্রফট একটি নিবন্ধ লিখে জানান যে তিনি স্ত্রী কৃমি পেয়েছেন ১৮৭৬ সালে ব্রিসবেনে একটি চীনা রোগীর বাহুর একটি স্ফীত অংশ থেকে। পুরুষ কৃমির বর্ণনা দেন আলফ্রেড জিবস বোর্ণে। মাদ্রাজ থেকে ১৮৮৮ সালে। এ ক্ষেত্রে লিউইস দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি স্ত্রী ফাইলেরিয়া কৃমি চিনেছিলেন, যা প্রথম পেয়েছিলেন অণ্ডকোষে এবং প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের শরীরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় কৃমির উপস্থিতি ধরেছিলেন।

এপিডেমিক ড্রপসি

(১) অসুখটির কারণ নির্ণয়

এক সময় এপিডেমিক ড্রপসি ছিল অভিশাপ। বাংলায় এ রোগ বিশেষ করে দেখা যেত। কোনও কারণ জানা ছিল না। অনেকে মারা পড়ত। মহামারীর আকারে বাংলায় দেখা দিয়েছিল ১৮৮১, ১৯০১, ১৯০৭,

১৯০৮, ১৯০৯, ১৯২৪ ও ১৯২৬-২৭ সালে। অনেকে মনে করতেন সরষের তেলের সঙ্গে অসুখটার সম্পর্ক আছে। কিন্তু কোনও তথ্যপ্রমাণ মেলেনি।

কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের বিজ্ঞানীরা ১৯৩৯ সালে প্রথম আবিষ্কার করলেন যে সরষের তেলে শেয়ালকাঁটা (আর্জিমোন মেক্সিকানা) মেশানোর ফলে এই রোগ হয়।

(২) সরষের তেলে শেয়ালকাঁটা ভেজাল নির্ণয়

কারণ তো জানা গেল। কিন্তু সরষের তেলে যে শেয়ালকাঁটা মেশানো রয়েছে, সেটা জানা যাবে কীভাবে? ভেজাল কীভাবে ধরা যাবে? তার একটা অতি সহজ পদ্ধতিও (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড টেস্ট) আবিষ্কৃত হয়েছে কলকাতায়, ট্রপিক্যাল স্কুলে।

উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ

এক ধরনের গাছ (সর্পগন্ধা—রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা) থেকে যে অ্যালকালয়েড পাওয়া যায় তা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা যায় বলে ট্রপিক্যাল স্কুল প্রথম জানিয়েছিল। তখন অবশ্য তার থেকে বিশিষ্ট অ্যালকালয়েড বের করতে পারা যায়নি। পরে অন্য জায়গার বিজ্ঞানীরা সেটা বের করতে সফল হন।

মিত্র'র শল্যচিকিৎসা

মেয়েদের জরায়ুমুখের ক্যানসার (ক্যানসার সার্ভিকস)-এর শল্য চিকিৎসায় এক নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করেন ডাঃ সুবোধ মিত্র, কলকাতার বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। এই পদ্ধতি (র‍্যাডিক্যাল ভাজাইনাল হিসটেরেকটমি উইথ বাইল্যাটারাল পেলভিক লিম্ফ্যাডেনেকটমি বা মিত্রস অপারেশন) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এটাকে বলা হত ক্যালকাটা অপারেশন।

উপরে যে সব বলা হল, এ সমস্তই চিকিৎসা বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইপত্র

চিকিৎসা বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছিল কলকাতায়। ভারতে তো বটেই, বিদেশের নানা জায়গায় এই পুস্তকগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, বিশেষত ছাত্র, চিকিৎসক, গবেষক ও প্র্যাকটিশিং ডাক্তারের কাছে। এইরকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল: ঘোসেস ফার্মাকোলজি[১২], ঘোসেস প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন[১৩], ডাঃ কে পি দাসের ক্লিনিক্যাল সার্জারি[১৪] ও অপারেটিভ সার্জারি[১৫], ডাঃ কে ডি চ্যাটার্জীর প্যারাসাইটোলজি[১৬] এবং ডাঃ এম এন দে ও ডাঃ কে ডি চ্যাটার্জীর ব্যাকটিরিওলজি[১৭]।

চিকিৎসা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পত্রিকা

তিনটি আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে: (১) ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট (১৮৬৬), (২) জার্নাল অব ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩০) ও (৩) বুলেটিন ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন (১৯৫৩)। ইংরেজি ভাষায় লেখা এই তিনটি গবেষণা পত্রিকা ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। জার্নাল অব ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এখনও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র। এই পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার। এ ছাড়াও ছিল ক্যালকাটা মেডিক্যাল গেজেট, পি জি বুলেটিন প্রভৃতি। এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার বিদেশের বিখ্যাত কিছু রিভিউ জার্নালে নিয়মিত প্রকাশিত হত।

মেডিক্যাল কলেজগুলি প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

(১) মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর আদেশ অনুসারে ১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হল কলকাতায়। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ ব্রামলে। প্রখ্যাত সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ারকে ১৮৩৭ সালে এই কলেজের কাউন্সিলের সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষের পদে বরণ করা হয়েছিল, যাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার উন্নতি হয়। ডেভিড হেয়ারের প্রিয় কিছু ছাত্র প্রথম দলে ভর্তি হন এই কলেজে। এঁদের মধ্যে প্রসন্নকুমার মিত্র ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। প্রথম দলে ৫০ জন ছাত্র নির্বাচিত হয়েছিলেন। সকলেই বৃত্তি পেতেন। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের নেতৃত্বে একদল ছাত্র প্রথম শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করেন ১০ জানুয়ারি ১৮৩৬। রক্ষণশীল সমাজে এই নিয়ে তখন খুব আন্দোলন হয়েছিল। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রথম শব ব্যবচ্ছেদকারীদের সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কামান দাগা হয়েছিল। কলেজ খোলার ৩১/২ বছর পর ৩০ অক্টোবর ১৮৩৮ প্রথম পরীক্ষা হয়। এতে ১১ জন ছাত্রের মধ্যে পাশ করেন চারজন: উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র। প্রথম স্থান অধিকার করে উমাচরণ শেঠ দ্বারকানাথ ঠাকুর পুরস্কার (১০০০ টাকা) ও লর্ড অকল্যান্ডের দেওয়া একটি সোনার ঘড়ি পান।

প্রসন্নকুমার মিত্রের নাম উল্লেখ করার আর একটি কারণ আছে। ১৮৩৮ সালের ১২ মার্চ তারিখে সংস্কৃত কলেজে 'জ্ঞানার্জন সভা'য় প্রসন্নকুমার মিত্র ইংরেজিতে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বিষয় "The Physiology of dissection"[১৮] শব ব্যবচ্ছেদের ব্যাপার ছিল বক্তৃতার বিষয়—বিজ্ঞানকে মুক্তমনে গ্রহণ করার সে ছিল উষালগ্ন। অনেকরকম সংস্কার এরপর চূর্ণ হল। চারজন ছাত্র ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু, সূর্যকুমার চক্রবর্তী (গুডিভ চক্রবর্তী) ইংল্যান্ড গেলেন, সেখানকার পরীক্ষাতেও খুব ভাল ফল করলেন (১৮৪৭)। কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্ধকার কেটে যে যাচ্ছে ধীরে ধীরে সমাজ থেকে, সেই কালে তার আর একটি অনন্য উদাহরণ ব্রাহ্মণ ঘরের বধূ মিসেস কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ভর্তি হলেন ছাত্রী হিসাবে মেডিক্যাল কলেজে ১৮৮৪ সালে, পরের বছর তিনি চলে গেলেন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে। গর্বের বিষয় এই যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ছাত্রী হিস্যবে যোগদান করছিলেন। মহিলাদের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা প্রসারে একজন মহীয়সীর কথাও উল্লেখযোগ্য। মহারানী স্বর্ণময়ী দেড় লাখ টাকা দান করেছিলেন যে সব মহিলা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে আসবেন, তাঁদের হোস্টেল নির্মাণের জন্য।

শতবর্ষের কিছু আগের এই সব ঘটনা। কিন্তু এঁরা অনেকেই দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে চিকিৎসা করেছেন, চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি পেয়েছেন পরবর্তী কালে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভোলানাথ বসুর স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করছে ব্যারাকপুরে ও হুগলির মাদালাই গ্রামে ভোলানাথ বসু চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি। এইসব পাত্রপাত্রী আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতেও পদচারণা করেছেন। এখন প্রতি বছর মেডিক্যাল কলেজে ১৫৫ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হন।

(২) আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েকজন জনদরদী স্বাধীনচেতা চিকিৎসকের প্রচেষ্টা ও উদ্যম, যাঁরা আধুনিক চিকিৎসা

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন, ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন সর্বসাধারণের মাঝে। তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল, সরকারি যে শিক্ষাব্যবস্থা এতাবৎ প্রচলিত আছে, সেটা যথেষ্ট নয়। একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষাটাকে কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রসার ঘটাতে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। ১৮৮৬ সালে গড়ে উঠল ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিন। উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আরও চিকিৎসক তৈরি করা, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যাকে সাধারণের উপযোগী করা ও সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

একটা ভাড়া বাড়িতে স্কুল চলেছিল ১৭ বছর ধরে। বর্তমানে যে জায়গায় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ আছে, সেখানে জমি কেনা হয় ১৮৯৬ সালে এবং স্কুলটিকে বেলগাছিয়াতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯০৩ সালে। শিক্ষাসূচি বদলানো হয় ১৮৮৭ সালে, অন্য সরকারি মেডিক্যাল স্কুলের মত করে। নামও বদলে রাখা হয় ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল। রোগী দেখতে ও ক্লিনিকের জন্য ছাত্ররা মেয়ো হাসপাতালে যেতে আরম্ভ করেন ১৮৮৮ সাল থেকে। ১৯১৬ সালে এটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে এটি ভারতে সর্বপ্রথম স্বীকৃত বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। ১৯১৬ সাল থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসে। এম বি পরীক্ষার অনুমোদনও পায়। লর্ড কারমাইকেলের নামানুসারে ১৯১৯ সালে কলেজের নাম হয় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ একটি বিশেষ সভায় আবার নাম বদল করা হয়। এই কলেজের একজন দরদী ও বরেণ্য শিক্ষক রাধাগোবিন্দ করের নামানুসারে কলেজের নাম রাখা হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ। এখন কলেজটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারেন ১৫০ জন।

(৩) দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট

মূলত দুটি মেডিক্যাল স্কুল একত্র হয়ে গঠিত হয়েছে ক্যালকাটা ন্যাশানাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট। একটি মেডিক্যাল স্কুলের নাম ক্যালকাটা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ঠিকানা ৩০১/৩ আপার সার্কুলার রোড। এটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯১১ সালে এবং এটি হচ্ছে ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল স্কুল। ডাঃ এস কে মল্লিক, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২০ সালে স্থাপিত হয়েছিল অপর একট মেডিকাল স্কুল—যার নাম ন্যাশানাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট। "জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ" থেকে এই নামকরণ। গান্ধীজি এই মেডিক্যাল স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। এই মেডিক্যাল স্কুলটির পিছনে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষচন্দ্র বসু (শেষোক্ত দুজনে সেক্রেটারি হয়েছিলেন), ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ স্বনামখ্যাত নেতৃবৃন্দ। প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা ছিল ১৮৯ মানিকতলা মেন রোড। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন ১৯২৯ সালে কলকাতা পৌরসভার মেয়র হলেন, তখন বেশ কিছু জমি দেওয়া হল, ২৪ গোরাচাঁদ রোডে। তৈরি হল তিনতলা হাসপাতাল। পরে দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থে নামকরণ হল চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে এ দুটি মেডিক্যাল স্কুল এক হয়ে যায়, নামকরণ হয় ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা প্রতি বছরে ১৫০।

(৪) দি নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

পূর্ববর্তী নাম ছিল ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল। স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৩ সালের বাংলার প্রচীন মেডিক্যাল স্কুলগুলির অন্যতম, যা জনগণের সেবা করে এসেছে দীর্ঘ ৭৪ বছর। ছিল তিন বছরের শিক্ষাক্রম।' বাংলা ও ইংরেজি দুভাষাতেই শেখানো হত। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় ৪ বছরের শিক্ষাক্রম—যেসব ডাক্তার বের হতেন শিক্ষাক্রম শেষ করে তাঁরাই ছিলেন আসল স্থানীয় ডাক্তার বা তথাকথিত নেটিভ ডাক্তার—এল এম এফ—গ্রামে-গঞ্জে এঁরাই ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং জনগণের যথার্থ সেবা করেছিলেন। এই ক্যাম্পবেল স্কুলেই ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৯৫০ সালের ১০ আগস্ট কলেজের নাম হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। প্রতি বছর ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হন।

(৫) বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ

বাঁকুড়া শহরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৫২ সালে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ১৯৫৬ সালে আবার আবির্ভাব ঘটে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে, সেখানে শুরু হয় এম বি বি এস পঠন-পাঠন। এখানে প্রতি বছর ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হন।

(৬) বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ

বর্ধমানে রোনাল্ডসে মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। এটা বন্ধ হয়ে যায় ১৯৫৫ সালে। এর পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রতি বছর ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হন।

(৭) নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ

প্রতি বছর ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হন। এ ছাড়া আরও সিটি মেডিক্যাল স্কুল গড়ে উঠেছিল—ছেলেদের জন্য লিটন মেডিক্যাল স্কুল (১৯২৪), চিটাগাং মেডিক্যাল স্কুল (১৯১০) ও জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল জলপাইগুড়ি (১৯৩০)।

ডাঃ পরেশ গুহ রোডে কলকাতায় ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৬ সালে। এই অবক্ষয়ের যুগেও চিকিৎসাবিদ্যা পঠন-পাঠনে পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল কলেজগুলির সুনাম এখনও আছে, সারা ভারতে তো বটেই, বহির্বিশ্বেও। অনেক সময় ছাত্রদের উপর অযথা দোষারোপ করা হয়। বলা হয়, পঠন-পাঠনে, রোগী-পরীক্ষায় তাঁরা আর তত উৎসাহী নন। কিন্তু এই লেখকের অভিজ্ঞতা কিছুটা ভিন্ন। অধিকাংশ চিকিৎসক-শিক্ষকের মধ্যে মূল্যবোধের কোথায় যেন একটা অভাব। অবক্ষয়ের মূল উৎস সেইখানেই। শিক্ষক হয়ে নূতন প্রজন্ম যাঁরা আসছেন, তাঁরা হয়ত এই অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারেন, বাঁচাতে পারেন চিকিৎসা-শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র

(১) ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন

উষ্ণমণ্ডলীয় অসুখের গবেষণার সঙ্কল্প নিয়ে স্যার লিওনার্ড রজার্স ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৩ সালে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে কলেরায় হাইপারটনিক স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসার প্রচলন করেছিলেন, যাতে অনেক রোগীর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। তাঁর স্বপ্ন ছিল লন্ডনের আদলে কলকাতায় স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন প্রতিষ্ঠার। এর জন্যে তিনি ইংল্যান্ডের রয়াল আর্মি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকের পদ প্রত্যাখ্যান করেন (১৯০৭)। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনার জন্য লেখালেখিও করতে থাকেন, ১৯১০ সালে এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে এই নিয়ে একটি

প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। অবশেষে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসেস-এর ডিরেক্টর জেনারেল স্যার পার্ডে লিউকিস-এর সহায়তায় তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়—লর্ড কারমাইকেল, বাংলার গভর্নর ১৯১৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, ১৯২১ সালে দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র ও স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন প্রতিষ্ঠান। পৃথিবী জুড়ে রয়েছে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম। উষ্ণ অঞ্চলীয় রোগব্যাধির উপর গবেষণা, তথ্য আহরণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা রচনা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন। কোথাও কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হলে, নতুন ধরনের মহামারী দেখা গেলে তখন সেখানে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানীরা যান অনুসন্ধানে। দেশের প্রয়োজন অনুসারে নতুন করে গড়ে তোলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটু নজর দিলে অত্যুৎকৃষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

(২) অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ

ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান। কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের পাশেই। দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে অলিখিত সহযোগিতা। ১৯৩৩ সালে বাংলার গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসন সরকারিভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। জনস্বাস্থ্যের প্রচার ও প্রসারে সারা ভারতে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

(৩) পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ পি এন ব্যানার্জী, ডাঃ সুবোধ মিত্র প্রমুখের প্রচেষ্টায় এটি গঠিত হয় ১৯৫৬ সালে। চিকিৎসাবিদ্যা ও গবেষেণার ওপর গুরুত্ব দেবার জন্যই গড়ে উঠেছিল এই সংস্থা। তবে অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়নি।

(৪) শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল

আগের নাম প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল। স্থাপিত হয়েছিল ১৭০৭ সালে। স্যার রোনাল্ড রস এখানেই মশা নিয়ে ম্যালেরিয়া গবেষণায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। নতুন নামকরণ হয় ১৯৫৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন। আধুনিক সবরকম সাজসরঞ্জামে সুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত কলকাতার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল। ধরতে গেলে এই একই ক্যাম্পাসে রয়েছে ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিন।

স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার জন্য এটা সরকারের পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান কটি নিয়ে একই ছাতার তলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি পঠন-পাঠন ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো মিলনের উপযোগী। সম্ভাবনাময় নতুন এক দিগন্ত খুলে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ আবার সারা ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর মানচিত্রে গৌরবময় স্থান করে নিতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

কলকাতায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের আরও কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান উল্লেখের দাবি রাখে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঙালিদের দ্বারাই পরিচালিত, বাঙালি বিজ্ঞানীদের সংখ্যাই বেশি। (১) চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। (২) সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি, কলকাতাও প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৫৭ সালে। (৩) ডঃ জে সি রায়কে অধ্যক্ষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে গড়ে উঠেছিল আর একটি সুন্দর গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৩৫ সালে, যার প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ। এপ্রিল, ১৯৫৬ থেকে কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর অন্তর্গত এটি একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের মর্যাদা পায়। নাম বদলে হয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির আবার নাম বদলে রাখা হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি (IICB)। প্রাণরসায়নের অণুপরমাণু স্তরে গবেষণার ক্ষেত্রে সারা দেশে ও বিদেশেও প্রতিষ্ঠানটি সুনাম অর্জন করেছে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামো

স্বাধীনতার আগে সাধারণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা তেমন কিছু ছিল না বললেই চলে। নানারকম মড়ক, মহামারীতে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হত। হাসপাতাল ও চিকিৎসকের সংখ্যাও ছিল জনসংখ্যার অনুপাতে নগণ্য। কারণ ইংরেজদের মূলমন্ত্র ছিল শোষণ। জনস্বাস্থ্যের হালও ছিল অত্যন্ত খারাপ। দারিদ্র্য-অপুষ্টি-ব্যাধি চক্রাকারে আবর্তিত হত। গড় আয়ু ছিল অনেক কম (১৯৫১-৬১-তে, স্বাধীনতার কিছু পরে ছিল ৪১.২ বছর)। চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধাও ছিল সীমিত। যা কিছু সুযোগ তা সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয়র মধ্যে।

স্বাধীনতার পর ওই চেহারার অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আশা করা গিয়েছিল যেটা, সে তুলনায় ধরতে গেলে কিছুই হয়নি। জাতীয় চিন্তার দৈন্য এবং সুসংহত পরিকল্পনার অভাব এর জন্য দায়ী। আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি নেই, নেই কোন জাতীয় ওষুধ নীতি। জাতীয় স্বাস্থ্য রচনাতেও রয়েছে গুরুতর ত্রুটি। শত শত হাসপাতাল, হাজার হাজার শয্যা হয়েছে, বড় বড় যন্ত্রপাতি আনানো হয়েছে, চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু প্রথমত বণ্টন অসম, শহরকেন্দ্রিক। দ্বিতীয়ত রোগ সারানোর সুযোগ পায় বড়লোকেরা বেশি। তৃতীয়ত এ দেশের সাধারণ রোগ-অসুখের চিন্তা করার থেকে জটিল বা অনাগত রোগ-অসুখের চিন্তাই বেশি করা হয়। চতুর্থত রোগ যাতে না হয়, সেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেবার ব্যাপারে আছে গুরুতর ঘাটতি। অর্থাৎ আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা রোগ হলে রোগ সারানো। রোগ যাতে কাছে ঘেঁষতে না পারে, দূরে চলে যায়, বিদায় নেয়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি তত তৎপর নয়।

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সারা ভারতের চিত্রটা একনজরে দেখে নেওয়া যাক। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ত্রিশ শতাংশ বাস করে দারিদ্র্যসীমার নীচে, শিক্ষিতের হার ৪৯%, শিশুদের মধ্যে প্রোটিন অভাবজনিত অপুষ্টির হার ১%, শিশুমৃত্যুর হার ৯৪/১০০০, ১-৫ বছরের শিশুদের ৯০ শতাংশই মৃদু, মাঝারি বা সাংঘাতিক অপুষ্টিতে ভোগে, গড়ে একজন বিবাহিত মহিলা অন্তত ৬/৭ বার গর্ভধারণ করেন, ৫টা থেকে ৬টা জীবন্ত শিশু জন্মে, তাদের ভিতর ৪ থেকে ৫ জন বাঁচে। গর্ভপাত, মৃত শিশুর জন্ম প্রভৃতি গরিবদের মধ্যে ২০% মহিলার হয়ে থাকে। গর্ভবতীদের ৪০-৫০ শতাংশ ও গ্রামে ৫০-৭০ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভোগে, মাতৃমৃত্যুর হার ৪০০-৫০০/১০০,০০০; ৮% প্রসূতি মহিলার বয়স ১৯-এর নীচে, যার ফলে সন্তানজন্মদানকালে মায়েদের মৃত্যুর হার বাড়ে।[১১]

পশ্চিমবঙ্গের কিছু চিত্র এবার দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষিতের হার ৫৭.৭, শিশুমৃত্যুর হার ৬৩, বিয়ের গড় বয়স পুরুষের বেলায় ২৫.৭, মেয়ের বেলায় ১৯.২ বছর।[১২] কেরালার তুলনায় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সব দিক দিয়ে পিছিয়ে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি চমৎকার পরিকাঠামো। ১৯৯০-৯১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারি চিকিৎসকের পদ আছে প্রায় ৮০০০, তার মধ্যে এখন কর্মরত ৬০০০-এর কিছু বেশি। ১৯৪টি

প্রতিষ্ঠানে মোট শয্যাসংখ্যা ৪১৪৯৪। স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে ১২৫১টি, তাদের মোট শয্যাসংখ্যা ১২১০৭, মোট অ্যালোপ্যাথি রেজিস্টার্ড চিকিৎসক আছেন ৪৮২৫৮, প্রতি ২১৯১ জনে একজন ডাক্তার, প্রতি ১৯৪৮ জনে একজন নার্স। তবে বণ্টন অসম, যেমন গ্রামে প্রতি ৫২১৬ জনে একজন ডাক্তার, শহরে প্রতি ৮৪২ জনের জন্য একজন ডাক্তার। মুদালিয়র কমিশনের মতে অনুপাত হওয়া উচিত প্রতি ৩৫০০ জনে ১ জন ডাক্তার ও প্রতি ৫০০০ জনে একজন নার্স। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর ৩০-৪৫ হাজার বোতল রক্ত সংগৃহীত হয়।[২০]

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামোর ছক নীচে দেওয়া হল :[২১]
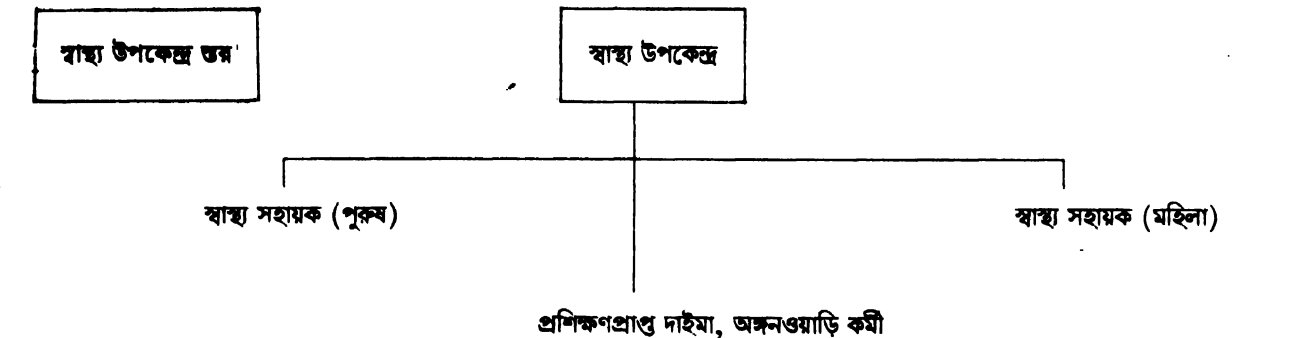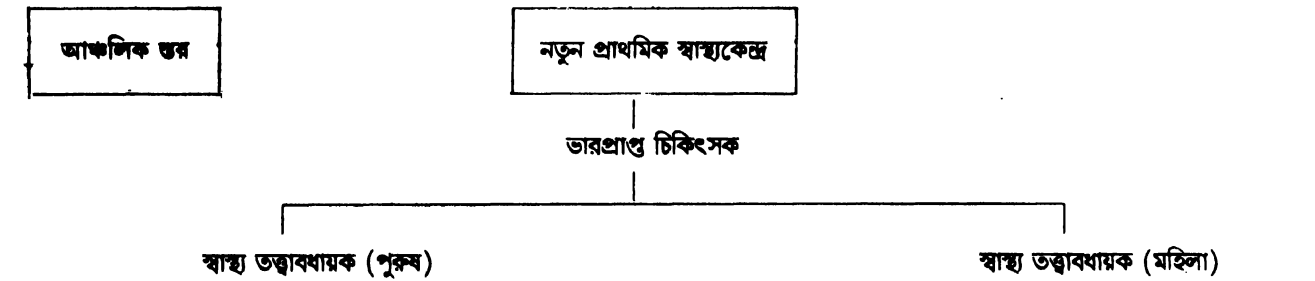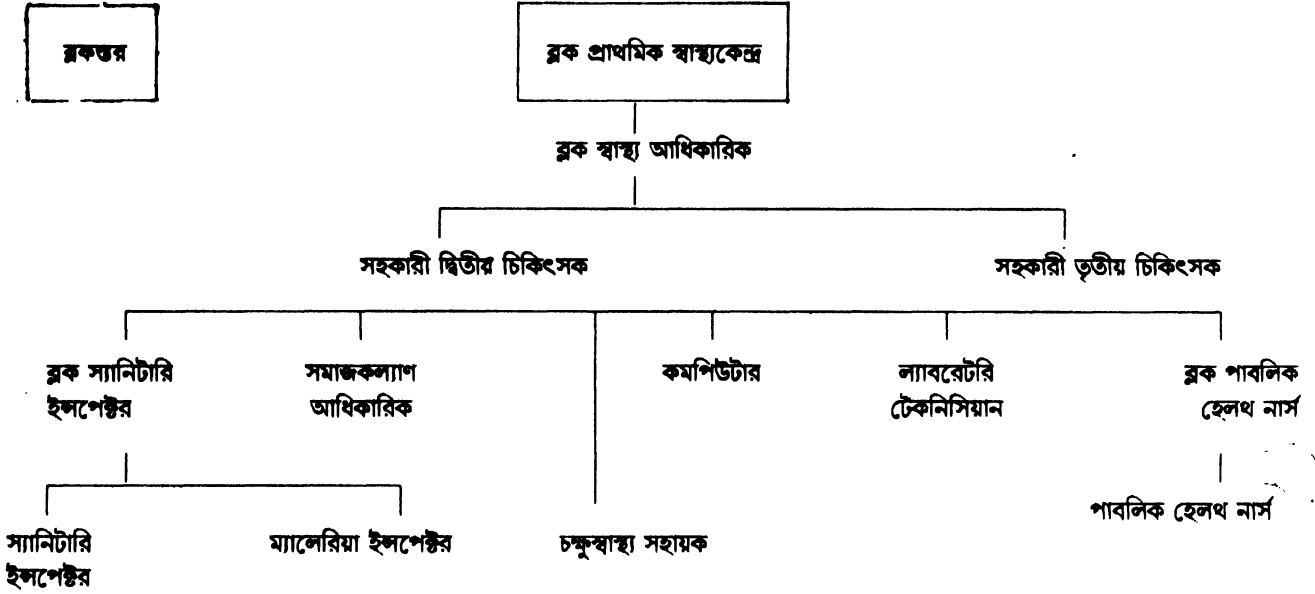
অনেকে বলে থাকেন, পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে এরকম পরিকাঠামো নেই। এই স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে যতটুকু যা আদায় করার সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। এই পরিকাঠামোকে সত্যিকারের মজবুত করতে পারলে তবেই এক শতাব্দীর গড়ে ওঠা পরিকাঠামোর সার্থকতা। নতুবা পরিকাঠামো আছে অথচ পরিষেবা রইল না—এমন ব্যবস্থার মূল্য কি?

ভেষজশিল্প ও পশ্চিমবঙ্গ

কিছুদিন আগেও, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভেষজশিল্পে বাংলার ঠাঁই ছিল ভারতের সবকটি রাজ্যের উপরে। এর পথিকৃৎ হিসাবে সবার আগে আসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম (জন্ম ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট)। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী।[২২] শুধু মসিজীবী না হয়ে বাঙালিকে নানা কর্মে নেমে আসতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি জেদ ও মেধার সমন্বয়ে গড়ে তুললেন বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। অনেক শোকতাপ এজন্য তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর সহযোগী ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর এক আত্মীয়ের গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সময় হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষে মৃত্যু হল। একটা বড় আঘাত। আরও কিছু পরে ডাঃ অমূল্যচরণ বসু প্লেগ রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে মারা গেলেন। ভীষণ শোক প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে, কিন্তু অবিচল রইলেন। কালক্রমে এটি একটি বিরাট কারখানায় পরিণত হল। সেইরকম নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল বেঙ্গল ইমিউনিটি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সে যুগে প্রতিরক্ষামূলক টিকা প্রভৃতির দিকে সাপের অ্যান্টিভেনম তৈরির দিকে ঝুঁকেছিলেন। এখন প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের পরিচালনাধীন। আজ বাংলার ভেষজশিল্পের গৌরব অস্তমিত। অথচ এ ক্ষেত্রেও পরিকাঠামো রয়েছে। তা ছাড়া হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল গড়ে ওঠায় সুবিধাও কিছু হয়েছে। বাঙালিদের তত্ত্বাবধানে ও বুদ্ধিমত্তায় কয়েকটি সুন্দর ছবির মত নতুন ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে, সরকারি সহযোগিতায় যেমন গ্লুকোনেট, যেমন বেসরকারি উদ্যোগে দেজ মেডিক্যাল, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, লাইফ, আলবার্ট ডেভিড, পার্কার রবিনসন প্রাইভেট লিমিটেড প্রভৃতি। এই শিল্পের অতীত যেহেতু ছিল উজ্জ্বল, সেইহেতু প্রসার ও প্রচারে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারলে সম্ভাবনার আর একটি দিগন্ত উন্মোচিত হবে, দেশের ছেলেরা কাজ পাবে, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার দিকে এগিয়ে যেতে পারা যাবে, দেশজ গবেষণার মাধ্যমে চাই কি আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন ওষুধও আবিষ্কৃত হবে, আবিষ্কৃত হবে নানা ধরনের রোগনির্ণয় করার যন্ত্রপাতি।

বরেণ্য চিকিৎসক

গত শতাব্দীতে বাংলা, বাঙালি সমাজ ও ভারত কয়েকজন দেশহিতব্রতী চিকিৎসককে পেয়ে ধন্য হয়েছে। এঁদের নিয়ে গর্ব ও গৌরব করবার অধিকার আমাদের আছে। নানা দিক দিয়ে এঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। আগেই বিভিন্ন জায়গায় কয়েকজন মহান চিকিৎসকের নাম করা হয়েছে, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যাঁরা অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে কয়েকজন চিকিৎসকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, এই আলোচনা অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত, ভগ্নাংশমাত্র। এ ক্ষেত্রেও একটি রূপরেখা মাত্র অঙ্কনেরই প্রয়াস পেয়েছে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক-ঐতিহাসিক সমাজসেবীদের যুক্ত প্রচেষ্টায় পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যের এই দিকটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনালোকিত।

প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে ডাঃ নীলরতন সরকারের (১৮৬১-১৯৪১) কথা। সুচিকিৎসক রূপে তাঁর সর্বভারতীয় সুনাম ছিল। কিন্তু শুধু চিকিৎসাকেই অবলম্বন করে থাকেননি তিনি। সমাজ হিতৈষণা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারে সর্বতোভাবে ব্রতী হয়েছিলেন। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ (আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ), কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন, ছিলেন ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স ও ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডীন, হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯১৯-১৯২১)। ১৯২০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্মেলনে যোগদান করেন।[২৩] ভারতে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন গঠনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। কার্যত ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে, যার নেতা এবং সভাপতি ছিলেন ডাঃ জি ভি দেশমুখ এবং ডাঃ নীলরতন সরকার ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।[২৪]

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (১৮৮২-১৯৬২) কর্মবহুল জীবনও স্মরণীয়। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁরও অবদান অনস্বীকার্য। চিকিৎসাবিদ্যার মান যাতে উন্নত হয়, সেজন্য চেষ্টা করতেন। নিজে ছিলেন একজন ভাল চিকিৎসক ও ভাল অধ্যাপক। তিনি মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (চিকিৎসা ও চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ামক সংস্থা)-র প্রথম সভাপতি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যভারও গ্রহণ করেছিলেন (১৯৪২-১৯৪৪)। ইংল্যান্ডে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একই বছরে (১৯১১) এম আর সি পি (লন্ডন) এবং এফ আর সি এস ডিগ্রি লাভ এবং প্রথমোক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র হিসাবে তাঁর মেধার পরিচয় দেয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যখনই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়-মহামারীতে দেশবাসী বিপন্ন হত, তখনই ডাঃ রায় ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১৯৫২-১৯৬২ সাল পর্যন্ত। লবণহ্রদ পরিকল্পনা, দীঘা উন্নয়ন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। কোনও কাজকেই তুচ্ছ মনে করতেন না। উদাহরণস্বরূপ কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাভার গ্রহণ করে ডাঃ রায় এটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন।[২৫]

এইবার কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একজনের কথা। ডাঃ নবীনচন্দ্র পাল। শৈশবেই দুঃখ-দুর্দশায় পড়েন, পিতৃহীন ও অভিভাবকহীন হন। হেয়ারের স্কুলে পড়াশুনা করেন, হেয়ারের নির্দেশে মেডিক্যাল কলেজে প্রথম দলের ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ১৮৩৬ সালের বাৎসরিক পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম হন। পুরো চার বছর অধ্যয়ন করে ১৮৩৯ সালে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করেন। সরকারি চাকরি নিয়ে গেছেন ঢাকায় (অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন), পরে বারাণসী (১৮৪১)। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি বারাণসীতে থাকেন, তারপর কলকাতায় চলে আসেন এবং প্র্যাকটিশ শুরু করেন, সুচিকিৎসকরূপে তাঁর খ্যাতি সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে—শহরে প্রবাদই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

হাকিম তো গবীন,
ডাক্তার তো নবীন।

তিনি গাছগাছড়া দিয়ে আয়ুর্বেদ মতেও কখনও কখনও চিকিৎসা করতেন, এসব বিষয়ে বইও লিখেছিলেন, অভিজ্ঞতাও ছিল। দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল তাঁর চিকিৎসা।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কঠিন রোগভোগের কালে নবীনচন্দ্র তাঁর চিকিৎসক নিযুক্ত হন।[২৬] ১৮৯২ সালে

৭৬ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। দয়ালু চিকিৎসক হিসাবে তিনি সুবিদিত ছিলেন। তাঁর আত্মীয় প্রভাতচন্দ্র দত্ত ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী।

ডাঃ নবীনচন্দ্র পালের কথা উল্লেখ্য এই কারণে যে নিজের অধ্যবসায় সম্বল করে তিনি উঁচুতে উঠেছিলেন, সেকালের রক্ষণশীল ঘরের ছেলে হয়েও সংস্কার ভেঙেছিলেন, কারণ শব ব্যবচ্ছেদ তখন সকলকেই করতে হত। তা ছাড়া জনদরদী চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। চিকিৎসক হিসাবে জনসাধারণের আস্থা অর্জনের থেকে বড় প্রাপ্তি চিকিৎসকের আর কী আছে?

এই প্রসঙ্গে আসে ডাঃ নারায়ণ রায়ের (১৯০০-১৯৭৩) কথা। তাঁর জীবনটাই ছিল সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত। দলমত নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশাতেই। এমন সেবাপরায়ণ দরদী চিকিৎসক সব দেশে সব কালে একান্তই দুর্লভ। তিনি যেন স্বচ্ছ এক দর্পণ—সেই দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে সমাজ ও চিকিৎসকদের নিজেদের মুখ দেখার দরকার আছে, শেখার আছে। শুধু সমাজসেবাই নয়, সমাজ বদলানোর জন্য যে আদর্শ ও দৃঢ়তা, তাও মূর্ত ছিল তাঁর চরিত্রে। তাঁকে গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অভিহিত করতে পারি—তিনি যেন আমাদের দেশের নর্মান বেথুন।

ছায়াছবির মতো অনেক নামের মিছিল ভাসছে চোখের সামনে। অ্যানাটমির মতো দুরূহ বিষয় সরস করে পড়াতে পারতেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী ও অধ্যাপক পশুপতি বসু। অন্য কলেজ থেকে তাঁদের ক্লাস-লেকচার শুনতে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্ররা দলে দলে আসতেন এবং ভিড় করতেন। চোখের চিকিৎসায় নিবেদিতপ্রাণ ডাঃ নীহাররঞ্জন মুন্সী, গবেষক ডাঃ সমীর বিশ্বাসের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সঙ্গে যোগ ছিল ডাঃ নীহাররঞ্জন মুন্সীর। এইরকম একজন সমাজসেবী ছিলেন ডাঃ অরুণ সেন (সম্প্রতি মারা গেছেন, চোখ ও দেহ দান করে গেছেন)। যিনি চিকিৎসক হয়ে কোনদিন প্র্যাকটিশ বা চাকরি করেননি, সাধারণের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিশিক্ষা প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ অমল রায়চৌধুরী, নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ। ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জী খ্যাতির শীর্ষে ওঠার পরও প্রতিদিন অল্পসংখ্যক রোগীই দেখতেন, কখনই এদের মতো চিকিৎসক টাকার পিছনে ছোটেননি। অকালে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে প্রতিভাধর চিকিৎসক তাপস বসুকে। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে ডাঃ মানস মুখার্জী রোগীকে বাঁচাতে মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখতে গিয়ে সংক্রামিত হন এবং মারা যান। তাঁর এই আত্মত্যাগও উল্লেখের দাবি রাখে। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুনীল দত্তের একটি ঘটনা দাগ কেটে আছে লেখকের মনে। একবার তাঁকে ডেকেছিলাম প্রতিবেশী একজনের অসুখে। তাঁর হাতে ভিজিট তুলে দিয়েছিলাম ৬৪ টাকা। তিনি নিতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ বলেছিলেন, তাঁর ভিজিট ৩২ টাকা। অনেক অনুরোধের পর টাকা নিয়েছিলেন, কিন্তু ৭ দিন পর নিজে থেকে আবার এসেছিলেন, বিনা ভিজিটে দেখে গিয়েছিলেন সেই প্রতিবেশীকে। এই এথিকস বা নৈতিকতাও শেখার। বিশেষত আজকের যুগে।

রবীন্দ্রনাথ বারবার উল্লেখ করেছেন ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের কথা। কবি তাঁকে স্নেহ করতেন, কারণ বাংলা ভাষায় সহজ করে তিনি স্বাস্থ্যের বই লিখেছেন। গ্রামের ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী, নিবেদিতপ্রাণ হিতব্রতী সহৃদয় এক চিকিৎসক গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বারে বারে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন কবি।[২৭, ২৮]

ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ও ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত চিকিৎসক হিসাবেও যেমন সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তেমনই সাহিত্যিক হিসাবে বাংলা ভাষার অঙ্গনে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছেন।

ডঃ শম্ভুনাথ দে ছিলেন একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। ১৯৫৯ সালে কলেরা এনটেরোটকসিন আবিষ্কার করেছিলেন, পরে প্রত্যয় হয়েছিল, কলেরার একসোটকসিন আছে। সেটা পুরোপুরি পৃথক করতে অবশ্য সমর্থ হননি। কিন্তু কলেরা নিয়ে যে গবেষণা করেছেন, তা আন্তর্জাতিক মানের, যে জন্য ১৯৬২ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটির ডি এসসি ডিগ্রি পেয়েছিলেন শারীরবিদ্যায় এবং ১৯৭৮ সালে ৪৩তম 'নোবেল সিম্পোজিয়ম অন কলেরা'তে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ নিশ্চয়ই খুব বড় সম্মান।[২৯]

চিকিৎসক-রোগীর পারস্পরিক সম্পর্ক

আগের তুলনায় চিকিৎসক ও রোগীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাটল ধরেছে এবং ব্যবধানটা ক্রমশই বাড়ছে। উভয় পক্ষই কিছুটা দায়ী। আগে ছিলেন পারিবারিক চিকিৎসক। সেই সম্বন্ধটা এখন আর নেই। তার থেকে বাণিজ্যিক লেনদেনটাই মুখ্য হয়ে উঠছে। কনজিউমার প্রটেকশন অ্যাক্ট অনুসারে মামলাও হচ্ছে। চিকিৎসককে এককালে দেবতার মত মনে করা হত। এখন ধারণাটা বদলাচ্ছে। এতে লাভের থেকে ক্ষতিই সম্ভবত বেশি। পারস্পরিক অবিশ্বাস থাকলে চিকিৎসক সাহসী হতে পারবেন না, ঝুঁকি নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার হাতছানিতে মুষ্টিমেয় চিকিৎসকও নৈতিকতা বা এথিকস লঙ্ঘন করতে পিছপা হন না—রোগীর জীবনের থেকে অর্থের দিকেই নজর বেশি থাকে। পারিবারিক চিকিৎসকের বাতাবরণ তৈরি হলে আগের ঐতিহ্য ফিরে আসতে পারে—যেটা সম্ভবত ফলপ্রসূ ছিল। এখানেও একটি ঘটনা মনে পড়ে। তখন বয়স কম। গ্রামে থাকি। আমাদের এক বন্ধু পারিবারিক চিকিৎসকের কাছ থেকে এমেটিন ইঞ্জেকশন নিয়েছিল। গঙ্গার ঘাটে তাকে সাঁতার কাটতে নামতে দেখে ডাঃ জে এন রায় তো তাকে প্রায় তেড়ে মারতে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন—কারণ এমেটিন নেবার পর সাঁতার কাটা মারাত্মক হতে পারত। গ্রামের চিকিৎসকদের অধিকাংশই ছিলেন সম্মানের শীর্ষবিন্দুতে। তাঁদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের ছিল নাড়ীর যোগ।

চিকিৎসা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার উন্মেষ

বিগত ১০০ বছরে ধীরে ধীরে হলেও চিকিৎসা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার উন্মেষ হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসার গুরুত্ব জনসাধারণ সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন। স্বাস্থ্যব্যবস্থার মানোন্নয়ন হয়েছে, যদিও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা, কুঅভ্যাস, কুসংস্কার প্রভৃতির ব্যাপারে এখনও যথেষ্ট ঘাটতি ও টানাপোড়েন রয়েছে। গড় আয়ু বেড়েছে—পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১-৬১-তে যা ছিল ৪৪.৩ বছর, ১৯৮১-তে হয়েছে ৫৫.১ বছর। ১৯৯১-এ ৫৯.৯ বছর। ২০০০ সালের লক্ষ্য গড় আয়ু হবে ৬৪ বছর। আগের কালে রোগ-নির্ণয়ের জন্য রক্ত নেবার দরকার হলে সেটাকে অযথা উৎপাত বলে মনে করা হত। এখন রোগ-নির্ণয়ের জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে রোগীরা কখনও কুণ্ঠিত হন না। বাংলা ভাষায় লেখা চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলির যথেষ্ট চাহিদা আছে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। চোখ দান করা, অঙ্গ দান করা বা দেহ দান করা এখন অনেক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ধর্মীয় বাধা-নিষেধ তত আসছে না। রক্তদান তো উৎসবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং অনেকের ধারণা জীবনে রক্তদান না করলে একটা পুণ্য কাজ করা হল না। এমনকি নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানেও রক্তদান শিবির খোলা হচ্ছে।[৩০] আগে অত্যন্ত নোংরা ঘিঞ্জি ও অন্ধকার জায়গায় প্রসব করানো হত। ধনুষ্টঙ্কারে বা টিটেনাসে মা/সন্তান মারা পড়ত। এখন বেশিরভাগ শিশুর জন্ম হয় হাসপাতালে

বা শিক্ষিত দাইমার হাতে। শিশুদের ৬টি রোগের বিরুদ্ধে টিকা নেবার ব্যাপারেও সব মায়ের আগ্রহ লক্ষ করার মতো। স্বাস্থ্য শিবির, স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা আলোচনা সভা, স্বাস্থ্যমেলা অহরহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে ক্যান্সার ডিটেকশন সেন্টার। সাক্ষরতার সঙ্গে স্বাস্থ্য আন্দোলনকেও যুক্ত করা হয়েছে। গড়ে উঠেছে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন। লোকে উপলব্ধি করতে পারছেন, এমন একটা ব্যবস্থা দরকার, রোগ হলে চিকিৎসার থেকে রোগ যাতে না হয়, সেটার উপর জোর দেবো। এমনকি ডাঙ্কেল চুক্তির সর্বনাশা দিকগুলি সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সচেতন। এগুলি শুভ লক্ষণ কিন্তু মনে রাখতে হবে, সবে ঘুম ভেঙেছে, এখন আড়িমুড়িটুকুও দেওয়া হয়নি—এখনও অনেক অনেক পথ হাঁটার আছে—স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত করতে হলে।

বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য অনুসারী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ রূপরেখা

বিগত শতাব্দীতে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে, চিকিৎসা শাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারে, তা নিয়ে বাঙালির গর্ব করার অধিকার আছে। কিন্তু সেই ঐতিহ্য থেকে, ভয় হয় দূরে সরে যাচ্ছি আমরা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎ রূপরেখাটা খুব স্পষ্ট করে ধরা পড়ছে না চোখের সামনে। অতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, বরং উজ্জ্বল, প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হবার আভাস আপাত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সব থেকেও যেন সব নেই-এর হাহাকার। কোথায় এখন উদার হৃদয়ের দাক্ষিণ্য? ব্যক্তিগত লাভ লোভ দ্বেষ হিংসা ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক ক্ষেত্রে সাংঘাতিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। দেশ ও দশের চিন্তা গৌণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে মাটিতে তৈরি হত অতীতের অধিকাংশ চিকিৎসক, সেই মাটিতে কোথায় যেন ভেজাল মিশে গেছে। মাটির সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে, নাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ব্যবসাভিত্তিক, লেনদেনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জনগণের জন্য, জনতাকে দিয়ে জনতার দ্বারা যা কিছু নয়, তা জনগণ কখনই গ্রহণ করবে না। যে নবজাগরণ এসেছিল, তার মূল সূত্র ছিল মানবতা, জীবে প্রেম, সেবাপরায়ণতা। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" সে ঈশ্বর অবশ্যই জনগণেশ। মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি এখনও অপসৃত হয়ে যায়নি একেবারে। তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতেই হবে। অতীতকে ভালভাবে জেনে-চিনে তার খারাপটুকু বিসর্জন দিয়ে ভালোটুকু নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সত্যিকার মেলবন্ধন করতে পারলে আসতে পারে ইতিবাচক উত্তরণ। বাংলা তখন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারে—সে পরিকাঠামো আছে বাংলার মাটিতে, বাঙালির রক্তে। দরকার পরিশুদ্ধি।

প্রমাণপঞ্জি

১। অমিয়কুমার হাটি (১৯৯৩) কলকাতার তিনশ বছর: জনস্বাস্থ্য, পশ্চিমবঙ্গ, ২৭, ৩৬

২। Lyons, A. S. and Petrucelli, R. J. 1978. *Medicine, an Illustrated History* pp. 616, Hurry N. Abrams, Inc. Publishers, N. Y.

৩। Pollitzer, R. 1959. *Cholera* WHO, Geneva pp. 1019.

৪। Scott. H. A. 1937-38. A *History of Tropical Medicine* pp. 1219. London Edward Arnold & Co.

৫। Barua, D. et. al. 964. El tor vibrios from cases of Cholera in Calcutta. Bulletine of the Calcutta School of Tropical Medicine, *12*, 55.

৬। Barua, D. Burrows, W. 1974. *Cholera*. W. B. Saunders Co. Philadelphic Tentor, Toronto.

৭। Harrison, G. 1978. Mosquitoes, Malaria and Man. John Murry/London pp. 314.

৮। Manson, P. 1908. My experience of Trypanosomiosis in Europeans and its treatment by atoxyl and other drugs. *Anrs. Trop. Md. Parasit. Z*, 33.

৯। di Cristina and Caronia, G. 1915. Sulla terapia della leishmaniosi interna. Pediatria *23*, sl.

১০। Rogers, L. 1918. Sodium antimany tartrate in Kalaazar. Ind. Med. Gaz. *53*, 161.

১১। Brahmachari, U. N. 1928. A Treatise on Kalaazar. John Bole Sons & Donielsson Ltd. 83-91 Great Titchfield Street, W. I. London, pp. 252.

১২। Ghosh, B. N. 1952 *Pharmacology, Materia Medica & Therapeautics*, Calcutta, Hilton Co. pp. 860 (19th Edition—First Edition 1901 vol I by Prof. R. N. Ghosh).

১৩। Ghosh, B. N. 1959. A Treatise on Hygiene and Public Health, Calcutta, Scientific Publishing Co. (First Edition October, 1912).

১৪। Das, K. P. 1956 (4th Edn). Clinical Methods in Surgery. The City Book Company, 15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta pp. 320 (First published in 1947).

১৫। Das, K. P. 1966. A hand book of Modern Operative Surgery (5th Edn). Messers K. P. Das, Calcutta pp. 324 (First Published in 1950).

১৬। Chatterjee, K. D. 1952. Human Parasites and Parasitic Diseases. Sree Saraswaty Press Ltd. 32. Upper Circular Road, Calcutta-700009. pp. 776.

১৭। De, M. N. and Chatterjee, K. D. 1935. Bacteriology. The Statesman Press, Calcutta. pp.599.

১৮। শিবনাথ শাস্ত্রী (তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট, ১৯৮৩), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ ৩৬০।

১৯। Devadas, R. P. 1993. towards better nutrition in the 21st Century, *Every man's Science*, 28, 40.

২০। Health on the March, West Bengal, 1990, State Bureau of Health Intelligence DHS, Govt. of W.B., 73 Lenin Sarani, Cal-13, pp. 131.

২১। জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত (১৯৯৩) পৃঃ৪০. ৮/২ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১।

২২। অমিয়কুমার হাটি (১৯৮৬) বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী, পশ্চিমবঙ্গ, ২০, ৮ আগস্ট, পৃঃ ১০৭।

২৩। ভারতকোষ (চতুর্থ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২৪। Sourvenir (1964) combined 51st and 52nd session, Indian Sc. Congress Association, Calcutta pp. 387.

২৫। নগেন্দ্রকুমার গুহরায় (১৯৮২) ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন চরিত pp. 164 .

২৬। হারাধন দত্ত (১৯৬২) মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্র নবীনচন্দ্র পাল, যুগান্তর ২৪/৬/৬২।

২৭। অমিয়কুমার হাটি (১৯৬৯) চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, জরাব্যাধি মৃত্যুর আলোকে, সাপ্তাহিক বসুমতী, ৮ মে ১৯৬৯।

২৮। অমিয়কুমার হাটি (১৯৯২) রবীন্দ্রনাথ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ, ২৫, ১১৬৮

২৯। Sen, A and Sarkar J. K. 1990. Life and work of Sambhunath De. Current Science, 59, 630.

৩০। যুগান্তর, ১৯/৩/৯৪

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

স্বাগত ১৪০০

'বৈশাখের প্রথম প্রত্যূষটি আজ আকাশ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো।'

১৪০০ সাল শুরু হবে। আজকের এই শুভদিনে আমাদের সুদীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে স্মরণ করছি। আমাদের বর্তমান আর ভবিষ্যতের ভাবনায় ভাবিত হচ্ছি।

ইতিহাসের ক্রমপর্যায়ে এসেছে শকাব্দ, এসেছে হিজরি সাল। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর হিসাব। এসেছে বঙ্গাব্দ। শাসক হিসাবে হয়তো আকবর রাজস্ব আর প্রশাসনের প্রয়োজনেই এর সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই বাঙালির ইতিহাসের আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই ইতিহাসের গর্বে আজ আমরা সকলেই গর্বিত।

আমাদের অতীতের শশাঙ্ক, দীপঙ্কর অতীশ আমাদের শৌর্য বীর্য মননশীলতার অবিস্মরণীয় প্রতীকী নাম।

আর্যাবর্তের বর্ণাশ্রমের অনড় নিগড়ে বাঁধা কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে চৈতন্যের প্রতিবাদ বাঙালির সমাজ ও চিন্তালোকে সুদূরপ্রসারী সাফল্য এনে দিয়েছিল।

তারপর আমাদের স্বাধীনতাহরণ। ইংরেজদের গোলামির দীর্ঘ দুই শতাব্দী। তার মধ্যেই আমাদের নবজাগরণ। ইংরেজরাই ছিল এর হয়তো পিছনে ইতিহাসের অবচেতন অস্ত্র হিসাবে। কিন্তু আমরা পেলাম রামমোহনকে, পেলাম স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে। পেলাম বিদ্যাসাগরকে। যুক্তিবাদ আর গণশিক্ষার বদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। সেই পথ ধরেই এসেছিল নাস্তিকতা, এল ডিরোজিও মাইকেলের সোচ্চার বিদ্রোহ। বিবেকানন্দ ধর্মীয় নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যেখানে শূদ্রের প্রবেশদ্বার হল অবাধ। এ সবেরই সফল পরিণতি শুভ্র সমুজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথ। আমরা বাঙালিরা উপলব্ধি করলাম আমাদের মাথার উপর হিমালয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ সীমা।

বিজ্ঞানের দরবারে বিশ্বজগতে বাঙালির পরিচয় ঘটালেন জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন বসু, আচার্য প্রফুল্ল রায়। সাহিত্যে বঙ্কিম, শরৎ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল আজও অম্লান। এ বাংলা জীবনানন্দের রূপসী বাংলা। এ বাংলা সুকান্তের দুর্জয় ঘাঁটি। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্র, নন্দলাল, যামিনী রায়ের তুলির রঙে আমরা বহু বর্ণে রঞ্জিত হলাম। চলচ্চিত্রে আমরা পেয়েছি উজ্জ্বল নক্ষত্র বাঙালি সত্যজিৎ রায়কে।

স্বাধীনতার আন্দোলনে বাঙালি গান্ধীজিকে অশ্রদ্ধা করেননি, কিন্তু আমাদের নায়ক থেকেছেন সুভাষচন্দ্রই। আমাদের নায়ক ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, বিনয় বাদল দীনেশ, সিধু কানু বীরসা মুণ্ডা। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ জোট। হ্যাঁ, আমরা গর্বিত, বাংলা ছিল ইংরেজদের সন্ত্রাস। দেশ ভাগ হয়েছে, আমরা খণ্ডিত হয়েছি। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলা আবার এগিয়েছে বুকে অনেক ক্ষত নিয়ে। এগিয়েছে ইতিহাস-নির্দেশিত পথে, আমরা বঞ্চিত হয়েছি। সামাজিক জীবনে তাই এসেছে অস্থিরতা, দারিদ্র্য। সংস্কৃতিও হয়েছে কলুষিত। তবু পশ্চিমবাংলা এগিয়েছে। সারা ভারতের মধ্যে গরিব শ্রমজীবী মানুষ এখানে পেয়েছে মর্যাদা, জীবনের অধিকার। এ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বামপন্থাকেই বেছে নিয়েছেন।

আমরা চাই স্বনির্ভর অর্থনীতি। একবার ইংরেজদের ঔপনিবেশিকতাকে আমরা পরাস্ত করেছি, আরেকবার ডলারের কাছে স্বাধীনতা হারাতে আমরা প্রস্তুত নই।

সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে এক ভয়ঙ্কর কলুষ আমাদের গ্রাস করতে চাইছে। বাঙালির বুদ্ধি, বিশ্বাস, নৈতিকতা কখনই হনুমানের দলের কাছে, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। হিন্দুত্বের নামে, ধর্মের নামে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী মানুষও ও-পথে যাবেন না—এই বিশ্বাস আমাদের স্থির বিশ্বাস। উন্নততর মানবিকতার লক্ষ্যে আমরা সামনের দিকেই এগোব। গণতন্ত্রের জন্য, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য, সকলের ন্যায়সঙ্গত জীবনধারণের অধিকারের জন্য।

এক অশুভ শক্তি এ রাজ্যে সক্রিয় তা আমাদের ক্রমান্বয়ে চিন্তিত করে তুলেছে। আমরা বাঙালি, জাতীয় ঐক্যের ধারণা আমাদের রক্তের গভীরে। আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি ভারতের ঐক্য ও সংহতি। এই মহানগরী কলকাতা, প্রকৃত অর্থেই, এক ভারত। আমরা উদার, আমরা সঙ্কীর্ণ নই। কিন্তু যে কুচক্র এ-রাজ্যের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে চাইছে সেই অশুভ শক্তিকে আমরা কিছুতেই ক্ষমা করব না। কারণ আমরা এই দেশকে, এই রাজ্যকে ভালোবাসি।

আমরা জানি আমাদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে—প্রয়োজন আছে আত্মসমালোচনার। আমরা সচেতন, আমরা সতর্ক এ-রাজ্যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। এ-রাজ্যে শিল্পায়ন চাই-ই চাই। চাই কর্মক্ষেত্রে আরও মনোনিবেশ। সমস্ত হাতের জন্য চাই কাজ। চাই বুদ্ধি ও মেধার সুপ্রতিষ্ঠা, উপযুক্ত মর্যাদা। সমাজের সমস্ত জমে থাকা আবর্জনা, সমস্ত দৌরাত্ম্য জানি দূর করতে হবে। আমরা জানি আবর্জনা আছে কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়।

গুন্টারগ্রাস আমাদের ভুল বুঝতে পারেন। নইপাল, নীরদ চৌধুরী আমাদের নিয়ে তামাশা করতে পারেন। দার্শনিক লাপিয়ার আমাদের গণ্য করতে পারেন, কিন্তু আমরা বাঙালি, আমরা ভারতীয়। আজকের এই শুভদিনে সমস্ত গ্লানি সমস্ত অপমানের ভস্ম থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমরা অগ্নিস্নানে শুচি হই। আমরা অনুভব করি—এই পিছিয়ে পড়া, এই দারিদ্র্য কিন্তু অতুলনীয় জীবনীশক্তিতে ভরা এই মাটিই আর এই মানুষ নিয়েই আমাদের জন্মভূমি। সমস্ত হীনম্মন্যতা ছেড়ে আমরা অনুভব করি—

'জানি না তোর ধনরতন
আছে কিনা রানীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে
সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে'।

[১ বৈশাখ ১৪০০ তারিখে 'বঙ্গমেলা ১৪০০'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ]

কৃষ্ণ ধর

শতাব্দীর বাংলা সাংবাদিকতা

বাংলা সাল অনুযায়ী নতুন এক শতাব্দীতে আমরা প্রবেশ করেছি। এই ১৪০০ সালের পাঠকদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ একটি স্মরণীয় কবিতা বঙ্গবাসীদের উপহার দিয়েছেন। এই একশো বছরে বাংলা সাংবাদিকতার বিপুল ও বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা ভাষার রচনাশৈলীতেও এসেছে লক্ষণীয় অভিনবত্ব। সংবাদপত্র যেহেতু মূলত সংবাদ পরিবেশন ও বিশ্লেষণ নিয়েই মনোযোগী, সে কারণে এই এক শতাব্দীতে সংবাদ সংগ্রহের পরিধি বিস্তার ও তার বিশ্লেষণের ধরন কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তাও আমাদের এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবেই আসতে পারে।

সংবাদপত্র সেবা থেকেই সাংবাদিকতা বৃত্তির উদ্ভব। একশো বছর আগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল একটা বিরাট পরিবর্তনের মুখে। ততদিনে ভারতের স্বাধীনতালাভের চেতনা বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে জনসাধারণের মনে। ইয়োরোপীয়দের পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকাগুলোকে স্পর্ধায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির 'বেঙ্গলি', মতিলাল-শিশিরকুমার ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের 'অমৃতবাজার পত্রিকা', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন', মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলকের 'মারাঠা', মাদ্রাজের 'দি হিন্দু' প্রভৃতি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র। বাংলাভাষায় প্রকাশিত 'সোমপ্রকাশ', 'সুলভ সমাচার', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকার সাহসী ভূমিকার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। একদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অন্যদিকে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের প্রচারবৃদ্ধি, এই দুটি ধারাই জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলা সাংবাদিকতার বিশেষ তাৎপর্য হল এই যে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও তার প্রতিকারের বিষয়গুলো সেদিন প্রচার করার অন্য কোনও পথ ছিল না। কারণ দেশের এক শ্রেণীর লোক ইংরেজের চাটুকারবৃত্তিতে লিপ্ত, ঔপনিবেশিকতাবাদের দালালের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তারা। কিন্তু দেশের বৃহত্তর অংশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য ও দুর্দশার মূল কারণ পরাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল।

জনসাধারণের মধ্যে সেই চেতনা সম্প্রসারণে বাংলা সংবাদপত্র সেদিন একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল। সাহিত্য পত্রিকা ও সংবাদ পত্রিকা উভয় শ্রেণীর মাধ্যমেই জনজাগরণের প্রক্রিয়াকে প্রখর ও গতিশীল করে তোলা হচ্ছিল। এ বিষয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ভূমিকাও ছিল অগ্রগণ্য। 'সাধনা', 'বালক', 'ভারতী' প্রভৃতি সাহিত্যপত্রিকা যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনাসূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, বাংলার পাঠকদের সামনে রচনার আদর্শ ও জ্ঞানের দীপ্তি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছিল। এটাও সাময়িকপত্রের সাংবাদিকতার নিরিখ হিসেবে গণ্য হবার দাবি রাখে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা সাংবাদিকতার এক গুণগত পরিবর্তন দেখা যায় স্বদেশি আন্দোলনের যুগে। এই পরিবর্তনের আলোকশিখাটি যিনি হাতে করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। গিয়েছিলেন বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য। কিন্তু এই অশান্ত শিক্ষকের মন তাতে শান্ত হল না। বিদায় নিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। কলকাতায় এসে বের করলেন 'সন্ধ্যা' (১৯০৪) পত্রিকা। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে নানাদিক দিয়ে স্মরণযোগ্য। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন এক অগ্নিগর্ভ দেশপ্রেমিক। সাংবাদিকতাকে তিনি মুক্তি আন্দোলনের শাণিত প্রহরণে পরিণত করলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকাতেই প্রথম ব্যবহৃত হল মান্য বাংলা চলিত ভাষা যাতে সাধারণ মানুষ সহজে তা পড়ে বুঝতে পারে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনামগুলি পর্যন্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটন্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় '(ব্রহ্মবান্ধব) স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্রভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিল। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা।'

'সন্ধ্যা' পত্রিকাই বাংলা সাংবাদিকতার জড়তা কাটিয়ে তাকে এক সচল ও প্রাণবন্ত ভাষাশৈলী উপহার দেয়। 'সন্ধ্যা' প্রতিদিন বিকেলে বেরোনোমাত্র হাজারে হাজারে বিক্রি হয়ে যেত। এর আগে কোনও বাংলা পত্রিকা এত জনপ্রিয়তা পায়নি। এর একটা মাত্রই কারণ তা হল ব্রহ্মবান্ধবের ভাষা। বাস্তবিকই তাঁর ভাষার চাবুক খেয়েই বাঙালির দিবানিদ্রা ভেঙেছিল। দোকানি, ব্যাপারি থেকে শুরু করে সবার হাতে হাতে ফিরত 'সন্ধ্যা'।

এর আগে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত অন্য কোনও পত্রিকাই এত বিপুল সংখ্যায় বিক্রি হয়নি। যুগের প্রয়োজনেই সাংবাদিকতার প্রকরণ গড়ে ওঠে। 'সন্ধ্যা' হল সেই যুগের দর্পণ। যুগটা ছিল ব্যাপক বিক্ষোভের। কার্জনের ছুরিকাঘাতে অখণ্ড বাংলা ভেঙে দু-টুকরো হল ১৯০৫ সালে। বাংলাকে এক করার জন্য বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে গোটা দেশ গর্জে উঠল। বাংলা থেকে মারাঠা পর্যন্ত সে এক অত্যাশ্চর্য উন্মাদনা। তাকেই ভাষা দিল সংবাদপত্র। কলকাতায় ব্রহ্মবান্ধব, মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক। একই আগুন ঝরাতে লাগল ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'যুগান্তর' (১৯০৬)। ততদিনে বাংলায় বিপ্লববাদীরা সংগঠিত হয়েছেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বদেশকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করবার পণ নিয়ে আত্মদান করলেন কিশোর ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী। বোমারু বাঙালি বলে নতুন পরিচিতি ঘটল 'তৈলসিক্ত স্নিগ্ধতনু' বঙ্গ সন্তানের। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সুখাসন আবার টলে উঠল।

'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকাই স্বদেশি যুগে বাংলা সাংবাদিকতার দিক নির্দেশিকা হবার যোগ্য। বিপ্লববাদীদের চিন্তা ও চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিল ব্রহ্মবান্ধব ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জোরালো ভাষা ও বিশ্লেষণ। এই শতাব্দীতে প্রবেশ করে সাংবাদিকতার ভাষা হল প্রখর এবং লক্ষ্য হল সুনির্দিষ্ট। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষের আন্দোলনও চলল দুই স্তরে। একটা স্তরে জনসভা, মিছিল ও বিক্ষোভ। অন্যান্তরে সংবাদপত্রে তার জোরালো সমর্থন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রচারই হয়ে উঠল বাংলা সাংবাদিকতার ব্রত। কার্যত সাংবাদিকতা তখন ছিল ব্রতই, জীবিকা নয়। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সাংবাদিকরা সর্বস্ব পণ করেছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে বহু পত্রিকার সম্পাদককে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিতে হয়েছে। ব্রহ্মবান্ধবের যখন বিচার হয় তখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরেজের আইনকানুন তিনি মানেন না। সুতরাং এই বিচারালয়কেও তিনি স্বীকার করেন না। দেশাত্মবোধের প্রেরণায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো সম্পাদকগণ সাংবাদিকতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এর জন্য তিনি আত্মদান করেন বিচারাধীন অবস্থায়। সত্যি সত্যিই ইংরেজের আদালত তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। তার আগেই তিনি মারা যান। বিশের দশকে বাংলা সাংবাদিকতার এক বাঁক পরিবর্তন দেখা যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাস্রোতের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাত এসে লাগল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং রুশ বিপ্লবের মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্র জগৎ প্রবল আলোড়ন তুলল ন্যায়বিচার এবং ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের দাবিতে। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোই এতদিন আসর দখল করে বসেছিল। বাংলা সংবাদপত্র জগতে ততদিনে দুটি বৃহৎ পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে 'বসুমতী' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। কিন্তু বামপন্থী সংগঠনশক্তিও সংবাদপত্রে তার প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহমেদের নেতৃত্বে বেরোয় 'লাঙ্গল', 'গণবাণী' এবং 'ধূমকেতু'। বাংলা সাংবাদিকতায় শোনা গেল ভিন্ন কণ্ঠস্বর। জাতীয় আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করা হল শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের মধ্যে। জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার মাত্রা সংযোজিত হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমজীবী পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাংবাদিকতায় যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে এসে তা এক নতুন তাৎপর্য লাভ করল।

বাংলা সাংবাদিকতার দুটি দিক উল্লেখযোগ্য। একটি হল তার জনশিক্ষা প্রসারের ভূমিকা এবং অন্যটি হল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকা। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব তার মধ্যে বরাবরই ছিল। রাজনীতির শিবির বিভাগের চিত্র সংবাদপত্র জগতেও প্রতিফলিত। বামপন্থী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ বাংলা সংবাদপত্রগুলি কখনই সদয় ছিল না। তার ফলে বাঙালি পাঠক সমাজের মধ্যে দেশে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রকৃত অবস্থা এবং তার অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। বামপন্থী শিবিরের সাংবাদিকতার গুণগত উৎকর্ষ যথেষ্ট উচ্চমানের হলেও তাদের পরিচালিত সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা সীমিত। তা ছাড়া সংবাদপত্র পরিচালনা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। সে কারণে বহু সংবাদপত্র প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই অর্থাভাবে ঝরে গেছে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের রচনার প্রভাব যথেষ্ট বিস্তৃতি পেয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে নিতানতুন সংবাদপত্রের জন্মও হয়েছে। ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' পাল্টা প্রকাশিত হয়েছিল 'যুগান্তর' (১৯৩৭)। এই দ্বন্দ্বের পেছনে ছিল গান্ধী বনাম সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শের সংঘাত। মুসলিম লিগের রাজনৈতিক বক্তব্য পরিবেশনের জন্য ত্রিশ দশকের শেষ দিকে ও চল্লিশের দশকের গোড়ায় বেশ কয়েকটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে 'আজাদ', 'ইত্তেফাক' ও 'মোহাম্মদী' মাসিক পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আক্রাম খান। উর্দু-আরবি ঘেঁষা বাংলার প্রচলন করেন তিনি তাঁর পত্রিকায়। এ নিয়ে তৎকালীন কংগ্রেসি সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। পাকিস্তান আন্দোলনের সহায়তা করার জনাই এই ধরনের কৃত্রিম ভাষা তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু বাংলা সাংবাদিকতায় সেই ভাষা স্থায়ী হয়নি। রাজনৈতিক প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 'আজাদের' সেই তথাকথিত 'মুছলমানি বাংলা'ও বিদায় নিয়েছে।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক বাংলা পত্রিকা 'স্বাধীনতা'। তার সম্পাদক ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। বাংলা সাংবাদিকতার ভাষা ও দৃষ্টিকোণ বদলে স্বাধীনতা পত্রিকার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংবাদ কাহিনী বা কাহিনীধর্মী প্রতিবেদন 'স্বাধীনতা' পত্রিকাতেই শুরু করেন সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী। সেই তরুণ প্রতিবেদক-গোষ্ঠীতে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, প্রভাত দাশগুপ্ত, গোলাম কুদ্দুস ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো লেখক যাঁরা পরে বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হয়েছেন। রামমোহনের 'সম্বাদকৌমুদী' থেকে বাংলা সাংবাদিকতা তার স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অধ্যায়ে এসে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার নতুন সাংবাদিকতার ধারায় এসে তার এক ঐতিহাসিক পর্বের সমাপ্তি বলা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলা সাংবাদিকতা সম্পূর্ণ নতুন এক মাত্রা অর্জন করে যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দেশের আর্থ-সামাজিক বিবর্তন ও অগ্রগতি ও তার নানাবিধ জটিলতা। সংবাদপত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। ১৩৫০ সালে মহামন্বন্তর থেকে শতাব্দীপূর্তির শেষ পঞ্চাশ বছরের বেশির ভাগটাই বাংলা সাংবাদিকতার ব্যাপ্তির যুগ বলা যায়।

জনশিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষার সংবাদপত্রের চাহিদাও বেড়েছে। ইংরেজি সাংবাদিকতার উন্নাসিকতার সেই অর্থহীন মনোভাবও দ্রুত অপসৃয়মান। প্রচার, প্রভাব এবং প্রকরণগত সৌষ্ঠবে বাংলা সংবাদপত্র যেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তেমনই গুণগত দিক দিয়েও বাংলা সাংবাদিকতার উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদপত্রগোষ্ঠীর স্বার্থবুদ্ধি আরও প্রগাঢ় হওয়া সত্ত্বেও বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণমুখী সাংবাদিকতার গতি রোধ করা তাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। ছোট-বড়-মাঝারি নানা বিচিত্র ধরনের ও বিভিন্ন মতবাদের পরিপোষক পত্র-পত্রিকা অবলম্বন করে বাংলা সাংবাদিকতা তার নিজস্বতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে এ কথা বললে নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তির অভিযোগ উঠবে না। সংবাদপত্রের একটা শ্রেণীচরিত্র থাকে। সাংবাদিকতাকে তা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃহত্তর জনস্বার্থকে বাদ দিয়ে সাংবাদিকতা তার সার্থকতায় পৌঁছতে পারে না। গত এক শতাব্দীর বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসও সেই কথাই বলে।

আবদুর রউফ

দুই শতাব্দীর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা

সাধারণভাবে কোনও ধ্যান-ধারণায় যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, পার্থিব মানবকল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান এবং ধর্মবিশেষের বিধিনিষেধের প্রতি অন্ধ আনুগত্য না থাকাটাকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার লক্ষণ। সেই হিসাবে আমাদের দেশে এইরকম চিন্তার ইতিহাস দীর্ঘ নয়। আমাদের এই বাংলায় অনেকেই রাজা রামমোহন রায়কে এইরকম চিন্তার পথিকৃৎ হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তাঁর মধ্যে যুক্তিবাদের প্রাবল্য ছিল। উনবিংশ শতকের একেবারে শুরুতেই রামমোহনের মানসিক গঠনে ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বদলে যুক্তিবাদ কীভাবে প্রাধান্য পেল সেটা বুঝতে হলে সেই সময় আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমির পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক পটভূমির রূপান্তর

বাণিজ্য করতে এসে ইংরেজরা এই দেশ দখল করে বসলে তাদের মাধ্যমে আমাদের দেশের মানুষ বিশেষভাবে দুটি জিনিসের পরিচয় পায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ। ইংরেজদের ব্যবসার একটা বিশেষ কায়দা ছিল, এ দেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে সেখানকার কলকারখানায় পণ্যসামগ্রী তৈরি করে এনে এখানকার বাজারে বিক্রি করা। যেহেতু এখানকার অর্থনীতি ছিল গ্রামভিত্তিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ তাই ইংরেজের পণ্যসামগ্রীর জন্য তেমন কোনও রেডিমেড বাজার এখানে ছিল না। শাসক ইংরেজদের কাজ হয়েছিল তাই এখানকার গ্রামভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বুনিয়াদটা ভেঙে দেওয়া। এ জন্য গ্রামভিত্তিক কুটিরশিল্পগুলি যাতে ধসে যায় তার সবরকম ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। অতিরিক্ত করের বোঝা এবং নানারকম জোরজুলুম তো ছিলই তার উপর তাদের এনে ফেলা হয়েছিল অসম প্রতিযোগিতার মুখে। ইংরেজদের কলকারখানায় তৈরি পণ্যসামগ্রী দেশজ হস্তশিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর তুলনায় দামে অনেক সস্তা ছিল। রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, জলপথের সংস্কার করে, রেলপথ বসিয়ে, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে ক্রমাগতই দেশের অর্থনীতিকে শহরকেন্দ্রিক, আমাদের এই বাংলায় কলকাতাকেন্দ্রিক করে তোলা হয়েছিল। এইভাবেই সারা দেশের পণ্যচাহিদাকে একটি সাধারণ বাজারের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল ইংরেজ। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ায় গ্রাম্যসমাজের ধর্মীয় বিধিনিষেধের বন্ধন এবং ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের মনোভাবও ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ে।

ইউরোপ রেনেসাঁর প্রভাবে তখন যে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটেছিল, শাসক এবং বণিক ইংরেজদের সঙ্গে সেই যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণাও এ দেশে এসে পড়েছিল খুব স্বাভাবিকভাবেই। এইরকম একটা আর্থ-সামাজিক পটভূমিতেই রামমোহনের মধ্যে বিকশিত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং যুক্তিবাদী মনোভাব। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও ছিল আমাদের দেশের পটভূমিতে একটি নতুন জিনিস। আগে মানুষ গ্রামীণ সমাজ এবং ধর্মের প্রতি এত বেশি অনুগত ছিল যে আপন স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবতেই পারত না। কিন্তু কলকাতাকেন্দ্রিক বাজার-অর্থনীতি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের বন্ধন আলগা হয়ে পড়ায়, শহরে এসে স্বাধীন জীবিকা অবলম্বনের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশ লাভ করারও পটভূমি তৈরি হয়ে যায়। রামমোহন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং যুক্তিবাদ দুটোরই অধিকারী হয়েছিলেন।

নতুন ধরনের ধর্মচিন্তা

যুক্তিবাদী রামমোহন প্রথমে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষাগুলি অনুধাবন করেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। এই কাজে সুবিধার জন্য তিনি সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষাগুলি আয়ত্ত করেছিলেন যথার্থ বহুভাষাবিদের মতই। হিন্দুধর্মে তো বটেই ইসলাম ধর্মেও তাঁর মতো পণ্ডিত সেই সময় খুব কমই ছিলেন। তুলনামূলক ধর্মবিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য এবং যুক্তিবাদের সহায়তায় রামমোহন বিশেষ করে উপনিষদের উপর ভিত্তি করে এমন এক ধরনের ঈশ্বরচিন্তায় উপনীত হন যা এখানকার পরম্পরা-বহির্ভূত না হলেও প্রচলিত ঈশ্বরভাবনার কোনও ধারাবাহিকতা এর মধ্যে ছিল না। এ ছিল একেবারেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, যুক্তিবাদী মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ঈশ্বরভাবনা। ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরচিন্তা শুরু হয় এইভাবেই। পরে অবশ্য রামমোহনের অনুগামীগণ এই নতুন ধরনের ব্যক্তিগত ঈশ্বরচিন্তাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন প্রকৃতির একটি ধর্মীয় পন্থের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন আর ব্যাপারটা ধর্মনিরপেক্ষ থাকেনি।

নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীদের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা

সেকুলার বা পন্থনিরপেক্ষ চিন্তার ব্যাপারে রামমোহনের পরেই যাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর আছে কি নেই সেই ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তিনি ছিলেন যথার্থই সেকুলার হিউম্যানিস্ট বা পার্থিব মানবতাবাদী। মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এও বলে দিয়েছিলেন, শাস্ত্রে না থাকলেও তিনি বিধবাবিবাহের প্রয়াস চালানোর কসুর করতেন না। দেশের লোক শাস্ত্রবাক্য মানে বলে তিনি এর সাহায্যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পোশাক-আশাকের মধ্যেও যে হিন্দুয়ানি দেখা যেত সেটাও ছিল উদ্দেশ্যমূলক। চিন্তাভাবনায় দেশের সাধারণ মানুষদের তুলনায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেলেও অন্তত বাইরের

দিক থেকে তিনি তাদের কাছাকাছিই থাকতে চেয়েছিলেন। তা না হলে সমাজপরিবর্তনে তাঁর সমগ্র ক্রিয়াকলাপ শুরুতেই বরবাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সারা ভারতবর্ষে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্রই বোধ হয় মাতৃভাষায় শিশুশিক্ষার জন্য এমন বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন যার মধ্যে ধর্মের কোনও জিকির ছিল না। তাই আধুনিক বাংলা ভাষায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই সমান অধিকার জন্মেছিল। তা না হলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো এখানকার বাঙালি মুসলমানরাও হয়তো লেখাপড়ার ভাষার জন্য উর্দুর স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হত।

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য লেখার মধ্যেও এমন সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব ছিল যা সেকুলার বা পার্থিব মানবতাবাদেরই লক্ষণ বহন করে। যেমন 'সীতার বনবাস' বইয়ে তিনি নারীর বেদনার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তুলনামূলকভাবে রামচন্দ্রের তথাকথিত ধর্মীয় মাহাত্ম্যকে আদৌ পাত্তা দেননি। সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদির মতো আজগুবি কাহিনীও তাঁর প্রশ্রয় পায়নি। বাস্তবিক উনবিংশ শতকে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন আমরা পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক আর একজন খ্যাতিমান অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রথম দিকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এই সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক থাকার সময়েই তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মগ্রন্থপাঠ, ঈশ্বরভজনামূলক প্রার্থনা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকে। অক্ষয়কুমারের লিখিত গ্রন্থগুলির তালিকা অনুসরণ করলেই তাঁর সুদৃঢ় ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব টের পাওয়া যায়। তিনি 'পদার্থবিদ্যা' নামে বিজ্ঞানের বই এবং 'বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' নামে বস্তুবাদী দর্শনের বই লিখেছিলেন। 'ধর্মনীতি' এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামে বই লিখে অক্ষয়কুমার দত্ত এ দেশে ধর্ম সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ আলোচনায় একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র এবং অক্ষয়কুমারের প্রায় সমসাময়িক কালে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিওর শিষ্যগণ (যাঁদের অভিহিত করা হয় ইয়ং বেঙ্গল নামে) অধিকাংশই ছিলেন প্রায় পুরোপুরি নাস্তিক। হিন্দুধর্মের দুর্বলতা এবং কুসংস্কারগুলির তীব্র সমালোচনা করাটাকে এঁরা নিজেদের কর্তব্য জ্ঞান করতেন। এইসব ইয়ং বেঙ্গলগণ গড়েছিলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। এইখানেই হত যতসব ধর্মবিরোধী এবং পার্থিব বিষয়ে হাজার অনুসন্ধিৎসা সংবলিত আলোচনা। বাস্তবিক ধর্ম সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সেকুলার বিষয়সমূহ আলোচনার মহাসভা ছিল এই অ্যাসোসিয়েশন। শুধু আলোচনাই নয়, নিজেদের জীবন ও ইয়ং বেঙ্গলগণ নতুন নতুন সেকুলার আইডিয়া অনুযায়ী পাল্টে ফেলেছিলেন। অবশ্য তারুণ্যের উদ্দীপনায় এঁদের অনেক রকম বাড়াবাড়িও ছিল। প্রদর্শনমূলক গোমাংসভক্ষণ এবং অতিরিক্ত মদ্যপান ছিল এই বাড়াবাড়িরই লক্ষণ। ইয়ং বেঙ্গলদের বেশির ভাগই ছিলেন একেবারে কালাপাহাড়ি নাস্তিক্যের ভাবধারা বহনকারী। যা কিছু ধর্মীয় এবং পবিত্র বলে তৎকালীন সমাজে বন্দিত ছিল, সব কিছুর বিরুদ্ধে অবজ্ঞা প্রদর্শনই ছিল এঁদের কাজ।

পরবর্তী কালে খ্যাতিমান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন এই ইয়ং বেঙ্গলদেরই একজন। তিনি অবশ্য খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধর্মের কোনও প্রভাবই তাঁর মানসজীবনের উপর পড়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতা', 'শর্মিষ্ঠা' কিংবা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক ইত্যাদি পড়লে বোঝা যায় তাঁর মানসিকতা ছিল পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ পার্থিব মানবতাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাই প্রচলিত যেসব কাহিনী অবলম্বনে তিনি কাব্য কিংবা নাটক লিখেছিলেন সেগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্য পেয়েছিল তাঁর হাতে। সেকুলার হিউম্যানিজম্ বা পার্থিব মানবতাবাদের সমস্ত লক্ষণই পরিস্ফুট হয়েছিল এইসব লেখায়। তাই শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দে নয়—বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তিনি বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন ধারার প্রবর্তক। অবশ্য এই ধারার প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত দিয়েই।

ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোপুরি খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে যাঁদের নাম স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে ইনিও একজন। তা ছাড়া অন্যান্য স্মরণীয় ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে আছেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ।

এই ডিরোজিওপন্থী ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে রামমোহনের উত্তরসূরি হওয়ার আপাতদৃষ্টিতে কোনও লক্ষণ ছিল না। এমন কি অ্যাগ্নস্টিক্ বা অজ্ঞেয়বাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও তাঁদের বিশেষ কোন সাদৃশ্য ছিল না। এঁদের আন্দোলনকে দেশের তৎকালীন বাতাবরণের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তরুণদের একটা উত্তেজনাপূর্ণ কাণ্ডকারখানা বলেই মনে হয়। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ এঁদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তারও ঐতিহাসিক যথার্থতা রয়েছে। ওদুদ লিখেছেন, '.......ডিরোজিয়োর শিষ্যরা পরবর্তী জীবনে যে উদার মনুষ্যত্ব ও স্বদেশহিতৈষণা নিয়ে বেড়ে ওঠেন তাতে রামমোহনের পরিচিত শিষ্যদের চাইতে তাঁরাই তাঁর বিদেহ আত্মার স্নেহাশিষের বেশি যোগ্য হয়েছিলেন বলা যায়। তাঁদের মত অকপট, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত মানুষ যে কোনো দেশের ভূষণ। তাঁদের সম্বন্ধে আরো স্মরণ করবার আছে যে রামমোহন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন একালের ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার প্রতি, কিন্তু সে সাধনা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ডিরোজিয়োপন্থীদের নিবিড় অনুরাগে। সেদিনের উচ্চশ্রেণীর স্কুল-কলেজ স্থাপনা, সে-সব অধ্যাপনা, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার জন্য সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা, উচ্চ রাজপদ যোগ্যতার সঙ্গে গ্রহণ, এ-সবই সমাধা হয় মুখ্যতঃ ডিরোজিয়োপন্থী ও তাঁদের দোসর ইয়ং বেঙ্গলদের দ্বারা'। (পৃ ৪১, কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, ২য় খণ্ড)

বাস্তবিক রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ডিরোজিওপন্থী ইয়ং বেঙ্গলগণ এবং এঁদের আন্দোলনসৃষ্ট অসামান্য প্রতিভাধর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত,—এঁদের প্রভাবেই বাংলায় বিশেষ করে কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। রামমোহনের ব্যক্তিগত সেকুলার ঈশ্বরভাবনা শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগামীগণের দ্বারা একটি ধর্মীয় পন্থের চেহারা নিলেও তাঁর চিন্তার ধর্মনিরপেক্ষ লক্ষণগুলির প্রভাব সমাজ-অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল ছিল বহুকাল। যদি বলা হয় এর ফলেই এ দেশে পরবর্তী কালের নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদী ধ্যান-ধারণার বাহকদের উদ্ভব ঘটে তাহলে মনে হয় খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না।

ধর্মাশ্রয়ী চিন্তাভাবনার রূপান্তর

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ বাংলায় কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সেকুলার চিন্তার জোয়ার সৃষ্টি হলে ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তিগণ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। এর ফলে বিশেষ করে হিন্দুসমাজের শিক্ষিত মানুষদের ধ্যান-ধারণায় এক ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মমতাবলম্বী হয়ে পড়েন। কিন্তু এই সূক্ষ্ম নিরাকার ব্রহ্মবাদী মতাদর্শ এ দেশের সাধারণ মানুষের মন তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। ব্রাহ্মদের বিগ্রহবর্জিত উপাসনামন্দির এবং প্রার্থনাপদ্ধতির ধরন দেখে সাধারণ মানুষ ভাবত এরা খ্রিস্টানদেরই একটা ভিন্ন রূপ।

কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মকে হুবহু মেনে নেওয়া বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাধারণ মানুষদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হিন্দুধর্মের নতুনতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই প্রয়োজন সঠিকভাবে মেটাতে পেরেছিলেন রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ।

কেবলমাত্র হিন্দুধর্মে নয়, রামকৃষ্ণ খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের সাধনার মধ্যেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পক্ষের অনুশীলন তো ছিলই। এইভাবে 'যত মত তত পথ'-এর মতো প্রত্যয়ে উপনীত হন রামকৃষ্ণ। বাস্তবিক ধর্মমতের এই উদার ব্যাখ্যা দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে ছিল একেবারে অভিনব। তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। রামকৃষ্ণের ধর্মশিক্ষার স্পিরিট অনুসরণ করে তিনি বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা করে বোঝালেন সারা বিশ্বচরাচরই ব্রহ্মময়। সবার মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্মের অবস্থান। দেশের যুবকদের তিনি বোঝালেন, তোমরা জেগে ওঠো ব্রহ্মের তেজে। যুবকদের তিনি দেশব্রতী হওয়ার ডাক দিলেন। মোক্ষপ্রাপ্তি নয় দেশ এবং মানবসেবাকেই জীবনের ব্রত করে নেওয়ার উপদেশ দিলেন তিনি তরুণদের। বললেন, এর নামই ঈশ্বরসেবা। আরও বললেন, দেশের একজন মানুষও যতদিন অভুক্ত থাকবে তাকে খাওয়ানোই যথার্থ ধর্মাচরণ। বিবেকানন্দের আহ্বান ছিল আচণ্ডাল ভারতবাসী সবার জন্য। কোনওরকম জাতি, বর্ণ কিংবা সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ তিনি করতে চাননি। এইভাবে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের যে নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন তা ছিল পুরোপুরি তাঁর ব্যক্তিগত অভিনব ব্যাখ্যা। কারণ এই রূপে হিন্দুধর্মের কোনও চর্চাও এ দেশে কখনই ছিল না। ধর্ম সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অভিঘাতেই যে হিন্দুধর্ম নিয়ে এমন অভিনব ব্যাখ্যা বিবেকানন্দের মাথা থেকে বেরিয়েছিল এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তৎকালে সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুদের মনের মতো হয়েছিল এই ব্যাখ্যা। তাই এর উপর ভিত্তি করেই তারা গড়ে তুলল তাদের জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা। ফলে গোড়া থেকেই এ দেশের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠল উদারনৈতিক হিন্দুধর্মকে ভিত্তি করে।

অবশ্য এই ব্যাপারে বিবেকানন্দের আগে থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানচর্চাসহ ইউরোপের নতুন নতুন সেকুলার ধ্যান-ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি এ দেশের কৃষ্ণচরিত্র যেভাবে নতুন করে ব্যাখ্যা করেন তা ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। সেই কারণে প্রথম দিকে এই ব্যাখ্যা ধর্মভাবাপন্ন হিন্দুদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞানরহস্য' নামে বই লিখেছিলেন। দেশের ভূমিসমস্যা এবং কৃষকসমস্যা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ সেই সময় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তাঁর 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম' ইত্যাদি উপন্যাসগুলির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরই প্রবক্তা। তৎকালের শিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণ তাঁর এই উপন্যাসগুলির দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তায় অভ্যস্ত মানুষের দ্বারাই ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদী আদর্শের সূচনা হয়। এই ধরনের জাতীয়তাবাদ যখন জনপ্রিয়তা লাভ করছে সেই সময়েই অভ্যুত্থান ঘটে বিবেকানন্দের।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি বেদান্তদর্শনভিত্তিক হিন্দুধর্মের অভিনব ব্যাখ্যার দ্বারা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর এই তরুণ সন্ন্যাসীর জয়যাত্রা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনওদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। কিন্তু তাঁর বাণী দেশের যুবসমাজের মনে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চার করে। হিন্দুধর্ম এবং ঐতিহ্যগর্বে তাদের বক্ষ স্ফীত হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিমধ্যেই যে মানসজমি কর্ষণ করে রেখেছিলেন তাতে বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বীজ পড়ামাত্রই তা মহীরুহে পরিণত হতে বেশি সময় নেয়নি। এর ফলে ধর্মাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণা এমন প্রাবল্য লাভ করে যে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে প্রবল বেগে উচ্ছ্রিত ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার স্রোত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষতা

উনিশ শতকের একেবারে শেষ থেকে শুরু করলেও বিশ শতকের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণা স্বচ্ছ রূপ পেতে শুরু করে। বোঝা যায় এই কবি ও চিন্তাবিদের মধ্যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাড়াবাড়ি নেই। তিনি মূলত যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং পার্থিব মানবতাবাদী। আর এইগুলিই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার আদত লক্ষণ। কিন্তু ইউরোপীয় সেকুলারিজম্ বা পার্থিব চিন্তার আর-একটি যে শর্ত ছিল বস্তু-বহির্ভূত কোনও অপ্রাকৃত সত্তার পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি, সেটি রবীন্দ্রনাথে পাওয়ার জো নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজুড়ে অতিপ্রাকৃত এক চিন্ময় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বিস্তার। সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন এবং এই ঈশ্বরচেতনার বেশির ভাগটাই তিনি আহরণ করেছিলেন উপনিষদ থেকে।

কিন্তু এ কথা মানতেই হবে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর আর হিন্দুধর্মবাদীদের ঈশ্বর এক নয়। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনাকে বাঁধা যায় না। তাই এই ধরনের ঈশ্বরকে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। যাঁরা হিন্দুপুনর্জাগরণবাদী চিন্তার খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার ধারাটা অবলম্বন করা অনেকখানি সহজসাধ্য হয়েছিল। তাই কালক্রমে এ দেশে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশের মধ্যে এই ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরবাদী পার্থিব মানবতাবাদের চিন্তার ধারাটাই প্রাধান্য লাভ করে। রবীন্দ্রোত্তর কালে এই ধারার একজন বড় মাপের প্রতিভূ হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

পার্থিব মানবতাবাদের অন্য একটি ক্ষীণ ধারা

যে ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা বস্তু-বহির্ভূত কোনও অতিপ্রাকৃত সত্তায় পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, যেটাকেই সঠিক অর্থে সেকুলার চিন্তা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে তার ধারা হিন্দুপুনর্জাগরণবাদের চাপে ক্ষীণ হয়ে পড়লেও এ দেশ থেকে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি কখনই। কারণ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেই এর সন্ধান পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে। শরৎচন্দ্র ছিলেন অ্যাগ্‌নস্টিক্ বা অজ্ঞেয়বাদী। কয়েকটি উপন্যাস এবং কিছু কিছু প্রবন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণার যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় তাতে বেশ বোঝা যায় অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্ববিষয়ে শরৎচন্দ্রের কোনওরকম মাথাব্যথা ছিলনা। তিনি হিন্দুর অনুদার ধর্মীয় সমাজে বদ্ধমূল সংস্কারে আচ্ছন্ন নর-নারীর হৃদয়ঘটিত সমস্যা নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জনের সমস্যা, সেই সময় তথাকথিত অসামাজিক প্রেমের স্বীকৃতি, পরাধীন দেশের দুঃখবিমোচনের সমস্যা,—এইসব নিয়েই মথিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের বেদনাবোধ এবং যাবতীয় চিন্তাভাবনা। বেশির ভাগ উপন্যাসের কাহিনীকেই বিয়োগান্ত করে তিনি সমাজমনে বেদনার সঞ্চার করতে চেয়েছেন সমাজটাকে একেবারে ভেতর থেকে শোধরাবার জন্যেই। তাঁর নায়ক-নায়িকাদের বেশির ভাগই (মাত্র কয়েকজন ব্যতিক্রম) ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু সে শুধু সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিতে যা হওয়া সম্ভব সেটাই বোঝানোর জন্য। শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বর্ণনারীতিতেও ঈশ্বরের কথা মাঝে-মাঝেই এসেছে ঠিকই কিন্তু সেটাও প্রচলিত বাচনভঙ্গির বেশি কিছু নয়। ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে যেখানেই শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মতামত পাওয়া গেছে সেখানেই তিনি এতটাই স্পষ্টবাদী যে এ সব নিয়ে

তাঁর যে কোনওরকম মাথাব্যথা নেই এই ব্যাপারটা তিনি কোনওরকম ধাঁধার মধ্যে রাখতে চাননি। নর-নারীর হৃদয়ঘটিত তথাকথিত অসামাজিক সম্পর্ককে বিয়োগান্ত পরিণতিতে নিয়ে গিয়ে পাঠকচিত্তে বেদনার সঞ্চার করে ভেতর থেকে সমাজ-পরিবর্তনের যে ইতিবাচক শক্তির তিনি জন্ম দিতে চেয়েছিলেন সেই শক্তি পরিবর্তিত সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে নিয়ে যাক—এটাই যে ছিল শরৎচন্দ্রের অন্তরের কামনা, 'চরিত্রহীন', 'পথের দাবী' এবং 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে এবং অন্যান্য কিছু কিছু লেখায় এমনকি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও তিনি নানাভাবে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন।

নজরুলের কাব্যেও ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার প্রবল আবেগ। শোষণ-অত্যাচারে জর্জরিত বন্ধনপীড়িত মানুষের মুক্তি এবং জাতীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষার যে আবেগ তিনি বাংলা কাব্যে সঞ্চারিত করেছিলেন তার মধ্যে কোনও ধর্ম এমনকি ঈশ্বরেরও স্থান নেই। ঈশ্বরের প্রশ্নে তিনি 'বিদ্রোহী ভৃগু' ভগবান বুকে এঁকে দেন 'পদচিহ্ন'। নজরুলের বিদ্রোহ এবং বিপ্লবাত্মক কবিতাগুলিতে রয়েছে পার্থিব মানবতাবাদী ভাবনার উদ্দীপনাময় রূপের প্রকাশ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নজরুল ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তবে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ তাঁর ছিল না। তাই গান রচনার সময় অজস্র প্রেমের গান ছাড়াও—আল্লাপ্রীতি, পয়গম্বরপ্রশস্তি এবং শ্যামাসংগীত সবই তিনি লিখেছেন। শোনা যায় ধর্মমূলক বেশির ভাগ গানগুলিই ছিল ফরমায়েসি। প্রাণের আবেগে সৃষ্ট নজরুলকাব্যের মূল সুর কিন্তু পার্থিব মানবতাবাদী। ক্ষেত্রে ঈশ্বর এবং ধর্মের স্থান নগণ্য।

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম্ এবং মার্কসবাদ-প্রভাবিত ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা

শরৎচন্দ্রের মধ্যে পার্থিব মানবতাবাদকে সর্বপ্রথম চিহ্নিত করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। এই এম এন রায় শুরুতে ছিলেন মার্কসবাদী। পরবর্তী কালে একেবারে শেষ বয়সে তাঁর মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটে। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম্ নামে যে তত্ত্ব তিনি শেষ বয়সে প্রচার করেছিলেন জনজীবনে তার তেমন কোনও প্রভাব না পড়লেও, এই তত্ত্ব এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অন্যতম একটি দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে। এই র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজ্‌মের ভাবধারার ধারায় এ দেশের যেসব লেখক-সাহিত্যিক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে গৌরকিশোর ঘোষ এবং শিবনারায়ণ রায়ের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। এঁদের লেখায় যে ভাবধারা প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে সবাই একমত হতে না পারলেও তা যে শতকরা একশ ভাগ ধর্মনিরপেক্ষ এই বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

প্রথমে অধুনালুপ্ত সোভিয়েত রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব এবং পরে চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রায় অনুপ্রাণিত মার্কসবাদে আস্থাশীল এ দেশের একদল কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকার এবং সুরকার প্রবল উৎসাহে গড়ে তোলেন গণমুখী এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল সুর যে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আই পি টি এ নামে তাদের একটি সংগঠনও গড়ে ওঠে। একসময় এই সংগঠনের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছিল। বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি এই আই পি টি এ অনুগামীগণের সৃষ্টি। মার্কসবাদে আস্থাশীল কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সমর সেন, গোপাল হালদার, উৎপল দত্ত প্রমুখ। এঁরা সবাই বর্তমানে প্রয়াত। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় অবশ্যই মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী। জীবিত এবং মৃতদের ভেতর থেকে এইরকম আরও অনেকের নামই করা যায়। তালিকা দীর্ঘ করাটা বোধহয় এই মুহূর্তে তেমন কোনও প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গক্রমে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম না উচ্চারণ করাটা মনে হয় অপরাধের পর্যায়ে চলে যাবে, যদিও এ কথাও ঠিক পূর্ববিশ্বাসে তিনি আর স্থির নেই। তবুও ধর্মনিরপেক্ষ, মার্কসবাদ-প্রভাবিত ভাবধারার ইতিহাস পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অবশ্যই স্মরণীয়।

বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা

ইংরেজ আমলে আধুনিক ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মুসলমানদের মুখ দেখা গিয়েছিল অনেকটা বিলম্বে। এই ঘটনার ঐতিহাসিক কারণগুলি বহু গবেষকের দ্বারা নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এখানে পুনরাবৃত্তির কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বাঙালি মুসলমান সমাজ থেকে উদ্ভূত কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গ ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার বিকাশ আদৌ কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল না। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতা থেকে উৎসারিত ভাবধারা যখন বিভিন্ন ধরনের বই এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল—প্রাথমিকভাবে তার দ্বারা কিশোর নজরুল প্রভাবিত হয়ে থাকবেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহী কবি নজরুলের আত্মপ্রকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীর দুটি দশক পেরিয়ে যাওয়ার পর। তার আগেই আমরা পেয়েছি মীর মোশার্‌রফ হোসেনকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই যিনি রচনার আধিক্যে এবং প্রতিভার গৌরবে বাংলার সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সুপরিচিত হয়েছিলেন। মোশার্‌রফ হোসেনের সাহিত্যজীবনের দুটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় নিঃসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী চিন্তার স্বাক্ষরবাহী। এই পর্যায়ে তিনি অত্যাচারিত-নিপীড়িত মানুষের বেদনাকে ভাষা দিতে চেয়েছেন। তাঁর 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) নাটকে যে বেদনাবোধের প্রকাশ আমরা দেখি তার উল্লেখ করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'এই বেদনাবোধের প্রকাশে এবং—তার চাইতেও যা বড় কথা—সম্পূর্ণ সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনে মোশার্‌রফ হোসেন আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করেন। সমসাময়িক জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা এটিই তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম। মুসলমান জমিদার মুসলমান প্রজার উপরেই কেবল অত্যাচার করেছেন, তা নয়, আদালতে তার পক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দিয়েছে হরিদাস বৈরাগী আর তিতু মোল্লা—দুই সম্প্রদায়েরই দুই ধর্মপ্রাণ চরিত্র। জীবনের অভিজ্ঞতায় মোশার্‌রফ হোসেন দেখেছিলেন যে, এই ধরনের চরিত্র ধর্মের কথা বলে কিরকমভাবে লোক ঠকিয়ে থাকে।' (পৃ ২০৩, *মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য*) এহেন মোশার্‌রফ হোসেন তাঁর সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বদলে গিয়েছিলেন। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'-তে (১৮৯৯) সর্বপ্রথম তাঁর এই মানস রূপান্তর ধরা পড়ে। দেখা যায় তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। কেন এমন হল? এই জিজ্ঞাসার জবাবে আনিসুজ্জামানের অভিমত, 'তিনি যে প্রথম জীবনের হিন্দু-মুসলমান মিলন-কামনা ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করলেন, তার জন্যে অনেকখানি দায়ী—আমরা যদি বলি—সমসাময়িক পরিবেশের অনুদারতা, তাহলে খুব ভুল হয় না। যেকালে এঁরা সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হলেন, সেকালেই হিন্দুপুনর্জাগরণবাদ বাংলার সাহিত্যে ও সমাজে আত্মপ্রকাশ করল। তার একটি দিক ছিল হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয়-ধারার নয়—বিরোধ-স্মৃতির চর্চা করা, যার অপরিহার্য ফল হিন্দুমানসে মুসলিম-বিদ্বেষের সূচনা। এর প্রতিক্রিয়ায় এবং সেই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির প্রভাবে মুসলমান-মানসে জাগল হিন্দুর শুভবুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ এবং তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা। অতএব, মিলন-কামনা আর কিছুতেই সাহিত্যে ও সমাজে খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। মোশার্‌রফ হোসেনের মনোভাবের পরিবর্তনের পেছনে এই অনুদার পরিবেশের দান যে অনেকখানি, সেটা স্বীকার না করে উপায় নেই। কেবল তাঁর নয়, সেকালের

সব লেখকই যে এই অবস্থার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেটা সুখকর হয়নি। তবে মোশাররফ হোসেনের গৌরব এখানে যে তাঁর যা কিছু রচনা সাহিত্যপদবাচ্য তাই এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত। *(পৃ ২২৩, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য)*

ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি মুসলমান সমাজে বিশেষভাবে যাঁর নাম স্মরণীয় তিনি ডাক্তার লুৎফর রহমান। যে নামটি এখন বিস্মৃতপ্রায়। ইনি ছিলেন নজরুলের সমসাময়িক, মূলত প্রাবন্ধিক। সাধারণত কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখের 'শিখা' গোষ্ঠীকেই ইদানীং মনে করা হয় এঁরাই হলেন বাঙালি মুসলমান সমাজে 'মুক্তবুদ্ধি' আন্দোলনের পথিকৃৎ। কিন্তু কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এঁদের তুলনায় কিছুটা আগেই ইউরোপীয় পার্থিব মানবতাবাদের চর্চা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণার গভীর অনুশীলন করেছিলেন লুৎফর রহমান। ক্রমাগত বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ লিখে তিনি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে কোনও কোনটির বহু সংস্করণের প্রকাশই প্রমাণ লুৎফর রহমানের জনপ্রিয়তা কতদূর প্রসারিত ছিল। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল, 'মহৎজীবন', 'সত্যজীবন' এবং 'মানবজীবন'। এ ছাড়া তিনি শিশুসাহিত্য এবং উপন্যাসও লিখেছিলেন। নারী-সমাজের উন্নতির জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল অন্তহীন। এই উদ্দেশ্যে লুৎফর রহমান গঠন করেছিলেন 'নারীতীর্থ' নামে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান। কলকাতার মীর্জাপুর স্ট্রিট ছিল এর ঠিকানা। এখান থেকে 'নারীশক্তি' নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতেন। এই ধরনের একটা প্রয়াস দেখে অনুমান করা যায় বিশ শতকের গোড়ার দিকের সামাজিক পরিস্থিতিতে কাজটা কতখানি দুঃসাহসিক ছিল, কতখানি সেকুলার মূল্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে তবেই মানুষ সেই সময়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশে এমন একটা উদ্যোগ গ্রহণে অগ্রণী হয়।

এরপরই স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে বেগম রোকেয়ার কথা। এনারও কর্মকাণ্ড লুৎফর রহমানের সমসাময়িক। এমন দুঃসাহসী মহিলা শুধু সেকালে কেন একালেও দুর্লভ। দুঃসাহসই শুধু নয় মুক্তবুদ্ধি এবং সেকুলার চিন্তার নিরিখেও তিনি ছিলেন তুলনাহীনা। সারাজীবন যুক্তিহীনতা, অমানবিকতা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আপসহীন লড়াই। তখনকার দিনে বোধহয় লেখিকা হিসাবে তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি দাবি করেছিলেন পুরুষের সঙ্গে নারীর সমানাধিকার। এই সমানাধিকার কোনও ধর্মেই স্বীকৃত নয় বলে তিনি কেবল ইসলাম ধর্ম নয় সব ধর্মেরই সমালোচনা করেছিলেন কঠোর ভাষায় কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতিতে। দৈনন্দিন আচার-আচরণ এবং পোশাক-আশাকে তিনি আর পাঁচটা পর্দানসীন মুসলিম মহিলাদের মতই ছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখনীতে ঝরে পড়ত বিপ্লবাত্মক মতবাদের আবেগ। বিদ্যাসাগরের মতোই তিনি বাইরের দিক থেকে সমাজের মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়েই থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেকুলার মতাদর্শ প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপসহীন। মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ছিল তাঁর এই আপসহীন মতবাদেরই অঙ্গ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল। মুসলমান মেয়েদের জাগরণের উদ্দেশ্যে এবং দুঃস্থ মহিলাদের সাহায্যকল্পে সেই ১৯১৬ সালে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা 'মুসলিম মহিলা সমিতি' নামে একটি সংগঠন। রোকেয়ার লেখা বইগুলি 'মতিচুর' 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী', 'সুলতানার স্বপ্ন' ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান। তিনি ছিলেন সমকালের অনেকখানি এগিয়ে থাকা ব্যক্তিত্ব। ১৯৩২ সালে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

'শিখা' গোষ্ঠীর অবদান

ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার যে ভাববন্যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুসমাজে প্রবাহিত হয়েছিল তার গতিবেগ বাঙালি মুসলমানের মানসভূমি প্লাবিত করার আগেই হিন্দুপুনর্জাগরণবাদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুসলমান সমাজে তাই 'মুক্তবুদ্ধি' চর্চার কাজ মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে নতুন করে শুরু করতে হয়। কাজটা যে ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্নভাবে কাজী নজরুল ইসলাম, লুৎফর রহমান এবং বেগম রোকেয়ার উদ্যোগে শুরু হয়েছিল সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁদের নাম বলা হয়নি এমনও লেখক-কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক অনেকেই ছিলেন, মুসলমান সমাজের অগ্রগতির জন্য যাঁদের বহুমুখী উদ্যোগের কিছু কিছু সাফল্য ইতিমধ্যেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ১৯২৫ সালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান সমাজে 'মুক্তবুদ্ধি' চর্চার ব্যাপারটা একটা তাত্ত্বিক আন্দোলনের চেহারা নেয়। শুরু থেকেই এই সাহিত্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহের হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ পরবর্তী কালের খ্যাতিমান লেখক-সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদগণ। 'শিখা' ছিল এই সমাজের বার্ষিক মুখপত্র। 'শিখা'-র প্রতিটি সংখ্যার প্রথম পাতাতেই ছাপা থাকত, "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" কী ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার চর্চা এই সাহিত্যসমাজে হত তার নমুনা হিসাবে 'সমাজের' অন্যতম প্রধান কর্ণধার আবুল হোসেনের একটি প্রবন্ধের কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যেতে পারে। 'আদেশের নিগ্রহ' নামে এই প্রবন্ধটি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে পঠিত হয়। আবুল হোসেন লিখেছেন, "কালের পরিবর্তনে অবস্থার বিপর্যয়ে ধর্ম-শাস্ত্রের কথা মানুষ পুরোপুরি পালন করতে পারে না। তখন ধর্মভীরু ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রকে অপরিবর্তনীয় মনে করে মানুষের প্রতি দোষারোপ করে। আজ মুসলমানদের মনোভাবও তাই। বিধি বিধান বা ধর্মগুরুর আদেশের নিগ্রহ হতে মুক্তি না পেলে মুসলমান ত মানুষ হবেই না, বরং ইসলামও কেবল পুঁথিগত ডেড্ লেটার হয়েই থাকবে, যেমন কোরান-হাদিস বাংলার সাধারণ মুসলমানের নিকট বন্ধ করা (সিল্ড্) একখানি পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই নয়, যে-পুস্তক হতে তারা কিছুই গ্রহণ করতে পারে না অর্থাৎ পারছে না। ...... ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে গিয়ে মুসলমান আজ কতকগুলি ভণ্ড, প্রাণহীন, গর্হিতরুচি, বুদ্ধি-বিবেকহীন জীবে পরিণত হয়েছে। মুসলমান নেতৃবৃন্দ এদিকে দৃকপাতও করছেন না, বরং সমস্তই 'ধামাচাপা' দিয়ে তাঁরা সমাজে সাচ্চা বনে' বসেছেন।" *(পৃ ২৫৩, 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম)* বাস্তবিক 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা' গোষ্ঠী জীবনের নানা দিক ব্যাপ্ত করে বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনার যে স্রোতস্বিনী বইয়ে দেন সেটাই কালক্রমে শিক্ষিত মুসলমানদের এক বিরাট অংশের মানসভূমিকে সিক্ত করে নতুন যুগের ফসল ফলার উপযোগী করে তোলে।

ওদুদ, আইয়ুব এবং মুজতবা আলী

প্রসঙ্গক্রমে, আমার মনে হয় রবীন্দ্রোত্তর যুগে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার ধ্বজাবহনকারীদের মুসলমান সমাজসম্ভূত তিনজন বুদ্ধিজীবীর নাম আলাদাভাবে উল্লেখিত হওয়ার দাবি রাখে। এঁরা হলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং সৈয়দ মুজতবা আলী। এঁদের চিন্তা-ভাবনার ধরন এবং সৃজনশীলতার ক্ষেত্র যে একরকম নয় সে কথা সবার জানা। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার নিরিখে বিচার করলে এঁদের সমগোত্রীয়তা লক্ষ না করে উপায় নেই। এঁরা তিনজনেই ছিলেন কল্যাণময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু এই ঈশ্বর ছিলেন এঁদের ব্যক্তিগত অনুভব এবং

নিজস্ব ব্যাখ্যাপ্রসূত। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় ঈশ্বরের সঙ্গে এই ঈশ্বরচেতনার সাদৃশ্য ছিল না। ওদুদের ঈশ্বরকে ইসলাম ধর্মের 'আল্লা' বলে আপাতদৃষ্টে মনে হলেও একটু গভীরে গেলেই বোঝা যায় ওদুদের এই আল্লাকে ইসলামের নিষ্ঠাবান অন্ধ অনুগামীগণ মেনে নেবেন না কিছুতেই। সেই দিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বর সম্পর্কে এঁদের তিনজনেরই চেতনা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু এঁদের এই ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরচেতনার এমন একটি আবেদন আছে যা শিক্ষিত মানুষের পরিশীলিত মনকে আকর্ষণ করে। ঈশ্বর-বিবর্জিত সেকুলার ভাবাদর্শ যাঁদের মনকে নাড়া দেয় না তাঁদের জন্য কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যে রয়েছে একটি গ্রহণীয় পথনির্দেশ।

ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা এবং দেশের বর্তমান মানসিকতা

আস্তিক্যপন্থী রাবীন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাই হোক কিংবা মার্কসবাদী অথবা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদের নাস্তিক্যবাদী সেকুলার ভাবধারাই হোক, কোনওটাই এখনও দেশের গণমানসে তেমন কোনও পাকাপোক্ত জায়গা করতে পারেনি। এখনও কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী খ্রিস্টান সবার মধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলিরই জবরদস্ত প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু কোনও ধর্মই যে আর তার আগের রূপে টিকে থাকতে পারছে না সেটাও একটু চোখ মেলে তাকালেই বোঝা যায়। ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির ব্যাপক প্রভাব সর্বত্রই ধর্মাচরণের ধরন-ধারণকে বদলে দিচ্ছে। এখন যে পূজাপার্বণে, ঈদে কিংবা ক্রিসমাসে উৎসবের মজা লোটার ধরনটা আমূল বদলে যাচ্ছে, ধর্মাচরণটা যে ক্রমেই উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে এ কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠ অভিভাবকগণ না চাইলেও ছেলে-ছোকরারা ধর্মীয় উৎসবের মেজাজটা এমনভাবে বদলে দিচ্ছে, যে সেটাকে আর যাই বলা যাক ভগবদ্ভক্তি বা আল্লাপ্রীতি বলা যায় না কোনও মতেই।

ধর্মের অভিভাবকরাও যে খুব নিষ্ঠাবান এমন কথাও হলফ করে বলা যায় না। কোনও ধর্মের বিশেষ কোনও বিধি-বিধান কারও ব্যক্তিস্বার্থের পক্ষে হানিকর হলে তিনি যে সেটা এতদসত্ত্বেও মেনে চলবেন এমন কোনও গ্যারান্টি আর নেই। প্রত্যেকেই যে যার সুবিধেমতো ধর্মীয় বিধানগুলির ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। ধর্মের নামে কোনও জবরদস্তিই আর কেউ মানতে রাজি নয়। কেবল নারীর উপর আরোপিত বৈষম্যমূলক ধর্মীয় বিধানের অচলায়তনটিকে খাড়া রাখার পুরুষতান্ত্রিক গোঁয়ার্তুমি সব সমাজেই চোখে পড়ে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা নারীকে এই অচলায়তনে আটকে রাখা কোনভাবেই আর সম্ভব হচ্ছে না। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ধ্বজাধারীগণ সবচেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন জীবনের এই ক্ষেত্রটিতে। মুসলমানদের মধ্যেতে। আধুনিকা, শিক্ষিতা নারীর স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে না ভেবে আর উপায় থাকছে না।

ধর্মীয় সমাজে পোশাক-আশাক এবং খাদ্যাখাদ্য নিয়ে যে সব বাছবিচার আছে ধর্মের অনুগামীগণের আধুনিক জীবনে তা প্রায় অচল হতে বসেছে। এখন আর রাস্তাঘাটে কেবলমাত্র জামাকাপড় দেখে হিন্দু না মুসলমান—চিনে ফেলা সম্ভব নয়। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে বাঙালির দেশজ ঐতিহ্য প্রায় অবলুপ্তির পথে। নারীদের মধ্যেও সালোয়ার-কামিজ যে হারে চালু হতে শুরু করেছে তাতে বঙ্গললনাদের চিরায়ত ভাবমূর্তি আঁকড়ে থাকা আর সম্ভব নয়।

খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারেও আর তেমন কোনও বাছবিচার নেই। এখন তো ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ খাদ্যের প্রতিই আকর্ষণটা যেন বেশি বেড়ে গেছে। আগে যে সব মুসলমান হোটেল 'নো বীফ' সাইনবোর্ড টাঙিয়ে হিন্দু খদ্দের আকর্ষণ করত এখন তাদের ধারণা হচ্ছে সাইনবোর্ডটা আর না টাঙালেও চলে। কোথাও কোথাও উঠিয়েই দেওয়া হয়েছে। আধুনিক মুসলমানরাও এখন অমুসলিম হোটেলে মাংস খেতে গিয়ে 'ঝটকা' না 'হালাল' সেই তথ্য জেনে নেওয়ার আর বিশেষ কোনও প্রয়োজন অনুভব করছে না। অবশ্য কেবলমাত্র শুয়োরের মাংস ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য বিচার এমনিতেই খুব কম।

আসলে বাইরের দিক থেকে বাঙালি ক্রমাগত একটা ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের দিকেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু মনের দিক থেকে ব্যাপারটা সেভাবে এগোচ্ছে না মোটেই। যদিও বর্তমান বাঙালি কবি-সাহিত্যিকগণের বেশির ভাগেরই ধর্ম এবং ঈশ্বর নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই, এঁদের কারও কারও পাঠকসংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, তবুও কেন যেন বাঙালির মানসজগতে ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা তেমন ঠাঁই পাচ্ছে না। সেখানে যুক্তিহীনতা, গোঁড়ামি, অর্থহীন অলৌকিকতার প্রতি ঝোঁক ইত্যাদি ব্যাপারের বাড়াবাড়ি দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। হয়ত আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অনিশ্চয়তার মধ্যে নিহিত রয়েছে এর কারণ। কিন্তু বর্তমান অবস্থা যতই হতাশাব্যঞ্জক হোক না কেন বাঙালির মননশীলতা যে ক্রিয়াশীল আছে তারও লক্ষণগুলি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। এই মননশীলতার জোরেই ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনার ধারা পুনরায় সব বাধা অতিক্রম করে আবার বন্যার বেগে বাঙালির মানসভূমি থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অর্থহীন অলৌকিকতা-প্রীতি, যুক্তিহীনতা এবং অমানবিক সংকীর্ণতার আবর্জনা। তখন এই উর্বর মানসভূমিতে আবার ঝলমল সোনালি ফসল। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বিশাল ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে সেই সম্ভাবনার বীজ। আপাতত এই দুরন্ত আশা বুকে নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব ১৪০১ সালের দিকে।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
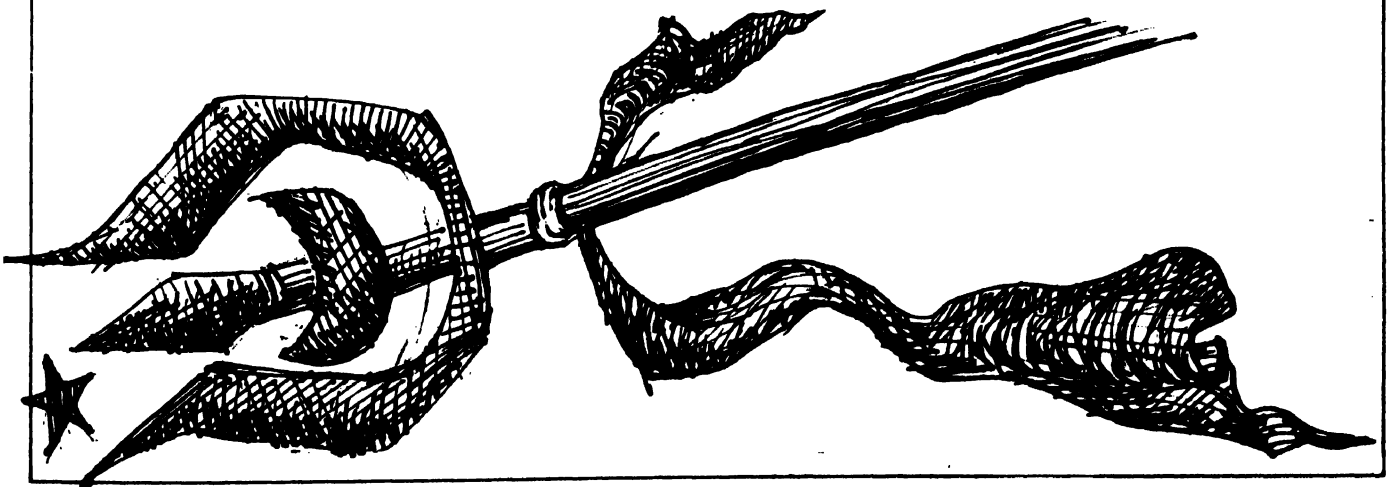
এক শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মুসলমান

একশ বছর আগে ১৩০০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব বাঙালির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এর আগে ১৮৩১-৩৩ পর্বে রামমোহন রায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বুদ্ধিজীবী মহলের বাইরে—মার্কিন সমাজের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে—সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিবেকানন্দের প্রভাব আরও একটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ—যে-উদ্দেশ্যে শিকাগোতে ১৮৯৩-এর বিশ্বধর্ম মহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায় বিবেকানন্দের বক্তৃতার ফলে। উদ্দেশ্যটা ছিল খ্রিস্টান ধর্মকে বিশ্বধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করা। বিলি সানডে নামে ওই মহাসভার একজন উদ্যোক্তা পরবর্তী কালে বলেছিলেন যে বিশ্বধর্ম মহাসভা আমেরিকার ইতিহাসে ভয়ঙ্কর অভিশাপ ডেকে এনেছে।

বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভার উদ্বোধনী ভাষণের উপসংহারে বলেছিলেন যে ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে বহুবার নরশোণিতে সিক্ত করেছে এবং সভ্যতা ধ্বংস করেছে। সব শেষে বললেন, "আমি সর্বতোভাবে আশা করি যে এই ধর্মসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইল, উহা সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্ববিধ নির্যাতন পরম্পরার এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসান বার্তা ঘোষণা করিবে।" স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে কারও নাম উল্লেখ না করে স্বামী বিবেকানন্দ সভ্যতা ধ্বংসকারী ও নরহত্যাকারীরূপে কোন ধর্মোন্মত্তদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা অনুমানের বিষয়রূপে রেখে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেননি তা স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্ট করে পরবর্তীকালে বলেছেন। ১৮৯৭ সালে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করে দেশে ফিরলে তাঁকে বহু সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মাদ্রাজে প্রদত্ত সংবর্ধনাগুলির মধ্যে শেষ সংবর্ধনাটি ছিল খুব বড় এবং এখানে বিবেকানন্দ যে বক্তৃতাটি দেন তা 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামে বিখ্যাত। এই বক্তৃতায় ভারতের অতীত সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এক সময়ে ভারতে ব্রাহ্মণের একচেটে অধিকার ছিল এবং ব্রাহ্মণের সেই একচেটে অধিকার ভেঙেছে মুসলমানরা। "মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল, একথা মনে করা নিতান্ত পাগলামিমাত্র।"

কথায় আছে, চোরের মায়ের বড় গলা। যারা গায়ের জোরে আমেরিকা-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম-সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে তারাই সবচেয়ে বেশি প্রচার করেছে যে এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে শাস্ত্র নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়েছে। কোনও কোনও মুসলমান শাসক নিশ্চয়ই বলপূর্বক অনেককে মুসলমান করেছিল। কিন্তু কতজনকে করেছিল? এবং কবে করেছিল? এবং কোন কোন অঞ্চলে করেছিল?

যখন ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও দেশ স্বাধীন হয় তখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসের রূপ কী রকম ছিল? চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে অধিকাংশ মানুষই ছিল মুসলমান। বিশেষভাবে সমুদ্রোপকূলবর্তী বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কী কারণে এবং কীভাবে এবং কবে এবং কোন হারে মুসলমান হয়? কোন কোন মুসলিম শাসক সমুদ্রোপকূলবর্তী বাঙালিকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিল? সাধারণ ভাবে লক্ষণীয় যে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে চট্টগ্রাম নোয়াখালি বরিশালের স্থানীয় অধিবাসীদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোনও ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক প্রমাণ নেই।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লির বাদশাহ মুহম্মদ বিন তুঘলকের দূত হিসেবে ইবন বতুতা কালিকট থেকে সমুদ্রপথে চীনে যাওয়ার সময় চট্টগ্রামে মুসলমানদের বহু ধর্মস্থান এবং কবরস্থান দেখেছিলেন এবং সেই সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন যে বাংলায় জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব সস্তা। পরোক্ষ প্রমাণ থেকে মনে হয় যে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করার অনেক আগে থেকেই সেখানে সমৃদ্ধ মুসলিমদের কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে মুসলিম সওদাগরদের বসতি ছিল। এর তুলনীয় পরিস্থিতি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলেও দেখা যায়। আরব মুসলমানরা মুহম্মদ কাশিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জয় করেছিল বটে, কিন্তু তারও অর্ধশতাধিক বছর আগে, ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে, মালাবার উপকূলে, বর্তমান ক্যান্নানোরের কাছে, মুসলিম বণিকরা বসতি স্থাপন করেছিল এবং মসজিদ নির্মাণ করেছিল। এটাই ভারতের প্রাচীনতম মসজিদ। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সওদাগররা ভারতের বিভিন্ন বন্দরে বসতি ও বাজার স্থাপন করেছিল এবং এইসব বাণিজ্যপথেই ইসলাম ধর্ম নিঃশব্দে ভারতে তথা বাংলায় প্রবেশ করেছিল। সেজন্যেই কেরলের বা বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে মুসলিম উপস্থিতি এত স্পষ্ট। কিন্তু কবে থেকে এত স্পষ্ট হল?

১৭৫৭ সালে বাংলায় কার্যত মুসলিম শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। ভারতে বিধিবদ্ধভাবে জনগণনা শুরু হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে। আর 'বেঙ্গল প্রপারে' ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার নির্ভরযোগ্য গণনা পাওয়া যায় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ১৮৮১ সালে 'বেঙ্গল প্রপারে' হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৭,২৫৪,১২০ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৭,৮৬৩,৪১১ জন অর্থাৎ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৬০,৯২৯,১ জন বেশি। দশ বছর ধরে অনুষ্ঠিত জনগণনায় ১৮৯১

সালে হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়াল ১৮,০৬৮,৬৫৫ জন, অন্য দিকে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াল ১৯,৫৮২,৩৪৯ জন অর্থাৎ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াল ১,৫১৩,৬৪৯ জন বেশি। পরবর্তী জনগণনাগুলি থেকে দেখতে পাই যে প্রত্যেক দশ বছর অন্তর অন্তর হিন্দুর থেকে মুসলমানের সংখ্যা বড় বড় লাফ দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমান জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিটাই হচ্ছে প্রবণতা। এবং এই প্রবণতার ভিত্তিতে আমরা এটাও মানতে বাধ্য যে কয়েক দশক আগে—হয়ত ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের আগে যখন ভারত কাগজে-কলমে মুঘল শাসনের অধীনে ছিল তখন—বাংলায় মুসলমানরাই সংখ্যালঘু ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের যুগেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংল্যান্ডে, জার্মানিতে এবং ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে যখন প্রবল কলরোলে হিন্দু জাগরণ হচ্ছে তখনই প্রদীপের নীচে অন্ধকারে নিমজ্জিত গ্রামবাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের অগোচরে এবং হয়ত অজ্ঞাতে, মুসলমানদের সংখ্যা বিপুল হারে দারুণ দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে।

কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কী কী ভাবে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়? গত একশ বছর ধরে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণের প্রসঙ্গে সম্প্রদায়বিশেষের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণটা বোঝা নিতান্ত জরুরি। হ্রাস-বৃদ্ধির একটা কারণ হল জন্ম-মৃত্যু। আর-একটি কারণ হল ধর্মান্তরণ। অধিবাসীদের একাংশ যদি হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে তা হলেই হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আবার ধর্মান্তরণও দু-ভাবে হতে পারে—বলপূর্বক এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে। কে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে পারে? যার অর্থবল ও অস্ত্রবল আছে। ১৮৯১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার অর্থবল ও অস্ত্রবল দুটোই ছিল হিন্দু জমিদারি ও মহাজনদের হাতে। সুতরাং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ করা হিন্দু জমিদারি-মহাজনদের পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। সহজ বুদ্ধির বিচারেই বলপূর্বক ইসলাম ধর্মান্তরণের তত্ত্ব মিথ্যে হয়ে যায়। আর জন্ম-মৃত্যুর কারণে হিন্দুদের জনসংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি হ্রাস পেয়েছে অথবা হিন্দুদের মধ্যে জন্মহার কম, এ রকম তত্ত্বের সমর্থনে কোনও সত্য পাওয়া যায়নি। দেখা গেছে যে একই আর্থিক স্তরের দুই সম্প্রদায়ের দুই পরিবারের মধ্যে জন্মহার এবং মৃত্যুহার একই রকম। অর্থাৎ জন্ম-ও-মৃত্যুর হারের উপর ধর্মের কোনও প্রভাব নেই, যা আছে তা হল আর্থিক অবস্থার ও সেই সঙ্গে শিক্ষার প্রভাব। তা হলে বাকি থাকে একটি কারণ—স্বেচ্ছায় একটি ধর্মত্যাগ আর স্বেচ্ছায় অন্য ধর্মগ্রহণ। এবং এই শেষোক্ত কারণেই একশ বছরে বাংলাভাষীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকাশ থাকে যে স্বেচ্ছায় ধর্মগ্রহণ এক জিনিস এবং ধর্মান্তরণ অন্য জিনিস।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ডঃ জেমস ওয়াইজ ঢাকাতে সিভিল সার্জেনের পদে নিযুক্ত হন। তখন তিনি পূর্ববাংলার সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা নিয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন যেগুলির থেকে কিছু অংশ তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'নোটস অন দি রেসেজ, কাস্টস অ্যান্ড ট্রেডস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল' নামক লন্ডন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশ করেন এবং বাকি অংশ ডঃ ওয়াইজের মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী দেন হার্বার্ট রিজলিকে। ডঃ ওয়াইজের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'জর্নল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের' তৃতীয় খণ্ডে 'দি মহামেডানস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল' নামে এক প্রবন্ধে স্যার রিজলি লেখেন যে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা সামাজিক সমতালাভের জন্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। ডঃ ওয়াইজ এবং স্যার রিজলির মতামতকে আমরা বেসরকারি মত বলতে পারি। এখানে সত্যের খাতিরে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডঃ ওয়াইজ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বলপূর্বক ইসলামীকরণের কথা বলেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে তাঁর কালে পূর্ব বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা সমান সমান হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুদের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

এবার ১৮৭১ সালে প্রথম জনগণনার উপর এইচ বেভেরলির এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার উপর ই এ গেইটের প্রতিবেদন পরীক্ষা করা যাক। দুটি জনগণনার দুজন দায়িত্বশীল কর্তাই লিখেছেন যে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরাই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রধান অংশ। এখানে একদা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত নিম্নবর্ণ ও দরিদ্র শ্রেণীর উল্লেখ থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলায়, বিশেষত পূর্ববাংলায়, মুসলমান জনসংখ্যার চমকপ্রদ বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ বাঙালি হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই নিহিত এবং তাদেরই অত্যাচারে ও আচরণে বাঙালি হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণ ও নিম্নশ্রেণী হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে মুসলমান সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার ১৯৪৭ সালে এই ঘটনারই উলটপুরাণ কাহিনী শুরু হয়।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। এখন আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের নাটক দেখি। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলার জনবিন্যাসের রূপটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। শহরে শিক্ষিত সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে হিন্দুরাই প্রধান এবং গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র মানুষদের মধ্যে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালি সমাজের এই দ্বিখণ্ড রূপের ভিত্তিতেই লর্ড কর্জন বঙ্গভঙ্গ আইনকে কার্যকর করলেন। কর্জন প্রণীত বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়াতে বাঙালি জাগরণের ইতিহাস সুবিদিত। এবং এটাও আমাদের জানা যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে—জয় মা বলে ভাসা তরী' গেয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্ণধারের ভূমিকায় এগিয়ে এসেছিলেন।

অচিরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গভীরে নিহিত শোচনীয় সমস্যাটাকে তথা সত্যটাকে প্রত্যক্ষ করে আন্দোলনের আয়োজনে উন্মত্ত না হয়ে সরে গেলেন মহানগরীর কোলাহল থেকে শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের মতো পরিপূর্ণ শিল্পীর কথা আমার জানা নেই। তাঁকে শুধু নিভৃতের শিল্পী বলে ভাবলে আমাদেরই অনুধাবনার দৈন্য প্রকাশ পাবে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' যখন বয়কট নীতিতে বাংলার হাটে হাটে সস্তার বিদেশি কাপড় পোড়ানোর উৎসব চলছে তখন রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা হল কুষ্টিয়ার বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের জন্যে সমবায়ের আদর্শে পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারে প্রবর্তন করলেন নির্বাচন-প্রথা। উচ্চতর কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয়ের প্রথম দলের দুজন ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠালেন। আসল কথা, বাংলার অর্থনীতিকে নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে। আবার এ সবের পাশাপাশি লিখছেন, 'রাজাপ্রজা', 'সমূহ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি, 'এখন আর দেরি নয় ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর গো, আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ' প্রভৃতি গান এবং 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাস। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'তপোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক ক'রে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে"। সমসময়ে সমাপ্ত করলেন 'গোরা' উপন্যাস রচনা। সমগ্র উপন্যাস ধরে গোরা খুঁজে বেড়িয়েছে ভারতবর্ষকে। জটিল সুদীর্ঘ ভারত-সন্ধানের শেষে পরেশবাবুর কাছে ফিরে এসে গোরা বলল, "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো

জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা''। স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ এখানে হিন্দুর দেবতা এবং ভারতবর্ষের দেবতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। একজনকে সারাক্ষণ 'দূর', 'দূর' করলে দোষ নেই, কিন্তু সে যদি সত্যিই দূরে যেতে চায় তা হলে তাকে ঘাড় ধরে টেনে আনা হবে জমিদারি মেজাজের প্রমাণ। কিন্তু ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'ঘরে-বাইরে'র জমিদার নিখিলেশ সেরকম জমিদারি মেজাজ দেখাবার পরামর্শকে গ্রাহ্য করেনি বলে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে। তার মতে 'দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা।' সন্দীপ ও তার আদর্শে অনুপ্রাণিত 'বন্দেমাতরম' ঘোষণাকারী হিন্দু বাবুবাহিনীও নিখিলেশের বোধবুদ্ধির বিরুদ্ধে গেছে। ফলে এলাকায় মৌলবির আনাগোনা শুরু হল, দুই-এক জায়গায় গরু-জবাই দেখা দিল। স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাবের পিছনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরম্পরা অথবা কার্য-কারণ সম্পর্ক দেখেছেন। যখন গরু-জবাই নিয়ে অভিযোগ উঠেছে তখন নিখিলেশের বক্তব্য: 'নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই।' এই পর্বেই 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান', 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' প্রভৃতি কবিতা রচিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ১৯০৬-১৬ পর্বে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি শব্দটার তাৎপর্যকে সাহিত্য থেকে কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষক-জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত বহু বিস্তৃত করলেন এবং একই সঙ্গে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের অনুধাবনাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ও নতুন মাত্রা দিলেন। স্বভাবতই বাঙালিবাবু সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশজ সত্যকে বোঝবার চেষ্টা করেনি এবং সম্ভবত অধিকাংশেরই সেরকমভাবে বোঝবার ক্ষমতাও ছিল না। বাঙালিবাবুরা সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেছিল। এই অস্বীকারের প্রতিফলন দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বারবার ব্যর্থতায়। তাঁর রচনাবলী, বিশেষত 'ঘরে-বাইরে' বারবার প্রচণ্ড প্রতিকূল সমালোচনার লক্ষ্য হয়। বাঙালি মুসলমানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁকে হিন্দুপক্ষীয় বলে বর্জন করেছে এবং বাঙালি হিন্দু বাবুসম্প্রদায় তাঁকে পরিহার করেছে দেশবিরোধী হিন্দুবিরোধী ও সমাজদ্রোহী বলে। পরে অসহযোগ আন্দোলনের কালেও রবীন্দ্রনাথ আবার দেশবিরোধী ও সমাজদ্রোহী বলে অভিযুক্ত হয়েছেন কারণ তিনি কখনও নেতিবাচক আন্দোলনের অর্থহীন উত্তেজনা দিয়ে নিজেকে অভিভূত হতে দেননি, সর্বদা স্থির ও স্থিত থেকেছেন নিজের দূরপ্রসারী কর্মসূচিতে।

অবশ্য 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসের বিচার সর্বাগ্রে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিছু সমাজবাস্তবতার মানদণ্ডও সাহিত্য বিচারের অন্যতম মানদণ্ড। সাহিত্যে তথা শিল্পে বাস্তবের তাৎপর্য নির্ধারণ করতে গিয়ে ১৯১৪ সালে 'বাস্তব' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, ''গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তাহা সবচেয়ে কম বোঝে।'' তারপর অভিযোগের উত্তরে লেখেন, ''বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বিশেষ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্বরচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি।'' প্রচলিত ইতিহাস অথবা ধারণা যেখানে বিভ্রান্ত শিল্পী সেখানে পথপ্রদর্শক। 'মহেশ' গল্পের স্রষ্টা শরৎচন্দ্রই হাওড়া জেলার কংগ্রেসি নেতা শরৎচন্দ্রের অপেক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য। এইজন্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু দশকের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে সাহিত্যের প্রমাণকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছি।

উল্লিখিত একই পর্বে সমাজবিজ্ঞানের সূত্র থেকে কী ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেটাও বিচার্য। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু 'হিন্দু সমাজের গড়ন' ১৩৫৪-১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখেন। এই গ্রন্থের শেষাংশে তিনি লিখেছেন, ''বাঙলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, যেখানে নদী অথবা খাল-বিলের প্রাদুর্ভাব, নমঃশূদ্র জাতির প্রাদুর্ভাব সেই সকল জায়গায় বেশি। হিন্দু সমাজ চিরদিন এই কৃষিজীবী জাতিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, এমন কি অস্পৃশ্য বলিয়া গ্রামের প্রান্তে ভিন্ন পল্লীতে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছে।...নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা অল্প নহে এবং ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলার এক এক বৃহৎ অংশে ইঁহাদের বিস্তৃত বসতি আছে। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা শিক্ষালাভের পরে বর্ণহিন্দুদের নিকট অপমানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নমঃশূদ্রগণ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক জাতি এবং গভর্ণমেন্টের বিশেষভাবে অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া দাবি জানান। নমঃশূদ্রগণ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের উত্তরে 'নমঃশূদ্র হিতৈষী সমিতি' প্রতিষ্ঠা এবং 'নমঃশূদ্র সুহৃদ', 'পতাকা' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে নমঃশূদ্রদের প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণ আছে। পরধর্ম সহনশীলতার জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের যে বৈশিষ্ট্যের গুণগান করেছেন বাস্তবে তার পরাকাষ্ঠা কতখানি সেটার সন্ধান করা। যে-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই ভেতরে ভেতরে অপমান অত্যাচার ঘৃণার ছড়াছড়ি তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোন্ চোখে দেখবে তা সহজেই অনুমেয়।' রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'বিশাল বাঙ্গলা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে ব্রাহ্মণ্য সমাজের আচার-বিধান ও বহুবিধ বিধিনিষেধের ফলে উচ্চবর্ণ হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ''ঘরে ঘরে উদারতর পারিবারিক নীতি ও অভিনব সামাজিক আচার-ব্যবহার অবিলম্বে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাঙ্গলার ১ কোটি ৫০ লক্ষ অবনত ও পতিত জাতি বাঙ্গলার কৃষ্টিকে নীচের দিকে টানিয়া অতলে ডুবাইয়া দিবে।'' রবীন্দ্রনাথ একই কথা ছন্দে বলেছিলেন, ''পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।''

চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে অধিকাংশেরই স্বভাব হল হাতটা একটু তুলে কানটা কানের জায়গাতেই আছে কিনা দেখবার কষ্টটা না করে প্রথমেই প্রবল ভাবাবেগে চিলের পেছনে ছোটা। সেজন্যে কেন দশকে দশকে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা বোঝবার কষ্ট না করে আমরা অনেকেই প্রথমে মুসলমানদের জন্মহার বৃদ্ধির কথা বলি। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে বাংলাভাষীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রমিক ধারায় হিন্দুধর্ম বর্জন করেছে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। যারা আনুষ্ঠানিকভাবে কলমা পড়ে মুসলমান হয়নি তাদেরও একাংশ জনগণনার সময় হিন্দু পরিচয় দিতে অস্বীকার করেছে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার পঞ্চম ভাগের প্রথম খণ্ডে বাংলা ও সিকিম অংশের প্রতিবেদনে এ ই পোর্টার এই বক্তব্যই লিপিবদ্ধ করেছেন যে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণই হল হিন্দুধর্ম বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে যান। তখন তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। গান্ধী তখন তাঁর মালিকান্দার বাড়িতেও গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন। এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন, ''নোয়াখালীতে তখন হিন্দু মুসলমানের ভিতরে অপ্রীতির ভাব চলছিল। একজন সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী যুবক এসে মহাত্মাজীকে সে কথা বলে। মহাত্মাজী তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই জিলায় হিন্দু মুসলমানের শতকরা এবং তাদের জমির হার কত? যুবকটি বলে, মুসলমান শতকরা ৭০ ভাগ এবং হিন্দু ৩০ ভাগ আর জমির মালিক হিন্দু শতকরা ৭০ ভাগ আর মুসলমান ৩০ ভাগ। মহাত্মাজী বলেন,

এইখানেই ত সংঘর্ষের কারণ। অর্থনৈতিক বৈষম্য যে মিলনের প্রবল অন্তরায় একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।" বর্ণভেদের মতো অর্থভেদও যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অন্যতম নির্ধারক এ কথাটা এখানে পরিষ্কার।

মহাত্মা গান্ধীর পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা শেষ করে ফিরে যাওয়ার অব্যবহিত পরে ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মোতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি স্থাপিত হয়। ওই বছরেই ১৬-১৭ ডিসেম্বর কলকাতাতে স্বরাজ্য পার্টি 'হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে। এই ঘোষণার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল স্বরাজ লাভের পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার সূত্রাবলী। এই প্যাক্টে ঘোষণা করা হয়, জনসংখ্যার ভিত্তিতে তথা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতা অনুসারে অর্থাৎ যথার্থ গণতান্ত্রিক উপায়ে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন লোক্যাল বডিতে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হবে। কিন্তু ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে শেষ দিনগুলিতে কোকনদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণের জন্যে চুক্তিকে সমর্থনের পরিবর্তে সমালোচনা করা হয়। কারণ ওই চুক্তি প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে অর্থ সাহায্যকারী জমিদার-মহাজনদের স্বার্থের পরিপন্থী হোক-না তারা সংখ্যালঘু তবু তারাই কংগ্রেসি কর্মসূচির যথার্থ সমর্থক। জাতীয় কংগ্রেসের এই নীতির ফলে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের গুরুত্ব নষ্ট হয় এবং বাংলার সংখ্যালঘু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত হিন্দুদের জয় হয়। এর প্রতিফলন দেখা যায় চাকরি বাকরি এবং অন্যান্য সমস্ত সমজাতীয় ক্ষেত্রে। অগত্যা চিত্তরঞ্জন বাধ্য হয়ে ঘোষণা করলেন যে স্বরাজ অর্জনের পরে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের সূত্রগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা হবে। বাঙালি হিন্দু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তদের কায়েমী স্বার্থের ক্ষমতা ও ভণ্ডামি হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের ব্যর্থতা থেকে প্রমাণিত হয়। তারপরে ১৯২৫-এর ১৬ জুন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে সব সম্ভাবনার অবসান।

এ জন্যেই 'এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুর্যাল সোসাইটি: টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল গ্রন্থে' জে এইচ ব্রুমফিল্ড মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু জমিদার মহাজন ও অভিজাতদের বাধার ফলে কংগ্রেসের পক্ষে কোন কৃষি-সংস্কার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কথা ভাবা সম্ভব হয়নি। এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'জমির মালিক' গ্রন্থে অতুলচন্দ্র গুপ্ত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে লেখেন, "মহাত্মার প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার চাষী, যাদের অধিকাংশ মুসলমান, কংগ্রেসের ডাকে প্রবল সাড়া দিয়েছিল, কংগ্রেসকে মনে করেছিল নিজের জিনিস। তেমন ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেনি। এই অভূতপূর্ব অবস্থার সুযোগেও বাংলার কংগ্রেস নেতারা বাংলার রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ও আন্দোলনকে ধর্মভেদের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার কোনো চেষ্টাই করেননি। নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের চিন্তা তাঁদের বুদ্ধিকে অন্ধ ও কর্মকে পঙ্গু করেছিল। বাংলার চাষীর অনায়াসলভ্য নেতৃত্ব বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিল। ১৯২৮ সালের আইন সংশোধন ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ হ'ল বাংলার আইন সভার কংগ্রেসি সভ্যদের কাছে চাষীর স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়।"

সেই যে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে এক নতুন জমিদারশ্রেণী এবং এই জমিদারদের আশ্রয়পুষ্ট জোতদার-মহাজন ও বাবু শ্রেণী সৃষ্টি করেন—তার ফলাফল পরবর্তী কালে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে বিশেষভাবে পরিচালনা করেছে। একদিকে বর্ণভেদ প্রথার ফলে হিন্দুসমাজের এক বিরাট অংশ অপমানিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দুসমাজ বর্জন করে মুসলিম সমাজের সামিল হয়ে গেছে এবং তার ফলে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলার জনবিন্যাসের রূপ ও স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার ফলে লর্ড কার্জনের পক্ষে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণামে বাংলার অর্থনীতিতে এক হিন্দু কায়েমী স্বার্থ বছরের পর বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে যার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি মুসলিম মানসে ক্রমশ সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি বাবুবিরোধী সাম্প্রদায়িকতা। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ পার্টির রাজনীতি কিংবা ফজলুল হকের কৃষকপ্রজা পার্টির প্রভাব বাঙালি মুসলিম সমাজকে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের রাজনীতি থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্যে নির্বাচন পর্যন্ত দূরে রাখতে পেরেছিল। কৃষকপ্রজা পার্টি সর্বৈব কৃষক ও প্রজাদের পার্টি ছিল না, তার মধ্যেও জোতদার ও মহাজনী উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কিন্তু মোটের উপর তা সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের নিয়েই গঠিত ছিল এবং একই সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবেই তার জনপ্রিয়তা ছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লিগের শোচনীয় পরাজয় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দিল যে যদিও একদা ব্রিটিশ ধাত্রীবিদ্যায় বাংলার মাটিতেই মুসলিম লিগের জন্ম হয়েছিল তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় লিগকে নিজেদের দল বলে মানেনি। নির্বাচনে কোনও দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ফলে যুক্ত মন্ত্রিসভা অনিবার্য হল। ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের কাছেই যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু জমিদারি স্বার্থের রক্ষক কংগ্রেস সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বাধ্য হয়ে ফজলুল হক সন্ধির হাত বাড়ালেন মুসলিম লিগের দিকে। হিন্দুত্বের প্রচারক সঙ্ঘের অন্যতম সংস্থা ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত 'স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম' গ্রন্থে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে অসাম্প্রদায়িক ফজলুল হকের সুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস বাংলায় মুসলিম লিগের ক্ষমতায় পৌঁছনোর পথ সুগম করেছিল।

এই যুক্ত মন্ত্রিসভা বিভিন্ন অঞ্চলে ঋণ-সালিশী বোর্ড গঠন, মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে মানি লেন্ডার্স আক্ট প্রণয়ন, বিদেশে গিয়ে কার্যশিক্ষার জন্যে উচ্চবৃত্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু জনহিতকর কাজ করলেও দুটি প্রশ্নে অগ্রসর হবার চেষ্টায় ভাঙনের মুখে পড়ে—একটি হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে এবং অপরটি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়টিকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠনের প্রশ্নে। এখানে প্রকাশ থাকে যে ১৯৩৭-এর নির্বাচন পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয়নি, তখন বিত্ত ও শিক্ষাই ছিল ভোটাধিকারের ভিত্তি। সুতরাং ফজলুল হক মন্ত্রিসভার হাত-পা বাঁধা ছিল পুরোপুরি সম্পন্ন ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসি রাজনীতি আর বাঙালি হিন্দু বাবুদের কায়েমী স্বার্থ ফজলুল হককে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের অনুগ্রহের সামনে। অতঃপর সাধারণ বাঙালির নেতা ফজলুল হককে আমরা দেখি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে। ২২ ডিসেম্বর ওই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন মহম্মদ আলি জিন্না এবং ২৩ ডিসেম্বর ফজলুল হক প্রস্তাব করেন, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the north-western and eastern zones of India should be grouped to constitute 'Independent States; in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. এই প্রস্তাবই ইতিহাসে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে প্রসিদ্ধ হয়।

এখানে উল্লেখ থাকে যে ১৯৩৮-৩৯ পর্বে ফজলুল হক যে দুটি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কাছ থেকে প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা পেয়েছিলেন স্বাধীনতার

পরে কংগ্রেস সরকার সে দুটো ক্ষেত্রেই ফজলুল হকের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়ে প্রমাণ করল যে ফজলুল হকের বিরুদ্ধতা করে তারা ভুল করেছিল। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। ইতিহাসের সত্য এই যে বাঙালি হিন্দু বাবুদের কায়েমী স্বার্থে সেদিন কংগ্রেসি নেতাগণ ফজলুল হকের জনমুখী পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের জনবিরোধী আচরণে হতাশ হয়ে ফজলুল হক আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে দশের স্বার্থকে যারা হিন্দু স্বার্থ আর মুসলমান স্বার্থ বলে ভাগ করে তারা দেশভাগ না করে ছাড়বে না।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা করেছিলেন তার পরে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন বাঙালি জীবনে নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯৩২ থেকে ৪২ পর্যন্ত দশ বছরে অন্নদাশঙ্কর রায় হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে যে-সব প্রবন্ধ লেখেন সেগুলি বর্তমানে তাঁর 'সমগ্র প্রবন্ধে'র প্রথম খণ্ডে সংকলিত এবং এই প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। কারণ সরকারি কর্মসূত্রে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে বাঙালি জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিচিত্র ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং তাঁর বহুবিদিত জিজ্ঞাসু মনীষা ও শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেই অভিজ্ঞতাগুলির গূঢ়তর তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন। 'ভারতীয় মুসলমান' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বিরোধটা তত্ত্বের নয়, স্বত্বের। এখানে তত্ত্বের মানে ধর্ম আর স্বত্বের মানে ভূমি। আবার ভূমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও নানা অধিকার অথবা জমি, ফসল, চাকরি, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ। এ সবের সঙ্গে সামাজিক সম্মানের প্রশ্নও অবিচ্ছেদ্য। সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী হিন্দুকে এক সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দাবি করে এসেছেন। হিন্দুরা যদি একটা জাতি হয় তা হলে মুসলমানরা কী ? বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানরা শুধুই একটা সম্প্রদায় হয়ে থেকেছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা আর সম্প্রদায়ের পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাইল না, তারাও হিন্দুজাতির মতো একটা জাতির পরিচয়ে অধিকার চাইল। এবং 'জন্মস্বত্ব' প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে ভারতীয় মুসলমানদের জাতি পরিচয় লাভের জন্যেই তার পাকিস্তান দাবি। কারণ জাতির জন্যে নিজের দেশ চাই। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান পক্ষ বলতে শুধু তাদেরই বোঝায় না যারা শরিয়তি মত কঠোরভাবে মেনে দিন যাপন করে, এদের মধ্যে তারাও আছে যারা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও দৃঢ় অর্থে হিন্দু নয়। 'আদিম পাপ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "তিন-চার হাজার বছরের অপমান যাদের মনের পরতে পরতে জমেছে সেই অস্পৃশ্য ইতর ঘৃণিত জাতেরা যখন জাগবে তখন তারা কিষাণ মজদুর স্তোকবাক্যে ভুলবে না।"

আবার বলছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক ধরে রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, নবগোপাল মিত্র, এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতিতত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণ শুরু করেন। তাঁদের কাছে জাতি শব্দটির অর্থ কখনই নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট ছিল না—বর্ণভেদ অর্থেও তাঁরা জাতি শব্দটা ব্যবহার করেছেন, আবার ইয়োরোপীয় জনগোষ্ঠী অর্থেও জাতি শব্দটা ব্যবহার করেছেন, আবার আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীদের এক বৃহৎ জনসমষ্টিকেও কৃষ্ণজাতি বলে বর্ণনা করেছেন। তবু সাধারণভাবে তাঁদের প্রভাবে অগ্রসর উচ্চবর্ণ শিক্ষিত ও মুখ্যত সম্পন্ন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মনে এক national pride বা জাতিগর্ব সৃষ্টি হয়। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে নাগপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের একটা মন্ত্র, একটাই ব্রত, একটা লক্ষ্য ছিল এবং সেটা হল, বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাষায়, We Hindus are a Nation by ourselves ঘোষণা করা। সাভারকরের যুক্তি অনুসরণ করে মহম্মদ আলি জিন্না দুবছর পরে লাহোরে ঘোষণা করলেন যে ভারতীয় মুসলমানরা শুধু একটা সম্প্রদায়মাত্র নয়, তারাও একটা জাতি এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস। কোনও জাতির জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশের প্রথম ও প্রধান শর্ত হল পায়ের নীচেকার মাটির উপর সম্পূর্ণ অধিকার তথা প্রভুত্ব। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের দাবি। ১৯৪০-এ ফজলুল হক যে-প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন তাতে কোথাও পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু এক বছর পরে ১৯৪১-এর ২৩ মার্চ ফজলুল হকের নিষেধ অমান্য করে মুসলিম লিগ কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে পাকিস্তান দিবস পালন করে। ক্ষুব্ধ ফজলুল হক তখন শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাহায্যে গঠন করেন প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশ পার্টি। এবং তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে চারজন লিগ মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। এবং তখন পঁচিশ জন কংগ্রেস বিধায়ক সমর্থন জানান ফজলুল হককে। হক মন্ত্রিসভা তখনকার মতো টিকে গেল।

ইতিমধ্যে ঘটল আগস্ট বিপ্লব। যুদ্ধকালীন ও বিপ্লবকালীন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট উগ্র দমননীতি চালালে ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদ করলে ক্রুদ্ধ গভর্নর পুরো হক মন্ত্রিসভাকেই বরখাস্ত করেন। গভর্নর হার্বার্ট বরাবরই ফজলুল হকের বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। কারণ ব্যক্তিগতভাবে হক ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র আর তাঁর দাদা শরৎচন্দ্রের বন্ধু, তার উপরে হক মন্ত্রিসভার দুজন সদস্য ছিলেন সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লকের সভ্য। ১৯৪৩-এর ২৯ মার্চ হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে গভর্নর হার্বার্ট মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে আহ্বান জানালেন খাজা নাজিমুদ্দিনকে। মনে করিয়ে দেওয়া যায়, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে এই নাজিমুদ্দিনকেই পটুয়াখালি কেন্দ্রে ফজলুল হক পরাস্ত করেছিলেন আর পটুয়াখালি ছিল খোদ নাজিমুদ্দিনের জমিদারি। গভর্নরের আহ্বানে নাজিমুদ্দিন ১৯৪৩-এর এপ্রিলে মন্ত্রিসভা গঠন করে ২৪ এপ্রিল কার্যভার গ্রহণ করেন। তার পরেই ভয়ংকর বেগে এসে পড়ল পঞ্চাশের মন্বন্তর, নেহরুর অনবদ্য ভাষায়—Famine came, ghostly, staggering, horrible beyond words. শুধু খাদ্যবস্তুর নয়, সুতিবস্ত্রেরও অস্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। বাজার থেকে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সুতিবস্ত্রও উধাও হয়ে গেল কেন ? খাবারের সঙ্গে কাপড়ের এই অস্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ কিসের প্রমাণ ? চাষীর সঙ্গে তাঁতীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ কি ? ইতিমধ্যে হার্বার্টের স্থলে গভর্নর হয়ে এসেছিলেন রাদারফোর্ড। ১৯৪৩-এর ৮ অক্টোবর অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে নতুন গভর্নর রাদারফোর্ড ঘোষণা করেন যে প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শহরে ও গ্রামের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অমানুষিক মুনাফার লোভে খাদ্যবস্তু ও সুতিবস্ত্রের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ওইসব আবশ্যকীয় পণ্য কালোবাজারে বিক্রি করছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর যে মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তর ছিল এ বিষয়ে কোনও নতুন প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু এই প্রশ্ন অবশ্যই করা যায় যে ওই মন্বন্তর সৃষ্টিকারীদের ধর্ম কী ছিল ? মন্বন্তর সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীদের ধর্মীয় পরিচয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিকদের রচনাবলী থেকে আমরা সহজেই জানতে পারি। তাঁদের সাহিত্য থেকে জানা সত্যটা কী ? ওই মন্বন্তর সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীরা ছিল প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা ওই ব্যবসায়ীদের দমন করার চেষ্টা করেছিল। তার ফল কী হল ? লিগ মন্ত্রিসভার সমর্থক লিগ বিধায়কদের অনেকেই বিক্রয় হয়ে গেলেন, নাজিমুদ্দিনের ভাষায়, 'মাড়োয়ারি আর হিন্দু মহাসভার ধনী ব্যবসায়ীদের' কাছে। তার ফলে পতন হল মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভার। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী, দুর্ভিক্ষ স্রষ্টাদের দমনপ্রয়াসী এবং তাদের উপর আঘাতকারী—এই তিনরকম ক্রিয়ার পেছনে আত্মগোপনকারীদের ধর্মীয় পরিচয় ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে

উঠল দেশবাসীর চোখের সামনে। গভর্নরের রেডিও ভাষণ, সমকালীন সাহিত্য এবং নাজিমুদ্দিনের লিখিত বক্তব্য থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে প্রধানত হিন্দু ব্যবসায়ীরাই মফস্বল বাংলায় খাবার ও কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলিম লিগ সরকার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে নাজিমুদ্দিন কথিত 'মাড়োয়ারি ও হিন্দু মহাসভার ধনী ব্যবসায়ীরা' অঢেল টাকা দিয়ে লিগ সরকারের পতন ঘটাল। সমস্ত ঘটনাবলীর কার্যকারণ পরম্পরা থেকে বাংলার সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারল যে মুসলিম লিগই সাধারণ মানুষের প্রকৃত উপকারী বন্ধু। 'বহু চেষ্টায় ও সংগ্রামে লিগ নেতারা যা পারেনি ঐ বণিক ও মহাজনরা তাদের আচরণ দিয়ে সেই কাজ করল—বাংলার সাধারণ মানুষের বৃহত্তর অংশকে লিগের পক্ষে যোগদানে বাধ্য করল। এই সত্যটি বোঝা উচিত যে বাংলায় দুর্ভিক্ষের করাল দিনগুলির অন্তরালে মুসলিম লিগের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে অমুসলমান ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

নাজিমুদ্দিনের লিগ মন্ত্রিসভার পতনের পর গভর্নর স্বয়ং বাংলার শাসনভার গ্রহণ করলেন। ওদিকে খোদ ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লেবার পার্টির অসামান্য সাফল্যে অ্যাটলির নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হল। তার পরেই জাপানে পরমাণু বোমাবর্ষণ ও জাপানের আত্মসমর্পণ। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন। আগের আইনসভায় কংগ্রেস বিধায়কের সংখ্যা ছিল ৩৬, এবার ওই সংখ্যা বেড়ে হল ৫৭ এবং মুসলিম লিগ বিধায়কের সংখ্যা আগের বার ছিল ২৫, এবার তাদেরও সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩০, পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের বিধায়ক সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেল। প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে সবচেয়ে চমকপ্রদ হল বাংলার ফলাফল। মন্বন্তরের আগে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লিগের অস্তিত্ব ছিল নগণ্য এবং প্রাধান্য ছিল কংগ্রেস আর কৃষক-প্রজা পার্টির, কিন্তু মন্বন্তরের ঠিক আগে গভর্নরের সৌজন্যে মুসলিম লিগ ক্ষমতার অধিকার পেল এবং তাদের সামান্য ক্ষমতা নিয়ে মফস্বলে মফস্বলে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে হিন্দু কায়েমী স্বার্থকে যেমন ঘোর শত্রুতে পরিণত করে তেমনই সাধারণ মানুষের বিশ্বাসভাজন হয়। হিন্দু কায়েমী স্বার্থ তখনকার মতো টাকার জোরে ওই লিগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটালেও শেষরক্ষা করতে পারেনি, কারণ পরবর্তী নির্বাচনে মুসলিম লিগই বাংলার বৃহত্তম দল হিসেবে সুরাবর্দির নেতৃত্বে প্রাদেশিক আইনসভা অধিকার করল। লিগের এই সাফল্যকে জিন্না বর্ণনা করলেন a plebiscite of the Muslims of India on Pakistan.

১৯৪৬-এর মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন এল ভারতবর্ষে এবং মিশনের প্রস্তাব গ্রহণে প্রথমে কংগ্রেস দ্বিধা করেছে আর মুসলিম লিগ সম্মত হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস যখন শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে তখন আবার লিগ পেছিয়ে এসেছে। অতঃপর মুসলিম লিগকে বাদ দিয়েই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হল কার্যত যা ছিল লিগবিহীন কংগ্রেস সরকার। একতরফা সরকার গঠিত হলে ক্ষুব্ধ বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি বললেন, We will see that no revenue is derived by such Central Government from Bengal and consider ourselves as a separate State having no connection with Centre. সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বাংলার বিরোধের সূচনা এইখানে। এই বিরোধের প্রথম প্রকাশ হল ১৬ আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডাইরেক্ট অ্যাকশন। এটা ইতিহাসের পরিহাস যে ওই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে বা হত্যার তাণ্ডবে পরিণত হয়। এই দাঙ্গা কতটা পূর্ব-পরিকল্পিত অথবা কতটা সরকার-পরিচালিত ছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ প্রচুর। কিন্তু দাঙ্গার পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পুলকিত চিত্তে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে লেখেন, In Calcutta the Hindus had the best of it. অতঃপর নোয়াখালির দাঙ্গা। 'মডার্ন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে সুমিত সরকার এবং 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর রায় নোয়াখালির দাঙ্গা সম্পর্কে বলেছেন যে এই দাঙ্গা ছিল সম্পত্তিঘটিত। এই দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ছিল ৩০০ যা কলকাতা বা বিহারের দাঙ্গার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। নোয়াখালিতে হত্যার সংখ্যাল্পতার কারণ দাঙ্গাকারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নারী লুণ্ঠন। সরকারি ও বেসরকারি অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে জমিদার ও মহাজনরা বহুকাল ধরে আইনের নামে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হস্তগত করে নিচ্ছিল এবং যখনই আইন সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে তখনই কায়েমী স্বার্থ বাধা দিয়েছে, ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন বঞ্চিত ও শোষিতরা মরিয়া হয়ে জমিদার ও মহাজনদের পাল্টা আক্রমণ করে। 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাস থেকে আরও জানা যায় যে মুসলিম লিগ থেকে বহিষ্কৃত গোলাম সরওয়ার ছিলেন নোয়াখালির মানুষ খ্যাপাবার সর্দার। যদিও 'ক্রান্তদর্শী' ইতিহাস নয়, উপন্যাস, তবুও দেশভাগের ইতিহাস অনুধাবনের জন্যে 'ক্রান্তদর্শী' ঐতিহাসিককে নতুন দৃষ্টিশক্তি দান করে এবং এই উপন্যাস বহু ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ।

১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ঐতিহাসিক ঘোষণা : ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে ভারতবাসীদের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। দুমাস পরে, এপ্রিল মাসে, হুগলি জেলার তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর জন্যে হিন্দুস্থান এবং বাংলাভাগের দাবির পুনরাবৃত্তি করলেন। বাংলা ভাগের দাবির বিরোধিতা করে সুরাবর্দি বললেন যে বাংলা ভাগ বাঙালির আত্মহত্যার সামিল হবে এবং দিল্লির সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, I am visualising an independent, undivided, sovereign Bengal in divided India. এবং শরৎচন্দ্র বসু এপ্রিল মাসে গঠন করলেন অল বেঙ্গল অ্যান্টি-পাকিস্তান অ্যান্ড অ্যান্টি-পার্টিশন কমিটি এবং এই কমিটির প্রেসিডেন্ট হলেন তিনি নিজে আর সেক্রেটারি হলেন কামিনীকুমার দত্ত। সুরাবর্দি, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশেম প্রমুখের অখণ্ড বাংলার স্বপ্নকে কীভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রমুখ নেতারা ভেঙে দিয়েছিলেন তার মূল্যবান ইতিহাস অমলেন্দু দে লিপিবদ্ধ করেছেন 'স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা, প্রয়াস ও পরিণতি' নামক গ্রন্থে।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রশ্নে ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তার প্রশ্ন যতটা অভিনিবেশ আকর্ষণ করেছে ভাষাশ্রয়ী জাতীয়তার প্রশ্ন ততটা করেনি। Paul R. Brass 'ল্যাঙ্গুয়েজ, রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন নর্থ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টিতে ভাষার ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' আর 'ইন্ডিয়া : এ পোলিগলোট নেশন অ্যান্ড দি লিঙ্গুইসটিক প্রবলেম' গ্রন্থ দুটিও বিশেষ বিবেচ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতা লাভের দশকে সুনীতিকুমার মনে করতেন যে হিন্দি ভাষাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতম ভাষা, কিন্তু সংবিধান গ্রহণের পর থেকে হিন্দিবাদীদের প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দামতায় তিনি ক্রমশ তাঁর পূর্বতন অবস্থান থেকে অপসরণ করতে থাকলেন। সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্বের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন।

উত্তর ভারতে একদা উর্দু ভাষাই ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভাষা। লালা লাজপত রায় যখন হিন্দি ভাষার প্রচারে নামেন তখন তাঁর পিতার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, কারণ তাঁর পিতা ছিলেন উর্দুভাষী এবং বিশ্বাস করতেন যে উর্দু হচ্ছে শরিফদের ভাষা আর হিন্দি বাজারের ভাষা। সেকালে উর্দুর কোনও সাম্প্রদায়িক রূপ ছিল না, যা ছিল তা একান্তই সাংস্কৃতিক। হিন্দি ভাষার প্রচারে স্বয়ং মুনসি প্রেমচাঁদ উর্দু ছেড়ে হিন্দিতে সাহিত্য সাধনা

শুরু করেন। ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম আর হিন্দি ভাষা হয়ে ওঠে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বাহন। হিন্দি সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করতে থাকলে উত্তর ভারতের মুসলমানরা এই ভেবে শঙ্কিত হতে থাকে যে স্বাধীনতা পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায় উর্দু ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে হিন্দি ভাষার প্লাবনে ও শাসনে। Paul R. Brass বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অপেক্ষা বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা যে পাকিস্তান সৃষ্টির-রাজনীতিতে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার কারণ তারা অনুভব করেছিল, হিন্দুপ্রধান ভারতে উর্দু ভাষা বিপন্ন হবে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বা উত্তর ভারতের মুসলমানদের ধর্ম রক্ষার জন্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমানরা আছে, কিন্তু উর্দু ভাষা রক্ষার জন্যে 'হিন্দুস্থানের' বাইরে কেউ নেই। পাকিস্তান কায়েম করাই হচ্ছে উর্দু ভাষাকে কায়েম করার একমাত্র তরিকা। পক্ষান্তরে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রবক্তারা হিন্দি ভাষা প্রবর্তনকেই মনে করে হিন্দুধর্ম রক্ষার একমাত্র পন্থা।

১৯৪৭-এ দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষীরাও দুভাগ হল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল উর্দু ভাষার তানাশাহী। ঠিক কথা যে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের উপর যতটা উর্দু ভাষার তানাশাহী চাপানো হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের উপর ততটা হিন্দি ভাষার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হিন্দি ভাষা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। সমস্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিন্দি বিভাগ সম্পূর্ণ আবশ্যিক। এবং এই সমস্ত কিছুর আর্থিক ব্যয় বহন করে সংবিধানভুক্ত অন্যান্য ভাষাভাষী জনসাধারণ যাদের মাতৃভাষার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার এক কানাকড়িও ব্যয় করে না। স্বয়ং অন্নদাশঙ্কর রায়, সত্যজিৎ রায়, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে কোনও স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বোঝা যায় যে এর কারণ হল তাঁর হিন্দি-বিরোধিতা।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অস্তিত্ব, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে, তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সত্তা কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এটা গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। সংবিধানের ১৭শ ভাগ অনুসারী অষ্টম তালিকাভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র দেবনাগরী লিপির হিন্দিকে যে-প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রচুর প্রশ্ন আছে। কেনই বা শুধু হিন্দিকে 'রাজভাষা' এবং তার লিপিকে 'দেবতা'র মাহাত্ম্য দেওয়া হবে? ৫০ বছরে সংবিধানের যদি ৬০-৭০ বার সংশোধন হতে পারে তা হলে 'রাজভাষার' প্রশ্নেই বা সংশোধন হবে না কেন? কেনই বা হিন্দির প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপুল ব্যয়ভার অন্যান্য ভাষাভাষীদের বহন করতে হবে? আর হিন্দি ভাষা যদি ভারতে বাস্তব সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি হয় তা হলে অন্যান্য ভাষা-শিক্ষা ও চর্চার সার্থকতাই বা কী? ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী দেশে একটিমাত্র আধুনিক ভাষাকে 'রাজভাষা' করলে জাতীয় সংহতিকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে কি? যে-বাঙালিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে তার পক্ষে বাংলা শেখা ও চর্চা সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থের অপব্যয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে উন্নতিকামী বাঙালির পক্ষে বাংলা ভাষা একটি অবাঞ্ছিত বোঝা। বাংলা ভাষা-শিক্ষা ও চর্চা যদি বাঙালির একাংশের উন্নতির অন্তরায় হয় তাহলে স্বভাবতই সেই অংশ বাঙালি হয়ে থাকবে না, হিন্দিভাষীদের সঙ্গে নিজেকে সর্বতোভাবে সনাক্ত করে সে তার বাঙালি পরিচয়কে বিস্মৃত হবে। পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের মধ্যে উন্নতিকামী অংশ আজ যে তার বাঙালি পরিচয় সম্বন্ধে বিব্রত এ বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ আছে কি? হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের বাঙালি পরিচয় ও বাঙালি সত্তার কোনও আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ আছে কিনা তা তলিয়ে বিচার করার বিষয়।

কিন্তু হিন্দিরাজ্যে বাংলা ভাষা যতই নিষ্পিষ্ট হোক, আমরা যারা বাঙালি বলে গৌরব বোধ করি, এবং বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে গর্ব বোধ করি, আমরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই বাংলাদেশের জন্যে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ও স্বীকৃতিতে। হিন্দির দাপটে পশ্চিম বাংলার মানুষ যদি বাংলা ভাষাকে বিস্মৃত হয় তাহলেও বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার তথা বাঙালির পরিচয় অক্ষুণ্ণ থাকবে—একপক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিতের জন্যে, অন্যপক্ষে তেমনই রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্বীকৃত বাংলাদেশের ভাষা হিসেবে। বাংলাদেশের উদ্ভবই হয়েছে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবি থেকে। সেখানেও, পূর্ব পাকিস্তানের পর্বে, উর্দুশাহীর দাপটে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল। বাংলা ভাষার জন্যে সংগ্রামে উর্দুর তানাশাহী ভেঙে যাওয়ার দৃষ্টান্তটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ উর্দুশাহীর সেনাবাহিনী বাংলাভাষীদের উপর যে-আক্রমণ শুরু করল তা চূড়ান্ত পরিণতি পেল ১৬ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কাছে তাদের আত্মসমর্পণে। বাংলা ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের থেকে জন্ম লাভ করল এক নতুন দেশ। ধর্ম তাকে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করলেও ভাষা তাকে বিশ্বের মাঝে দিয়েছে স্বতন্ত্র মহিমা, নিজস্ব পরিচয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় বাঙালির পরিচয় কি দিয়ে হবে? ভাষা ছাড়া আর কোন পরিচয় আছে তার? অথচ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তার বাংলা ভাষা-শিক্ষা ও চর্চার কোনও মূল্য আছে কি? আবার বাংলাভাষীরূপে তার বাঙালি সত্তা রক্ষা করতে গেলে তা কি জাতীয় সংহতির বিরোধিতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের বা স্বতন্ত্রতার পরিপোষণ করা হবে না? নতুন শতাব্দীতে এসে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি কি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি? অথচ ভারতীয় বাঙালিরও একটা স্বতন্ত্র মহিমা আছে—বাংলাদেশের যে বাঙালি তার বেলায় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হল ইসলাম, কিন্তু ভারতীয় বাঙালির বেলায় ধর্ম হল ব্যক্তিগত ব্যাপার, হিন্দুই হোক কী মুসলমানই হোক, তার প্রকাশ্য ধর্ম হল মানুষের ধর্ম।

অনিল বিশ্বাস

আজি হতে শতবর্ষ আগে : বঙ্গমনীষার শিক্ষাচিন্তার আলোয়

“একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি : দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলে তখন সে কহিল, ‘আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।”

একশো বৎসর আগে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধটি। প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে একই বৎসরে লেখাটি রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসুর মতো তিনজন বিশিষ্ট মনীষী রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি পত্রাকারে অভিনন্দিত করেন।

‘সাধনা’ পত্রিকার ১৩০০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় ‘শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি’ নামে প্রকাশিত রচনায় এই পত্রগুলির উল্লেখ ছিল, চৈত্র ১৩৯৯ সংখ্যাতেই পত্র তিনটি উদ্ধৃত ও আলোচিত হয়েছিল।

১৪০০ সাল যখন শেষ হতে চলেছে অর্থাৎ চতুর্দশ বঙ্গীয় শতাব্দী এবং ১৪০১ সালের বৈশাখ অর্থাৎ বঙ্গীয় পঞ্চদশ শতাব্দী যখন আসন্ন, তখন ঠিক একশো বৎসর আগে, ১৩০০ সালে, বঙ্গের তথা ভারতের অগ্রণী মনীষী-ত্রয়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে সংস্কৃতি-পরিবেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঠিক কোন্ চিন্তাধারাকে প্রায় সর্বৈব সমর্থন জানিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন, সে কথা আজ শতবর্ষ পরে দেশের শিক্ষানুরাগী মানুষমাত্রেরই জেনে রাখা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। শুধু পাঠ নয়, নবাগত বঙ্গীয় শতাব্দীতে আমাদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগী প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ সহ বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস ও আনন্দমোহন : এ দেশের মনীষী-চতুষ্টয় আমাদের জনসাধারণের জন্য যে ধরনের শিক্ষা ও জীবনাদর্শ কাঙ্ক্ষণীয় বলে মনে করেছিলেন, সেই লক্ষ্যের অভিমুখী আমরা হতে পেরেছি কি না, এবং আমাদের অর্জিত সাফল্যই বা কতটুকু। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার সচেতন পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু এখানে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য এবং সেই বক্তব্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত মনীষী-ত্রয়ীর অভিমতের প্রতি পঞ্চদশ বঙ্গীয় শতাব্দীর নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাইছি।

রবীন্দ্রনাথের ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ এবং সেই প্রবন্ধে বিভিন্ন গুরুতর প্রবন্ধের উপস্থাপনা লক্ষণীয়। প্রবন্ধটির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যের একটি সারাৎসার উপস্থাপিত করেছেন। সেইগুলি সূত্রাকারে এই রকম—

(১) আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সঙ্গে ভাব পাই না,

(২) বয়সকালে ঠিক তার বিপরীতটাই ঘটে, ভাব যখন পেলাম, তখন আবার ভাষা খুঁজে পাই না,

(৩) ভাষা ও ভাবের শিক্ষায় যুগপৎ সমৃদ্ধ হতে না পারায় পাশ্চাত্য চিন্তাধারার উৎকৃষ্ট দিকগুলি আত্মস্থ করতে পারি না, ফলে শিক্ষিত মানুষও সেগুলির প্রকৃত সমাদর করতে পারেন না,

(৪) ভাব বা ধারণাগুলির সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি অধিকার স্থাপন করতে না-পারায়, মাতৃভাষার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যায়, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা তৈরি হয়,

(৫) মাতৃভাষা জানেন না, এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা হয় বলেই তাঁরা তখন বলেন, মাতৃভাষায় কোনও ভাব প্রকাশ করা যায় না, এ ভাষা শিক্ষিত মনের উপযোগী নয়। অর্থাৎ, আঙুর আয়ত্তের অতীত হলে যেমন তা টক বলেই **লজ্জা-নিবারণ** করে মানুষ।

এই সমগ্র বক্তব্যটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করেছিলেন—‘যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায় আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি তখনও ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাচ্ছি না।’

স্বভাবতই দেশ ও দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং সামগ্রিক অনগ্রসরতা প্রত্যেক জাতীয় মনীষীকে বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিদায়ী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। কেননা দেশ যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশমাত্র। ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধটি বস্তুত বঙ্গীয় ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের রচনা। তাই আমাদের রচনাটির সূচনায় উদ্ধৃত গল্পাংশটির ‘দরিদ্র ব্যক্তি’ ‘দেবতার’ কাছে যে প্রার্থনা করেছিল, তারই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।’

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পাঠান্তে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে **জানিয়েছিলেন,** ‘পৌষ মাসের ‘সাধনা’য় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের

ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।'

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'আপনার শিক্ষার হেরফের নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই-একটি কথা (যথা, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজন সভ্য বাংলাভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহা গৃহীত হয় নাই.........

এ বিষয়ে গুরুদাস দুটি পরামর্শও দিয়েছিলেন। প্রথমত, বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদি যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন যেন মাতৃভাষার শিক্ষা ও অনুশীলনে উৎসাহ দেয়। কোনও কোনও সভায় কাজকর্ম ও বক্তৃতাদি ইংরেজিতে করা হয়তো প্রয়োজন, একশো বৎসর আগে গুরুদাস লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাভাষাতেই সভাসমিতির কাজ করা যায় শুধু নয়, সেটাই শোভন ও সঙ্গত।

আনন্দমোহন বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন,—

'পৌষ মাসের 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত; সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই। প্রবন্ধটি যেমন গুরুতর **বিষয়সম্বন্ধীয়,** ভাবগুণে এবং ভাষালালিত্যে আমার তেমনি মধুর ও উপাদেয় হইয়াছে।'

মাতৃভাষার ব্যবহার ও অনুশীলন ব্যাপক করার জন্য আনন্দমোহন তাঁর চিঠিতে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেন—

(১) বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ভাষা এবং নিয়মাদি পরিবর্তন করতে পারে, (কিন্তু এই বিষয়ে বাধা আসে মাতৃভাষাভাষীদের কাছ থেকেই),

(২) এ বিষয়ে জনমত গঠনের প্রয়োজন,

'সাধনা' পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে যা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

'উক্ত তিন পত্র হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, সিন্ডিকেটের সভ্যগণ বাঙালির শিক্ষায় বাংলার কোনো উপযোগিতা স্বীকার করেন না এবং আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই প্রধানত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। ......দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও দায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।'

সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরও ছিল, 'সহজ কথা না বুঝলে তার মতো কঠিন আর কিছু হতে পারে না। কেননা, কঠিন কথা না বুঝলে সহজ কথার সাহায্যে বোঝানো যায়, কিন্তু সহজ কথা না বুঝলে আর উপায় থাকে না।'

বঙ্গীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ মুহূর্তে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের বঙ্গীয় মনীষীর শিক্ষাচিন্তার যুগোচিত পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক মনে করি।

অতীশ দাশগুপ্ত

বিস্মৃতপ্রায় সাধনার উত্তরাধিকার

বঙ্গাব্দের গত দুই শতাব্দীর বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের আলোচনায় যে প্রসঙ্গটি সাধারণত অগ্রাধিকার পায় তা হল খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের শিক্ষিত নগরবাসী মধ্যবিত্তের চিন্তার জগতে 'নবজাগরণ', যার প্রভাব বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অনুভূত ও জীবন্ত। সেই বহু-গবেষিত নবজাগরণের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অধ্যায় আমাদের এখনও আচ্ছন্ন করে। নবজাগরণের মনীষীবৃন্দ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার মধ্যে যুক্তিহীন শাস্ত্রীয় আচার-কুসংস্কারের পরিবর্তে ধর্মীয় সমন্বয়বাদের উপস্থাপনার প্রসঙ্গটি অন্যতম। কিন্তু যে তথ্যটি আমরা সচরাচর স্মরণে রাখি না তা হল কুসংস্কার-বর্জিত ধর্মীয় সমন্বয়বাদের সাধনার সূত্রপাত বাংলায় এবং ভারতের অন্যত্র উন্মেষিত হয়েছিল উনিশ শতকের বহু পূর্বে এবং সেই সাধনার ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের বাইরে প্রচারবিমুখ গ্রামীণ সমাজের বৃহত্তর জনজীবনে। বাংলার নবজাগরণের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি কেবল এই অসামান্য লোকায়ত সংস্কৃতির ধারার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। আজ যে ইংরেজি-শিক্ষিত সচ্ছল বাঙালি-সমাজ কলকাতা মহানগরীতে ১৪০০ বঙ্গাব্দের আবাহনে উচ্ছ্বসিত, তাঁদের অধিকাংশের হয়ত স্মরণেই নেই যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতিমোহন সেনের গভীরতম দর্শনের জগতে কী দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল ওই লোকায়ত নির্লিপ্ত ধর্মীয় সমন্বয়বাদের ধারা। আমরা অনেকে এখনও অজ্ঞাত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এবং শশিভূষণ দাশগুপ্তের শ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে কী দুষ্প্রাপ্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে। সেই বিশাল আকর-তথ্যের সম্ভার বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষিত করা সম্ভব নয়। বহু শতাব্দীর সমন্বয়বাদী সাধনার যে বিস্মৃতপ্রায় উত্তরাধিকার বঙ্গাব্দের বিগত দুই শতকে সজীব থেকে বর্তমানেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সাধ্যমত উপস্থিত করার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সূত্র ধরেই শুরু করা যাক। ক্ষিতিমোহন সেন রচিত 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত ১৯৩০ সালে) প্রামাণিক গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরের জিনিস। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজ শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। ভারতের এই আন্তরিক সাধনার ধারাবাহিক রূপ যদি আমরা স্পষ্ট পেতুম তা হলে ভারতের প্রাণবান্ ইতিহাস যে কোন্‌খানে তা আমাদের গোচর হতে পারত। তা হলে জানা যেত ভারতবর্ষ যুগে যুগে কী লক্ষ্য করে চলেছে এবং সেই লক্ষ্যসাধনে কী পরিমাণে তার সিদ্ধি। সুহৃদ্বর ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে তার ভিন্ন ভিন্ন শাখায়-প্রশাখায় অনুসরণ করে এসেছেন। আমরা দেখতে পেয়েছি এই প্রবাহটি গভীররূপে সত্য এবং একান্তভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয়। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সাধনার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে ক্ষিতিমোহনের এই রচনায় তাকে আবিষ্কার করা গেল।"

এই লোকায়ত উত্তরাধিকারকে দেশের মানুষ 'সহজিয়া' সাধনার ঐতিহ্য হিসেবে পরিগণিত করেন, যার একটি নির্দিষ্ট শাখা বাংলার বাউলদের জীবন-দর্শন ও সংস্কৃতির মাঝ দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি নিরন্তর প্রবাহিত। বাউলদের সহজিয়া দর্শনের বিষয়ে ক্ষিতিমোহন সেন যে গবেষণা-নির্ভর প্রবন্ধটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেটি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'The Religion of Man' গ্রন্থের পরিশিষ্টে। সহজিয়া বাউলদের প্রভাব মূল গ্রন্থেও প্রতিফলিত হয়েছিল। গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে (যার শিরোনাম 'The Man of My Heart') রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, যখন তিনি আধ্যাত্মিক সত্যের অন্বেষণে তাঁর সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে উন্মুখ, তখন "One day I chanced to hear a song from a beggar belonging to the Bāul sect of Bengal...What struck me in this simple song was a religious expression that was neither grossly concrete,...nor metaphysical in its rarefied transcendentalism. At the same time it was alive with an emotional sincerity. It spoke of an intense yearning of the heart for the devine which is in Man and not in the temple, or scriptures, in images and symbols. The worshipper addresses his songs to Man the ideal..." বাউল গানের বিশিষ্ট সংকলক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (৩১শে চৈত্র): "মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাউল-সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল, আমিও তাঁকে অন্তরের

সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি। আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউল-দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল-সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনও এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"

বাংলায় সহজিয়া ঐতিহ্যের উন্মেষ প্রাগার্য যুগে বাঙালির গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব যোগ ও তন্ত্রসাধনার সূত্রে। যদিও অথর্ববেদে এই সাধনার বিক্ষিপ্ত স্বীকৃতি রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সহজিয়া ধর্ম বাংলায় নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল পালযুগে 'সহজযান' বৌদ্ধধর্মের প্রসারের মাধ্যমে, যার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান উত্তরাধিকারের কিছু প্রভেদ ছিল। ওই সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রথম সাংস্কৃতিক প্রকাশ ঘটে আজ থেকে এক হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার আদিস্রষ্টা সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদে। সিদ্ধাচার্যরা উচ্চবর্ণের অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, তাঁদের যোগাযোগ ছিল বাংলা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে। চর্যাপদের সুপ্রাচীন দোঁহাগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথমে সংগ্রহ করে এনেছিলেন নেপালে প্রাপ্ত পুঁথি থেকে। অধিকতর সংখ্যায় আরও সমৃদ্ধ দোঁহাকোষ তিব্বত থেকে এনেছিলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। চর্যাপদে যে 'সহজ' সাধনার প্রকাশ ঘটেছিল তা হিন্দু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সব শৃঙ্খল ও যাবতীয় লোকাচার পরিত্যাগ করতে উন্মুখ ছিল। ততদিনে হিন্দুধর্মের শ্রৌত পর্যায় সমাপ্ত হয়ে রক্ষণশীল অসহিষ্ণু স্মার্ত পর্যায় শুরু হয়েছে যা বাংলার ও পূর্ব ভারতের সহজিয়া কৃষক সমাজকে জাতপাতের বিভাজনে বিভক্ত করতে উদ্যত ছিল। তার বিরুদ্ধে সিদ্ধাচার্য সরহ যা লিখেছিলেন তার পরিশ্রুত রূপ আধুনিক বাংলায় মোটামুটি এ রকম দাঁড়াবে:

"ব্রাহ্মণরা আসলে ভীতু ও মূর্খ,
ওরা অর্থহীন চতুর্বেদ আওড়ায়,
মাটি জল আর কুশ নিয়ে
ওরা বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে।
কী হবে প্রদীপে? নৈবেদ্যেরই বা কী প্রয়োজন?
কী লাভ মন্ত্র আউড়ে?
তীর্থ আর তপোবনে গিয়েই বা কী হবে?
মোক্ষ আসে কি শুধু অবগাহনে?...
নয় মন্ত্র, নয় তন্ত্র, নয় ধ্যান—
এ সবই ছলনা মাত্র।
হে মূর্খ, স্বভাবে যা শুদ্ধ
সমাধিতে আবিল কোরো না সেই মন।
কষ্ট দিও না নিজেকে, থাকো সুখে।
...'এই আপন, ঐ পর'—এ ভাবে ভাবে যে,
বদ্ধ থাকে সে বিনা বন্ধনেই
মুক্ত করতে ব্যর্থ সে নিজেকে।"

চর্যাকারদের নিজস্ব ভাষায়:

"জাহের বান চিহ্নরূপ না জানী।
সো কহসে আগম বেত্রঁ বখানী।"

অর্থাৎ, 'যাঁর চিহ্ন, বর্ণ এবং রূপই জানা যায় না, তাঁর কী ব্যাখ্যা দেহতত্ত্বে কে করবেন?' চর্যাকারের তাই স্পষ্ট উত্তর:

"অপনা অপা বুঝ তু নিঅমন"।

অর্থাৎ, 'আপনি বুঝে নাও আপনাকে নিজের চিন্তার দ্বারা'।

সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় ছিল চর্যাপদের মুক্তি-অভিলাষী অভিব্যক্তি:

"এবং কার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বি আপক বক্ষেণ তোড়িউ।"

আধুনিক বাংলায় এর রূপ হবে:

'আমি ভেঙেছি বাধার তোরণ
যত শৃঙ্খল বাধা করেছি হরণ।'

বাংলায় ও অন্যত্র সহজিয়া সাধনার সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য সার্থকতা লাভ করল দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী পর্যায়ে তুর্ক-আফগান ও মুঘল যুগে। মধ্যযুগে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার ধারা দুটি স্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল: সগুণ ও নির্গুণ। বৈষ্ণব সহজিয়া ভক্তিবাদের প্রকাশ ঘটল সগুণ ধারায়, যার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাদের অন্যতম ছিলেন চৈতন্যদেব। আর নির্গুণ সহজ পথের পথিক হলেন বাংলার বাউল ও উত্তর ভারতের সন্ত-সাধকরা; সন্তকবিদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কবীর ও তাঁর শিষ্য দাদূ ও নানক। এই নির্গুণ উপাসকরা সহজিয়া সাধনার উত্তরাধিকারকে নির্দিষ্টভাবে সমৃদ্ধ করলেন হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ের প্রশ্নে। ওই ঐতিহাসিক উত্তরণ সাধিত হল নির্গুণ সহজিয়া ঐতিহ্যের সঙ্গে সুফী দর্শনের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ায়। বাংলার বাউল ও উত্তর ভারতের সন্তকবিরা, একদিকে, ধর্মীয় সমন্বয়বাদ ও সহিষ্ণুতার গান গেয়েছেন এবং একই সঙ্গে, অন্যদিকে, অর্থহীন পৌত্তলিকতা, মন্দির-মসজিদের প্রাতিষ্ঠানিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে।

নিরক্ষর কবীর গান বেঁধেছিলেন:

"জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ
ঔর মুলুক কেহিকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
বাহর করে কো হেরা।"

অর্থাৎ, 'খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে বাকি জগৎটা কার? তীর্থে মূর্তিতেই যদি রাম থাকেন তবে তার বাইরে বিস্তীর্ণ সমাজকে দেখে কে?'

"মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে
মৈঁ তো তেরে পাস মেঁ।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ
না কাবে কৈলাস মেঁ।"

অর্থাৎ, 'ভগবান বলেন, আমাকে কেন বৃথা বাইরে খুঁজে মরিস? আমি তো তোর পাশেই আছি। আমি না থাকি দেবালয়ে, না থাকি মসজিদে, না থাকি কাবায়, না কৈলাসে আমার স্থান।'

কবীর আরও বলেছিলেন:

"হিন্দু কহু তো মৈঁ নহীঁ মুসলমান ভী নাহিঁ।
পাঁচ তত্ত্বকী পূতলা গৈবী খেলে মাহিঁ॥"

অর্থাৎ, 'আমাকে যদি হিন্দু বলতে চাও, তবে আমি হিন্দু নই। আমি মুসলমানও নই। তবে কী আমার পরিচয়? পাঁচ তত্ত্বের এই শরীর, তার মধ্যে অনির্বচনীয় নিগূঢ় পুরুষ করছেন লীলা, এইটুকু পরিচয় ছাড়া আর কী বলতে পারি?'

বাংলার সহজিয়া মদন বাউল (যাঁর জন্ম মুসলমান গৃহে) গেয়েছিলেন:

"তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই
চলতে না পাই,
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে"॥

বাউলরা বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসকে শ্রদ্ধা করতেন, কারণ তিনি 'সহজ' সাধনার দর্শনকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব 'সহজ' পথ খুঁজে পাননি। চণ্ডীদাস পেরেছিলেন:

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে, সহজ জানিবে কে?
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার, সহজ জেনেছে সে।"

চণ্ডীদাসের যে দুটি পরিচিত পঙ্ক্তি রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেনের রচনায় বারংবার উল্লেখিত হয়েছে তা হল:

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাতের পরে জটিল সামাজিক পরিবেশের নতুন আবর্তে সহজিয়া সাধনার সমন্বয়বাদী ধারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের ইংরেজি-শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে সহিষ্ণুতার আদর্শের একটি উচ্চ মঞ্চ স্থাপন করেছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু ধর্মীয় সমন্বয়বাদের প্রসঙ্গে নবজাগরণের দুটি সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথমত, মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের অধিকাংশ এই নবজাগরণের শরিক হননি এবং, দ্বিতীয়ত, নবজাগরণ সীমিত ছিল নগরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে, যার ফলে বাংলার বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের সুপ্রাচীন সহজিয়া সমন্বয়বাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে বিপুল পরিমাণে শূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং গরিব মুসলমান বাউল ও ফকিরদের সহজিয়া ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণশাসিত রক্ষণশীল হিন্দু এবং কট্টরপন্থী মুসলমান সমাজের আওতার বাইরে চলে আসতে শুরু করেছিলেন। লালন শাহ্ থেকে আরম্ভ করে বহু উদাসীন ধর্মগুরু তাঁদের সৎ জীবন-যাপন ও সমন্বয়বাদী চিন্তাধারায় অনেক সাধারণ মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাঁদের লোকায়ত সহজিয়া ধর্মের পরিবেশে।

বাউলদের উপরে প্রথম আঘাত আসতে শুরু করল কট্টরপন্থী শরিয়তবাদী মৌলানাদের কাছ থেকে। সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপট অবশ্য নির্মিত হতে শুরু করেছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী মহাবিদ্রোহের পরবর্তী দশকগুলিতে। মহাবিদ্রোহ নির্বাপিত হওয়ার পরে ঔপনিবেশিক শোষণ সুদৃঢ় করার তাগিদে ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ইংরেজ শাসকরা ধর্মীয় বিভাজনের মারাত্মক কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের চক্রান্তমূলক কর্মসূচির সূত্রপাত ঘটেছিল কিছু নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সূত্র ধরে। ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায়ে নতুন জমিদারি ও প্রশাসনিক চাকুরির ক্ষেত্রে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী মুসলমান মধ্যবিত্তের তুলনায় বিভিন্ন ধরনের সুবিধা অর্জন করেছিল। নতুন রাজত্বে ইংরেজি ভাষা যখন ফারসির স্থান অধিগ্রহণ করল, তখন থেকে মুসলমান মধ্যবিত্তের পিছিয়ে পড়া শুরু হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদেরই সৃষ্ট এই আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে ব্যবহার করতে তৎপর হল বিভাজনের নীতি ফলপ্রসূ করার স্বার্থে। তাদের প্রত্যক্ষ মদতে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের নেতৃত্বে আলিগড় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটল। ইংরেজদের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সংঘর্ষের সূচনা করা এবং গ্রামীণ সমাজে সমন্বয়বাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে ব্যাহত করা।

বাংলায় ইসলামের কট্টর মৌলবাদীরা তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিল সমন্বয়বাদী সহজিয়া বাউল সাধকদের। মৌলানারা জোর দিয়েছিল বাউলদের গান গাওয়ার বিরুদ্ধে। মোল্লাদের সাকরেদরা বাউল-ফকিরদের গানের আসরে দাঙ্গা বাধাত এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করত। রংপুরের মৌলানা রেয়াজউদ্দীন আহমেদ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বাউল ধ্বংসের ফৎওয়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছিলেন, "এই বাউল বা ন্যাড়া মত মোছলমান হইতে দূরীভূত করার জন্য বঙ্গের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহল্যা জুমা ও জমাতে এক একটি কমিটি দিয়া স্থির করিয়া যতদিন পর্যন্ত বঙ্গের কোন স্থানেও একটি বাউল বা ন্যাড়া মোছলমানের নামে পরিচয় দিয়া মোছলমানের দরবেশ ফকির বলিয়া দাবী করিতে থাকিবে ততদিন ঐ কমিটি অতি তেজ ও তীব্রভাবে পরিচালনা করিতে হইবে। মোট কথা মোছলমানের কর্তব্য এই যে, মোছলমান সমাজকে বাউল ন্যাড়া মত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না করা পর্যন্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে।" ইসলামের মৌলবাদীদের সঙ্গে অপপ্রচারের চক্রান্তে একইভাবে তৎপরতা দেখিয়েছিল কলকাতার গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিভূরা। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার নাগরিক আবর্তে দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালীতে সহজিয়াদের গালমন্দ করেছিলেন, জেলে পাড়ায় সং বেরিয়েছিল একই ধরনের অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে। এত সব চক্রান্ত সত্ত্বেও, উপরোক্ত 'বাউল ধ্বংসের ফৎওয়া' বইটি থেকে জানা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অবিভক্ত বাংলায় ষাট-সত্তর লক্ষ বাউল-ফকির নিয়মিত প্রচাররত ছিলেন গ্রামীণ সমাজে তাঁদের সহজিয়া গান পরিবেশনের মাধ্যমে।

বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা ও অনীহার সম্মুখীন হয়েও উনিশ শতকের শেষে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাউলরা তাঁদের সহজিয়া ঐতিহ্যের কোন বিশেষ দিকগুলি বাংলার গ্রামীণ সমাজে বারংবার তুলে ধরতে ব্রতী হয়েছিলেন? তাঁদের গানের কোন বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একাত্ম হতে চেয়েছিলেন? বাউলরা বাংলার সহজিয়া সাধনার পূর্ববর্তী ঐতিহ্যকে অর্থাৎ বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়া উভয় ধারাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছিলেন আধ্যাত্মিক দর্শনের গভীরতার প্রশ্নে। বৌদ্ধ সহজিয়ারা 'মহাসুখ'-এর তত্ত্বকে সহজ পন্থার লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন পুরুষ ও নারীর 'উপায়' ও 'প্রজ্ঞা'র দ্বৈত ভাবকে সম্মিলিত করে। তাঁরা জাতিবর্ণের বিভেদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাস্ত্রীয় শাসন উপেক্ষা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের 'মহাসুখ' অর্জনের পথটি, সিদ্ধাচার্য চর্যাকারদের বিশুদ্ধ প্রয়াসের অঙ্গীকার সত্ত্বেও, বড় বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর তান্ত্রিক পদ্ধতির উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই পদ্ধতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নীত করেন সগুণ ভক্তিবাদী প্রেমের দর্শনে। কিন্তু তাঁদের সহজপন্থাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমিত থাকল রাধা ও কৃষ্ণের লীলার স্তরে যা আসলে পুরুষ ও নারীর প্রেমের উপর দৈবভাব আরোপের এক পরিশীলিত দর্শনরূপে পরিগণিত হতে পারে, মানুষের একান্ত ঈশ্বরনৈকট্যের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা সেখানে কার্যত অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে, বাউলরা আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারলেন। তাঁদের দর্শনে চির-আকাঙ্ক্ষিত ঈশ্বরের সান্নিধ্যই একমাত্র সাধনা এবং সেই ঈশ্বর প্রতিভাত হয়েছেন বাউল সাধকের অন্তরতম চৈতন্যের গভীরে 'মনের মানুষ' রূপে, যাঁকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সাধক নিজের মনের গঠন ও চেতনায় অনির্বচনীয় উত্তরণের সম্ভাবনা অনুভব করেন। এই আত্মোপলব্ধির দার্শনিক প্রেক্ষিতেই বাউলরা নিজেদের মন ও দেহকে পবিত্র ও সংযত-সুন্দর রাখার প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাঁরা বাইরের মন্দির-মসজিদ বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য মনে করেন। সেই 'মনের মানুষ'-এর তত্ত্বের সহজ উপস্থাপনা রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন বাউলের গানে:

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥"

বাউল গানেই তার উত্তর পেয়েছিলেন :

"তোরই ভিতর অতল সাগর।"

অথবা,

"মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।"

আমরা আগে বলেছি, বাউলের দর্শন সহজিয়া সাধনার সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যকে আরও পরিণত করেছিল ইসলামের সুফী দর্শনের সঙ্গে সম্মিলন রচনা করে। 'মনের মানুষ'-এর তত্ত্বের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আলি রাজা প্রণীত সুফী দর্শনের 'জ্ঞান-সাগর' আকর-গ্রন্থে। সৃষ্টিকর্তা বা 'আল্-হক্'-এর নিজের প্রেমের প্রকাশ এবং আত্মোপলব্ধির জন্য মানবচৈতন্যে বা 'রুহ্'-এর অস্তিত্বে তাঁর আগমন এবং আত্মপ্রকাশের পর 'রুহ্'-এর আবার 'আল্-হক্'-এ মিলিয়ে যাওয়া—এ যেন এক 'অচিন পাখি'র মানুষের মনের পিঞ্জরে সাময়িক অবস্থান এবং তারপরে উড়ে যাওয়া অন্তহীন আকাশে। 'মনের মানুষ'-এর মতোই 'অচিন পাখি' বাউল সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ এবং এই প্রসঙ্গটি এসেছে সুফী ফকিরদের আত্মোপলব্ধির গভীরতর দর্শন থেকে। বাউল-গানে তাই বারংবার ফিরে আসে 'অচিন পাখি'-র অনুষঙ্গ :

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।"

'অচিন পাখি'র প্রসঙ্গটি আর একটি বাউল-গানে ভিন্ন অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয় ; বাউল মনের সাবলীল গতি ওই 'পাখি'র মতোই স্বাধীন :

"আমরা পাখির জাত।
আমরা হাঁইট্যা চলার ভাও জানিনা,
আমাদের উড়্যা চলার ধাত॥"

সুফী দর্শনের সঙ্গে উপনিষদের উত্তর-মীমাংসার যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় 'আল্-হক্' ও 'রুহ্'-এর সঙ্গে যথাক্রমে 'পরমাত্মা' ও 'জীবাত্মা'র সাদৃশ্যের মাধ্যমে, নির্গুণ আধ্যাত্মিক ভক্তির মরমিয়া স্পর্শে তা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সহজিয়া বাউলের 'মনের মানুষ' ও 'অচিন পাখি'র অন্বেষণে আত্মোপলব্ধির আকুল সাধনায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে লিখেছেন "সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে : আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাট রূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।"

সুফী দর্শনের সঙ্গে বাউলদের সহজিয়া সাধনার আরও সাযুজ্য পাওয়া যায় যখন দেখি সুফী ফকির ও বাউল সাধক তাঁদের প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চয়ন করেছিলেন লোকায়ত সঙ্গীত নিবেদনের পদ্ধতিকে। সুফীরা 'সমা' গানে অভ্যস্ত, আর বাউল-গান বাউলের নির্লিপ্ত প্রচারের একমাত্র সম্বল। সুফীদের সংগঠনের 'পীর-মুরিদি' সম্পর্কের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বাউলদের গুরুবাদের। তবে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক গুরুবাদের সঙ্গে বাউলদের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মূলগত প্রভেদ রয়ে গেছে। শাস্ত্রীয় গুরুর আধিপত্যের পরিবর্তে বাউল চেয়েছেন সেই গুরুদের সান্নিধ্য যাঁরা সারা জীবনের সুখ-দুঃখের তীব্র মুহূর্তে পথ-নির্দেশ দেবেন আত্মোপলব্ধির একান্ত প্রয়োজনে। এই গুরুদের অবস্থান তাই বাইরে থেকে আরোপিত নয়, সাধকের মনের অন্তরে উত্তাপহীন মোমের স্নিগ্ধ আলোর মতোই সেই গুরুদের অস্তিত্ব। বাউল গেয়েছেন :

"গুরু যে তোর বরণডালা, গুরু যে তোর মরণ-জ্বালা,
গুরু যে তোর হৃদয়-ব্যথা, ঝরায় দু'নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন?"

বাউলদের সাধনা বাংলার ও ভারতের একান্ত নিজস্ব সহজিয়া ঐতিহ্যের অঙ্গ। তাকে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শন বা যান্ত্রিক ইতিহাস-গবেষণার নিরিখে মূল্যায়ন করা যাবে না। স্মার্ত হিন্দু ও শরিয়তি ইসলামের মতো ভারতের অসহিষ্ণু আধিপত্যকামী ধর্মীয় প্রবাহগুলির নির্দেশও এখানে অচল। বাউলরা বর্ণভেদ, কুসংস্কার ও শাস্ত্রের কোনও আচার-বিধিই মানতে প্রস্তুত নন। এমনকি বৈষ্ণব পণ্ডিতরা যখন বাউলদের মনের মানুষের প্রেমতত্ত্বের হিসেব চান ধর্মীয় ব্যাকরণ অনুসারে, বাউল সাধক পরিহাসচ্ছলে গান গেয়ে ওঠেন :

"ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরী ?
নিকষে ঘসয়ে কমল, আ মরি মরি।"

সহজিয়া বাউলরা জীবনবিমুখ নন, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন বাংলার গ্রামীণ সমাজের নিম্নবর্ণের কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্য থেকে। বাউলদের এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে নির্দিষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যাবে উত্তর ভারতের কবীর ও দাদূর মতো সহজিয়া সন্ত কবিদের জীবন সাধনার। উত্তর ভারতের নির্গুণ ভক্তিসাধনা ও ইসলামের সুফী দর্শনের সঙ্গে বাংলার সহজিয়া ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন নিরক্ষর বাউল সাধকরা গভীর নির্জন পথে।

শেষ করা যাক রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে : "আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কী রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

তথ্যসূত্র :

১। ক্ষিতিমোহন সেন : *বাংলার বাউল, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা*
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *The Religion of Man* (অক্সফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট ট্রাস্ট বক্তৃতা); *মানুষের ধর্ম*
৩। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : *হারামণি* (বাউল গানের সংকলন)
৪। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : *Obscure Religious Cults*
৫। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *বাংলার বাউল ও বাউল গান*
৬। এনামুল হক : *বঙ্গে সুফী প্রভাব*
৭। প্রবোধচন্দ্র বাগচী : *বাউলের ধর্ম* (প্রবন্ধ)
৮। অলকা চট্টোপাধ্যায় : *রাহুলজীর জীবনচর্যায় তিব্বত* (প্রবন্ধ)
৯। সুধীর চক্রবর্তী : *গভীর নির্জন পথে*
১০। কল্যাণ সুন্দরম : *অসাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে*

[প্রবন্ধটি লিখবার সময় যাঁদের সঙ্গে আলোচনার ফলে লেখক উপকৃত হয়েছেন তাঁরা হলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা শ্রীমতী অমিতা সেন (অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মাতা), বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী (প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক), ও বিশ্বভারতীর হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক রামেশ্বর মিশ্র (ডঃ মিশ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চায় মধ্যযুগের সহজিয়া সন্ত-সাধকদের প্রভাবের বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী ও বিশ্বভারতীর হিন্দি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ রাম সিং তোমারের সান্নিধ্যে।]

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

বাংলার সমাজ-বিবর্তন ও প্রগতি

বঙ্গাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা পা রেখেছি। কিন্তু বাংলা, বাঙালি বা বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস খুঁজতে আরও অনেক বছর পিছনে হাঁটতে হবে। তবে আদি সেই কালের ইতিহাসে তথ্য যেমন আছে তেমন অনেকটাই আছে কিংবদন্তী। ইতিহাসকারেরা বলছেন অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্যভাষী আলপাইনীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মঙ্গোলরাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ দেশের অধিবাসী। ভাষা না হলে জাতি হয় না, আবার ভাষা সংস্কার না জন্মালে জাতীয়তাবোধও সৃষ্টি হয় না। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "মৌর্য্য-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত-রাজবংশের রাজত্ব পর্য্যন্ত খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ পর্য্যন্ত, এই আটশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষী জনগণ নিজ অনার্য্যভাষা সমূহকে ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আর্য্য ভাষা—অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত—গ্রহণ করে; উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর-ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের ইতিহাস ও পুরাণ—বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল, তাহাও বাঙ্গালায় গৃহীত হইল।" এভাবে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য—এই তিন জাতির মিলনে বাঙালি জাতির সৃষ্টি হল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙালি মূলত অনার্য ছিল এবং আর্যরক্ত যেটুকু মিশেছিল তাও খাঁটি ছিল না, উত্তর ভারতেই অনার্য-মিশ্র হয়ে গিয়েছিল। পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার দুশো বছরের মধ্যেই বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়ে বাংলা ভাষা স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়ে উঠল এবং খ্রিস্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি এই বাংলা ভাষায় গান রচনা, সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হল।

পাল যুগ থেকেই বাঙালির জাতীয় মন বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, শৈব, শাক্ত, বৈদিক, বৈষ্ণব এবং সুফি প্রভৃতি বহু সুরের ঝংকারে আজও পর্যন্ত আন্দোলিত হয়ে আসছে। বাঙালির সংস্কৃতিও এই ঐতিহাসিক ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আদি বঙ্গবাসীরা কিন্তু বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে বহির্বঙ্গস্থ শক্তি শিশুনাগ, মৌর্য, শুঙ্গ, কম্ব, গুপ্ত, পাল, চন্দ্র, বর্মণ, দেব, কোচ, সেন, তুর্কী, মুঘল, ইংরেজ প্রভৃতির আক্রমণ, শাসন, শোষণ ও জবরদস্তিতে নিজ স্বাধীন সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রান্তবাসী হয়ে রয়েছে। এরা আজও নির্বিত্ত বা নিম্নবিত্ত, নিম্ন বা অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী। কামার, কুমোর, নাপিত, ধোপা, হাড়ি, ডোম, শিকারি, মুচি, মেথর, বাগদি, চণ্ডাল, কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি ছত্রিশ জাতের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী এবং মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য মঙ্গল সাহিত্যে। স্বভাবতই এই সব শূদ্র জাতীয় জনসংখ্যাই বেশি ছিল। এদের মধ্যে কিছু অংশ যখন যে শাসক শক্তি থেকেছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে সামান্য সুবিধা ভোগ করেছে। গুপ্ত ও বৌদ্ধ-পাল আমলে এই জাতীয় কিছু অনুগৃহীত মানুষ সৎশূদ্র বা কায়স্থ এমনকি বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ স্তরেও উন্নীত হয়। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় বাংলাভাষী অঞ্চলে নিষাদ ও কিরাত রক্তেরই মিশ্রণ ঘটেছে বেশি। আর্য রক্ত সাংকর্য বাঙালির মধ্যে কম।

রাষ্ট্রক্ষমতায় যদি বিদেশি শক্তির অবস্থান থাকে তাহলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতেও তাদেরই প্রাধান্য থাকে। তাই বাঙালির ভাষা, শাস্ত্র ও সংস্কৃতি সব কিছুতেই বিদেশাগত সম্পদই মূল্য পেয়েছে অধিক। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার ইত্যাদির চাপে তুর্কী ও মুঘল আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচুঁ-নাকের মানুষেরাও ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীকে উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি লাভের জন্য যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তার পরিচয় রয়েছে। তুক-তাক-মারণ-উচাটন-মাদুলি-ঝাড়ফুঁকে উচ্চবর্ণের মানুষেরাও ক্রমশ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, আর সে বিশ্বাসের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। শুধু ধর্ম নয় দর্শনের ক্ষেত্রেও এই মিশ্রণ ও গ্রহণপ্রবণতা লক্ষ করা যায়। ইসলাম ধর্মও প্রভাবিত হয়েছে বৌদ্ধ যোগসাধনা, দেহতত্ত্ব ও সহজিয়া বাউলতত্ত্বের দ্বারা। দরগা, মাজার, পীর, ফকির, ঝাড়ফুঁকও ইসলামবিশ্বাসীদের মধ্যে স্থান করে নেয়।

দুই

চিরবিজিত বাঙালি জীবনে আত্মীকরণ ও সমন্বয়ই মূল প্রবণতা হলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই কিছু দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতেই হয়। ফলে জীবন নিস্তরঙ্গ থাকে না, জনজীবন ও সমাজে পরিবর্তন ঘটে এমনকি যুগান্তরও। এরূপ যুগান্তর বা ভাববিপ্লব সমাজ-ঐতিহাসিকরা অন্তত আটটি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করেছেন। বাংলার পুণ্ড্র অঞ্চলে বৌদ্ধ মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও অবলুপ্তির ফলে প্রথম যুগান্তর ঘটে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাঢ় ও পুণ্ড্র বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্ত বংশের রাজত্ব। তৃতীয় ঘটনা বৌদ্ধ-পাল বংশীয় রাজত্বের চারশ বছরব্যাপী শাসনকাল। চতুর্থ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোড়ন সৃষ্টি হয় দাক্ষিণাত্য থেকে সমাগত উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজবংশের সময়ে। পঞ্চম বিপ্লবাত্মক ইতিহাস সৃষ্টি হয় তুর্কী বিজয়ে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের কোণঠাসা পরিস্থিতিতে। ষষ্ঠ ভাববিপ্লব ঘটে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও কুলবিস্তারী প্রভাবে এবং নতুন বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসারে। সপ্তম ক্রান্তিকাল হল মুঘল সাম্রাজ্য শাসনে। একালে যেমন সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, তেমনই ঘটে লৌকিক দেবদেবীদের অভ্যুত্থান ও ব্রাহ্মণ্যবাদের অবক্ষয়। অষ্টম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে বাংলার সমাজে ব্রিটিশ শাসনকালে। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা এই বাংলায় আবার নিয়ত বিদ্রোহের ঘটনাবলীও এখানে। পচাগলা প্রাচ্য বঙ্গসমাজে পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোকের প্রদীপ জ্বালিয়ে নবজাগরণের সৃষ্টি ও প্রতিপালন পরাধীনতার মধ্যেও নিঃসন্দেহে বিপ্লবাত্মক ঘটনা।

পরাধীনতায় অভ্যস্ত বঙ্গবাসী যে সবসময় নিশ্চেষ্টভাবে পরশোষণ মেনে নিয়েছে এমন নয়। শৌর্যবীর্যের পরিচয়মূলক আখ্যান ও কল্পকাহিনী অনেক প্রচারিত আছে। 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়'— এই বিজয় সিংহ হয়তো বঙ্গবাসী ছিলেন কিন্তু বাঙালি ছিলেন না। তিনি বাংলাভাষী হতে পারেন না কারণ বিজয় সিংহের সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছরে বাংলা ভাষার উদ্ভবই হয়নি। তবে নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে সমাজদ্রোহী, গোত্রদ্রোহী লোকের সন্ধান পাওয়া যেত। পাল রাজত্বকালে নিম্নবৃত্তির কৈবর্তদের রাজদ্রোহ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। বিদ্রোহী কৈবর্ত নেতা দিব্যরুদ্রক পালরাজাদের বাহুবলে পরাজিত করে তিন পুরুষ ধরে স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করে। প্রজাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষেরাও কৈবর্ত শাসন মেনে নিয়েছিল। চণ্ডাল রাজ কালকেতুর উপাখ্যান কল্পকাহিনী হলেও সমাজের মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা না থাকলে গল্প গড়ে উঠবে কেন! ধূর্ত ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল প্রমুখ উচ্চবর্ণের মানুষের ন্যায়নীতিহীন চরিত্রের ব্যঙ্গ রূপ যেমন রয়েছে অপরদিকে নিম্নবর্ণের কালকেতু-ফুল্লরার গভীর প্রেমকাহিনী এবং পরিচ্ছন্ন শাসনব্যবস্থার বর্ণনা মধ্যযুগের সমাজ-মানসের পরিচায়ক। বিদ্রোহী ইছাই ঘোষের কাহিনী অথবা কালু ডোম বা তার পুত্র লখাই ডোমের সাহসিক রণনৈপুণ্যের প্রচলিত গল্প নিম্নবর্ণের মানুষের দ্রোহমূলক সত্তার দৃষ্টান্ত। ডোম, চণ্ডাল, গোয়ালা, কৈবর্ত প্রভৃতি গোত্রের মানুষের স্বাধীন জীবনযাপনের ঘটনা পাল যুগে বহুশ্রুত।

সেন বংশের রাজত্বকালেই বাংলার বুকে ঘটল নতুন ঘটনা। এতকালের বঙ্গবিজেতারা এসেছিল আর্যাবর্ত, অযোধ্যা বিহার থেকে। জৈন, বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতিতে, আচার-বিচারে বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি ছিল। কিন্তু ১২০১ সালে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলায় তুর্কী শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম শাসন কায়েম হয়। ফলে একটি বিদেশি জাতি, ভিন্ন ধর্ম ও বিদেশি ভাষার আমদানি হল বাংলা তথা ভারতে। উন্নত বাহুবল, অস্ত্রবল, মনোবল এবং এক বিশ্বজয়ী উদার ধর্মমত নিয়ে নতুন শাসকরা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর সহজেই কর্তৃত্বের আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজের অন্তস্তল থেকে নিদারুণ আঘাত পেল তার গোঁড়ামি, অনুদারতা, আচার-নিষ্ঠার বাড়াবাড়ির জন্য। খানিকটা মানবসাম্যে আস্থাবান ইরানি, তুর্কী ধর্ম আচার-বিচার ও সংস্কৃতি স্থানীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করল। মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখল জন্ম ও বর্ণসূত্রে বৃত্তি নয়, একজন ক্রীতদাসও যোগ্যতাবলে রাজ-জামাতা বা বাদশাহ হতে পারে। ইসলাম ধর্মে সকলের সমান অধিকার এ দেশের বিশেষ করে লাঞ্ছিত অপমানিত নিম্নবর্ণের মানুষকে বেশি করে আকৃষ্ট করে। প্রবীণ চিন্তাবিদ ডঃ আহমদ শরীফ এ সময়ের বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন : "সেদিন এভাবে সুপ্রাচীন অচলায়তন অটল অবিচল সমাজে শাস্ত্রের ও সমাজের নিয়মনীতির প্রতি গণমানবের মনে যে সন্দেহ সংশয় ক্ষোভ ও দ্রোহ জাগাল, যে চেতনা নতুন জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবিকাভাবনা উদ্দীপ্ত করল, যে কাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা উদাম যোগাল, যে আত্মপ্রত্যয় কর্মে ও আত্মবিস্তারে প্রবর্তনা দিল তা ক্রমে ধর্মান্তরে, কর্মান্তরে, চিন্তা চেতনার রূপান্তরে এবং সাহিত্যে শিল্পে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে সংগীতে শাস্ত্রে সমরে পোশাকে প্রশাসনে সাংস্কৃতিক আচার-আচরণে রস-রুচিচর্চায় অভিব্যক্তি পেতে থাকে পলাশী যুদ্ধোত্তর আর এক নতুন যুগ সূচিত হওয়ার মুহূর্ত অবধি।"

জীবনচর্যা থেকে সংস্কৃতিতে এক অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল পাল বংশের পতনের কাল থেকেই। বৌদ্ধধর্ম নানা বিকৃতির মধ্য দিয়ে নানা উপশাখা তন্ত্রমন্ত্রে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে। প্রায় বাংলা অর্বাচীন অবহট্‌ঠে রচিত চর্যাগীতির মধ্যে ধর্মীয় সাধনার চেয়ে জীবনের দাবিই বড় হয়ে ওঠে। যদিও সান্ধ্যভাষায় রচিত কিন্তু একটি অর্থ তো বিস্ময়করভাবে বিপ্লবাত্মক সেই দশম-একাদশ শতকে যখন কবি তিলাপা বলেন, "দেব পূজা করো না, তীর্থে যেয়ো না, দেব পূজায় মোক্ষ বা মুক্তি পাবে না" কিংবা কাহ্নপা যখন বলেন, "মন্ত্রতন্ত্র কোন কাজই করে না।"

পূর্বেই বলেছি সাঙ্গীকরণ বাঙালি চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য...বাঙালীর বৃত্তি যথার্থ বৈতসী। যে আদর্শ, যে ভাব স্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাংলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বারবার বাঁচাইয়াছে।" রাষ্ট্রে-ধর্মে-শিল্পে-সাহিত্যে মেরুদণ্ডহীনতা, কামপরায়ণতা, রুচির বিকার সমাজদেহে যে দুষ্টক্ষত সৃষ্টি করেছিল বাঙালি ব্রাহ্মণ্যবাদ, শাস্ত্রশাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলার নিজস্ব শিকড়ে তার প্রাণশক্তি ফিরে পেতে সচেষ্ট হল। 'গীতগোবিন্দ'-র যুগ থেকে পাঁচালি, ধামালি, কথকতার কাল শুরু হল, আশ্রয় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বিভিন্ন লৌকিক পুরাণ কাহিনী। শূদ্রদেবতারাও সাহিত্যে স্থায়ী স্থান পেয়ে গেল। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে শূদ্রের অধিকার নেই, তাই বাংলা তর্জমার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের শাস্ত্র ও পুরাণে প্রবেশাধিকার জন্মাল। এ কাজে সহায়তা করলেন উচ্চবর্ণেরই কিছু উদারমনস্ক মানুষ। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মে নিম্ন-বর্ণের মানুষকে ধরে রাখা। প্রায় দেড়শো বছর ধরে পরিব্যাপ্ত এই দ্বন্দ্বের সমাধান হল চোদ্দ-পনের শতকে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা কিছুটা হার স্বীকার করেই অনিবার্য সংস্কারের পথে সাময়িক জয় পেলেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি, নবাগত ইসলাম ধর্মের সাম্য ও উদারতার প্রতি নিম্নবর্গের মানুষের আকর্ষণ বেড়েই চলছিল। রক্ষা করলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি উত্তরভারতীয় সন্তমতের আদলে রাধাকৃষ্ণ নামের মাধ্যমে সুফির প্রেমবাদ প্রচার করে ইসলামের প্রসার রোধে সমর্থ হন। তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমবাদে উদারভাবে তালাক, অস্পৃশ্যতা বর্জন, বর্ণব্যবস্থার নিরাকরণ, বৈরাগ্য, নামকীর্তন, সেবা ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হলেন। 'হেন মহাঠাকরানীভাব যার মনে উপজয়/ বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণ ভজয়।' চৈতন্যদেব 'নরে নারায়ণ' ও 'জীবে ব্রহ্ম' উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর জনপ্রিয় স্লোগান ছিল 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ'। এই মূল্যায়নের মধ্যে মনুষ্যত্বের মহিমা কীর্তিত হল, জন্ম-বর্ণের উর্ধ্বে মানবতা মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পেল। বাংলার সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের অবদান সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করা হল :

"শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নূতন ধারা সৃষ্ট বা প্রবর্তিত করিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার মর্য্যাদা তাঁহার হাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের গুরু-পরম্পরা, সংস্কৃত ভাষায় যে-দার্শনিক বিচার প্রকট করিলেন, যে-রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যে-সকল মূল গ্রন্থ, টীকা ও কাব্যাদি রচনা করিলেন, তাহা বিদ্যা ও বুদ্ধির দিক হইতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির অপূর্ব সৃষ্টি ; বাঙ্গালীর বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্যন্যায়ের ও স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের এবং শ্রীকুল্লুক ভট্ট, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ টীকাকার ও সংকলয়িতাদের মেধায় দেখা যায়, তেমনি ইহা শ্রী রূপ, শ্রী সনাতন, শ্রী জীব, শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যদের পাণ্ডিত্যেও দেখা যায়। আবার বৈষ্ণব পদাবলীতে

বাঙ্গালীর হৃদয়ের, তাহার রসানুভূতির যে-পরিচয় পাই, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুপ্রেরণার ফল। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার জন-সংগীত কীর্তনগানে যে লক্ষণীয় এবং অতিবিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিল, বাঙ্গালার নিজস্ব সংগীতের প্রাণ-স্বরূপ সেই কীর্তনগানও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ। ঘরমুখো বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া নূতন উদ্যমে পুরী গয়া কাশী বৃন্দাবনে গেল, জয়পুরে গেল এবং আরও পশ্চিমে গেল ;—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল। এখানেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রভাব দেখি।"

বাংলার সংস্কৃতি নগরনির্ভর কোনদিনই ছিল না, আদিম অস্ট্রিক জাতি থেকে প্রাপ্ত রিক্থকে অবলম্বন করে গ্রামজীবনে সীমাবদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘদিন। শিল্পনগরী হিসেবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুর নানা কারণে শিল্প ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে বৃহত্তর ভারতে পরিচিতি পেয়েছিল। বিদ্যাক্ষেত্র রূপে নবদ্বীপেরও সুনাম হয়েছিল। স্বাধীন মুসলমান শাসকদের অধীনে বাংলা বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে তেমন করে যুক্ত হতে পারেনি। সেটা সম্ভব হল মোঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে। উত্তর পশ্চিম ভারতের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হল, দিল্লি-আগরা- জয়পুর-চিতোর থেকে পারস্য ও তুরস্ক পর্যন্ত বাংলার ঢাকাই মসলিনের কদর ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার গ্রামীণ সভ্যতা সর্বভারতীয় বিকাশমান সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। বাংলা ও মৈথিলী ভাষা মিলেমিশে এক কৃত্রিম গীতিকবিতার ভাষা 'ব্রজবুলি' আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দি থেকেও নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল' এবং মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ' অনূদিত হয়ে ভাষাগত আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেল।

তিন

বাংলার হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে রূপান্তরিত মুসলিম সম্প্রদায়ের বয়স পাঁচ থেকে সাতশ বছর এবং হিন্দু থেকে খ্রিস্টানদের হল প্রায় চারশো বছর। তুর্কী বিজয়ের সময় থেকে রাজধানীতে বিদেশি বিভাষী মুসলিম প্রশাসক দেখা গেলেও গ্রামে-গঞ্জে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ দেখা যেত না। চোদ্দ শতকেও এই সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। তবে পঞ্চদশ শতকে প্রায় গ্রামেই মুসলিম পাড়া দেখা যেত। ষোড়শ শতকে মুসলিম শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ নবীকাহিনী ইত্যাদি প্রচলিত হয়। এই বাঙালি মুসলমানরা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত মানুষ। ধর্মান্তরের ফলে তাদের বৃত্তি বা জীবনযাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। শিক্ষা থেকে তারা আগের মতো বঞ্চিতই থেকে গেল। তবে স্বল্প সংখ্যক বাঙালি মুসলমান পরিবারে আরবি শিক্ষার প্রবেশ ঘটেছিল এবং কিছু মানুষ মধ্য চাষী স্তরে উন্নীত হয়। কাজি, সৈয়দ, খান, শেখ, খোন্দকার ইত্যাদি খানদানি পদবি অনেকে গ্রহণ করতে থাকে বিত্ত ও সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে। শিক্ষিত দেশজ মুসলমানরা সাধারণত মোল্লা-মৌলবী-উকিল-হেকিম-প্রাথমিক শিক্ষক-দারোগা গোমস্তা-নায়েব প্রভৃতি কাজ পেত। বড়জোর কাজি, বা ফৌজদার পর্যন্ত পদ লাভ করত। তুর্কী-মুঘল আমলে বাঙালি মুসলিম এর থেকে উঁচু পদ পায়নি। বলা হয়ে থাকে কোনও বাঙালি বা ভারতীয় মুসলিম একমাত্র মালিক কাফুর ছাড়া তুর্কী-মুঘল আমলে আমির বা প্রশাসকের উঁচু পদে আসীন হয়নি। কিন্তু দেশজ বর্ণহিন্দুরা এই সময়ে সেনাবাহিনী ও দরবারে সবসময় উঁচু পদে স্থান পেয়েছে। ফলে তুর্কী-মুঘল এমনকি ইংরেজ আমলে (উনিশ শতকের তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত) গ্রামাঞ্চলে হিন্দুরাই ছিল অভিজাত অংশ। ধর্ম এক হলেও দেশজ মুসলমানদের সঙ্গে তুর্কী-মুঘলদের কোনও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যোগ ছিল না, যেমন ছিল না দেশীয় খ্রিস্টানদের সঙ্গে শাসক ইংরেজদের। নাগরিক অভিজাত বলতে যা বোঝায় তা ছিল ওই বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগেও। তবে অনেক সময় বাংলায় বসবাসকারী বিদেশি মুসলমানদের বাঙালি স্ত্রী গ্রহণ করতে হত, ফলে তাদের সন্তানাদি ভাষায় বাঙালি হয়ে যেত। এই বিদেশি এবং বিদেশি-মিশ্র মুসলমান ও হিন্দু বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন শুরু হয়। বাংলাদেশে ইসলামের শরিয়তি মত নয়, সুফি মতই বেশি প্রসার লাভ করে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে দিল্লির সাম্রাজ্যবাদী মুঘল-শোষণ এবং মগ-হার্মাদদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনে বিপর্যস্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিত্ত সাধারণ মানুষ 'সত্যপীর' নামে অভিনব এক দেবতা সৃষ্টি করে। আশ্চর্যজনকভাবে এই জনপ্রিয় দেবতা মোল্লা-মৌলবী ও পুরোহিতদের সমর্থন লাভ করে। "হিন্দুর দেবতা তিনি মুসলমানের পীর/ দুই কুলে সেবা লয় হইয়া জাহির।" "মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম/ কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ।" কোরান-পুরাণ দু-হাতে এই দেবতার পুনরুজ্জীবন যদি একালে আবার সম্ভব হত তা হলে অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে মানুষ রেহাই পেত। রাষ্ট্রশক্তি যেখানে এ-যুগেও ব্যর্থ দুই সম্প্রদায়কে মেলাতে সেখানে সে যুগে সাধারণ স্বল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উপায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙালির সংস্কৃতিতে ইসলামি উপাদান যেটুকু এসেছিল তা মিলিত বাঙালির জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করেই এসেছে।

কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নানা ঐতিহাসিক কারণে ভুল বোঝাবুঝির একটা সমান্তরাল ধারা বহুদিন যাবৎ চাপা ছিল, কখনও তা প্রকাশ্য হয়েছে। এই সম্প্রদায়-বিদ্বেষ ইংরেজ আমলেই বৃদ্ধি পায়। কলকাতার কোম্পানির কর্মচারী ও সহযোগী হিন্দুরা কথ্য ইংরেজি শিখতে থাকে। ফারসির বদলে ইংরেজি প্রশাসন ও কাজের ভাষা হয়ে ওঠায় শিক্ষিত বর্ণহিন্দুরা ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখাতে থাকে। মধ্যযুগ থেকেই হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল। ইংরেজ আমলেও তাদেরই প্রাধান্য থাকল বরং বৃদ্ধি পেল। পাশ্চাত্য উন্নত শিক্ষা ও সভ্যতার দরজা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই উন্মুক্ত হয়েছিল, আর হিন্দুরাই সেই সুযোগ সাগ্রহে প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছিল। প্রশাসনের ভাষা রূপে ইংরেজি আইনগত হয় ১৮৩৮ সালে এবং আবশ্যিক হয় লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে ১৮৪৪ সালে কিন্তু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু বহু আগে, হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় ১৮১৭ সালে। উর্দুভাষী মুসলিমরা অবশ্য ১৮৫০-এর কয়েক বছর আগে থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বাঙালি মুসলিমরা এ ক্ষেত্রে বহুদিন পিছিয়েই থাকে, কেননা ইতিহাসগতভাবে তাদের মধ্যে প্রায় কোনও শিক্ষাই ছিল না। গ্রামের মানুষ তা সে হিন্দু বা মুসলিম যাই হোক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। হিন্দুর শিক্ষা আন্দোলন কিছুটা রাজধানী শহর ছেড়ে মফস্বল শহর ও গ্রামে প্রসারিত হলেও সম্প্রদায়গতভাবে বাঙালি মুসলমান বিলম্বে তাতে শামিল হয়েছিল। বাস্তবত শাসন কর্তৃত্ব, আদালত ও বাণিজ্যে বাঙালি মুসলিম জনগণ অনেকদিন ছিল অনুপস্থিত। মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী ওয়াহাবী ও ফরায়েজী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় মুসলমান সমাজে হতাশা বৃদ্ধি পায়, যদিও এই সব বিদ্রোহে কৃষক সমাজের অংশগ্রহণের ফলে একটি অন্য মাত্রাও যুক্ত হয়েছিল। এরপর বাঙালি অগ্রসর মুসলিম মধ্যবিত্তরা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে এবং ১৮৭০ সালের পর থেকে দেশজ মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার কদর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়ার পর কার্যত ইংরেজের অনুগ্রহ, সরকারি দপ্তরে পিওন-বেয়ারা-কেরানির চাকরি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হল। ডঃ আহমদ শরীফ বলেছেন : "কিন্তু তথ্য জানা ছিল না বলে দেশজ মুসলিমরাও স্বধর্মী সুবাদে নিজেদের তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি ভেবেছে। আর উনিশ-বিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম মাত্রই ইংরেজ প্ররোচনায় হিন্দুদের ভেবেছে তাদের সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের কারণ। এই

ভুল ধারণাবশে বিদ্বিষ্ট মনে হিন্দুদের তারা দেখতে শিখেছে মুসলিমদের শোষক, শাসক এবং শত্রুরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী রূপে। এ চেতনাকে উনিশ শতকে প্রথম উদ্দীপিত করে ইসলামের ও মুসলিমের পুনরুজ্জীবনবাদী ওয়াহাবীরা, পরে পরোক্ষে ফরায়েজীরা (ফরজে অনুগতরা) এবং বিশ্ব মুসলিম সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববাদী সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী এবং স্যার সৈয়দ আহমদ। আসলে বর্ণ হিন্দুর চরিত্রে পেশায় আনুগত্যে ও লক্ষ্যে গত দু হাজার বছর ধরে কোন অসঙ্গতি ছিল না, মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল আমলে তারা দরবারে-প্রশাসনে ও নানা পেশায় একইভাবে উপস্থিত ছিল।"

চার

১৮৩৫ সালে বেন্টিঙ্কের আমলে যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়: "এখন আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটা শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য যে-শ্রেণীর লোকেরা হবে আমাদের ও আমরা যে কোটি কোটি লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানকারী; এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় আর রুচিতে, মতে নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।" তাই বলা যায় ইংরেজ রাজত্বে ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত ছিল শ্বেতকায় শাসকেরা, আর সর্বনিম্নে ছিল বিপুল জনগণ-কৃষক, কারিগর ও শ্রমিক। বাঙালি জমিদার, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী মহাজনদের অবস্থান ছিল এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী। এই মধ্যবর্তী শ্রেণী ইংরেজের প্রশাসনিক ও উন্নত শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ কাজে লাগিয়ে সমাজসংস্কারে ব্রতী হয়। আর এই সমাজসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে এক পঙ্গু পাণ্ডুর জাতিকে উজ্জীবিত করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ ও নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। কার্ল মার্কস বলেছেন, "যেসব জাতি পূর্বে ভারতবর্ষে অভিযান করেছে তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের সভ্যতাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নত। ব্রিটিশরা ভারতীয় গ্রাম সমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে, শিল্পবাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু তা সমস্তই প্রায় ধ্বংস করেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এই ধ্বংসের কাহিনীতে কলঙ্কিত। বিরাট এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজাগরণের আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। তাহলেও স্বীকার করতেই হবে, ভারতের নবজাগরণ শুরু হয়েছে।"

নবজাগরণের সূচনা হয় ঠিকই কিন্তু চরিত্র স্পষ্ট হতে কিছু সময় লাগে। বাংলার প্রাণকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল এবং বাংলার আধুনিক যুগের সূচনা গঙ্গার দুই ধারের নতুন গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চল থেকেই ঘটতে থাকল। হঠাৎ ধনীদের ঐশ্বর্যের আলোয় শহর কলকাতা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, পরিণত হয় বিলাসভূমিতে। সামাজিক প্রয়োজনে আগমন হয় বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের। তখনও নতুন কালের সাংস্কৃতিক ভাবনা গড়ে ওঠেনি। ফলে মধ্যযুগের কাহিনী কাব্যের যুগাবসানে কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, খেউড়, তরজা ইত্যাদির একটি ধারা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "ইংরেজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎরাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যতা ও ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নতুন রাজধানীতে নতুন সমৃদ্ধশালী কর্মব্যস্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া দুইদণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না। কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য সর্বস্ব ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া, অত্যন্ত লঘু সুরে, উচ্চৈস্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁসিসহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ, তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহার মধ্যে লড়াই এবং হারজিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন ঝন শব্দে ঝংকার দিতে হইবে, আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নতুন হঠাৎরাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নতুন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।"

অনতি-সমকালেই অনুরূপ আর একটি ধারার উদ্ভব হয়, যাকে 'মুসলমানী বাংলা ভাষার কাব্য' বলা হয়ে থাকে। বিদেশাগত মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ঘরে তুর্কী, দপ্তরে ফারসি, মসজিদে আরবি এবং সামাজিক ব্যবহারে আরবি-তুর্কী-ফারসি মিশ্রিত হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করত। নবাবী আমলে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নগর বন্দর অঞ্চলে রাজকর্মচারী, সিপাই, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা পেশার অবাঙালি লোক বাস্তব কারণেই বাংলাভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসে নিজেদের মাতৃভাষা কথোপকথনের ক্ষেত্রে বিকৃত করে এক 'খোট্টাভাষা'র জন্ম দিল। এই মিশ্রভাষার প্রচলন বাংলাভাষীদের একাংশের মধ্যে ঘটেছিল যার ফলে মুসলমানী বাংলাভাষা তৈরি হয়ে গেল। এই দোভাষী রীতিতে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম বীরগাথা, পীর পাঁচালী, প্রণয় কাহিনী, নবী ও আউলিয়া উপাখ্যান ইত্যাদি রচিত হয়। বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় পূর্বোক্ত কবিগান বা মুসলমানী বাংলা কাব্যের আত্মিক যোগ খুব সামান্যই।

ইংরেজ পুঁজিপতি শ্রেণীর একাধিপত্য ও ঔপনিবেশিক শোষণনীতির ফলে বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেনি। অপরদিকে ভূমিস্বত্বভোগী, খাজনা আদায়কারী জমির সঙ্গে সম্পর্কহীন নতুন জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে গ্রামীণ অর্থনীতির সংকটও বৃদ্ধি পেল। সামগ্রিক অর্থনীতির চেহারাও উন্নত হল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও মধ্যবর্তী বুদ্ধিজীবী অংশের মধ্যে সৃজনশীলতা ও প্রাণশক্তির জোয়ার সৃষ্টি হয়। বিনয় ঘোষের কথায়, "এই গতিশীলতা ও প্রাণশক্তির জোরেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন উত্থান পতনের বন্ধুর পথে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে, নতুন মনীষা, গঠন কুশলী সমাজ সংস্কার ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য শিল্প প্রতিভার বিকাশ হয়েছে।"

পাঁচ

বাংলার নবজাগৃতির বিশ্লেষণ করলে তিনটি ধারা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় ডিরোজিও-ডেভিড হেয়ার-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-মধুসূদন-হরিশ প্রমুখের চিন্তাধারা ও সংস্কার আন্দোলন; রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশব সেনের মধ্যপন্থী চিন্তাধারা এবং রাধাকান্ত-ভবানীচরণ-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখের রক্ষণশীল চিন্তাধারা ও সংস্কার আন্দোলনে। তৃতীয় ধারায় বঙ্কিম ও বিবেকানন্দর মধ্যে নব্য হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদ যুক্ত হওয়ায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও কোনও কোনও বিষয়ে ইতিবাচকতা অস্বীকার করা যায় না। তবে সামগ্রিকভাবে সবকটি ধারা সম্পর্কেই বলা যায় একদিকে উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অতি আকর্ষণ ও শ্রেণীস্বার্থ এবং অপরদিকে সমাজসংস্কার স্পৃহা ও জাতীয়তাবোধ যে নিয়ত দ্বন্দ্ব বজায় রেখেছিল তার প্রভাব সেকালের প্রায় সমস্ত যুগপুরুষের মধ্যে কমবেশি লক্ষ করা যাবে। এই দ্বন্দ্বের স্বাভাবিকতা ও অনিবার্যতা না অনুধাবন করতে পারলে নবজাগৃতির স্রষ্টাদের শ্রেণীসীমাবদ্ধতাই বড় হয়ে দেখা দেবে, তাঁদের মূল্যবান অবদানগুলি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তার উত্তরাধিকার থেকে বর্তমান প্রজন্ম বঞ্চিত হবে।

বাঙালি সমাজের জাগরণ বা স্বাধীন বিকাশ শাসক ইংরেজ কখনও চায়নি। প্রথম দিকে ইংরেজ শাসকরা চেয়েছিল সনাতনপন্থীদের সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন প্রণয়নেও দ্বিধার অন্ত ছিল না। দেশীয় মানুষকে চটিয়ে কোনও সংস্কারে ইংরেজরা উদ্যোগী হতে চায়নি। দেশীয় সংস্কার আন্দোলনের চাপেই তারা বাধ্য হয়েছে কিছু কিছু দাবি মেনে নিতে। বিদেশির অন্ধ অনুকরণ ও রক্ষণশীলদের চূড়ান্ত গোঁড়ামির সমদূরত্বে দাঁড়িয়ে বাঙালি সমাজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিশ্বদৃষ্টি ও ইয়োরোপীয় মানবিক দর্শনের স্বীকরণের মাধ্যমে নতুন ধারাটি বিকশিত করা অতীব কঠিন কাজ ছিল। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং দেশীয় রক্ষণশীলতা এই উভয় বাধা অতিক্রম করে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও শিক্ষার আলোক এবং স্বীয় শাস্ত্র গ্রন্থাবলীর ইতিবাচক দিকগুলিকে মন্থন করে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষীরা যে সংগ্রাম করেছিলেন তার ক্ষেত্রগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) সমাজসংস্কার-বিষয়ক আন্দোলন—
- (ক) সতীদাহ প্রথা নিবারণ
- (খ) বিধবা বিবাহ প্রবর্তন
- (গ) কৌলিন্য ও বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ
- (ঘ) স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন ও নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা কামনা
- (ঙ) বাল্যবিবাহ প্রথা রদ
- (চ) পণপ্রথা ও কন্যা বিক্রয় প্রথা বিলোপ
- (ছ) মদ্যপান নিবারণ
- (জ) জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা নিরাকরণ
- (ঝ) হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা
- (ঞ) ইংরেজের অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা

(২) ধর্ম-বিষয়ক আন্দোলন—
- (ক) খ্রিস্টান মিশনারি ও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব
- (খ) সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়
- (গ) রক্ষণশীল হিন্দু ও সংস্কারমুক্ত উদারপন্থী হিন্দুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক

(৩) শিক্ষা-সংক্রান্ত—
- (ক) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন
- (খ) শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা
- (গ) নারী-শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার
- (ঘ) শহরের বাইরে গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা
- (ঙ) বিজ্ঞান ও মেডিক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন
- (চ) মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা
- (ছ) বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রচার

(৪) রাজনৈতিক আন্দোলন—
- (ক) কৃষক বিদ্রোহগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ও বিতর্ক
- (খ) জাতীয়তাবোধের উন্মেষ—হিন্দুমেলা, আত্মীয়সভা, ভারতসভা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি অসংখ্য সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধন ও স্বাধীনতা কামনা জাগিয়ে তোলা
- (গ) ইলবার্ট বিল, বঙ্গভঙ্গ প্রয়াস ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও কূটকৌশলের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন
- (ঘ) এইসব সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সাহায্যকারী হিসেবে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রকাশ ও টিকে থাকার সংগ্রাম

(৫) সাহিত্য-সংস্কৃতি—
- (ক) বাংলা গদ্যের সৃষ্টি এবং অজস্র বিতর্ক রচনার বাহন হয়ে ওঠা
- (খ) নবজাগৃতির চেতনাসমন্বিত নবযুগের মহাকাব্য সৃষ্টি
- (গ) বাংলা গল্প ও উপন্যাসের সৃষ্টি
- (ঘ) বাংলা নাট্যশালার সৃষ্টি ও গণ-আন্দোলনের শরিক হয়ে ওঠা
- (ঙ) জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত স্বদেশী গান ও কাব্যসংগীতের জোয়ার
- (চ) যুগচেতনার বাহনরূপে বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবর্তী শ্রেণীর দ্বারা যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল এবং ক্রমে যা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কূলপ্লাবী হয়ে ওঠে এবং পরিণামে সোনার ফসলকে সমাজের সর্বস্তরে ধীরে ধীরে পৌঁছে দেয়। আলো যেই জ্বালান না কেন অন্ধকার দূর করা তার ধর্ম, তেমনি আলোকিত হওয়াও মানবিক অধিকার। আর সেই অধিকারবোধও জন্ম দেয় আলো ও অন্ধকারের তুলনামূলক দৃষ্টান্ত। এই দ্বন্দ্বই ইতিহাসকে এগিয়ে দেয় প্রগতির পথে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সার্থকতা সেখানেই। তবে একথাও স্বীকার্য যে এই শতাব্দীব্যাপী বহুমুখী নবজাগৃতির সংগ্রামে শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি যথেষ্ট নয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক ভূমিকা, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এবং মুসলিম জাতীয়তার প্রতিভূরূপে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, কৃষকসভা, শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনাও যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করেছিল। তা সত্ত্বেও ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশবিভাগ রোধ করা যায়নি। এর জন্য শুধু ইংরেজের ভেদ-বিভেদের রাজনৈতিক কূটকৌশলকে দায়ী করলে হবে না, মুক্তবুদ্ধি ও উদারপন্থী হিন্দু-মুসলমান নেতারা একক জাতীয়তার কথা যতই বলে থাকুন না কেন হিন্দুরা হয়েছিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী এবং মুসলিমরা ছিলেন বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব-চেতনাপুষ্ট। তৎকালীন বৃহত্তর ভারত আজ তিন খণ্ড—কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক দ্বেষ, বিদ্বেষ, হানাহানি থেকে কারও রেহাই নেই।

অজয়কুমার দে

বাংলা সিনেমার প্রথম পর্যায়

সিনেমার জন্ম পাশ্চাত্যে। জনসাধারণের সামনে প্রথম শো-টি হয়েছিল ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর, প্যারিসের একটি কাফেতে। তার ছয় মাসের মধ্যে সিনেমা আসে ভারতে। প্রদর্শিত হয় বম্বে শহরের একটি হোটেলে ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই তারিখে। তারও পাঁচ মাস পরে ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে জনৈক বিদেশি মিঃ স্টিভেন্সের আনুকূল্যে সিনেমা চলে আসে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী এই কলকাতা শহরে। দেখানো হয় স্টার থিয়েটারে নাটক প্রদর্শনের পরে। তখন সিনেমা অর্থে ফিল্মের ছোট টুকরোকে (film-strip) বোঝাত। হাতে ধরা থাকত ছোট ঘটনা, যেমন ঘোড়া দৌড়চ্ছে, বা স্টেশনে ট্রেন আসছে ইত্যাদি। সারা ভারতে যেখানেই স্টার থিয়েটার কোম্পানি যেত, সেখানেই মিঃ স্টিভেন্স এই টুকরো ছবি দেখিয়ে বেড়াতেন। প্রায় একই সময়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাঁফো তাঁর পুত্রদের কিছু টুকরো ছবি দেখালেন।

এই ছবি দেখে কলকাতার এক যুবক উদ্দীপিত হলেন। তাঁর নাম হীরালাল সেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ও তাঁর ভাই মতিলাল সেন মিলে রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি গঠন করে ছবি তোলার ও প্রদর্শনের যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনার আয়োজন করলেন। ১৯০২ সালে এল মুভি ক্যামেরা এবং পরের বছরেই হীরালাল জনপ্রিয় নাটকগুলির, যেমন 'আলিবাবা', 'বুদ্ধদেবচরিত' ও 'ভ্রমর'-এর নাটকীয় অংশগুলি মঞ্চস্থ অবস্থায় তুলে রাখলেন। অধিকাংশ নাট্যাংশ তোলা হয়েছিল অমরেন্দ্র দত্তর ক্লাসিক থিয়েটারে এবং পরে সে ছবি দেখানো হত সেই হলেই। হীরালাল বিজ্ঞাপনের ছবি করেছিলেন বেশ কয়েকটি, কলকাতার রাস্তায় বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার ছবি তুলেছিলেন। দুটি তথ্যচিত্রও করেছিলেন একটি 'দিল্লী দরবার', অপরটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে। তিনি কোনও বড় ছবি বা কাহিনীচিত্র তুলেছিলেন বলে শোনা যায়নি, যদিও একজন পরিচালক সত্তর দশকে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে হীরালাল ১৯০৪ সালে দু-ঘন্টার একটি ছবি করেছিলেন। কিন্তু এর সমর্থনে কোনও দলিল বা কোথাও কোনও উল্লেখও পাওয়া যায়নি। ছবিটি তো নয়ই। ভায়ের সঙ্গে বিবাদে তাঁদের রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যায় ১৯১৩ সালে। ১৯১৭ সালে তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে তাঁর সব যন্ত্রপাতি ও ছবিগুলি এক বিধ্বংসী আগুনে শেষ হয়ে যায়। বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হীরালাল সেন পুরোধা তথ্যচিত্রকার হিসেবেই পরিচিত হয়ে থাকবেন। প্রথম বড় ও কাহিনীচিত্র করার কৃতিত্ব হল মহারাষ্ট্রের দাদাসাহেব ফালকের যিনি পৌরাণিক কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' করেন ১৯১২ সালে। পরের বছর বম্বের 'করনেশন সিনেমায়' সে ছবি দেখানো হয়।

বাংলা চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যাপারটা একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসার রূপ পায় একজন দক্ষ পার্শী ব্যবসায়ীর হাতে। তাঁর নাম জে এফ ম্যাডান। পশ্চিম ভারত থেকে এসে তিনি লক্ষ করেন বাঙালিদের যাত্রা ও নাটক-প্রীতি। তাকেই কাজে লাগান। ১৯০২ সালে Pathe Frexes কোম্পানি থেকে কিছু ছবি দেখানোর যন্ত্রপাতি কেনেন এবং কলকাতার ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে এবং তার এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস নাম দিয়ে ছবি দেখাতে শুরু করেন। দু-বছরের মধ্যেই তিনি ম্যাডান থিয়েটার লিঃ গঠন করেন। তখন তাঁর হাতে আসে দেশের বিভিন্ন স্থানের কয়েকটি হল। ১৯৩১ সালে তাঁর মালিকানায় হলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৬টি। শুধু ভারতে নয়, সিংহলে ও বার্মায়ও তাঁর হল ছিল। ১৯১৪-১৫ সালে ম্যাডান ছবি প্রযোজনার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেন এবং ১৯১৯ সালে প্রথম বাংলা কাহিনীচিত্র—অবশ্যই নির্বাক্—তাঁর কোম্পানি দ্বারা প্রযোজিত হয়। ১৯১৯ সালের ৮ নভেম্বর 'বিল্বমঙ্গল' দেখানো হয় কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে এবং ছবির পরিচালক ছিলেন একজন পার্শী। ভদ্রলোকের নাম রুস্তমজী দোতিওয়ালা। পৌরাণিক-সামাজিক কাহিনী নিয়ে ম্যাডান থিয়েটার অনেক ছবি তৈরি করেন। নির্বাক্ যুগে মোট ছবি হয়েছিল ১১টি; তার মধ্যে ৬২টিই ম্যাডান থিয়েটার প্রযোজিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির নাম 'বিষবৃক্ষ' (১৯২২), 'শিবরাত্রি' (১৯২৬), 'প্রফুল্ল' (১৯২৬), 'চণ্ডীদাস' (১৯২৭), 'জনা' (১৯২৭), 'সরলা' (১৯২৮), 'কাল পরিণয়' (১৯৩০) এবং 'নৌকাডুবি' (১৯৩২)। ম্যাডানের প্রযোজনায় নির্বাক্ ছবি করে যাঁরা বিখ্যাত হন, তাঁরা হলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি, অমর চৌধুরী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, মধু বসু ও নরেশ মিত্র।

ম্যাডান থিয়েটারের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেক ফিল্ম কোম্পানি গঠিত হয়। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী শুরু করেন ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ডি জি নামেই বিখ্যাত ছিলেন। ১৯২১ সালে তাঁর বিখ্যাত ছবি প্রদর্শিত হয়। ইংল্যান্ডবাসী ভারতীয়দের দেশে ফিরে আসার পর যে ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণ দেখা যায় তাকে নিয়েই এ ছবির কাহিনী। সামাজিক হাস্যরসের ছবি হিসাবে এ ছবি বাংলার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। কমেডিয়ান হিসেবে অভিনয় করার এক প্রোজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ডি জি। চ্যাপলিনের ঢঙে তাঁর অভিনয় বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন ধারার সংযোজন করে। 'বিলেত ফেরত' ছাড়াও তিনি অনেক ছবি করেন। যেমন, 'দি লেডি টিচার', 'দি ম্যারেজ টনিক', 'দি স্টেপ মাদার'। তাঁর আরও একটি অবিস্মরণীয় অবদান হল, তাঁরই প্রচেষ্টায় শিক্ষিত বাঙালি নারীরা সর্বপ্রথম সিনেমায় অভিনয় করতে এলেন। যেমন, ওঁর নিজের স্ত্রী প্রেমলতিকা দেবী এবং পরে মণিকা গাঙ্গুলী প্রমুখ। এর আগে দেহোপজীবিনীদের অভিনয় করার জন্যে আনা হত। ডি জি তাঁর হাস্যরসের সামাজিক থিম ও অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে শুধু নতুন

হাওয়াই বহননি, তিনি বাংলা চলচ্চিত্রকে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ করে তুলেছিলেন। সেদিনের সামাজিক পরিবেশে এটা ছিল বড় অবদান।

অনাদি বসু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অরোরা ফিল্ম কোম্পানি যাদের প্রথম ছবি এক পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে 'দস্যু রত্নাকর' (১৯২১)। সুখের বিষয়, এক উজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে আরোরা কোম্পানি এখনও বেঁচে রয়েছে। এ সময়ে আরও যেসব কোম্পানি ছবি প্রযোজনা বা পরিবেশনার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ইন্ডিয়ান কিনেমা আর্টস, তাজমহল ফিল্ম কোঃ, ব্রিটিশ ফিল্মস লিঃ, আর্য ফিল্মস, গ্রাফিক আর্টস, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফ্‌ট এবং বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিট। এ সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবির নামও করা যেতে পারে। যেমন, 'আঁধারে আলো' (১৯২২), 'সোল অফ দি স্লেভ' (১৯২২), 'জয়দেব' (১৯২৭), 'ফ্লেমস অফ ফ্লেস' (১৯২৮), 'অলীকবাবু' (১৯৩০), 'অপরাধী' (১৯৩০), 'চোরকাঁটা' (১৯৩১) 'চাষার মেয়ে' (১৯৩১), 'নিশির ডাক' (১৯৩২)। প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালকরা হলেন: প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, চারু রায়, প্রফুল্ল রায় ও দেবকী বসু। পরবর্তী কালে এঁরাই অনেক সবাক্ ছবির উপহার দিয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রকে।

নির্বাক্ যুগে সরকার দুটি আইন প্রণয়ন করেন। সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট অফ্ ইন্ডিয়া, ১৯১৮-এর মাধ্যমে সব ছবিকেই সেন্সর করা বাধ্যতামূলক হয়। আর বেঙ্গল অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯২২ সালে চালু হওয়ার ফলে সরকার প্রতিটি টিকিটের দামের সঙ্গে ট্যাক্স আদায় করতে থাকেন।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে নির্বাক্ যুগের একটি মাত্র খণ্ডচিত্র ছাড়া আর কোনও ছবি এখন পাওয়া যায় না। যেটি পাওয়া যায়, তার নাম 'জামাইবাবু'। ১৯৩১ সালে তোলা এই ছবির পরিচালক কালীপদ দাস। স্ল্যাপ-স্টিক ধরনের কমেডির প্রকাশে পরিচালক সার্থক হয়েছিলেন। সেদিনের পত্র-পত্রিকা বা ছবির স্টিল ফটো, পোস্টার, প্রচার-পুস্তিকা বা সেদিনের কোনও মানুষের স্মৃতিসম্পদ। এ সব ছাড়া আর কিছুই আমাদের হাতে নেই যা থেকে নির্বাক্ যুগের ছবি সম্পর্কে জানা যায়।

নানান সূত্র ধরে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে বাংলার নির্বাক্ যুগের ছবিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ছবি ভারতের সব ভাষাতেই হত। বাংলার পৌরাণিক ছবিগুলিতে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি অন্য ভাষার তুলনায় কম হত। হয়ত বাংলার রেনেসাঁর ফসল এটি। দ্বিতীয়ত, নাটক ও যাত্রা বাংলায় জনপ্রিয় ছিল এবং এদের থেকে কাহিনী দিত বাংলা ছায়াছবি। অভিনয়ে থাকত নাটকাভিনয়ের ছাপ। তৃতীয়ত, অনেক ছবির কাহিনীর উৎস ছিল বাংলা উপন্যাস বা ছোটগল্প। সবাক যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব শুধু বাংলায় নয়, অন্যান্য প্রদেশের ছবিতেও পাওয়া যায়। চতুর্থত, বাংলাদেশ তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল। অথচ তা প্রতিফলিত হত না বাংলা চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্র শুধু আমোদ-প্রমোদের উপকরণ ছিল। পঞ্চমত, চলচ্চিত্র তখনও শিল্প (art) হিসেবেও মর্যাদা পায়নি আমাদের দেশে। অথচ নির্বাক্ যুগেই আমরা দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত সুন্দর ছবি হয়েছে, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে প্রকাশভঙ্গিতে! আমেরিকায় গ্রিফিথ করেছেন 'ইনটলারেন্স' ও 'বার্থ অফ্ এ নেশন', চ্যাপলিন করেছেন 'গোল্ড রাশ', রাশিয়ায় আইজেনস্টাইন করেছেন 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন', 'স্ট্রাইক' ও 'অক্টোবর', পুডভকিন করেছেন 'মাদার' সে যুগেই। ডভ্‌ঝেঙ্কো, লুবিশ, ফ্ল্যাহার্টি, গ্রীয়ারসন, ক্যাভালকন্তি চলচ্চিত্রের ভাণ্ডার সাজিয়েছেন নানান রঙে। আমাদের নির্বাক্ যুগের ছবি শিল্পশৈলীর কোনও নিদর্শন হয়ে ওঠেনি।

ভারতে প্রদর্শিত প্রথম সবাক্ ছবি আমেরিকার ইউনিভার্সাল কোম্পানির "মেলোডি অফ্ লাভ"। কলকাতাতেই দেখিয়েছিল ম্যাডান থিয়েটার তাদের এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে ১৯২৯ সালে। ছবিতে শব্দ আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্তন এল। পুরনো যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়ল, নতুন যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক টাকার। স্বভাবতই স্টুডিওগুলি বড় মাপের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিল। বাংলায় চলচ্চিত্র তৈরি করার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতার নিকটবর্তী টালিগঞ্জে। ম্যাডান থিয়েটার ওখানে ১৯৩০ সালে শব্দরোধী এক স্টুডিও তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। একই বছরে বি এন সরকার শুরু করেন নিউ থিয়েটার্স কোম্পানি যা এন টি হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। এন টি ১৯৩১ সালে টালিগঞ্জে ল্যাবরেটরি সহ একটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করে। বি এন সরকার আমেরিকা থেকে টেকনিশিয়ান এনে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আরও কোম্পানি শুরু হয়, যেমন শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স, রাধা ফিল্মস, ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মস, ফিল্ম করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া প্রভৃতি। প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নেওয়ায় চলচ্চিত্র শিল্পে (industry) স্থায়িত্ববোধ এল, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলীরা কাজের নিরাপত্তা পেল।

শব্দ আসায় দ্বিতীয় সমস্যা হয়েছিল সঙ্কুচিত বাজারের। বাংলা ভাষার ছবি চলবে বাংলাদেশে বা বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে। সুতরাং দ্বি-ভাষিক (সাধারণত হিন্দি ও বাংলায়) ছবি তৈরি হতে লাগল। এর একটি সুফল দেখা গেল। বাংলা ভাষার ছবি বাংলাদেশে সুরক্ষিত বাজার পেল। টাকা উঠে আসার সম্ভাবনা দেখা দিল।

বাংলাদেশে সবাক্ চিত্র তৈরি করা শুরু হয়েছিল বিখ্যাত গায়িকা মুন্নিবাই-এর গান গাওয়ার দৃশ্যের ছবি তোলার মধ্য দিয়ে। সেগুলি ১৯৩১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ক্রাউন হলে দেখানো হয়। শুধু এই ছবি নয়, বাংলা ভাষায় প্রথম সবাক্ কাহিনীচিত্র করার কৃতিত্বও ম্যাডান থিয়েটারের। সে ছবির নাম ' জামাইষষ্ঠী', পরিচালক ছিলেন অমর চৌধুরী। দেখানো হয় ক্রাউন হলে ১৯৩১ সালের ১১ এপ্রিল। দু-বছরে ম্যাডান থিয়েটার ১৪টি ছবি করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালে, আর্থিক দুরবস্থার জন্যে ম্যাডান থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। পরের বিশ বছর ধরে নিউ থিয়েটার্স বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করে।

শ্রীসরকার নিউ থিয়েটার্সে অনেক গুণী লোকের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন— কমেডিয়ান ডি জি, পরিচালক দেবকী বসু, অভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া এবং আরও অনেকে। ডি জি-র কথা আগেই বলা হয়েছে। দেবকী বসুর সঙ্গীতের রসবোধ ছিল। তিনি দু-জন বৈষ্ণব সন্ত কবির জীবন নিয়ে ছবি করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ছবি দুটি, 'চণ্ডীদাস' (১৯৩২) ও 'বিদ্যাপতি' (১৯৩৭) গানের জন্য আকর্ষণীয় হয়। ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহার করে ছবির যে নতুন চেহারা নেয়, দেবকী বসু তা দেখালেন 'বিদ্যাপতি'তে। তাঁর হিন্দি ছবি 'পুরাণ ভগৎ' (১৯৩৩) তাঁর জনপ্রিয়তাকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেয়। নিউ থিয়েটার্সের নামও ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন অভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া। আসামের গৌরীপুর রাজ্যের রাজার ছেলে বলে তিনি 'প্রিন্স' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ইউরোপে ফরাসি পরিচালক রেনে ক্লেয়ার ও জার্মান পরিচালক আর্নেস্ট লুবিশের সঙ্গে কাজ করেন। দেশে ফেরেন শব্দ ও আলোর কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এবং এন টি স্টুডিওতে যোগদান করেন। দেবকী বসু যেমন পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হতেন, বড়ুয়ার আকর্ষণ ছিল সামাজিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি। যে ছবি তাঁকে সারা ভারতে অসামান্য জনপ্রিয়তা দেয়, সেটি হল 'দেবদাস' (১৯৩৫)। ছবিটি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাসের চিত্রায়ণ। ছবিটি হিন্দি ও বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। ছবির কাহিনী এক ব্যর্থ প্রেমিকের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কাহিনী ; তার প্রেমিকার বিয়ে হয়েছিল এক বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে। অনেকের মতে 'দেবদাস' ছবিতে রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই

দেখা যাবে পরিচালক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানোর চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহী ছিলেন নায়কের বিষাদঘন জীবনকে দেখাতে। এর কারণও ছিল। বাঙালি দর্শকরা সাধারণত ভাবপ্রবণ হওয়ার ফলে বিয়োগান্ত গল্প, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে আকৃষ্ট হতেন এবং বিরহে কাতর, আত্মপীড়ায় ক্লিষ্ট নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করতেন। ফলে, বড়ুয়া ছিলেন বাঙালিদের বড় প্রিয়। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনি ছবি করেছিলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতে তাঁর চিন্তা স্বচ্ছ ছিল না। যেমন, ১৯৩৮ সালে তোলা তাঁর ছবি 'অধিকার'। বড়লোকের অবৈধ মেয়ে এখন বস্তিবাসী। যেমন করে হোক, এমনকি অন্যায়ভাবে হলেও, সেই মেয়ে ধনী ও সুখী হতে চায়, শেষ পর্যন্ত পারে না। যে সব ভারতীয় পশ্চিমী জীবনধারাকে অনুকরণ করেন, তাঁদের নিয়ে ছবি করলেন 'মুক্তি' ১৯৩৭ সালে। এক ধরনের মার্জিত হাসির ছবি করেছিলেন বড়ুয়া ১৯৩৯ সালে। ছবির নাম 'রজত জয়ন্তী'। বাংলা ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়ার অবদান নিঃসন্দেহে বড় মাপের। কিন্তু তাঁকে খুব বেশি বড় করে দেখা কি খুব যুক্তিসঙ্গত হবে? আজ যদি কেউ তাঁর ছবিগুলি এবং সমসাময়িক কালের পশ্চিমের দেশের কিছু ভাল ছবি দেখেন, তা হলে কয়েকটি কথা তর্কাতীতভাবে তার মনে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যেমন, বড়ুয়ার অভিনয়ে ছিল এক ধরনের mannerism, অর্থাৎ তাঁর কথা বলায় বা চলায় একই ঢঙের পুনরাবৃত্তি হত। একজন উঁচু মাপের অভিনেতার নিশ্চয়ই এটা বৈশিষ্ট্য নয়। পরিচালক হিসেবে তাঁর চিত্রভাষায় বা গল্প বলার রীতিতে কোনও ধরনের উত্তরণ নজরে আসেনি। পশ্চিমের দেশের ছবির তুলনায় এ দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর গল্প বলার রীতিতে ভাবপ্রবণতা প্রাধান্য পায় এবং ফলে, ছবি হয় বাস্তববোধবর্জিত। একজন সমালোচকের মতে, 'His films conjured up a world of cliches and a kind of cheap fatalism, and his heroes, right from Devdas (1935) to Uttarayan (1941) cloistered inside a neurotic dreamworld with their romantic 'death-wish', exude a sloppy sentimentality." ইউরোপে বিখ্যাত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা বাংলা ছবির কোনও উপকার করতে পারেনি বলে মনে হয়।

নির্বাক্ ছবি বাংলা ছবির জগৎ থেকে শেষ বারের মত বিদায় নেয় ১৯৩৬ সালে। সবাক্ ছবি করা শুরু হয়েছে। বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য ত্রিশ দশকের বাংলা ছবির এক বড় বৈশিষ্ট্য। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন নিয়ে চারু রায় করেন 'বাঙ্গালী' (১৯৩৬), মধু বসু অপেরাটিক স্টাইলে তোলেন মিউজিক্যাল ছবি 'আলিবাবা' (১৯৩৭), 'অভিনয়' (১৯৪০) ও 'রাজনর্তকী' (১৯৪১)। মধু বসুর নর্তকী ও তাঁর স্ত্রী, প্রখ্যাত অভিনেত্রী সাধনা বসুর অভিনয় ছবিগুলির সৌষ্ঠব বাড়ায়। শহরে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত প্রকাশ পায় নীতিন বসুর 'দিদি' (১৯৩৭), 'দেশের মাটি' (১৯৩৭) ও 'জীবন মরণ' (১৯৩৯) ছবিগুলিতে। নীতিন বসুর ছবির চিত্রভাষায় ও গল্প বলার রীতিতে নতুনত্ব অর্থাৎ এক ধরনের সিনেমাটিক স্টাইল পাওয়া গেল। নীতিন বসু ও তাঁর ভাই মুকুল বসু যন্ত্রপ্রয়োগে কিছু নতুনত্ব করেছিলেন। যেমন, 'প্লে-ব্যাক' প্রথা প্রথম শুরু করেন নীতিন বসু তাঁর 'ভাগ্যচক্র' (১৯৩৫) ছবিতে।

কয়েকজন সাহিত্যিক ছবি করার কাজে হাত লাগান এই দশকেই। যেমন, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। তবে তাঁদের কাজ বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি।

ছবি সবাক্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের অভিনেতাদের চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু যাঁরা মঞ্চে সফল ছিলেন, তাঁরা চলচ্চিত্রের পাতলা পর্দায় অচল হয়ে পড়লেন। চলচ্চিত্রের সূক্ষ্মতাকে তাঁরা অভিনয়ে ধরতেই পারলেন না। ব্যর্থ হলেন নাটকের বাঘা বাঘা অভিনেতারা—শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ। তবে, ব্যতিক্রম ছিল। যেমন তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সর্বোপরি ছবি বিশ্বাস। এরা সকলেই তাঁদের অভিনয়-দক্ষতা দিয়ে বাংলার চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা ছবির মর্যাদা বাড়িয়েছেন আর একদল শিল্পী। তাঁরা গায়ক-গায়িকা—কাজী নজরুল ইসলাম, রাইচাঁদ বড়াল, কে সি দে, পঙ্কজ মল্লিক ও কানন দেবী।

চল্লিশ দশক বাংলার পক্ষে বড়ই দুর্দিনের সময়। একটি বিশ্বযুদ্ধ, যার ঝাপটা পড়েছিল এই রাজ্যেও। একটি 'মন্বন্তর' (১৯৪৩), স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনে উত্তাল বাংলা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি কিন্তু দেশভাগ, ফলে লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষের পশ্চিমবাংলায় চলে আসা, সব মিলিয়ে বাংলার মানুষের জীবন সেদিন ভীষণ বিপর্যস্ত। এ সব সত্ত্বেও বাংলার চলচ্চিত্র জগতের শিল্পীরা ছিলেন নির্বিকার। একটি দুটি ছাড়া কোনও ছবিতেই বাংলার সেদিনের কোনও বিপর্যয়ই প্রতিফলিত হয়নি। অথচ অন্যান্য শিল্পের শিল্পীরা—গায়ক-গায়িকারা, নাট্যশিল্পীরা, অঙ্কন শিল্পীরা তাঁদের শিল্পমাধ্যমে বাংলার অবস্থাকে রূপায়িত করেছেন।

এ সময়ের জনপ্রিয় ছবি বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪)। শিল্পপতির শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বড়লোকের মেয়ে ও গরিব ছেলের মধ্যে প্রেম—এই ছিল ছবির বিষয়বস্তু। সেদিনের শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত সময়োপযোগী ছিল এই ছবি। ছবির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে দর্শকরা ভিন্নস্বাদের ছবি দেখতে চাইছেন। সে কথা প্রমাণিত হয় হেমেন গুপ্ত-র দুটি জনপ্রিয় ছবি থেকে। ছবি দুটি হল '৪২' (১৯৫১) ও 'ভুলি নাই' (১৯৪৮) এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পটভূমিকায় তৈরি। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাস্তুহারাদের নিয়ে দুটি ছবি হয়েছিল—নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' (১৯৫১) ও সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' (১৯৫২)। এ কটি ছবিই এ দশকের বাস্তবধর্মী ছবি। এর পাশাপাশি একরাশ ছবি হয়েছিল যাদের বিষয়বস্তু ছিল রোমান্টিক প্রেম বা পারিবারিক সমস্যা। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির নাম—'শেষ উত্তর' ও 'গরমিল' (১৯৪২), 'প্রিয় বান্ধবী', 'কাশীনাথ', 'যোগাযোগ' ও নীলাঙ্গুরীয় (১৯৪৩), 'দুই পুরুষ' ও 'ভাবীকাল' (১৯৪৫), 'নৌকাডুবি' ও 'স্বয়ংসিদ্ধা' (১৯৪৭)। যদিও এই ছবিগুলির অধিকাংশেই ছিল এক ধরনের ভাবপ্রবণ নাটকীয়তা, তাই কিছুটা অবাস্তবও। তবুও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় লক্ষ করা গেল। নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতা আরও বেশিভাবে প্রকাশ পেল বাংলা চলচ্চিত্রে। এ ছবিগুলির গল্পের উৎস ছিল উপন্যাস এবং বাংলা উপন্যাসে সে সময় এই জটিল সম্পর্কের নানান চিত্র তুলে ধরা হচ্ছিল।

পৌরাণিক কাহিনীচিত্রও সে দশকে তোলা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি খুব জনপ্রিয় হতে পারেনি। অন্তত ভারতের অন্যান্য ভাষায় পৌরাণিক কাহিনীচিত্রের জনপ্রিয়তার তুলনায় তো নয়ই। এর কারণ বোধহয় দুটি। প্রথম, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের জাগরণ। দ্বিতীয়, জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত ও রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্তকে পৌরাণিক কাহিনী সেভাবে টানতে পারেনি।

এ সময়ে যে ছবি চিত্রভাষার শৈলী ও নতুনত্বের জন্যে ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকবে, সে ছবি হল 'কল্পনা' (১৯৪৮)। ছবিটি হিন্দিতে, মাদ্রাজে তোলা। তবুও উল্লেখ করার কারণ, ছবিটির পরিচালক হচ্ছেন প্রসিদ্ধ বাঙালি নর্তক উদয়শঙ্কর এবং স্বভাবতই বাঙালির চিন্তাধারা, মানসিকতা তাতে প্রকাশ পেয়েছে। উদয়শংকর সিনেমার গতিশীলতায় তাঁর নাচের পরিকল্পনাকে বাঁধতে পেরেছিলেন আশ্চর্য সুন্দরভাবে। আরও একটি হিন্দি ছবির কথা মনে পড়ে এ প্রসঙ্গেও। তারও পরিচালক বাঙালি। ছবিটি হচ্ছে 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৬), বিমল রায় পরিচালিত। বিষয়বস্তুতে ও প্রকাশভঙ্গিতে বাস্তবধর্মী ও নতুন।

ভারতের চলচ্চিত্রে যেমন, তেমনি বাংলা চলচ্চিত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল এই দুটি ছবি। এই যুগের বিখ্যাত পরিচালকরা হলেন প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, নীতিন বসু, হেমেন গুপ্ত, নরেশ মিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজানন্দের ছবি 'শহর থেকে দূরে' (১৯৪৩) ও 'মানে না মানা' (১৯৪৪), খুবই জনপ্রিয় হয়।

যুদ্ধের পরে কালো টাকার আমদানিতে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্টুডিও বা ল্যাবরেটরি বা প্রযোজনার ক্ষেত্রে যে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছিল, তা নড়বড়ে হয়ে পড়ে। কিন্তু ছবির প্রযোজনা কিন্তু থামেনি ; বরং ছবির সংখ্যা বেড়েছিল (নীচে টেব্‌ল্ দ্রষ্টব্য) বোধহয় কালো টাকার জন্যে।

সাল :	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯
প্রযোজিত ছবির সংখ্যা :	১৫	৩৩	৩৭	৬২

দেশভাগের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল বাংলা ছবিতে ১৯৫০/৫১ সালে। বাংলা চলচ্চিত্রের বাজার অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে। অনেক স্টুডিও বন্ধ হয়ে যায়। এক বিধ্বংসী আগুনে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর যন্ত্রপাতি ও অধিকাংশ ছবিই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাংলাদেশ ছেড়ে অনেক পরিচালক, অভিনেতা ও কলাকুশলী—বিমল রায়, নীতিন বসু, কেদার শর্মা প্রমুখ বোম্বাই শহরে পাড়ি দেন।

বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য, নতুনত্ব, কিছুটা বাস্তবধর্মিতা এবং আঙ্গিকেও অনেকটা বাস্তববোধ থাকা সত্ত্বেও, চল্লিশ দশকের বাংলা ছবি কিন্তু উন্নত চলচ্চিত্রের ভাষা দিতে পারেনি। সে সময় বাংলা চলচ্চিত্র ছিল সাহিত্য বা নাটকাশ্রয়ী। সাহিত্যের বা নাটকের ভাষা থেকে চলচ্চিত্রের ভাষা যে ভিন্ন ধর্মের এ কথাটা অপরিচিত ছিল। চলচ্চিত্রের গতিশীলতা শব্দের প্রবর্তনে যা নতুন চেহারা নিয়েছিল বা অল্প সময়ে একটি সুসঙ্গত নাটকীয় নকশায় গল্প বলা অথচ সূক্ষ্মভাবে, চলচ্চিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমাদের পরিচালকরা উপলব্ধি করতে পারেননি। এই দুর্বলতা আমাদের চোখে আরও বেশিভাবে পড়ে যখন আমরা পাশ্চাত্য দেশে সে সময়ে যে সব ভাল ছবি হয়েছে সেগুলি দেখি।

১৯৪৮ সালে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় সিনেমার ওপর এক প্রবন্ধ লেখেন : 'In India it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. Often by a queer process of reasoning movement was equated with action and action with melodrama.'' তিনি আরও লেখেন, 'What the Indian cinema needs today is not more gloss, but more imagination, more integrity and a more intelligent appreciation of the limitations of the medium... What our cinema needs above everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema, which would be uniquely and recognisably Indian''. এর সাত বছর পরে সত্যজিৎ নিজেই Uniquely Indian ছবিটি করে ভারতীয় ও বিশ্বের চলচ্চিত্রের দরবারে উপহার দিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় কয়েকজন চলচ্চিত্রপ্রেমী ও বুদ্ধিজীবী যুবক, যাঁরা মনে করতেন চলচ্চিত্র একটি শিল্পমাধ্যম (art form), যাঁরা চলচ্চিত্রে জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন তার বাস্তবতার মধ্যে ('life in its realities'), যাঁরা ভাবতেন ও স্বপ্ন দেখতেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্যে একটি অন্য পথের, তাঁরা উন্নতমানের বিদেশি ছবি দেখবার বাসনায় গড়লেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, সেটা ১৯৪৭ সাল। ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের গোড়াপত্তন হল এভাবেই। এই যুবকদলে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নিমাই ঘোষ, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও আরও অনেকে। পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন। এই আন্দোলনের ফসল হিসেবে আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি অগণিত চলচ্চিত্র-প্রেমী দর্শক, কয়েকজন চলচ্চিত্রের সমঝদার, সমালোচক এবং কয়েকজন প্রতিভাবান পরিচালক ও কলাকুশলী।

১৯৪৯-৫০ সালে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জাঁ রেনোয়া আসেন কলকাতায় 'দি রিভার' ছবিটির শুটিং করতে। সত্যজিৎ রায় ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত ছবির শুটিং দেখতে যেতেন। হরিসাধন দাশগুপ্ত রেনোয়ার সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। তাঁরা রেনোয়ার সঙ্গে চলচ্চিত্র করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। রেনোয়া তাঁদের বলেছিলেন, 'হলিউডের ছবি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল, তাহলে তোমরা ভাল ছবি করতে পারবে।' যে বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে সত্যজিৎ কাজ করতেন, তারা তাঁকে লণ্ডনে পাঠায়। সেখানে সত্যজিৎ অনেক ছবি দেখেন, বিশেষত ইটালিয়ান নিও-রিয়ালিস্ট পরিচালকদের—ডি সিকার ও ভিসকন্তির।

১৯৫১ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাস্তুহারা লোকদের নিয়ে নিমাই ঘোষ তৈরি করেন 'ছিন্নমূল' ছবিটি। শিয়ালদহ স্টেশনে এই ছবির অনেকটা শুটিং হয়েছিল। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে বাস্তবধর্মী এই ছবি সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন 'a major milestone in the growth of a socially conscious cinema in India.' ছবিটি কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য পায়নি। নিমাই ঘোষ পরে মাদ্রাজে চলে যান এবং সেখানে ছবি পরিচালনা করেন তামিল ও কানাড়ী ভাষায় বা কোনও কোনও ছবিতে চিত্রগ্রহণের কাজ করেন। তিনি মারা যান ১৯৮৮ সালে। ১৯৫১ সালে পুডভ্‌কিন ও চেরকাসভ এবং পরে জন হাস্টন কলকাতায় এলে ফিল্ম সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের সঙ্গে ছবি করার নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৫২ সালে ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব হয় বোম্বাই শহরে। কলকাতাতেও উৎসবের অনেক ভাল ভাল ছবি (কুরোসাওয়ার 'রশোমন', ডি. সিকার 'বাই-সাইকেল থিফ' ও 'মিরাকল অফ্ মিলান', রসোলিনির 'ওপেন সিটি' প্রভৃতি) দেখানো হয়। এ সব ঘটনার সম্মিলিত ফলে ভারতে ছবি করা ও দেখার জন্যে নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখা দিল।

ইংল্যান্ডে থাকার সময় এবং ফেরার পথে সত্যজিতের মনে ছবি করার বাসনা দৃঢ় প্রত্যয়িত রূপ নেয়। ফেরার পথে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির স্ক্রিপ্টের একটি নকশা তৈরি করেন। দেশে ফিরে তাকে চূড়ান্ত রূপ দেন। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শুটিং শুরু করেন। শুটিং হত শনিবার বা রবিবার। কারণ তখন পর্যন্ত সত্যজিৎ বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কাজ করেন। আর্থিক সমস্যার সমাধানে সত্যজিৎ তাঁর বই, রেকর্ড ও পেইনটিং-এর সংগ্রহ সবই বিক্রি করেন। একটা সময় ছবি করা বন্ধ হয়ে গেল টাকার অভাবে। শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এলেন অর্থ সাহায্য করতে। ছবি শেষ হল। সিনেমা হলে রিলিজ হল ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ও বাংলার বুদ্ধিজীবীরা এই নতুন ধরনের চলচ্চিত্র ও তার সৃষ্টিকর্তাকে স্বাগত জানাল। এর দুই মাস আগে ছবিটি নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অফ্ মডার্ন আর্টে দেখানো হয়েছে এবং বহু প্রশংসা পেয়েছে। ভারতীয় ছবির এত দিনের নাচ-গানের ফর্মুলা, বিষয়বস্তু প্রকাশে ভাবপ্রবণতা বা নাটুকেপনা বা সাহিত্যিক মেজাজ, সব কিছুকেই ভেঙে দিল সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'। যে চিত্রভাষার অভাবে ভারতীয় ছবি পাশ্চাত্যের কোনও ভাল ছবির সমতুল্য হতে পারত না, সেদিন তা সম্ভব হল। সত্যজিতের ছবির গীতিময়তা, কাব্যিক ছন্দময়তা, কাহিনীর অংশে ছন্দময় নাটকীয়তা এবং সর্বোপরি তাঁর ছবির মানবতাবোধ এ সব মিলেমিশে তাঁর ছবিকে দিয়েছে এক অসাধারণ শৈল্পিক উৎকর্ষ। তাঁর চিত্রভাষা ও ছবি সমাদৃত হল পৃথিবীর বিখ্যাত পরিচালকদের ও সমালোচকদের দ্বারা ; ভারতীয় পরিচালকদের কাছে নতুন পথ খুলে দিল।

পার্থ রাহা

বাংলা চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর

১৩০০ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি সময়, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আগের দিনগুলিতে ফিরে যেতে আমরা চাই না। দিনগুলি ভুলতে চাই। কেননা, সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয় ১৩৫০। বাংলার সুখী সুখী সবুজ গ্রামজীবন ভেঙে খান খান। এল আকাল, এল মন্বন্তর। মানুষের তৈরি আকাল। দেশে অনাবৃষ্টি নেই, খরা নেই; বন্যা নেই। তবু দুর্ভিক্ষ। কলকাতার পথে পথে শুধু 'ফ্যান দাও' ধ্বনির আর্তনাদ। বাংলার অর্ধেক মানুষ সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মন্বন্তরের প্রভাব বাংলার সমস্ত শিল্পীমনে ধাক্কা দিয়েছে। ধাক্কাটা আসলে এসেছিল ১৯৪০-এর পর। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আইনি জন্ম হল ১৯৪৩-এর ১ জুন। আর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলন হয় তার কিছু আগে '৪৩-এর ২৫ মে। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রভাব তখনও তেমন সর্বব্যাপী নয় যে নতুন ছাত্র-যুব-শিল্পীরা কমিউনিস্ট প্রভাবিত সংগঠনে একাত্ম করে ফেলবেন নিজেদের। একদিকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের মরণপণ লড়াই। অন্যদিকে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের স্বাধীনতা আন্দোলনের দোদুল্যমানতা, সেদিনের তরুণদের প্রথাসিদ্ধ দলগুলি সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটিয়েছিল। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে তাঁরা সেদিন সমবেত হয়েছিলেন। মহামন্বন্তর আর বুর্জোয়া মানবতাবাদের তীব্র আকর্ষণে তাঁরা সেদিন জমায়েত হয়েছিলেন গণনাট্য সংঘের বিশাল তাঁবুতে। সেদিনের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন।

১৯৩১ থেকে '৪০ পর্যন্ত কমবেশি আড়াইশোর ওপর বায়োস্কোপ তৈরি হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রের তখন রমরমা অবস্থা। পরিচালক, তারকা, নায়ক-গায়করা, সরকারমশাইরা জুড়িগাড়ি চেপেছেন, কিন্তু জীবনের ছায়াছবি 'নতুন থিয়েটারের' মুখোমুখি হাতির শুঁড় কোনদিন দেখতে পাননি।

'৪৩-এর গণনাট্য আন্দোলন বাংলা ছায়াছবির সেই না হওয়া কাজটাই করেছিল। বাংলা সিনেমা 'মধুবংশীর গলিতে' প্রবেশ করল। প্রথম যে ছবি চারদিকে নতুন কথা শোনাল তার নাম 'উদয়ের পথে', পরিচালক বিমল রায়। ১৯৪৪ সালে। কাহিনীর কাঠামো ধনীকন্যা আর গরিব নায়ক। কিন্তু বাংলা ছবিতে মালিকের শোষণ, শ্রমিকের প্রতিবাদ, এমনকি কার্ল মার্কসের ছবি পর্যন্ত স্থান পেল। আজ হয়তো আমাদের সেই সব সাজানো সংলাপ, লোকদেখানো ইনটালেকচুয়ালিজ্‌ম অসহ্য মনে হবে; কিন্তু সেদিন তার বিষয়-বৈচিত্র্যে, উপস্থাপনায়, নতুন দিকচিহ্ন হিসাবে 'উদয়ের পথে'-কে যোগ্য সম্মান দিতেই হবে। ছবিটির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল হাল-আমলের 'কলাবতী ছায়াছবি' বা 'আর্ট ফিল্মে'র মতো 'খাঁ-খাঁ' সিনেমা হৌস উপহার পায়নি। সেদিনের 'হিট' ছবির তালিকায় 'উদয়ের পথে'-র নাম ছিল সামনের সারিতে। সত্যজিৎ রায় 'উদয়ের পথে'র বিশ্লেষণ সঠিকভাবেই করেছিলেন। "timely in its theme, bold its use of unknown amateurs in leading roles and admirable in its moral stand. It was step in the right direction."

গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল 'উদয়ের পথে'র উপর। শুধু আদর্শের নয়, ভঙ্গিমাতেও। জনগণের চাহিদার কথা বুঝতে পেরেছিলেন পরিচালক। 'নবান্ন' বা 'নবজীবনের গান' থেকে পরিচালক-প্রযোজকরা এই শিক্ষা পেয়েছিলেন 'স্টুডিও' বা 'স্টার' কোনও প্রথা বা 'সিস্টেম' বা কাল্পনিক মনোরঞ্জক কাহিনী দর্শকদের মন ভোলাতে পারবে না। চাই জীবন—জীবন থেকে নেওয়া ছবি। অজ্ঞাতকুলশীল কুশীলবদের ভিতর তারা স্বপ্নলোকের তারকাদের নয়, তাদেরই মতন, যে কেউ হতে পারে এমন চরিত্রদের খুঁজে পেয়েছিল।

এরই ফাঁকে দেশ স্বাধীন হল। হোক দ্বিখণ্ডিত, হোক ছিন্নমূল মানুষের বন্যায় ভেসে যাওয়া কলকাতার রাজপথ। জানি, "বাংলায় বিহারে গড়মুক্তেশ্বরে/বিকলাঙ্গ কাঁধে/ লোক চলে গোরস্থানে/ কিম্বা পোড়াবার ঘাটে" (সমর সেন)। জানি, লালকেল্লায় যখন উড্ডীন জাতীয় পতাকা আর আতসবাজির মহোৎসব, তখন শিয়ালদহ স্টেশনে হাজার লাখো মানুষের চিরদিনের মতন দেশ ছাড়ার, সব হারানো কান্নার আর্তনাদ। তবু মানতেই হবে আমাদের দেশের বিগত তিনশ বছরের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আমাদের স্বাধীনতা। হোক দ্বিখণ্ডিত, হোক দেশ ভাঙার অভিশাপে অভিশপ্ত। তবু।

সেদিনের সেই ছিন্নমূল মানুষেরা বাংলা চলচ্চিত্রে এল গণনাট্য সংঘেরই এক কর্মীর ক্যামেরায়। ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৫১-য়। গণনাট্যের কর্মিটি হলেন পরিচালক নিমাই ঘোষ। ছবির নাম 'ছিন্নমূল'। গণনাট্যের তখন সুখের সময় নয়। ভাঙন আর ভাঙন। ভাঙনের কাটা টুকরো সর্বত্র। কিন্তু যে শিল্পী গণনাট্য সংঘের আদর্শে একবার স্নাত হয়েছেন তিনি কী করে ভুলবেন তার কথা? দেশ ভাঙার তছনছ করা জীবনের দলিল 'ছিন্নমূল' কুশীলবরা ছিলেন গণনাট্যের প্রাক্তন কর্মীরা। যেমন ছিলেন ঋত্বিককুমার ঘটক।

যে কথা বলছিলাম, স্বাধীনতার প্রভাব পড়বেই সাধারণ মানুষের জীবনে। প্রভাব দ্বিমুখী—একদিকে স্বাধীনতার কাছে আমাদের অনেক কিছু চাওয়া, অনেক আশা, আর অন্যদিকে কিছুটা অন্তত নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা চেষ্টা। পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির অতি বামপন্থার ভ্রান্ত নীতি চিন্তাজগতে পাঁচিল তুলল ১৯৪৮ থেকে '৫২ আমাদের শিল্পীমনকে অনেকখানি স্তব্ধ করে দিয়েছিল। 'এ আজদী ঝুটা হ্যায়'—স্লোগান ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ভুলের মাশুল ভাঙাচোরা কমিউনিস্ট পার্টি আর তার হাজার মরণজয়ী শহীদ, আরও হাজার আলিপুর, দমদম, বক্সারের বন্দি।

তবু সেই সময় তৈরি হয়েছিলেন কিছু যুবক। তাঁরা দেখলেন 'মন্বন্তর', 'রশিদ আলি দিবস', দেখলেন স্বাধীনতা। নতুন যুবকের কাছে আশা—নিজের পায়ে দাঁড়াবার আশা। পাশাপাশি তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপের লড়াই এবং পরাজয় এবং হতাশা। এ সমস্ত কিছু নিয়েই সেদিনের যুবকেরা তৈরি হচ্ছিলেন। বহু দশক আগে, ১৯১৭-র বরফ ঝরা অক্টোবরের মস্কোয় এক টালমাটাল অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন আইজেনস্টাইন, ডবঝনকো, কুলেশভ, পুডভকিনরা। একঝাঁক নতুন প্রতিভা। সঙ্গে আরও অনেককে নিয়ে। 'বড়তেই দাও যদি ছোটর উপমা' (বিষ্ণু দে)—তেমন করেই দেখলাম চল্লিশের সেই ভয়ানক সময়ে, সেই দুর্যোগের সময়ে। সেই আনন্দের সময়ে একই রকমে বেরিয়ে এসেছেন সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণালরা, সঙ্গে রাজেন তরফদারদের মতন আরও কয়েকজন। দুঃখ-বেদনা-আনন্দে ভরা সময় তাঁদের একেক জনকে একেক ভাবে ধাক্কা দিয়েছে। আক্রমণ করেছে। আক্রান্ত করেছে। একদিকে পরাজয়ের হতাশা অন্যদিকে ফেলে আসা গণনাট্য আন্দোলনের আদর্শের যে প্রভাব তাঁদের মনে, জ্ঞানে, অজ্ঞানে, চেতনায়, অচেতনে, অবচেতনে ছাপ ফেলে দিয়ে গেছে।

অনেকেই বলে থাকেন '৫২ সালের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নাকি আমাদের তরুণদের এমনই প্রভাবিত করেছিল যে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ থেকে তাঁরা নব্যবাস্তববাদের কথা ভাবতে শুরু করেন। বাস্তব ঘটনা কিন্তু একেবারেই সেকথা বলে না। জীবন আর জীবনসংগ্রামের কথা নিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে হবে—একথা বিলেত থেকে জুড়িগাড়ি চেপে আসা নিও-রিয়ালিজম শেখায়নি। এই অনুভূতি সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালদের রক্তে-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল গণনাট্য আর বস্তুনিষ্ঠ জীবনধারা থেকেই।

'পথের পাঁচালীর' সম্মান ভাগ হত 'নাগরিকে'র সঙ্গে, যদি ছবিটি দর্শকের দরজায় পৌঁছতে পারত ১৯৫৫-র আগে, 'নাগরিক'ই বাংলার প্রথম 'Political Cinema'—রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে তৈরি করা ছবি। ঋত্বিক ঘটকই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত প্রথম পরিচালক। 'নাগরিক' ছিল সেদিনের অতিহঠকারিতাজনিত হতাশার প্রতিচ্ছবি। অর্থনৈতিক ভাঙনে মধ্যবিত্ত সর্বহারার সঙ্গে মিশে যাবে। মধ্যবিত্ত নায়কের সুখী জীবনের স্বপ্নকে ভেঙে ঋত্বিক তাকে বস্তিতে তুলে নিয়ে আসেন। কিন্তু নাগরিকের বস্তিবাস রাজনৈতিক উত্তরণ নয়। নিতান্তই আর্থিক ভাঙনের ফল। এ এক মূল্যবোধের লড়াই সেই কথাটা ছবিতে আসেনি। তবু পরিচালকের দুর্জয় সাহসের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই ফ্রেম থেকে ফ্রেমে।

সত্যজিৎ রায় ১৯৫৫-তে যখন ছবি করতে এসেছেন তখন তিনি সরাসরি কোনও কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁর মনন তৈরি হয়েছিল ব্রাহ্ম যুক্তিবাদের ভিতর দিয়ে। কিন্তু যৌবন লালিত হয়েছে চতুর্দিক বেষ্টিত বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে—এক বামপন্থী ঘরানার ভিতর দিয়ে।

'পথের পাঁচালীর' চেয়ে উন্নতমানের ছবি 'অপরাজিত', তবু 'পথের পাঁচালী' আমাদের যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি কেন ? সিনেমা যে নাটক নয়, অনেক কথা বলে যাবার জিনিস নয়, সে যে একটা নতুন শিল্পমাধ্যম এ কথা আমাদের কেউ জানাননি। বাংলায় বহু ভাল ছবি তৈরি হয়েছে। বহু ভাল ভাল সংলাপ জুড়ে আছে প্রথম 'দৃশ্য' থেকে 'সমাপ্ত' লেখা টাইটেল পর্যন্ত। প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো চিন্তাবিদরাও এসেছেন। তবু বাংলা চলচ্চিত্র 'সিনেমা' হয়ে ওঠেনি। 'পথের পাঁচালী' আমাদের জানাল চলচ্চিত্র এক স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম। আর 'নাগরিক'ই হচ্ছে প্রথম ছবি যে সিনেমার ভাষাকে অনুভব করতে পেরেছিল। সত্যজিৎ রায় ঠিক এই কারণেই 'নাগরিক'কে ভারতীয় সিনেমার প্রথম পথিকৃৎ বলেছিলেন।

'পথের পাঁচালীর' অপু অপাপবিদ্ধ অপু, নিষ্পাপ অপু, এক অজানা বিস্ময়ে তাকানো অপু। সে কাশফুলের ভিতর দিয়ে, ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে, নতুন নতুন জগতে এগিয়ে যাচ্ছে থমকে দাঁড়াচ্ছে না। তার অভিজ্ঞতায় হতাশা আছে, অমানবিকতা আছে, দুঃখ আছে, আছে মৃত্যু। কিন্তু পাশাপাশি নীল আকাশ আছে, আছে কাশফুল, কোনও অজানা স্টেশনে চলে যাবার মতো এক ট্রেনের হুইসিল এবং ট্রেন। স্বাধীনতার পর নতুন যুগের আশা, 'পথের পাঁচালী' আমাদের নতুন যুগের কথা বলেছে। 'অপরাজিত'তে অপু কলকাতায় এসেছে। কলকাতা তার কাছে এক নতুন ঠিকানা, নতুন উচ্চাশা। এখানেও 'দূরে-দূরে কোথাও' চলে যাবার হাতছানি। জাহাজের বাঁশি। স্বাধীনতা-পরবর্তী নতুন যুগের প্রতি আশার কথা—নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ অপরাজিত এই কথা 'অপু ট্রিলজি' থেকে আমরা পাই। আর সেই কারণেই 'অপুত্রয়ী' ভারতের সিনেমার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রসঙ্গত এই কলকাতাকেই আর-একটি ছেলে দেখেছে সেই সময়েই। সেও এক নিষ্পাপ শিশু। নিতান্ত মজা করতে কলকাতায় এসেছিল। আমি ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র কথা বলছি। তার কাছে এই কলকাতা হল সেই শহর যেখানে খাবার পাওয়া যায় না। সেখানে কুকুর আর মানুষ একই সঙ্গে একই জায়গায় পচা খাবার খায়। কলকাতা বিষময়, কলকাতা 'হার্ড রিয়ালিটির' কলকাতা।

'অপু ট্রিলজি', 'বাইশে শ্রাবণ', 'গঙ্গা', 'অযান্ত্রিক' বিদেশ থেকে ধার করা নিও-রিয়ালিজ্‌ম থেকে জন্ম নেয়নি। জন্ম নিয়েছিল সামন্ত-বিরোধী, জমিদার বুর্জোয়া শাসক-বিরোধী শ্রেণীচেতনার আদর্শ থেকে। 'বাইশে শ্রাবণে' তাই বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা। পরিচালককে তাড়া করে বেরিয়েছে পঞ্চাশের আকাল। তাই উনষাটের সরকারি হিংসার রঙে রাঙা খাদ্য আন্দোলনের পূর্বাভাস। 'কোমল গান্ধারে'র বিষয় হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ভাঙন, পাশাপাশি ভাঙা দেশের দোমড়ানো চাপা কান্না। কিন্তু ছবিটি তার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলল। হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত ঈর্ষা আর বিদ্বেষের দিশাহীন ছবি। তাই দলিল হয়ে উঠতে পারল না। তবু ঋত্বিক, একমাত্র ঋত্বিকই বারবার চেষ্টা করেছেন সৎ মূল্যবোধের আদর্শকে তুলে ধরতে, তুলে ধরার কথা ভাবতে, আর সেই ভাবনাকে আমাদের মধ্যে অনুরণিত করতে। মানুষ 'বায়োস্কোপ' দেখতে আসে আনন্দ পেতে। আর চলচ্চিত্রকারের উদ্দেশ্য হল তাকে শিক্ষিত করা। দর্শক তাদের বঞ্চনাময় জীবনের বাইরে কোনও এক স্বপ্নলোকের বাস্তবতাকে ছুঁতে চায় দু-আড়াই ঘণ্টায়। চলচ্চিত্রকারকে সেই কল্পলোকের কথার মাঝে শোনাতে হবে তার কথা। 'সুবর্ণরেখায়' তাই আমরা বাস্তবের দিনলিপি দেখি না, দেখি বাস্তবের বিপর্যয় আর ধ্বংসের ছবি। নবজীবনের মানুষরা আজও ছুটে চলেছে নতুন বাড়ির জন্য। কিন্তু, কোথায়, কোথায় সেই নতুন বাড়ি ?

ত্রিশের দশককে যদি বাংলা বায়োস্কোপের লক্ষ্মীলাভের যুগ বলি, তো পঞ্চাশের দশককে অবশ্যই নতুন ভাবনাচিন্তা-চিন্তাচেতনার দশক বলে চিহ্নিত করা যায়। সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল-রাজেন-বারীন সাহা এমনিতরো বেশ কিছু তরতাজা ভাল ছবি, জীবনের ছবি করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিষয়-বৈচিত্র্যেও সেদিনের বাংলা সিনেমা ছিল ভরপুর। সুন্দরবনের মালো থেকে একদা অন্তঃপুরবাসিনী মধ্যবিত্ত রমণীর সংগ্রাম—এই বিস্তীর্ণ পটভূমিকাই ধরার চেষ্টা করেছিলেন সেদিনের চলচ্চিত্রকাররা। কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই ভয় পাননি। 'কাঞ্চনজঙ্ঘার' মতো অসাধারণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের ছবি এ সময়েরই ফসল। স্বাধীনতা তখনও কৈশোর অতিক্রম করেনি। এর মাঝেই মানুষের আশা, হতাশায় রূপান্তরিত হয়েছে '৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনে। এরই পাশে পাশে জাঁকিয়ে বসেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী থেকে পাওয়া ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় এক নগণ্য যুবক প্রতিবাদ করছে। একজন ব্যক্তির প্রতিবাদ, কিন্তু এখানে সে ব্যক্তি নয়। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। রায়সাহেব যখন বেকার যুবককে অনেক নীতিজ্ঞান শুনিয়ে চাকরির ভিক্ষা দিতে চাইলেন—সে সরাসরি সে ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করল। সেই যুবকটি কলকাতায় থাকলে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারত? কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে, ট্রামের ঘর্ঘর সরিয়ে বেলভেডিয়ার রোডে সেই গা-ছমছম করা আলসেসিয়ান পোষা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলত তাহলে সেটি হত সম্পূর্ণ অবাস্তব। ইচ্ছাপূরণের কল্পনা। বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা পথিকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সাহস জুগিয়েছে যে মানুষরা চিরকাল হেরে এসেছে তারাও মুখের মতো জবাব দিতে পারে এই ত দেখলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে।

পঞ্চাশের শেষ বা ষাটের দশকে বিভিন্ন পরিচালক মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। সত্যজিৎ 'মহানগরে' বা ঋত্বিক 'মেঘে ঢাকা তারা'য় মধ্যবিত্ত নারীর সংগ্রামকে সামনে এনেছেন। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় জীবনের কথা বলতে চেয়েছেন। সব কিছু হারিয়েও বাঁচার হাহাকার। নায়িকার আকুল আবেদন 'দাদা, আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম'। 'সুবর্ণরেখা'তেও সর্বব্যাপী ধ্বংসের পরেও নতুন যুগের মাণবক এগিয়ে চলেছে। সে জানাচ্ছে 'জয় হোক মানুষের'। মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কোনদিন পরাজিত হবে না।

আমাদের এই তরুণরা যখন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন আমাদের সমালোচকরা,'চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা' দর্শক তৈরি করার কাজে তাঁরা কি যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন? বিদেশ থেকে সাহেবদের দেওয়া পুরস্কার নিয়ে দেশে ফেরার পরই কেবল তা দেখে দলে দলে বাঙালি দর্শক মোহিত হল। ভারতের সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতার শিল্পমনস্কতা ইত্যাদি দেখে সারা ভারত মুগ্ধ হল। এই বিপুল শিল্পমনস্কতার আরও পরিচয় পাওয়া গেল যখন উন্নততর শিল্পকর্ম 'অপরাজিত' বা 'অযান্ত্রিক'-এর প্রতি দর্শকরা মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'তেরো নদীর পারে'র মতো জীবনধর্মী অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম সমালোচকদের স্নেহস্পর্শ পেল না। কিন্তু অশিক্ষাকে অর্ধশিক্ষার মোড়কে ঢেকে রাখার চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। হঠাৎ শোনা গেল নিও-রিয়ালিজম্ নাকি বাংলা সিনেমায় একেবারে জুড়িগাড়ি চেপে চলে এসেছে। পাঠক যদি সে যুগের পত্র-পত্রিকা একটু উল্টে-পাল্টে দ্যাখেন ত দেখবেন, নিও-রিয়ালিজমের এক বিরাট লিস্টি। 'চলাচল', 'পঞ্চতপা', 'দীপ জ্বেলে যাই'—সবই নিও-রিয়ালিজম্। এমনকী ডাকহরকরার ভূমিকায় যুবতী তরুণীকুলের হৃৎকম্পকারী ম্যাটিনি আইডলকে নির্বাচন না করাও নাকি নিও-রিয়ালিজম্।

ফলে যা হবার তাই হল। আমাদের সমান্তরাল ছবির নির্মাতারা দর্শক পেলেন না। শূন্য সিনেমা হৌস। তাই তাঁরা উটপাখি হলেন। মৃণাল সেন বিজ্ঞাপনী মডেলকে উলঙ্গ করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতীকী লড়াইয়ে নামলেন। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র ঋত্বিক এক সিনিক বুদ্ধিজীবী। যেন অনেক উপরে বসে সমালোচনা করাই তার কাজ। আর নিজে আকণ্ঠ তরল রক্তে ডুবে 'আমি কনফিউজড্' বলে আত্মসমালোচনা করে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতার সমাপ্তি, জঙ্গলের লড়াইয়ে যোদ্ধাদের বোঝাচ্ছেন তাদের পথ ভুল। সেই যোদ্ধাদের পথ ভুল ছিল আজ তা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ভুল দেখানোর জায়গা লড়াইয়ের ময়দান নয়। ছবিতে নেই ভুলের বিশ্লেষণ। আছে বুদ্ধিজীবীসুলভ হতাশ অহমিকা।

আর সত্যজিৎ? যখন সারা পৃথিবী লড়ছে। লাতিন আমেরিকায় 'সিনেমা ভেরিতে'-র জনক ফার্নান্দো সোলানাস 'অ্যান আওয়ার অব ফারনেস' তৈরি করছেন। 'ব্যাটল ফর চিলি' তৈরি হচ্ছে এবং এই কলকাতায় তখন প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের শিকার হচ্ছেন তরুণরা, কলকাতার রাজপথে বহু অপাপবিদ্ধ কিশোর-তরুণের মৃতদেহ। মারা যাচ্ছে ময়দানে-ঘাসে, মারা যাচ্ছে ভোরের শহরে। ঠিক সেই সময় কিছু যুবক-যুবতী বিক্ষুব্ধ শহর থেকে দূরে—দূর অরণ্যে কিছু কাজ করার সময় পাচ্ছে না। নির্জন অরণ্যে মাদুর পেতে রোদ্দুরে গা এলিয়ে নামের খেলায় মেতেছে যেখানে কেনেডি, মাও-ৎসে-তুং রবীন্দ্রনাথ সবাই সমান। কিংবা 'প্রতিদ্বন্দ্বীর' সিদ্ধার্থর সামাজিক দায়বদ্ধতা শুরু ভাইকে গুয়েভারার ডায়েরি উপহার দিয়ে। শেষ হয় 'রাম নাম সৎ হ্যায়' ধ্বনিতে, অথবা 'সীমাবদ্ধ'র নায়ক যেমন করে হোক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। প্রথমে দ্রুত, ধীরে ধীরে দ্রুততা কমে আসছে। তারপর বহু কষ্টে উপরে উঠে আসা। কিন্তু তবু তিনি সত্যজিৎ রায়। সব কিছু ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথের পর আমাদের চারপাশের ধূ-ধূ চিন্তাহীনতার মধ্যে একমাত্র মরূদ্যান। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। জরুরি অবস্থার ঘন অন্ধকারময় দিনগুলিতেও 'জন অরণ্য' সৃষ্টি করার ক্ষমতা আর সাহস রাখেন। 'সদগতি'তে ছুঁড়ে দিয়ে শোষিতদের শোষণবাদের প্রতি শ্রেণীঘৃণা।

কিন্তু হায়, কয়েকজনকে সরিয়ে রাখলে সত্তরের দশক থেকে ভাল ছবি, জীবনকে দেখার ছবি, জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের ছবি এল না বাংলা বায়োস্কোপে। আবার বোম্বাই বিলাস—ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির এক নম্বর বা ইন্দ্রপুরীতে অনুপস্থিত। প্রকৃত সংস্কৃতির প্রতিফলন নেই আবার অপসংস্কৃতির নির্লজ্জতাও হনুকরণকে অতিক্রম করতে পারে না। বলতে পারেন মানুষ কেন যাবে ছায়া, রূপবাণী বা উজ্জ্বলায়। ভাঙা আসন, হলুদ পর্দা, অবসিতপ্রায় জাঁকজমক। যখন চড়া দামে সপ্তাহের সাদা আর অনেক বেশি কালো টাকার ভাড়ায় হৌসগুলি 'খলনায়ক'দের জায়গা করে দিচ্ছে, তখন টলিউডের আঙুল চোষা ছাড়া উপায় কী? ভাল ছবি অনুপস্থিত। সুখেন, অঞ্জনরা বাজার গরম করবে এ ত জানা কথাই। মুশকিল হল সুখেন অঞ্জনরা মনমোহন দেশাই বা রমেশ সিপ্পি নয়। অবগুণ্ঠনবতী খেমটানাচিয়ের এ-কুল গেল, ও-কুল তো গেছে অনেক আগেই।

আশিতে এসে কিছু তরুণ সরকারি আনুকূল্যে বাংলা ছবিতে শিল্পের বান ডাকালেন। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' চারিদিকে ভরে গেল। ছবিগুলি সরকারি অর্থে গড়ে উঠল। তারপর বাক্সবন্দি সরকারি মহাফেজখানায়। হয়তো বা নান্দনিক সুবিধায় তিন দিন থেকে তিন সপ্তাহের জন্য দর্শকের সামনে এল। আবার বাক্সবন্দি। দর্শকদের পিছিয়ে পড়া মানসিকতা নিয়ে প্রগতিশিবিরে সে কী ধিক্কার! সে কী হাহাকার! তবে ঋত্বিক-বারীন সাহা-রাজেন তরফদারের থেকে তফাৎ হল হাল-আমলের নির্মাতাদের গায়ে তেমন কোনও আঁচড় পড়ে না। কেননা তাদের জন্য আছে এন এফ ডি সি, দূরদর্শন আছে বিদেশি ব্যবস্থা। আরও কত জানা বা অজানা নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কিন্তু বেল পাকলে যেমন কোনও কোনও পাখির কোনও উপকারে আসে না তেমনি দুঃখিনী বাংলা ছবির আর দর্শক বেচারাদের ভবিষ্যতের ড্রপসিন কবে খুলবে?

একবারও কি ভেবে দেখেছেন কেন মানুষরা ছবিগুলি দেখবে? ছবিগুলি তার প্রতিদিনের কথা। প্রতিদিনের সংগ্রাম, পরাজয়ের হতাশা পেরিয়ে জয়ের দিকে। আগামী ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কি? 'পার' (যদিও বাংলা ছবি নয়, বাঙালি পরিবেশে, বাঙালি পরিচালকের ছবি বলে উদাহরণটি সামনে আনছি) কিংবা এমনই দুর্লক্ষ্য কয়েকটি উদাহরণ ছাড়া প্রায় প্রতিটি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মধ্যবিত্তর হেরে যাওয়া। তার পদস্খলন, পিছিয়ে পড়া মানসিকতার প্রতি ধিক্কার বা সংগ্রামে প্রতিক্রিয়ার বিভীষিকা, অথচ এই সব পরিচালকরা অনেক কিছুই দেখতে পান না। এই মধ্যবিত্তই সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে

অফিসে, ব্যাঙ্কে, সওদাগরি দপ্তরে, অটোমেশনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে রুখছেন। জীবন আর জীবিকার সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। কেন এঁরা দেখতে পাচ্ছেন না, সারা ভারতের সামগ্রিক পিছিয়ে পড়া পরিপার্শ্বের মধ্যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে একটি জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দীর্ঘ তিরিশ বছরের বহু শহীদের বহু রক্ত ঘামে আমাদের এই পশ্চিমবাংলার মাটি ভিজে গেছে? কোথায় কোথায় সেই সব মানুষ আমাদের ছবিতে? মানুষের জীবনের জয়গানের প্রকৃত ছবি আমাদের ছবিতে অনুপস্থিত। তবে কেন, তবে কেন মিছে মানুষকে ধিক্কার?

এখন একটি কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করার সময় এসেছে। মেজে-ঘসে পড়াশুনো করে একটা স্তর পর্যন্ত পৌঁছনো যায়। দেশবিদেশের নতুন ছবি-টবি দেখে, নানা লেখা পড়ে পাণ্ডিত্য ফলানো যায় সময় সময় কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি ধরা পড়তে বেশিদিন সময় লাগে না। কে না জানে, আর্ট ইস্কুলে রগড়ে রগড়ে শিকাসো হওয়া যায় না।

জানি বাংলা ছবিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের, দর্শকদের। আসুন, আমরা সবাই মিলে আক্রমণ করি, আঘাত করি। কিন্তু সবার আগে বাংলা ছবিকে বাঁচতে দিন। অস্তিত্বের সংগ্রামে সামিল হওয়া আজ আমাদের সবার, সবার আগের কাজ।

পঞ্চাশ বছর আগে ১৩৫০-এ ছিল আকাল, খাবার আকাল, কিন্তু মনের ফসল ভরা ছিল থরে থরে। আর আজ? আজও আমরা এক আকালের সামনে। চিন্তার আকাল। এই মন্বন্তর কি ভাঙতে পারব না? 'আগন্তুক'-এর স্রষ্টা আমাদের জানিয়ে গেছেন মানুষের জয় হবেই। আমরাও জানি, চতুর্দিকের ভেঙে পড়া মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে নতুন 'নবান্ন' সৃষ্টি হবে। সৃষ্টি হবে নবজীবনের গান।

শান্তি সিংহ

ধর্মীয় চেতনা : বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য মনীষী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় মেলামেশা করে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য নির্দ্বিধায় লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাও কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।...পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-বন্যায় এ দেশের ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল, চিরকাল-পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কী ?'[১]

ব্যক্তিত্বসচেতন পরিহাসরসিক বিদ্যাসাগর 'ব্রজবিলাস'-এ লিখেছেন, 'এমন কি পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয়, বহুদর্শী চাঁই মহোদয়েরা তাঁহাকে (বিদ্যাসাগরকে) খ্রিস্টান বলিয়া থাকেন।'[২]

অথচ Contradiction ও Confrontation-প্রিয় বিদ্যাসাগরকে দেখার জন্য, অনাবিল গভীর আগ্রহে, তাঁর বাড়ি স্বেচ্ছায় ছুটে গেছেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংস। বিদ্যাসাগরকে দেখে তিনি ভাবাবিষ্ট চেতনায় বলেছেন, 'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল-বিল-হ্রদ-নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য) বিদ্যাসাগর— (সহাস্যে) তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান! (হাস্য) শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! নোনা জল কেন ? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য)। তুমি ক্ষীর-সমুদ্র!...তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই।...তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।...'[৩]

অসহায়-পীড়িত-দরিদ্র নরনারীর সেবায় নিঃস্বার্থভাবে বিদ্যাসাগর আজীবন বহু অর্থ দান করেছেন, তার মধ্যে মানবতার অভ্রভেদী মহিমা প্রকাশিত; অথচ কোনও মন্দির-প্রতিষ্ঠা বা দেবসেবায় তিনি কোনও অর্থ ব্যয় করেননি। এই সত্যতা তাঁর বিখ্যাত উইলেও প্রমাণিত। কার্মাটাঁড়ে গরিব সাঁওতালদের তিনি চাল-ডাল, কাপড়-চোপড়, ওষুধ প্রভৃতি দিয়ে নানাভাবে সেবা করেছেন। সেখানে জনৈকা মেথরানীর কলেরা রোগে চিকিৎসা শুধু নয়, আরও অনেক দুঃস্থ পীড়িতকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসায় নীরোগ করেছেন। তাঁর সহোদর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, '(বিদ্যাসাগর) পূজার সময় কার্মাটাঁড়ের সাঁওতালদের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র টাকার অধিক বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেন। শীতকালে জঙ্গলপ্রদেশে অত্যন্ত শীত হয়, সাঁওতালদের গায়ে শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া প্রতি বৎসর যথেষ্ট মোটা চাদর ও কম্বল ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। শীতকালে যথেষ্ট কমলালেবু ও কলমী খেজুর প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং সাঁওতালদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিতেন।'[৪]

বিদ্যাসাগর অপার মানবপ্রীতি নিয়েই নরের মধ্যে নারায়ণ দেখেছেন। তাই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যয়দৃপ্ত অকপট স্বীকারোক্তি— 'After Ramkrishna, I follow Vidyasagar!' he exclaimed, only two days before his death...'[৫] অথবা 'There is not a man of my age in Northern India, on whom his (Vidyasagar) shadow has not fallen!'[৬]

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি : বেলুড়মঠ-গড়ার প্রথম দিকে, মাটি কাটা—জঙ্গল সাফাই কাজে নিযুক্ত একদল সাঁওতালকে স্বামীজি সশ্রদ্ধ আন্তরিকতায় লুচি-তরকারি-মণ্ডা-মিঠাই-দই ইত্যাদি যোগে আপ্যায়ন শেষে বলেছিলেন, 'তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোগ লওয়া হল।' স্বামীজি, শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেন, 'এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি!' অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :

> দেখ্ এদের, কেমন সরল! এর কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুন গেরুয়া পরে আর কী হল ? 'পরহিতায়' সর্বস্ব-সমর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। ...ইচ্ছা হয়—মঠ-ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এই সব গরিব-দুঃখী দরিদ্র নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেছি। আহা! দেশের লোক খেতে-পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?'[৭]

স্পষ্টতই বোঝা যায়, গভীর মানবপ্রীতি, দরিদ্র অবহেলিত মানুষের দুঃখ অসহায়তার প্রতি সহানুভূতিবোধে বিদ্যাসাগরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন বিবেকানন্দ।

কর্মযোগী-সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর তথাকথিত মঠ-মন্দিরে কখনই যাননি, বৈধীভক্তিপ্রসূত পূজাআর্চা, ব্রতপার্বণ, উপবাস কিছুই করেননি; অথচ ভক্তিভাবে নয়, যুক্তির নিরিখে—গভীর মানবতাবোধে, দুঃখপীড়িত নরনারীর কল্যাণসাধন ছিল তাঁর জীবনব্রত, তিনি যেন জীবের মধ্যেই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়ের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাই একদা শ্রীমকে [মহেন্দ্র গুপ্ত] বলেছিলেন, 'আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।'[৮] সর্বজীবে অপার ভালবাসা, কারণ-অনুসন্ধানহীন নিঃশর্ত-নিঃস্বার্থ সর্বব্যাপী হিতৈষা, যার মূল সুর যেন : দম্যতাম, দয়স্ব, দদস্ব (সংযত হও, দয়াবান হও, দানশীল হও)। কবি মধুসূদন-কথিত তিনি ছিলেন : 'the first man among us', 'above flattering any man', 'the genius and wisdom

of an ancient sage, the energy of an English man, and the heart of a Bengali mother', 'not only Vidyasagara, but Karunasagara also.'

তাঁর অভ্রভেদী, সংস্কারমুক্ত বিশাল ব্যক্তিত্বের কথা সে যুগে জীবন্ত বিস্ময়। কারণ, জীবদ্দশায় তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁর ফোটো বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত, অথচ তিনি নিজের মা-বাবা ব্যতীত অন্য কোনও দেবদেবীর ফোটোর কাছে মাথা ঠেকাননি! শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাবদৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, 'এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।'... ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, 'তবে আপনি কী— মানেন ?' বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী বিরাজমান।''[৯] বিহারীলাল সরকার তার 'বিদ্যাসাগর'-গ্রন্থেও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'একবার বিদ্যাসাগর কাশীধামে গিয়ে মন্দিরের পুরোহিত-পাণ্ডাদের মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।' ব্রাহ্মণেরা সক্রোধে বললেন, 'আপনি কী মানেন ?' তার উত্তরে তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট জনকজননীকে দেখিয়ে বলেন,'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।''[১০]

শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলে পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য ক্ষোভে দুঃখে কাশীবাসী হন। একবার কাশী থেকে কলকাতায় তিনি ফিরে এসে বন্ধু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে যান। পুরনো বন্ধুকে দেখে বিদ্যাসাগর সহাস্যে বলেন, 'কি হারান, শুনলাম তুমি নাকি কাশীবাসী হয়েছ ? তা বেশ, গাঁজা খেতে শিখেছ তো ?' হারানবাবু ক্ষুব্ধচিত্তে উত্তর দেন, 'কাশীবাসী হওয়ার সঙ্গে গাঁজা খাওয়ার সম্পর্ক ঠিক কী, বুঝতে পারলাম না।' বিদ্যাসাগর আরও একটু দিলখোলা হাসি হেসে বললেন, 'অ্যাতো সহজ ও সোজা সম্পর্কটা বুঝলে না ? জান তো, লোকের বিশ্বাস, কাশীতে যাঁর মৃত্যু হয়, তিনি সাক্ষাৎ শিব হন। শিব তো গাঁজাখোর। কাশীবাসে তোমার মৃত্যুর পর, তোমাকেও শিব হতে হবে। তাই মরার আগে যদি একটু অভ্যেস রাখতে, তবে শিব হওয়া সহজ হতো।''[১১]

লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী, বাবা ঠাকুরদাসও শেষ জীবনে কাশীবাসী হয়েছিলেন। অথচ তিনি একদা হরানন্দ ভট্টাচার্যকে ওইরূপ রসিকতা বা বিদ্রূপ করেছিলেন। কেনই বা তাঁর কথায় প্রায়ই শাণিত ব্যঙ্গ ঝলসে উঠত ? তার কারণ হিসেবে বলা যায়, সমাজ-জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন ভণ্ডামি, কৃতঘ্নতা। সহজ গভীর ভালবাসার পরিবর্তে তিনি পেয়েছেন হীন ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষ। তাই গভীর নৈরাশ্যের কালো মেঘ কখনও-সখনও তাঁর জ্বলন্ত মধ্যাহ্ন-সূর্যসদৃশ কর্মযোগী চেতনাকে ঢেকে ফেলেছে। ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ২৫ অঘ্রান, তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে পূজ্যপাদ পিতা ঠাকুরদাসকে লিখেছেন, 'নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। এ জন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব।''[১২] উপকৃত আত্মজনদের গভীর গোপন আঘাতের বেদনায় বা হীন ষড়যন্ত্রে বিদ্যাসাগর আত্মক্ষোভে তাঁদের বা স্বর্গাদপি গরীয়সী বীরসিংহ গ্রামজননীকেও ত্যাগ করেছেন, এ কথা অনেকেরই জানা।

এই বিশাল সৃষ্টির পিছনে একজন স্রষ্টার কল্পনা বা বিশ্বাস অনেকেই করেন। বিদ্যাসাগরের সেই বিশ্বাসেও চিড় ধরেছে জীবনের নানা ঘটনায়। একবার পুরীর সমুদ্রে এক স্টিমার-ডুবির ফলে প্রায় ৮০০ যাত্রী মারা যান। ওই সংবাদে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেন, 'দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে, নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্রে ডুবাইলেন ! আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া ৭০০-৮০০ লোককে একত্রে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দেন ! দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।''[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে শ্রীম বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর অভিমান ক'রে বলেন, ঈশ্বরকে ডাকবার আর কী দরকার ! দেখ, চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে, তখন অনেক লোককে বন্দী করলে, ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে, মহাশয় ! এদের খাওয়াবে কে ? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। কী করা যায় ? ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তা হলে কী করা যায় ; ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ কাটবার হুকুম হয়ে গেল ! এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন ? কই একটু তো নিবারণ করলেন না ? তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হলো না।''[১৪]

অনেক মহান চরিত্রে স্ববিরোধ থাকে। বিদ্যাসাগরের ভাবজীবনে তথা আচরণের কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার নিয়ে তিনি আজীবন পৈতেধারী ছিলেন, অথচ গায়ত্রী মন্ত্র জপতেন না। একথা তাঁর একাধিক জীবনীকারের রচনা থেকে জানা যায়। যজ্ঞ-ব্রত-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-উপবাসের কৃচ্ছ্রতা তিনি মানতেন না। নিজের জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও পঞ্চস্বস্ত্যয়ন, হোম প্রভৃতি শাস্ত্রীয় আচারের বিরোধিতা করেছেন— বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতীক পূজা ও স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি অযৌক্তিক, এই হিসাবে কোনও দিন প্রশ্রয় দেন নাই। মানুষ সাধারণত মৃত্যুর সন্নিকটে এলে, বিশেষত রোগে তিলতিল করে যন্ত্রণা পেয়ে, অন্তিম সময়ের দিকে এগিয়ে চললে, কিছু দুর্বলচিত্ত হয়। কিন্তু এই দৃঢ় কঠিন যুক্তিবাদী পুরুষ দুর্বলতাকে শেষ সময়েও প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁর কন্যা জোর করে কলিকাতার বাটির একতলার একটি ঘরে হোম করেন। ঘরটি দোতলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘর হতে নামবার পথের পাশে। কিন্তু সে ঘরে বিদ্যাসাগর প্রবেশ করেন নাই। কন্যার বিশেষ অনুরোধে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, ঈষৎ হেসে বলেন, 'মা, এইখানেও ধোঁয়া আসছে, মনে দুঃখ করিস না।''[১৫]

অথচ কাশীধামে বিদ্যাসাগরের মাতৃবিয়োগ হলে, তিনি তখন কলকাতায় থাকায়, কাশীপুর গঙ্গাতীরে মাতৃশ্রাদ্ধ শাস্ত্রবিহিতভাবেই সম্পন্ন করেন। তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'জননীদেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় ; নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা সমাগত হইলে কৃতীকে স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবার প্রথা থাকায় আমি ঐ কার্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; দাদা (বিদ্যাসাগর) ইহা দেখিয়া বলিলেন, তুমি একাই কি এ কার্য নিষ্পন্ন করিবে ? আমি কি কেহ নই ? এই বলিয়া দাদা ঐ সকল ব্রাহ্মণদের পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে ২।৪ জনের পায়ে ঘা থাকা প্রযুক্ত তাহাতে পূঁজ নির্গত হইতেছিল, তাহা দেখিয়াও তিনি কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করেন নাই।''[১৬]

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল, সূর্যোদয়কালে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীতে পরলোকগমন করেন। আগাম টেলিগ্রাম পেয়ে বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে কাশী ছুটে যান। শম্ভুচন্দ্রের লেখা থেকে জানা যায়— পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা তিন ভাই এবং ছোট ভাইয়ের শ্বশুর প্রতাপচন্দ্র

কাঞ্জিলাল চারজন মিলে 'কাঁধ দিয়ে' মণিকর্ণিকার ঘাটে ঠাকুরদাসের মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে সৎকার করেন। তারপর স্নান-তর্পণাদি যথারীতি করা হয়। ঠাকুরদাস তাঁর 'উইল'-এ অন্তিম ইচ্ছা জানিয়েছিলেন : তাঁর অন্তিমকালে জ্যেষ্ঠপুত্র কাছে থাকবেন। দাহাদিকার্য কাশীতে সুসম্পন্ন ক'রে, আদ্যশ্রাদ্ধাদি ও মহারাষ্ট্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণভোজন যেন করানো হয়। বিদ্যাসাগর পিতার 'উইল'-এ বর্ণিত অন্তিম ইচ্ছা যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্পন্ন করেন।'[১৭]

বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দীনময়ী দেবী (মতান্তরে দিনময়ী দেবী) ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট রাতে পরলোকগমন করেন। বিদ্যাসাগর, মৃতা স্ত্রীর পারলৌকিক কর্মাদি একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে দিয়ে যথারীতি করান। বীরসিংহ গ্রামের আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসীদের যথারীতি শাস্ত্রবিহিত ভোজনাদি পর্ব সুসম্পন্ন করানোর জন্য ওই বছর পৌষ মাসে ছেলে নারায়ণচন্দ্রের হাতে টাকা দিয়ে পাঠান।[১৮]

বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরমার হাতে লাগানো একটি অশ্বত্থ গাছ বিদ্যাসাগরের খুব প্রিয় ছিল। সেই গাছটির কথা ভাই শম্ভুচন্দ্রের কাছে প্রায়ই বলতেন। একবার কথা প্রসঙ্গে তিনি জানতে পারেন অনুজ গাছটির পরিচর্যায় উদাসীন। তখন তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে জানান, 'বংশের মধ্যে কেউ যদি বৈশাখ মাসে অশ্বত্থমূলে জল না দেয়, তুমি বৈশাখ মাসে রোজই জল দিও।'[১৯] লক্ষণীয়, বৈশাখ মাসে অশ্বত্থ গাছে জলদান পুণ্যকর্ম—এই লোকাচার মান্য করার জন্য ভাইকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন! তিনি যে-সব চিঠিপত্র লিখতেন, তার শিরোদেশে 'শ্রীশ্রীহরিশরণং', 'শ্রীশ্রীহরিঃসহায়' 'শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং' ইত্যাদি লেখা থাকত ঠিকই, কিন্তু তিনি ভক্তিপ্রণতচিত্তে কোনও দেবালয়ে গিয়ে দেবদেবীকে প্রণাম করতেন না।

অথচ মা-বাবা-স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর সশ্রদ্ধচিত্তে পারলৌকিক কর্মাদি করেছেন, এবং একবার রাজা রামমোহন রায়ের বড় ছেলের দৌহিত্র, ললিত চট্টোপাধ্যায়কে কৌতুকচিত্তে প্রশ্ন করেছেন, 'হ্যাঁ রে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?' ললিতবাবু বলেছেন, 'আছে বৈকি, আপনার এত দান, দয়া, আপনার পরকাল থাকবে না তো কার থাকবে?' এ উত্তর শুনে সংশয়বদীর মতন বিদ্যাসাগর হেসেছেন মাত্র।[২০]

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র প্রকাশকাল থেকেই বিদ্যাসাগর ওই পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচনী কমিটির সভ্য হন। নীতি ও আদর্শের কারণে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে তিনি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর ইস্তফা দেন। অথচ ১৮৫৮-তে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় তিনি ১৮৫৯-এর মে মাসে সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। আবার ১৮৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে একটি দল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মভাবনার বিরোধী হয়ে আলাদা উপাসনা-সমাজ গড়ে তোলেন। বিদ্যাসাগর, তাঁর পরম সুহৃদ অক্ষয়কুমার দত্তকে নতুন উপাসনা পদ্ধতি রচনায় প্রত্যক্ষ সাহায্য করেন। বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কার কর্মে দেশের রক্ষণশীল সমাজের কাছে যেমন বাধা পেয়েছিলেন, তেমনই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র কাছে বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার প্রভৃতি সংস্কার-কর্মে নিরন্তর উৎসাহ পেয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' গ্রন্থে জাগতিক নানা বিষয়ের আলোচনা থাকলেও গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর-বিষয়ক কোন কথা ছিল না। তা দেখে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যাসাগরের কাছে জানতে চান—'মহাশয়, ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাই কেন?' এ প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, 'যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে 'বোধোদয়' ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবে।'[২১]

'বোধোদয়'-এর পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর ঈশ্বর-বিষয়ক একটি ছোট প্রবন্ধ সংযুক্ত করেন।[২২] সেই প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ...'। লক্ষণীয়, ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বক্তৃতায় ঈশ্বর-বিষয়ে উক্ত কথা বলেন। বিদ্যাসাগর সশ্রদ্ধচিত্তে সেই কথা গ্রহণ করেছেন (বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর, তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র 'বোধোদয়' সম্পাদনাকালে ওই ধরনের কথা বাদ দেন)। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'—এই মহাবাক্যটি কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক তাঁহার 'বোধোদয়' পুস্তকে গৃহীত হয়, তদবধি ইহা লক্ষ লক্ষ বাঙালী বালক-বালিকার অন্তরে ঈশ্বর সম্পর্কে বিমল ধারণার উদয় করিয়া আসিতেছে।'[২৩]

সবিশেষ লক্ষণীয়, স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরের গভীর অনুরাগী ছিলেন, অথচ তিনিও ঐ বাক্যটি মনেপ্রাণে পছন্দ করেননি। তাই 'স্বামীজীর স্মৃতি' রচনায় প্রিয়নাথ সিংহ (স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু ও একই পাড়ার ছেলে) প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে লিখেছেন :

স্বামীজী—'... দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্ রে। ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।

প্রশ্ন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে।

এইকথা বলবা মাত্র স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেন : 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না।'[২৪]

প্রসঙ্গত, ঈশ্বরের নিরাকার, নিরঞ্জন ভাবকল্পনায় আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। বিদ্যাসাগর একদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, ঠিক সেই সময় একজন অন্ধ-খঞ্জ ফকির 'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন'... গানটি গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। গানের কথাগুলি শুনে, অভিভূত চিত্তে বিদ্যাসাগর সেই বাউলকে ডেকে পুরো গানটি শোনেন। অখিলউদ্দিন নামে সেই গায়ক সকৃতজ্ঞ চিত্তে অনেককে বলেছে—'বাবু (বিদ্যাসাগর) আমায় বড় ভালবাসতেন, আর এই গান শুনে খুব খুশি হতেন।'[২৫]

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায়, দক্ষিণেশ্বরের কালীঠাকুরের পূজারী, পাগলঠাকুর—ক্রমে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' রূপে সমাদৃত হয়েছেন দেশের তাবৎ বিদ্বৎসমাজেও। এমনকি সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব—সাধকশ্রেষ্ঠ, আন্তরিক আগ্রহে, স্বেচ্ছায় বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছুটে গেছেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট, আলাপ করার জন্যই। ওইদিন বিকেল প্রায় চারটে থেকে রাত্রি নটা অবধি প্রায় একটানা পাঁচঘণ্টা বাঙ্ময়গর্ভ নানা আলোচনার শেষে বলেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—(সহাস্যে) একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর—যাবো বই কি। আপনি এলেন, আর আমি যাবো না!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর—সে কি। এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(সহাস্যে) আমরা জেলেডিঙি। (সকলের হাস্য)। খালবিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)

(বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ—(সহাস্যে) তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—হাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে! (সকলের হাস্য)।

মাস্টার (স্বগত)—নবানুরাগের বর্ষা, নবানুরাগের সময় মান-অপমানবোধ থাকে না বটে!...[২৬]

'যাবো বই কি। আপনি এলেন, আর আমি যাবো না!' বিদ্যাসাগর এ কথা বলেও কথা রাখেননি। তাই তাঁর কথায় 'সত্যের আঁট নেই' বলে পরবর্তী কালে আক্ষেপ বা অভিযোগ করেছেন রামকৃষ্ণ। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে তিনি ভক্তদের কাছে বলেছেন, 'সাধনা চাই—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে—বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না!' কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'এইটে জেনে রেখো—আলেখলতার জাল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল, ফুল দেখা দিবে।'[২৭]

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দিকে সম্ভবত খুবই আশাবাদী ছিলেন। তাই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট শ্রীম-র কাছে বলেছিলেন, 'আর দু-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখবার প্রয়োজন। চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে, তারপর খড়ি, তারপর রঙ—পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎ কাজ করেছে—কিন্তু অন্তরে কী আছে, তা জানে না; অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে।...অন্তরে কী আছে জানবার জন্য একটু সাধন চাই।'[২৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে সাধারণ-অসাধারণ যে-সব মানুষ আসতেন তাঁদেরই ভাবান্তর হত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—'মনের বাহিরের জড়শক্তি সকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত ক'রে কোনও একটা অদ্ভুত ব্যাপার (miracle) দেখান বড় বেশি কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলিকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতনভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না।'[২৯]

কবি-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে বিশেষ ভক্তিভাবনায় আপ্লুত হয়েছেন। ১৮৮৪-র ৩০ জুন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব শ্রীমকে বলেছেন, 'ডাইলিউট' হয়ে গেছে একদিনেই! দেখলে কেমন বিনয়ী—আর সব কথা লয়।'[৩০]

অথচ ১৮৮২-র ৫ আগস্ট, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে (শনিবার) বিকেল প্রায় চারটে থেকে রাত্রি নটা অবধি একটানা প্রায় পাঁচঘণ্টা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে নানা ভাবের কথা বলেছেন রামকৃষ্ণদেব। অথচ 'ডাইলিউট' হননি বিদ্যাসাগর। রামকৃষ্ণদেব পরম আগ্রহে প্রশ্ন করেছেন, 'আচ্ছা তোমার কী ভাব?' বিদ্যাসাগর মৃদু হেসে, প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই বুঝি বলেছেন, 'আচ্ছা, সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব।' অথচ কোনও দিনই তাঁর মনের কী ভাব তা জানানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটে যাননি। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সহজগভীর আমন্ত্রণরক্ষার জন্যও সন্নিকটের দক্ষিণেশ্বর একবারও বেড়াতে যাননি, কিংবা 'যাবো বই কি। আপনি এলেন, আর আমি যাবো না!'—এ কথা দিয়েও কথা না-রাখার বেদনা বা চাতুর্যপূর্ণ অনৃতভাষণের কোনও আত্মগ্লানি পরবর্তী জীবনের কখনও অনুভব করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

বিদ্যাসাগরের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের আন্তরিক আগ্রহের টান সত্ত্বেও পরবর্তী কালে কেন বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতি টান অনুভব করেননি? তার সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে বলা যায়: মানবজীবনের প্রতিদিনের দুঃখবেদনা, কর্মোদ্যম, সংগ্রাম-চেতনাকে বিদ্যাসাগর 'মায়া' মনে করতে পারেননি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মতন ভাবতে পারেননি—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে: বা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। তা ছাড়া, আত্মানুসন্ধান বা ঈশ্বরভাবনা অপেক্ষা প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রাম এবং সমস্যা-উত্তরণের অভীপ্সা তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনবাদ ছিল। তিনি ছিলেন কর্মযোগী, ভাবমার্গের সাধক; ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন না। মানবপ্রীতিই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। অসহায়, দুঃখী, শিক্ষাহীন, নিরন্ন, আর্তপীড়িত নর-নারী-শিশুই ছিল তাঁর কাছে জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনবাদ তথা নিরন্তর মানবপ্রীতির নিরিখে তথাকথিত দেবদেবীর মূর্তি বা পটপূজা অর্থহীন। এ রকম প্রত্যক্ষ জীবনবাদী, কর্মযোগের কথা—পরবর্তী কালে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'The living God' কবিতায় ফুটে ওঠে—

> Ye fools! who neglect the living God,
> And His infinite reflections with which
> the world is full.
> While ye run after imaginery shadows,
> That lead alone to fights and quarrels,
> Him worship, the only visible!
> Break all other idols![৩১]

অন্যদিকে, শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য (End of life) ঈশ্বরলাভ। 'আগে বিদ্যা, না আগে ঈশ্বর?' লোকপ্রচলিত এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন: 'আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা।....আগে ঈশ্বর, তারপর জীবজগৎ।'[৩২] যিশুখ্রিস্টও বলেছেন, 'Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you.'[৩৩]

শ্রীম একদা বিদ্যাসাগরকে সবিনয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে?' বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার তো বোধ হয়,—ওরা যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই।'[৩৪] এ প্রসঙ্গে আমরা তো জানি: ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে, 'কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর আমন্ত্রণে, কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে আর ব্যালান্টাইন কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন ক'রে যে-রিপোর্ট 'কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এ পেশ করেন, তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি তৎকালীন বিশিষ্ট পণ্ডিত তথা কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নির্দ্বিধায় স্বীয় বক্তব্য জানান 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' দপ্তরে। সেই ঐতিহাসিক চিঠিতে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন, 'That the vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute.'

লক্ষণীয়, যে-বিদ্যাসাগর 'বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন ভ্রান্ত' বলেছেন, সেই বিদ্যাসাগরই পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের বাংলা-অনুবাদকর্মে, তীব্র সামাজিক প্রতিকূলতার মাঝে যার পর নাই সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-সংখ্যার 'নবভারত' পত্রিকায় রমেশচন্দ্র দত্ত সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন সদ্য-প্রয়াত বিদ্যাসাগরের প্রতি: 'আমাদের দেশের ধর্মধ্বজী, মিথ্যাচারী, আচারসর্বস্ব, আর্যাত্বাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুলনা করিলে তাঁহার একটি বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, ধর্মধ্বজী ছিলেন না। আমি যখন ঋগ্বেদ-সংহিতায় অনুবাদে প্রবৃত্ত, তখন আমি প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিতাম, তাঁহার মহামূল্য গ্রন্থাগার হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতাম। তিনি তখন রোগশয্যায় শয়ান, তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি সর্বদা আমায় উৎসাহ প্রদান করিতেন।'

বিদেশি পাদ্রিদের প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা কোনদিনই ছিল না। এ দেশি লোক, যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়ে পাদ্রি হতেন, তাঁদের সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্যেই অনেক সময় তির্যক মন্তব্য করতেন। বার্ধক্যে একবার তিনি,

তরুণ শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রাণখুলে গল্প করছিলেন। তখন পথ দিয়ে একজন দেশি পাদ্রি যাচ্ছিলেন। একসঙ্গে অনেকজন খোশমেজাজে আছেন দেখে সেই পাদ্রি মহোদয় এগিয়ে এসে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার শুরু করেন। তখন বিদ্যাসাগর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কী চান, বলুন?' পাদ্রি বলেন, 'আপনাদের Salvation (মুক্তি) চাই।' তৎক্ষণাৎ বিদ্যাসাগর করজোড়ে, সকৌতুকে বলেন, 'রক্ষা করুন, এরা নিতান্তই বালক, সারাটা জীবন এদের পড়ে রয়েছে, এখনই এদের Salvation-এর কথা শোনাবেন না। আমি বুড়ো হয়েছি, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাকে শোনান, কাজ হবে।'

বাঙালি পাদ্রি সাহেব এই বিচিত্র বুড়োটিকে বিদ্যাসাগর বলে চিনতে পারেননি। বৃদ্ধের কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি চলে যান।'[৩৫]

'বিদ্যাসাগর' নামের সঙ্গেই পরনে থান ধুতি, গায়ে মোটা চাদর, পায়ে তালতলার চটি, বজ্রগর্ভ, বড়-মাথা-মানুষটির ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে। অথচ তিনিই একবার, তৎকালীন বাংলার ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের একান্ত অনুরোধে ধুতি-চাদর ছেড়ে, চোগা চাপকান, পাগড়ি পরেছিলেন। কিন্তু দ্রুত অনুভব করেন : ও সব পোশাক-পরা মানে সঙ-সাজা! তাই আর কোনওদিন ও-সব পোশাক পরেননি। এ প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা একটি মজার ছবি এঁকেছেন, 'The Swami introduced Vidyasagar to us now as 'the hero of widow re-marriage, and of the abolition of polygamy'. But his favourite story about him was of that day when he went home from the legislature council, pondering over the question of where or not to adopt English dress on such occasions. Sudenly some one came upto a fat Mogul who was proceeding homewards in leisurely and pompous fashion, in from of him, with the news—'Sir, your house is on fire!' The Mogul went neither faster nor slower for this information, and presently the messenger continued to express a discrete astonishment, whereupon his master turned on him angrily, 'Wretch!' he said, 'am I to abondon the gait of my ancestors, because of a few sticks happen to be burning?' And Vidyasagar, walking behind, determined to stick to the chudder, dhoti and sandals, not even adopting coat and slippers.'[৩৬]

আমরা জানি, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি উত্তরজীবনে বাংলা-সাহিত্যে বিখ্যাত প্রাবন্ধিক হন। তাঁর লেখক-হয়ে-ওঠার পিছনে বিদ্যাসাগরের প্রভূত সাহায্য ছিল। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।'[৩৭]

অথচ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় প্রবন্ধ-নির্বাচন ব্যাপারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মতপার্থক্য এবং অনিবার্যভাবে 'ঠাণ্ডা-লড়াই' পরবর্তী কালে দেখা দেয়। বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্বদৃপ্ত চেতনায় একবার মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে পঠিত রাজনারায়ণ বসুর একটি বক্তৃতালিপি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অতীব চিত্তাকর্ষক হওয়া সত্ত্বেও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র গ্রন্থাধ্যক্ষের পক্ষে অমনোনীত করেন। তাতে মহর্ষি অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে ১৭৭৫ শকাব্দের ২৬ ফাল্গুন রাজনারায়ণ বসুকে জানান : 'ঐ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-তে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।'[৩৮]

ক্ষুব্ধ মহর্ষি-নির্দেশিত 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ'-এর শিরোমণি ছিলেন অবশ্যই বিদ্যাসাগর—এ অনুমান করা যায়। এবং 'এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই'—এই কঠোর অনুশাসন বা হুমকিতে অন্তত নির্ভীক বিদ্যাসাগর বিকারহীন থাকবেন, এরকম ভাবাই সঙ্গত।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ অপেক্ষা বিধবা বিবাহ প্রচার-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশে বিদ্যাসাগরের ঝোঁক ছিল বেশি। ফলে এ নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ক্রমশ তীব্রতর হয়। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বিধবাবিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন।'[৩৯]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তথা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নীতিগত বিরোধ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আত্মসচেতন বিদ্যাসাগর সম্মানজনকভাবে আত্মমর্যাদার দুর্গে ফিরে আসেন। ঐই প্রত্যাবর্তন-চিত্র বিদ্যাসাগরের জবানীতে লিখেছেন বিশিষ্ট জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : '...কিন্তু নানাপ্রকার মতভেদ নিবন্ধন অপ্রিয় সঙ্ঘটন হইতে লাগিল, তখন আর সেইসকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তিগত মতবিভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইলাম।'[৪০]

হিন্দুধর্ম-প্রবক্তা বিখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে বিদ্যাসাগর একবার বলেন, 'আপনাকে যাঁরা হিন্দুধর্ম প্রচারে এনেছেন, তাঁরা কী রকম হিন্দু তা আমার জানা আছে। তবে বক্তৃতা করতে যখন এসেছেন, তখন তা সহজ ক'রে করুন। লোকের প্রশংসা পাবেন। তবে আমার স্কুলের ছাত্ররা যে মুরগীর মাংস খায়, আপনার বক্তৃতা শুনে, তারা তা ছাড়বে বলে মনে হয় না।'[৪১]

সেকালের বিশিষ্ট বাগ্মী ও ব্রাহ্মধর্মের নেতা, যাঁকে স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়া সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে একসঙ্গে 'লাঞ্চ' খেয়েছেন, ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবী-কথিত সেই 'Thunderbolt of Bengal' কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মপ্রচার সম্পর্কেও বিদ্যাসাগর তির্যক কৌতুক করেছেন :

শ্রীম (মাস্টার)—[নরেন্দ্রের প্রতি]—বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।

নরেন্দ্র—বেত খাবার ভয়ে?

মাস্টার—বিদ্যাসাগর বলেন, মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে, যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপটা করেছে। যখন প্রমাণ হলো, তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মার! তারপর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি। তার জন্য বেতের হুকুম হলো। তখন আমি হয়ত বললাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুঝিয়েছিল, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়ত বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিচ্ছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিচ্ছিলি? ওরে কে আছিস—একে আর পঁচিশ বেত দে। (সকলের হাস্য)

তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! (সকলের হাস্য)। আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কী লেকচার দেবো?'[৪২]

জননী ভগবতী দেবীর ওপর বিদ্যাসাগরের অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসার কথা আজও সাধারণ্যে মুখে মুখে ফেরে। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর তাবৎ নারীজাতির প্রতি, বিশেষত নিপীড়িতা, দুঃখী, বালবিধবা তথা অবহেলিতা নারীদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতকার বিহারীলাল সরকারও বলেছেন : 'মা' নামে বিদ্যাসাগর মন্ত্রমুগ্ধ হইতেন। 'মা'-ই যে তাঁহার জীবনের সাধন-মন্ত্র ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গানবাজনার বড় শখ ছিল না। তবে কেহ কখনও 'মা' 'মা'-বলিয়া গান গাহিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। গায়ককে তিনি যেন বুকের কলিজার ভিতর পুরিয়া রাখিতেন। এক অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক, বেহালা বাজাইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাহিত। সে সঙ্গীতে 'মা' 'মা' ধ্বনি থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইয়া প্রায়ই তাহার গান শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেন না। এই মুসলমান ভিক্ষুক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সময়-সময় যথেষ্ট সাহায্য পাইত। একবার ইহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে গৃহনির্মাণের সমস্ত ব্যয় দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈবাহিক (কনিষ্ঠা কন্যার শ্বশুর) জগদ্দুর্লভ চট্টোপাধ্যায় ভাল গান গাহিতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রায়ই বাড়িতে আহ্বান করিয়া তাঁহার গান শুনিতেন। অন্য গান শুনিতেন না। কেবল যে-গানে 'মা' 'মা' থাকিত, সেই গানই শুনিতেন। গানের শখ ছিল না, কিন্তু মাতৃনামপূর্ণ গানে প্রাণ মাতিয়া উঠিত।'[৮৩]

রামকৃষ্ণদেব তাঁর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের শেষ পর্যায়ে বলেছেন, 'তাঁকেই মা বলে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কিনা।'...[৮৪]

বীরসিংহের 'সিংহশিশু' বিদ্যাসাগর। তৎকালীন বাংলার ভৌগোলিক তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আগে অবধি বীরসিংহ গ্রাম হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়।'[৮৫] লক্ষণীয়, তখন বিদ্যাসাগরের বয়স ৫২ বছর। ফলত জন্মকালীন পরিচয়সূত্রে বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণদেব দুজনই এক জেলার সন্তান। আবার দুজনের কর্মক্ষেত্র বা সাধনক্ষেত্র কলকাতায়। প্রত্যেকে নিজস্ব প্রতিভায় কলকাতার বিদ্বৎমহলে আপাতভাবে বিতর্কিত হয়েও ক্রমশ গভীরভাবে সমাদৃত। তাই দুজনেরই ফোটো, তাঁদের জীবিতকালেই বাংলার ঘরে ঘরে শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে স্থান পেয়েছে। অথচ দুজনের অন্তরচেতনার বহিঃপ্রকাশ তথা কর্মধারা দু-রকম। একজন সুপণ্ডিত জ্ঞানী, কর্মবীর। অন্যজন ঈশ্বরজ্ঞানী, মূলত ভক্তিমার্গের লীলাপ্রিয় জীবনরসিক হয়েও 'যত মত তত পথ' সত্যকে জীবন-সাধনার নানা পরীক্ষায় প্রমাণিত করেছেন।

মানবজীবনের দুঃখদীর্ণ রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করে বিদ্যাসাগর মোক্ষলাভ বা কল্পিত স্বর্গের স্বপ্ন দেখেননি। তাঁর কাছে মানুষই ছিল প্রবল গভীর সত্য। এই মানবতাবাদী মানুষটির মনোভাব অনুভব প্রসঙ্গে সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' নাটকের কোরাসের সেই বিখ্যাত কথা মনে পড়ে—'Wonders are many on earth and the greatest of them is man'. তাই তিনি ধূলিমলিন মাটির পৃথিবীতেই তথাকথিত আদর্শের স্বর্গকে নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। প্রতিদিনের অসংখ্য অসহায় মানুষের দুঃখদুর্দশাভরা বেদনামালিন্যের 'মাটি'-কে খাঁটি জেনে, তার প্রতিকারে তিনি আপসহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন আজীবন; তাবৎ হয়ত তাঁর অন্তরের হিরণ্যগর্ভ চেতনারূপ সোনা প্রচ্ছন্নই থেকে গেছে, যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের সময় তাঁকে বলেছিলেন, 'অন্তরে সোনা চাপা আছে, এখনও খবর পাও নাই। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।' অথচ কর্মযোগী বিদ্যাসাগর জীবনের বিশাল 'কুরুক্ষেত্রে' অবিরাম বিবেকের পাঞ্চজন্য-ধ্বনি শুনে, প্রতিবাদী চেতনায় প্রবল সংগ্রামের গাণ্ডিব টংকার শুনিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত লোককথার সেই 'কাঠুরে' যেন বিদ্যাসাগর, যিনি হৃদয়ের মাঝে চন্দনবনের সন্ধান পেয়েছিলেন! 'চন্দন' তো নিঃস্বার্থপরতা-শুচিতা-আত্মত্যাগ ও ক্রমশ ক্ষয়িত হয়েও নিরন্তর সৌরভ-মাধুর্য-স্নিগ্ধতাদানের প্রতীক। বিদ্যাসাগরের সারাটি জীবন তো চন্দনেরই সেবা-আত্মত্যাগ-শুচিতা ও নিঃস্বার্থ মানবপ্রীতির আন্তরিক সুগন্ধ ছড়ানো ব্রত! কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'চন্দন' কবিতা অনুসরণে বলা যায় : তাঁর (বিদ্যাসাগরের) সারাটি জীবন 'অখণ্ড এক পূজা'! যার আরেক নাম নিরন্তর মানবসেবা। জীবনসন্ধানী বিদ্যাসাগর যেন সমাজ-অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদসংকুল পরিবেশে, নানা ধরনের গাছগাছালির মাঝে চন্দন গাছের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু প্রতিদিনের দুঃখদীর্ণ রুক্ষ বাস্তবতা ভুলে তিনি কোনও দিব্যজগতের জন্য ব্যাকুল হননি। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত লোককথার 'চন্দনবন' ছাড়িয়ে, স্বপ্নমোহন অধ্যাত্মসাধনায় ঋদ্ধ হয়ে, ক্রমশ 'রূপার খনি', 'সোনার খনি', তারপর কেবল 'হীরা-মানিক'—এই সব অষ্টসিদ্ধি লাভ করে সাধক কবি রামপ্রসাদের মতন বলতে চাননি—'কত মুক্তামণি ছড়িয়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।' তথাকথিত অধ্যাত্ম-সাধনার পথ বিদ্যাসাগরের কাঙ্ক্ষণীয় ছিল না।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি যে-সব কর্ম করেছো, এ সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা'—এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তা হলে খুব ভালো। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি-ভালবাসা আসে, এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।'[৮৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ, বিদ্যাসাগর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে, একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে লেখেন, 'নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত করিয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।...'

আমরা জানি, তৎকালীন প্রচলিত সমাজব্যবস্থায়, দেশের অসংখ্য বালবিধবার বৈধব্যযন্ত্রণা, সামাজিক নির্যাতনের প্রতিকারকল্পে বিদ্যাসাগর নিরলস পরিশ্রমে, বহু শাস্ত্র গবেষণা করে, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'পরাশর সংহিতা' থেকে বিধবা-বিবাহ সমর্থনে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করেন—

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে॥

বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র পাঠান। তীব্র থেকে তীব্রতর বাদ-প্রতিবাদে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়—Act, XV of 1856, being an Act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu widows.

বিধবা বিবাহ আইন অনুযায়ী প্রথম বিয়ের বাসর হয়, বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২নং সুকিয়া স্ট্রিটের [বর্তমানে, ৪৮নং সুকিয়া স্ট্রিট] বাড়িতে। বর, সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র, মুর্শিদাবাদের জজ [পরে ম্যাজিস্ট্রেট] শ্রীশচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যারত্ন। আর কনের নাম কালীমতী দেবী। বর্ধমানের পলাশডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১০ বছরের বিধবা মেয়ে। (চার বছর বয়সে কালীমতীর বিয়ে হয় নদীয়া জেলার বহির্গাছি গ্রামের হরমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। মাত্র ৬ বছর বয়সে কালীমতী

বিধবা হয়)। পুলিশি প্রহরায় এই ঐতিহাসিক বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগরের দশ হাজার টাকা খরচ হয়। ওই বিয়ের আসরে বিশিষ্ট-পণ্ডিত-অধ্যাপকদের সঙ্গে সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শুধুমাত্র বিয়ের রাতের খরচই নয়, বিয়েতে কনের অলংকার-যৌতুক-গৃহসজ্জা, ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের ভোজন, বিদায় দক্ষিণা সবকিছুর দায়িত্ব বিদ্যাসাগরকে নিতে হত। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ অবধি মাত্র এগারো বছরে বিদ্যাসাগর ৬০টি বিধবা বিবাহ দিয়েছেন, তাতে তাঁর তৎকালীন বাজারে প্রায় ৮২ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। তারপর তিনি আরও ২৪ বছর জীবিত ছিলেন। ওই সময় বিধবা বিবাহ খাতে তাঁর কত ব্যয় হয়েছিল, তার সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, 'বিধবাবিবাহ ও বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি দেশহিতকর কার্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ঋণ হইয়াছিল।'[৪৭]

'অজেয় পৌরুষ' ও 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব'-এর বিরল গৌরব নিয়ে কর্মযোগী বিদ্যাসাগর মানবসেবাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অথচ লক্ষণীয়, তাঁর সেবাধর্ম হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্ম-খ্রিস্টান প্রভৃতি কোনও সম্প্রদায়ের তথাকথিত শাস্ত্রনীতি-সমর্থিত শুধুমাত্র আচারসর্বস্ব ব্যাপার ছিল না। কারণ, তা ছিল বিরাট সর্বব্যাপী মহা-মানবের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে-গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজল পূর্ণ উন্মুক্ত আপনার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।...'[৪৮]

উল্লেখপঞ্জি

১। *বিপিনবিহারী গুপ্ত-সংকলিত পুরাতন প্রসঙ্গ, বিদ্যাভারতী প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, ১৩১-১৩২ পাতা।*
২। *দেবকুমার বসু-সম্পাদিত বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ৫৯৩ পাতা।*
৩। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, ঠাকুরবাটি, ১৫দশ পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৯, ৫ পাতা।*
৪। *শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর-চরিত—কলকাতা ১৮৯১, ২১৭ পাতা।*
৫। *The complete works of Sister Nivedita (vol. I) Birth Centenary Publication. p. 378.*
৬। *Do. p. 299.*
৭। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, উদ্বোধন-প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, ২৩৪-২৩৫ পাতা।*
৮। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, ঐ, ৬ পাতা।*
৯। *রবীন্দ্র রচনাবলী ১১দশ খণ্ড প.ব. সরকার, আগস্ট ১৯৮৯, ১৮৪ পাতা।*
১০। *বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, ৩য় সংস্করণ, ৪৮৬ পাতা।*
১১। *চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৪৬৯-৪৭০ পাতা।*
১২। *তদেব ৫২৪ পাতা।*
১৩। *তদেব ৫২২ পাতা।*
১৪। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ, ১৪দশ মুদ্রণ, ১৩৮৮, ২৪ পাতা।*
১৫। *ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—নবোদয় বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ (১৩৬২), ৭৭-৭৮ পাতা।*
১৬। *শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর-চরিত—২২৩ পাতা।*
১৭। *তদেব ২২৯-২৩০ পাতা।*
১৮। *তদেব ২৩৯-২৪০ পাতা।*
১৯। *তদেব ২৩৩-২৩৬ পাতা।*
২০। *বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়, কলকাতা ১৩২০, ২২৯ পাতা।*
২১। *চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর—৫৩৯ পাতা।*
২২। *'ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।'*
২৩। *সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ৩য় সংস্করণ, ৬৯ পাতা।*
২৪। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, উদ্বোধন, ঐ ৪০৫ পাতা।*
২৫। *চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর—৫৪২-৫৪৩ পাতা।*
২৬। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, ঐ ১৬-১৭ পাতা।*
২৭। *তদেব ১৭৩ পাতা।*
২৮। *তদেব ১৮ পাতা।*
২৯। *স্বামী সারদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্ধ উদ্বোধন ১৩৯৫, ৯১ পাতা।*
৩০। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, ৯০ পাতা।*
৩১। *ড: শান্তি সিংহ সম্পাদিত কবিতায় বিবেকানন্দ কথামৃত প্রকাশনী ১ম প্রকাশ ১৯৯১, ৬০ পাতা।*
৩২। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ, ২০৩ পাতা।*
৩৩। *তদেব ৫ম ভাগ, ২০৩ পাতা [পাদটীকা]*
৩৪। *তদেব ৩য় ভাগ, ৬ পাতা।*
৩৫। *বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—৩য় খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স ১ম সংস্করণ ১৩৩৬, ৩৭৫-৩৭৬ পাতা।*
৩৬। *The complete works of Sister Nivedita (Vol. I) Birth Centenary Publication. p. 298.*
৩৭। *রাজনারায়ণ বসু—বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা—কলকাতা ১৮৭৮, ২৫-২৬ পাতা।*
৩৮। *প্রিয়নাথ শাস্ত্রী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী—কলকাতা ১৯০৯, ১১ পাতা।*
৩৯। *সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনী, ৩য় সংস্করণ, ৩৫৭ পাতা।*
৪০। *চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর ৫২০ পাতা।*
৪১। *শশিভূষণ বসু, বিদ্যাসাগর-স্মৃতি প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৩, ৫৪৯ পাতা।*
৪২। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, ২৫১-২৫২ পাতা।*
৪৩। *বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর—২৩৮ পাতা।*
৪৪। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, ১৪ পাতা।*
৪৫। *Rai Manmohan Chakraborty Bahadur : A Summary of the changes in the Jurisdiction of Districts of Bengal. 1751-1961, p. 34-35.*
১৮৭১-৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল। Ref. C.E. Buckland : Bengal under the lieutenant—Governors Vol I, p. 482.
৪৬। *শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩য় ভাগ, ১৫ পাতা।*
৪৭। *শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর-চরিত, ২০৩ পাতা।*
৪৮। *রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১দশ খণ্ড ঐ ১৭২ পাতা।*

অঞ্জন বেরা

বাংলা সংবাদপত্র : শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে

আজকের এই গণমাধ্যমের যুগে বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দীবরণ বাংলা সংবাদপত্র জগতের পরিক্রমণ ব্যতীত কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ বাংলার সংস্কৃতি ও তার বহুধাবৈচিত্র্যকে সুস্পষ্ট আদল দেবার ক্ষেত্রে এককভাবে বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকাই বোধহয় সবার ওপরে। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ এবং বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তরণের প্রতিটি পর্বেই সক্রিয় থেকেছে সংবাদপত্র। কখনও কখনও তা ধারক ও বাহক একই সঙ্গে। তাই সদ্য বিগত একশ বছরের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং আগামী সময়ের সম্ভাবনা ও দাবিকে বুঝতে হলে বাংলা সংবাদপত্রের পাতা না উল্টে আমাদের উপায় নেই।

কিন্তু এ প্রসঙ্গেই চলে আসে দুটি মোক্ষম প্রশ্ন—প্রথমত, ইতিহাসকে কি দশক বা শতকের মাপাছাঁদে বিভাজিত করা সম্ভব? ইতিহাস কি পঞ্জিকা মেপে পা ফেলে? তাও আবার বাংলা পঞ্জিকা মেপে? বিশেষ করে যখন বাংলা তারিখ মেলাতে হলে বাংলা দৈনিক না দেখে উপায় থাকে না! দ্বিতীয়ত, ১৩০১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৪০০ বঙ্গাব্দ কি বাংলা সাংবাদিকতার গতিধারায় সুচিহ্নিত ও সুসংহত একটি কালপর্ব? বঙ্গাব্দের বিগত শতকটি কি বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে আলোচনাযোগ্য কোনও বৈশিষ্ট্য উপস্থিত করতে পেরেছে?

প্রথম প্রশ্নটির পর্যালোচনা বিতর্কহীন হওয়া শক্ত, সম্ভবত, অসম্ভবই। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা ভাবতে গিয়ে, আশ্চর্যই বলতে হবে, ইতিহাসের নিজেরই খেয়ালে, বিগত একশটি বছর বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে, সত্যি-সত্যিই যেন একটি বিশেষ কালপর্ব হিসেবে সুসংহত রূপ নিয়েছে। যদিও স্বাভাবিক কারণেই তাতে আছে নানা স্তর বিভাজন। উত্থান, উত্তরণ, কখনও বা স্খলনও।

বিগত বাংলা শতক যখন শুরু হয়েছিল তারও প্রায় সাড়ে এগারো দশক আগে এদেশে সংবাদপত্রের জন্ম। ইংরেজি ক্যালেণ্ডার মতে, ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের তেইশ বছর পর এদেশে প্রথম সংবাদপত্রের প্রকাশ। তা ছিল জেমস্ অগাস্টাস হিকির ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট'। বেঙ্গল গেজেটের প্রকাশ আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে তা ছিল ঔপনিবেশিক বিশ্বের প্রথম সংবাদপত্র। আর হিকির গেজেট যেহেতু কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল তাই সেই সুবাদে বাংলা প্রদেশই ছিল ভারতীয় সংবাদপত্র ও ভারতীয় সাংবাদিকতার আঁতুড়ঘর।

কিন্তু হিকির গেজেট ভারত থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র হলেও তা ছিল ইংরেজি ভাষায় এবং একজন ব্রিটিশের সম্পাদিত। সে কারণেই, ভারতীয় সাংবাদিকতা বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে বেঙ্গল গেজেটের যোগসূত্র নেহাতই আনুষ্ঠানিক। একই কথা বলা যায়, ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশনা বা সাংবাদিকতা প্রসঙ্গেও। ভারতীয় ভাষার প্রথম সংবাদপত্রটিও এদেশে প্রথম প্রকাশ করেছিল ব্রিটিশরা। প্রকাশিত নমুনা যা পাওয়া যায়, সেই অনুযায়ী ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রটি ছিল—'সমাচার দর্পণ'। বাংলা সাপ্তাহিক। উইলিয়াম কেরী সাহেব তা প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ১৮১৮ সালের ২৩ মে। যে বছর এদেশে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে হিন্দু স্কুলের। অনেকে অবশ্য বলেন যে, দর্পণেরও আগে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৮-র ১৬ মে একটি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার কোনও কপি কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রটি ছিল বাংলা ভাষায় এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা থেকে। এ ছাড়াও, ভারতীয় ভাষায় প্রথম দৈনিকটিও ছিল বাংলা ভাষায়—ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'। যা গোড়ায় সাপ্তাহিক থাকলেও ১২৪৬ বঙ্গাব্দের ১ আষাঢ় (১৪ জুন, ১৮৩৯) থেকে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তা ছাড়া এই বাংলা প্রদেশ শুধু ইংরেজি নয়, বাংলাও নয়, একাধিক ভারতীয় ভাষার সাংবাদিকতারও ধাত্রীভূমি। এদেশের প্রথম ফার্সি সংবাদপত্র বেরোয় কলকাতা থেকে রামমোহন রায়ের সম্পাদনায়। এ দেশের প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্তণ্ড'-এর প্রকাশ কলকাতা থেকে ১৮২৬ সালে। ভারতের প্রথম হিন্দি দৈনিক 'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রকাশিত হয় এই কলকাতা থেকেই ১৮৫৪ সালে। দেশের প্রথম উর্দু সংবাদপত্রটির জন্মও এই কলকাতা শহরে। এ ছাড়াও অসমীয়া, ওড়িশা সাময়িকপত্র প্রকাশনাতেও কলকাতার অবদান অনস্বীকার্য। ফরাসি শাসনাধীনে থাকার সময় বাংলার চন্দননগর থেকে প্রকাশিত হয়েছে ফরাসি সংবাদপত্র। এখনও এই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় দুটি গুরমুখী দৈনিক। যা পাঞ্জাব বা হরিয়ানার কোনও শহর থেকেও হয় না। একাধিক বিশিষ্ট হিন্দি দৈনিক এই শহর থেকে এখনও প্রকাশিত হয়।

সব মিলিয়ে তাই এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, ভারতীয় সাংবাদিকতায় বাংলার ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবেই উজ্জ্বল। বাংলা সংবাদপত্র শুধু যে ভারতীয় সাংবাদিকতাকে পুষ্ট করেছে তাই নয়, বিশেষত কলকাতাকে কেন্দ্র করেই এই বহুভাষী ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সাংবাদিকতার উত্থান। বাংলা সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা গড়ে উঠেছে এই বৃহত্তর পরিমণ্ডলের আবহেই।

বিগত বাংলা শতকে (চতুর্দশ শতক) বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকা ও অবস্থান আলোচনা করতে গিয়ে কালপর্বের বিভিন্নতাগুলিও খেয়াল না রেখে উপায় নেই। চতুর্দশ বাংলা শতককে আমাদের জাতীয় ইতিহাস আড়াআড়িভাবে দু-ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। মোটামুটিভাবে এই শতকের প্রথম অর্ধটি আমরা কাটিয়েছি পরাধীনতার মধ্যে। এবং শতকটি শুরু

হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ও চেতনা সবে সাংগঠনিক আদল পেতে উদ্যোগ নিচ্ছে। ক্যালেণ্ডারের হিসেবে চতুর্দশ বাংলা শতক শুরু হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যেই। প্রায় যখন থেকে কংগ্রেস প্রকৃত অর্থে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ নিতে শুরু করে। কাকতালীয় হলেও এই যোগসূত্রটি বিগত বাংলা শতকটিকে নিঃসন্দেহে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এবং এরই ভিত্তিতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বলা যায়, ভারতীয় সাংবাদিকতা গুণগত পরিবর্তনের মুখে পড়েছিল ঘটনাক্রমে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকটি শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

অবশ্য, বিগত শতকটি শুরু হবার আগে ভারতীয় সংবাদপত্র ও বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস শুধু যে যথাক্রমে একশ ও আশি বছরেরও বেশি সময় পার করেছিল তাই নয়, বিকাশের বেশ কটি ধাপও তারা পার হয়ে এসেছিল।

এই বিকাশের পর্ব প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যে, বাংলা ত্রয়োদশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে দুটি সুস্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। একটি অংশ ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণাধীন। যাদের প্রায় পুরোটাই ঔপনিবেশিক স্বার্থের মুখপত্র। অপর অংশটি ছিল ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন। যারা ক্রমশ ঔপনিবেশিক শাসনে নির্যাতিত ভারতবাসীর হাতিয়ার হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এই দ্বিতীয় ধারাটির সূত্রপাত ঘটেছিল রামমোহন রায়ের হাতে। ১৮২১ সালে প্রকাশিত দ্বিভাষিক মাসিক 'ব্রাহ্মণ সেবধি' এর প্রথম নজির। 'সেবধি' মূলত ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, রামমোহনেরই নেতৃত্বে ভবানীচরণ ব্যানার্জিকে সম্পাদক করে ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী' ছিল পুরোদস্তুর সংবাদপত্র।

ভাষা প্রসঙ্গে যে বিষয়টি না বললেই নয়, তা হল ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের সূত্রপাত ব্রিটিশদের হাতে ঘটলেও, ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্রের প্রসার ও বিকাশ কিন্তু ব্রিটিশদের হাতে নয়, তা ঘটেছিল ভারতীয়দেরই হাতে। ভারতীয় সম্প্রদায় যত বেশি করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে ততই তারা হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলেছে সংবাদপত্রকে। এ কথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মত বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও সত্য। যত সময় গেছে, যত রাজনৈতিক পরিপক্বতা এসেছে, ততই ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এবং ব্রিটিশ শাসকরা যে তা মোটেই সুনজরে দেখেনি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৮৭৮ সালের ভার্নাকুলার প্রেস আইন।

কিন্তু তার মানে আবার এই নয় যে ঔপনিবেশিক স্বার্থ ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের দিকে নজর দেয়নি কিংবা ভারতীয়রা বা জাতীয়তাবাদী মহল শুধুমাত্র ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ভারতীয়দের পরিচালনাধীন ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিও যতদিন গেছে ততই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছে। হরিশ মুখার্জির হিন্দু পেট্রিয়টকে যদি ভারতীয়দের হাতে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির মধ্যে প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তা হলে, বিশেষত অমৃতবাজার পত্রিকা, কিংবা কিছুটা সময় পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' (প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দৈনিক), পরের দিকে 'ফরোয়ার্ড', লিবার্টি, অ্যাডভান্স, দ্য হিন্দু, ফ্রি প্রেস জার্নাল, হিন্দুস্থান টাইমস—এ সব কাগজ তো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় সংবাদপত্রের বিকাশ কখনই এ দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন স্তরে সংবাদপত্রগুলি যুগধর্মকেই বহন করেছে, প্রভাব বিস্তার করেছে এবং প্রভাবিত হয়েছে। যেমন, প্রথম সাত-আট দশক ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি মূলত কেন্দ্রীভূত থেকেছে সমাজ-সংস্কারমূলক বিষয় নিয়ে। কিন্তু মোটামুটি সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই আমরা দেখতে পাই যে সংবাদপত্রমহল ক্রমশ রাজনৈতিক প্রশ্নে আলোড়িত হয়ে উঠছে। কাঠগড়ায় উঠছে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাবৃদ্ধি, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিস্তৃতি প্রভৃতি কারণে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও প্রকৃত অর্থে গণমাধ্যমের চেহারা নিতে শুরু করেছে। বাংলা চতুর্দশ শতক যখন শুরু হচ্ছে তার আগেই ভারতীয় সংবাদপত্র সমাজ-সংস্কারমূলক ভূমিকার স্তর তো অতিক্রম করেছেই, জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তার একটা বড় অংশই ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী সংগঠিত গণআন্দোলনের সঙ্গে তখন একাত্ম হয়ে ওঠার মুখে। এবং বিগত শতাব্দী যখন সবে তার প্রথম দশকটি পার করছে, তখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সংবাদপত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অংশটি সুস্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করে। বিগত বাংলা শতক শুরু হবার আগেই সোমপ্রকাশ, সুলভ সমাচার, সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা, (১৮৭৮-র ২১ মার্চ থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক এবং ১৮৯১-র ফেব্রুয়ারি থেকে দৈনিক), 'ভারত শ্রমজীবী', 'ঢাকা প্রকাশ', 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', 'বরিশাল বার্তাবহ', 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী', বাংলা সাংবাদিকতাকে গুণগত উত্তরণের পর্বে পৌঁছে দেয়।

নতুন বাংলা শতকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পর্বে বাংলা সংবাদপত্র জগতের সম্ভবত সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' (১৯০৪), অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম' এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'যুগান্তর'। বাংলা সাংবাদিকতাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকায় পরিণতি দিতে এই তিন সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। পরবর্তী প্রজন্মের বাংলা সাংবাদিকতায় এদের প্রভাব কখনই ভোলবার নয়।

বাংলা সংবাদপত্র জগতে আরও এক পর্বান্তর আমরা লক্ষ করতে থাকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। আধুনিক সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায় বাংলাভাষায় তার সূচনা ঘটে ১৯১৪ সালে হেমেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় 'দৈনিক বসুমতী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্নবার হাতবদল হয়ে দৈনিক বসুমতী এখনও বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম দৈনিক। শুধু বিষয়বস্তু নয়, বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশনার কারিগরি দিকেও বসুমতী নবযুগের সূচনা করেছিল। বসুমতীই সর্বপ্রথম রোটারি প্রেসে ছাপা বাংলা কাগজ। তা ছাড়া, সেই সময় থেকেই আমরা লক্ষ করতে থাকি যে, দৈনিকগুলিই বাংলা সংবাদপত্র জগতের মূল অস্তিত্ব হিসেবে উঠে আসতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের তৃণমূল বিস্তার, গণ-আন্দোলনের বিকাশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সংবাদ সংস্থার আবির্ভাব—এ সবই সংবাদপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকাগুলির প্রাধান্যকে খর্ব করতে শুরু করেছিল। বাস্তব পরিস্থিতির চাহিদার ভিত্তিতেই উঠে এসেছিল দৈনিক সংবাদপত্রগুলি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ না করে পারছি না যে এ দেশে প্রথম জাতীয়তাবাদী সংবাদ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন বঙ্গভাষীই—কেশবচন্দ্র রায়। ১৯০৮ সালে সিমলায় তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া (এ পি আই)। রায় নিজে যুক্ত ছিলেন ইংরেজি সংবাদপত্রের সঙ্গে। এ পি আই-ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রয়টার-এর মালিকানায় চলে যায়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে দেশের তৃতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদসংস্থা হিসেবে ইউনাইটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া (ইউ পি আই) বিধুভূষণ

সেনগুপ্তের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই কলকাতাতেই। ইউ পি আই-র বোর্ড অব্ ডিরেক্টরসের সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এবং এই সংবাদসংস্থার পিছনে আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অ্যাডভান্স এবং শরৎ বসুর ফরোয়ার্ডেরই মূল ভূমিকা ছিল।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রগুলির মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় উঠে এসেছিল ফজলুল হকের 'নবযুগ', চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি কাগজ। তিরিশের দশকে উল্লেখযোগ্য বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র বলতে প্রথমেই চলে আসে অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে প্রকাশিত 'যুগান্তর' (১৯৩৭), ১৯৩৯ সালে প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত 'ভারত', ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির মুখপত্র 'দৈনিক কৃষক' (আবুল মনসুর আমেদ সম্পাদিত)। পরবর্তী সময়ে মৌলানা আক্রম খান সম্পাদিত দৈনিক আজাদ এবং সুরাবর্দী সম্পাদিত দৈনিক 'ইত্তেহাদ' অবশ্য মুসলিম লিগেরই স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করত। সামগ্রিকভাবে বাংলা সাংবাদিকতায় এদের স্থায়ী প্রভাব পড়েনি বললেই চলে।

তবে বাংলা সাংবাদিকতায় প্রভাবের দিক থেকে, স্বল্প আলোচিত হলেও, কমিউনিস্ট মুখপত্রগুলির ইতিবাচক অবদান খুবই স্পষ্ট।

রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে শ্রমিক-কৃষকসহ খেটে-খাওয়া মানুষের কথা তুলে ধরার দিক থেকে বাংলা সাংবাদিকতায় নতুন উপাদান সংযোজিত হয় বিশের দশক থেকে। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'নবযুগ' দৈনিক। 'নবযুগ'-এর মালিক ছিলেন ফজলুল হক। কিন্তু সম্পাদনার কাজ দেখতেন মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখার্জির ভাষায় 'নবযুগ'ই ছিল এ দেশে 'শ্রমিক কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কিত রচনা সমৃদ্ধ প্রথম পত্রিকা।' এক বছরের মধ্যেই অবশ্য মুজফ্ফর আহমদ (কাকাবাবু) ও নজরুল 'নবযুগ' ছেড়ে দেন। তাঁরা নিজেরাই একটি দৈনিক প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখন সফল হননি। এর পর, বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্র হিসেবে প্রথমে 'লাঙ্গল' (১৯২৫) এবং পরে নাম বদলে 'গণবাণী' (১৯২৬) প্রকাশিত হলে কাকাবাবুই ছিলেন সেই কাগজের মূল পরিচালক। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কাকাবাবু গ্রেপ্তার (১৯২৯) হলে 'গণবাণী' বন্ধ হয়ে যায়।

তবে তিরিশের দশকে বাংলাপ্রদেশে কমিউনিস্ট সংগঠন তুলনামূলকভাবে শক্তিবৃদ্ধি ঘটালে একাধিক সংবাদপত্র কমিউনিস্টরা প্রকাশ করেছে। ১৯৩৩ সালে আব্দুল হালিমের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গণশক্তি পাবলিশিং হাউস একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে। যেমন—মার্কসবাদী, মার্কসপন্থী, মাসিক গণশক্তি (১৯৩৪)। ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হতে শুরু করে নবপর্যায়ের মাসিক 'গণশক্তি'। আটটি সংখ্যা প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে গেলেও, ১৯৩৯ সালের এপ্রিলে হালিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আগে চলো'। এর অল্প আগেই কাকাবাবুর উদ্যোগে সংগঠিত 'হিন্দ্ প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং লিমিটেড' বাংলা দৈনিক প্রকাশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে যাত্রাতেও এ চেষ্টা বাস্তবায়িত করা যায়নি। ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠলে 'জনযুদ্ধ' (প্রথমে পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক) সর্বপ্রথম অবিভক্ত সি পি আই-র সরাসরি মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট সাংবাদিকতায় অবশ্য সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রকাশ। সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন 'স্বাধীনতা'-র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। সাংবাদিকতার ভাষা, বিষয়বৈচিত্র্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা সব দিক থেকেই বলা যায়, 'স্বাধীনতা' বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র জগৎকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৪৮ সালের মার্চে সি পি আই-কে নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সরকার 'স্বাধীনতা' দপ্তরেও তালা ঝুলিয়ে দেয়। এর পর, ১৯৫১ সালে হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে 'স্বাধীনতা' পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। তার পরও প্রায় এক দশক চলার পর কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে 'স্বাধীনতা' বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' ও দৈনিক 'স্বাধীনতা' নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বিগত শতকে বাংলা সংবাদপত্র জগৎ নতুন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল স্বাধীনতার পর। অবশ্য, শুধু বাংলা কেন সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সাংবাদিকতাও নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে। বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রার আর একটি ঘটনা ছিল অবশ্য দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলার বিচ্ছেদ।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের কাঠামোগত ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলির ভারতীয়করণ। 'দ্য স্টেটস্ম্যান', 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া', 'দ্য পাইওনিয়ার'-র মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজি কাগজগুলি দু-চার বছরের মধ্যেই ভারতীয়দের মালিকানায় চলে আসে। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সরাসরিই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোনও বিদেশি মালিকানাধীন সংবাদপত্র এ দেশ থেকে প্রকাশ করতে বা বিদেশি প্রকাশনার ভারতীয় সংস্করণ বার করতে দেওয়া হবে না।

এই মালিকানা বদল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও, স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা ও লক্ষ্য শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে গঠিত প্রথম প্রেস কমিশন (১৯৫২-৫৪) বুর্জোয়া উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই চিহ্নিত করেছিল যে, জনস্বার্থমূলক সাংবাদিকতাই ভারতীয় সংবাদপত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথম প্রেস কমিশন তীব্রভাবেই বিরোধিতা করেছিল সংবাদপত্রের বাণিজ্যিকীকরণের। শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে জনমত গঠনের এই শক্তিশালী হাতিয়ারটি চলে যাক প্রেস কমিশন তা চায়নি।

কিন্তু বিষয়টি শুধুমাত্র কমিশনের চাওয়া না-চাওয়ার ওপর নির্ভর করছিল না। বিশেষত বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি একচেটিয়া শিল্পপতিদের হস্তগত হবার দরুন ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে মূল্যবোধের ক্রম-অবক্ষয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। জনস্বার্থমূলক সাংবাদিকতার বদলে বাণিজ্যিক স্বার্থের ক্রমবিস্তার ভারতীয় সংবাদপত্র মহলের প্রভাবশালী অংশকেই তার ঐতিহাসিক ভূমিকা থেকে বিচ্যুত করেছে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিই নয়, বৃহৎ সংবাদপত্র ব্যবসায়ীদের হাতে হিন্দিসহ একাধিক ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র আক্রান্ত। সংবাদপত্র প্রকাশনা জগতে মালিকানার কেন্দ্রীভবন ও বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে তার বিপজ্জনক গাঁটছড়া মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদকে সঙ্কুচিত না করে পারেনি। পাশাপাশি, শাসকশ্রেণীর ভূমিকাও বহু ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যেমন ১৯৪৮ সালে দৈনিক স্বাধীনতা অফিসে রাজনৈতিক কারণেই তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সরকার তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কোনও ধার ধারেনি। সত্তর দশকের মাঝামাঝি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির বেশিরভাগই তখন কিন্তু শাসকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকাকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছে।

স্বাধীনোত্তর বাংলা সংবাদপত্র জগৎ সম্পর্কেও বলা যায় যে, যত সময় পার হয়েছে বাণিজ্যিক সংবাদপত্রে বুর্জোয়া উদারনৈতিকতার ইতিবাচক প্রবণতাগুলি তত ক্ষয় পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে (পরে স্বাধীন বাংলাদেশ)

বাংলা সংবাদপত্রগুলি যখন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে কণ্ঠরুদ্ধ, তখন পশ্চিমবাংলায় বাংলা সংবাদপত্র জগৎ পড়েছে মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থের কবলে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় যে, বাংলা সংবাদপত্র যে শুধুমাত্র স্বাধীনোত্তর ভারতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই একান্তভাবে সীমাবদ্ধ থেকেছে তা নয়। আসাম এবং ত্রিপুরা থেকেও ছোটখাটো প্রকাশনা মাথা তুলেছে বারবার। এই মুহূর্তে আসাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক যুগশঙ্খ' (১৯৮২), 'দৈনিক সোনার কাছাড়' (১৯৮০) কিংবা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ' (১৯৬৬ 'দৈনিক গণঅভিযান' নামে) ও 'ডেইলি দেশের কথা'-র নাম করা যায়। কিন্তু প্রচার সংখ্যার ও আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকে এগুলি এতই সীমাবদ্ধ যে ওই দুই রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিই বেশি পরিচিত।

স্বাধীনতোত্তর পর্বে বাংলা সংবাদপত্র জগতেও কেন্দ্রীভবন নেতিবাচক প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদপত্রের অভাব। কেরালা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এমনকি ওড়িশাতেও রাজধানী শহরের বাইরে এক বা একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশনাকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্র জগৎ কার্যত কলকাতা-কেন্দ্রিক। শিলিগুড়ি, আসানসোল বা বর্ধমান শহর থেকে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু প্রচার সংখ্যা বা প্রভাবের দিক থেকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দু-তিনটি দৈনিকই বাজারের প্রায় পুরোটা দখল করে রয়েছে।

যা কখনই বাংলা সাংবাদিকতার পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। আসলে, এর মূলে রয়েছে আদতে সেই বাণিজ্যিকীকরণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আরও বলা যায় যে, 'আঞ্চলিক' ভাষা হিসেবে ও কিছু কারণে বাংলাভাষায় সংবাদপত্রের বাজার হিন্দির মতো বৃহৎ নয়। ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মিডিয়া ব্যারনরা সরাসরি বাংলা সংবাদপত্র জগতে স্থায়ীভাবে পা দেবার ব্যাপারে এখনও তেমন আগ্রহ দেখায়নি। যদিও স্বাধীনতার ঠিক পরেই 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া' গোষ্ঠীর প্রকাশক সংস্থা বেনেট কোলম্যান কোম্পানি (তখন শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া ও তার জামাতা জৈনের মালিকানাধীন) ১৯৪৮ সালের আগস্টে 'সত্যযুগ' নামে একটি বাংলা দৈনিক কলকাতা থেকে বার করে। তারও আগে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রামনাথ গোয়েঙ্কা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছিলেন দৈনিক পত্রিকা 'ভারত'। কিন্তু এই সর্বভারতীয় বৃহৎ প্রকাশনাসংস্থার মালিকনাও 'ভারত' কিংবা 'সত্যযুগের' স্বল্পায়ু ঘোচাতে পারেনি। আনন্দবাজার পত্রিকা এবং 'যুগান্তর'ই স্বাধীনতার পর বাংলা সংবাদপত্র বাজারে প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এ ঘটনাও বাংলা সংবাদপত্র জগৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই একচেটিয়া বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ বাংলা সংবাদপত্র জগতের বৈচিত্র্যকে নষ্ট করেছে। 'লোকসেবক', 'জনসেবক', 'পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ', 'মাতৃভূমি', 'স্বরাজ',-র মতো বাংলা দৈনিকগুলি বাণিজ্যিক অংকের সহজ সূত্রেই অবলুপ্ত হয়ে যায় ষাটের দশকের মধ্যে। এ ছাড়া, দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সত্যযুগ', এবং পরে কলকাতা থেকে 'দৈনিক বসুমতী'-র মতো সংবাদপত্রগুলি যে বাজার পায়নি তাও তো অনেকাংশে বাংলা সংবাদপত্র জগতে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দাপটের কারণেই।

কোনও সন্দেহ নেই, এই মুহূর্তে ভারতের অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্রগুলির মতো বাংলা সংবাদপত্র জগৎও নতুনতর একে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বাণিজ্যিক সংবাদপত্রগুলি সাংবাদিকতার বুর্জোয়া উদারনৈতিকতার ইতিবাচক মূল্যবোধগুলিকেও জীর্ণবস্ত্রের মতো ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখোমুখি বিরোধিতা এবং শাসকশ্রেণীর জনবিরোধী নীতিগুলির সঙ্গে নজিরবিহীন একাত্মতা জনগণের বৃহত্তর অংশের স্বার্থের সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের ঐতিহাসিক যোগসূত্রকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে তৎপর। 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি'র নিষ্ঠ সমর্থক একচেটিয়া পুঁজি সংবাদপত্র প্রকাশনা জগতে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। এরই প্রত্যক্ষ পরিণতি হল, বাণিজ্যিক মানদণ্ডের বিপজ্জনক প্রাধান্য এবং জনস্বার্থমূলক সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। বাংলা সাংবাদিকতাও গুণগতভাবে ভিন্ন এই বিপদের সম্মুখীন। বাংলা ভাষায় বৃহত্তম প্রকাশনা সংস্থাটি এখন আন্তর্জাতিক 'মিডিয়া ব্যারনদের' দেশি এজেন্টে পরিণত হতে উদ্যোগী। 'গণশক্তি' পত্রিকাকে বাদ দিলে একটিও বাংলা দৈনিক কি আছে, যে একচেটিয়া পুঁজির প্রকাশ্য বা গোপন আশীর্বাদ ছাড়া প্রকাশনা টিকিয়ে রাখার আশা রাখে? কিন্তু এ জিনিস মোটেই কাম্য নয়। যদিও এটাই সত্যি যে, গুণগতভাবে—বিকল্প—পথের দিকে দিক-পরিবর্তন না করলে বিপদের গভীর খাদ কখনই এড়ানো যাবে না। আর এ পথের সন্ধান সমস্যার বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটির বিবেচনা ব্যতিরেকে কখনই সম্ভব নয়। আসলে, বুর্জোয়াজির নিজস্ব সঙ্কটেরই প্রতিফলন পড়ছে বুর্জোয়া সংবাদপত্র জগতে। সাম্প্রদায়িকতায় সুড়সুড়ি দেওয়া, উগ্র-কমিউনিস্ট বিরোধিতা, নগ্ন দক্ষিণপন্থাকে সম্বল করে বাংলা সংবাদপত্রের যে শিবিরটি বাঁচতে চাইছে তারা ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে অস্বীকার করছে।

বাংলা সংবাদপত্রের মূলস্রোত, তারা নানামুখী সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, বিকশিত হয়েছে জনস্বার্থকে ধারণ করে, উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তর্জাতিকতাবোধ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার পক্ষাবলম্বন করেই।

সমাজের ব্যাপক গরিষ্ঠ অংশের মানুষের স্বার্থের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেললে গণমাধ্যম হিসেবে এই সংবাদপত্রগুলি বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হবে। এ অবস্থায় উপকরণগত সামর্থ্যের আপাত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও,এগিয়ে আসতে হবে বাংলা সংবাদপত্রের বিকল্প উদ্যোগগুলিকেই। এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বিকশিত করতে হবে বাংলা সাংবাদিকতার গৌরবময় ও গণঘনিষ্ঠ ঐতিহ্যকে।

এ শুধু আশা নয়, বাস্তবায়নের চেষ্টাও, এর মধ্যে মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। যত সময় যাচ্ছে, বাংলা সংবাদপত্র জগতে নীতি ও অবস্থানগত মেরুকরণ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এর একদিকে রয়েছে শ্রেণীসচেতনতা, জনস্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে নীতিহীন বাণিজ্য স্বার্থ, ভোগবাদ, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ওকালতি।

নতুন বাংলা শতাব্দী এল বাংলা সংবাদপত্র জগতের এমনই এক সন্ধিক্ষণে। নতুনতর এই চ্যালেঞ্জের সফল মোকাবিলাই আগামী সময়ের সাধনা হয়ে উঠুক। হয়ে উঠুক শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

শতাব্দীর প্রবন্ধসাহিত্য

'রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।'

বিদায়ী চতুর্দশ বঙ্গাব্দের প্রথম নববর্ষের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে তথা বঙ্গীয় সমাজে বঙ্কিম-প্রতিভার ভূমিকা নির্ণয়কালে, উপসংহারে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণাবাক্যের মতো উচ্চারণ করেছিলেন।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ বঙ্গাব্দের সন্ধিক্ষণে প্রবন্ধটির পরবর্তী এবং উপসংহার বাক্যটিও সর্বাংশে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি বলে মনে হচ্ছে আমার—'এই কথা ('ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য') স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।'

এখন থেকে ঠিক শতাব্দীকাল আগে লিখিত ও প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির ঠিক দু'মাস পরেই কবি বিহারীলালের প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ যে-মন্তব্য করেছিলেন তাঁর 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে, তা-ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'বঙ্গের সারস্বতকুঞ্জে মৃত্যু ব্যাধের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার নিষ্ঠুর শরসন্ধানে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল।'

১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ অর্থাৎ বঙ্কিম-প্রয়াণের কিঞ্চিদধিক একটি বৎসরের মাথায় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভার সাংবাৎসরিক অধিবেশনে এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগরচরিত' নামে যে-প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, সেখানেও তিনি লিখেছিলেন—

'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।...বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।...তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।'

অর্থাৎ, গদ্যসাহিত্যকে বিদ্যাসাগরই সাহিত্যিক গদ্যে উন্নীত করেছিলেন। সাহিত্যিক গদ্য ব্যতিরেকে কোনো প্রবন্ধই প্রবন্ধসাহিত্যের স্তরে উন্নীত হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই আমরা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের প্রথম শিল্পোত্তীর্ণ রূপটি যে পেয়েছিলাম, তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটি রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধেই সংক্ষিপ্ত সংহত ভাষায় তুলে ধরেন—

'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলা ভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে দুই শ্রেণীর যোগী লক্ষ্য করেছিলেন। ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন। সংসারী লোকের কাছে ধ্যানযোগীর রচনাগুলি উপরি-পাওনা। 'কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন'—রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, সাহিত্যের যেখানে যা কিছু অভাব ছিল, সর্বত্র তিনি নিজের সমস্ত শক্তি ও আনন্দবেগ নিয়ে দেখা দিতেন—'কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।'

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য 'বঙ্গদর্শন'কে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়ে উঠলো, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো।' এবং 'বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।'

রামমোহন প্রসঙ্গেও 'কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা— আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই'— যার সূত্রপাত রামমোহনের হাতে হয়নি, এই মূল্যায়নও রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধেই আমরা পাই। এবং একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তবু নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছিলেন— 'বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত।'

দুই

বাংলা প্রবন্ধ নয়, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বলতে যা বুঝি, সেই বস্তুটি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই 'বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল'—বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাষাশৈলী—দু'দিক থেকেই।

এবং বঙ্কিম প্রয়াত হলেন ২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন!' লিখছেন, বৈশাখ ১৩০১ বঙ্গাব্দে।

বস্তুত, রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন পাঠককে স্মরণ করাতে পারে—কালিদাসের রচনাকর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও বিশ্লেষণ। কালিদাসের সৃষ্টিগুলি আছে ভাষা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষায়, কিন্তু সৃষ্টিগুলির নেপথ্যে তাঁর অভিপ্রায় ও জীবনজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে কালিদাসের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা পরবর্তীকালে পাঠকের জানার কোনো উপায় নেই। সৃষ্টিগুলির অভ্যন্তরেই তা গুহাহিত আছে। পাঠক ও সমালোচক নিজের নিজের রসবোধ, জীবনবোধ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণসামর্থ্য অনুযায়ী তা বুঝে নেবেন, এই স্বাধীনতা তাঁদের আছে।

রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, 'নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি!'

আমি বলতে চাইছি, রবীন্দ্রনাথ যখন কালিদাসের কাব্যনাটক, রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, কর্ম ও সাহিত্যকীর্তি প্রভৃতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করছেন, তখন অতুলনীয় বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেই সমস্ত তথ্য প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উৎস যে কালিদাস, রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, কর্ম ও সৃষ্টিতেই নিহিত, এমনটি না-হওয়াই সম্ভব।

বস্তুত, মূল্যায়ন ও সমালোচনার কাজটা যখন করছেন, রবীন্দ্রনাথের মতো একজন অসাধারণ প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ, মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন এবং উচ্চাঙ্গের মননকল্পনাসম্পন্ন— একই সঙ্গে ধ্যানযোগী ও কর্মযোগী পুরুষ!

তার অর্থ কি এই যে, কালিদাসের কাব্যনাটকাদির, রামমোহন কী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও কীর্তির রবীন্দ্রকৃত ব্যাখ্যা, ভাষা ও বিশ্লেষণ অসার বা অঠিক?

নিশ্চয়ই তা নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ বঙ্গীয় শতাব্দী দুটির সন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ রবীন্দ্রনাথ পূর্বতন ভারতীয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিশ্লেষণকালে বড়ো বেশি করে ভাবছিলেন, সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের কথাটিও। সেই উত্তরাধিকার যে প্রথমত ও প্রধানত তাঁকেই (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকেই) বহন করতে হবে, এ বিষয়ে তিনি নিজে অন্তত নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন উত্তর-তিরিশে পৌঁছে, খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে বুঝতে সুবিধা হবে সব ধরনের পাঠকের, তাই সেই হিসাবে সময়টা হলো—১৮৯০-১৯০০ কালপর্ব।

রবীন্দ্ররচনাবলী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা ও গ্রন্থাবলীর রচনাকাল ও প্রকাশকালের দিকে জিজ্ঞাসু সাহিত্যপাঠক যদি এক ঝলক তাকিয়ে দেখেন, তা হলেই স্পষ্ট হবে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে, বিশেষত তাঁর মননসমৃদ্ধ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাবলী তথা চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন দেশ ও জাতির সর্বাত্মক উন্নতি সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশ ও জাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠা ও পরিশ্রমসহকারে হস্তক্ষেপ করেছেন।

১৮৯০-৯১ থেকে অর্থাৎ ১২৯৭-৯৮ বঙ্গাব্দ থেকে শুরু হয়েছিল যুগপৎ ধ্যানযোগী ও কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথের কাজ। এই কালপর্ব তথা কর্মকাণ্ডের প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি আমি মনে করি, 'সাধনা' পত্রিকায় পৌষ ১২৯৯ সালে প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি। প্রকাশের পূর্বে ১২৯৯ বঙ্গাব্দেই রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত হয়েছিল প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি শিক্ষা বিষয়ক বটে, কিন্তু 'শিক্ষা'র যথার্থ সংজ্ঞার্থ মনে রেখে লেখা বলেই প্রবন্ধটি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ বঙ্গীয় শতকদুটির সন্ধিক্ষণের সমগ্র জাতীয় মনীষার সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা-উৎকণ্ঠা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখিত। তাই এই প্রবন্ধটি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুসহ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করতে পেরেছিল। একত্রিশ বৎসর বয়সী তরুণ ও উদীয়মান সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন তা কল্পনাতীত। কেননা, রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' ছাড়া তখনও পর্যন্ত এমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তির অধিকারী হতে পারেন নি।

কিন্তু, উল্লিখিত প্রবন্ধটির জন্য যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীনভাবে নন্দিত করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় তথা জাতীয় মনীষার প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র তো একাই ছিলেন 'দ্য গ্রেটেস্ট ম্যান অব দ্য নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরি'!

বিদায়ী শতাব্দীর বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের গতিপ্রকৃতিও আদৌ উপলব্ধিতে আনতে হলেও বুঝতে হবে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ পর্যন্ত উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় নবজাগৃতির সমগ্র ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আত্মস্থ করতে না পারলে অর্থাৎ নিছক কবিতার সৃষ্টিসামর্থ্য বা সাহিত্যবিষয়ক রচনানৈপুণ্যেই রবীন্দ্রনাথও পারতেন না রবীন্দ্রনাথ হতে। ধ্যানযোগীর কবিতাকর্মেই তাঁর সাধনা হতো পর্যবসিত, কর্মযোগীর অক্লান্ত সাধনায় হতে পারতেন না সমকালের সহযাত্রী হয়েও কালোত্তীর্ণ।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি তাই শেষ হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ জীবনসাধনার আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকারে— 'ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন'-এর সম্মিলন-সাধনায়।

কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি, রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্যক্ বিচারে একটি অনপনেয় প্রতিবন্ধক।

এই কারণেও তাঁর গদ্যরচনার বিশালতা, গভীরতা, বৈচিত্র্য ও জীবনবীক্ষার সমগ্রতা বহুলাংশে আজও অতি সীমিত বিশেষজ্ঞ-চর্চার বাইরে কার্যত অজানাই থেকে গেছে।

তথাকথিত রসচর্চায় গড়পরতা বঙ্গীয় লেখক-পাঠক-সমালোচকের যে আগ্রহাতিশয্য, মননচর্চার ক্ষেত্রে ততটাই তার আপেক্ষিক অনাগ্রহ।

তথ্য ও পরিসংখ্যানের খোঁজখবর নিলে দেখাই যায়, ত্রয়োদশ বঙ্গীয় শতাব্দীর অবসানের আগে থেকে শুরু করে চতুর্দশ বঙ্গীয় শতাব্দীর সূচনা-পর্বেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে দেশ-জাতি-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্তজড়িত প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর মননপ্রতিভাকে অটল নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সঞ্চালিত করেছেন। শুধু শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার উন্মোচনই নয়, সাহিত্য-প্রাচীন সাহিত্য-লোকসাহিত্য বিষয়ক বিবিধ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সূত্রপাতও এই সময়ে, ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজ-ধর্ম প্রভৃতি স্বদেশ ও স্বজাতি সংক্রান্ত জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ অধীর আগ্রহে লেখনী চালনা করছেন এই কালপর্বেই। শুধু যে প্রবন্ধসাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন, তাই নয়, কবিতা ও ছোটো-গল্প রচনার পাশাপাশি 'পঞ্চভূত' ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর রম্যরচনাধর্মী 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' সৃষ্টিতেও অসামান্য সিদ্ধি অর্জন করলেন। এবং এই কালপর্বেই লক্ষণীয় হলো, সদ্যপ্রয়াত মনীষী ও সাহিত্যস্রষ্টাদের জীবন ও কর্মকান্ড অবলম্বনে বিশ্লেষণমূলক শ্রদ্ধা নিবেদন, বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-বিহারীলাল-রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনস্বীর মূল্যায়নকালে বস্তুত নিজেরই জীবনাদর্শ ও লক্ষ্যের পরিস্ফুটন।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ বঙ্গীয় শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের রবীন্দ্রসাহিত্য, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য লক্ষণীয় ও স্মরণীয়, কেননা, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যই প্রথমত ও প্রধানত গণনীয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে, একেবারে 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটির

রচনা ও প্রকাশ পর্যন্ত কালপর্বটি তাই সতত প্রণিধানযোগ্য। বিদায়ী চতুর্দশ বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রবন্ধসাহিত্য আলোচনার প্রথম প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কেন্দ্রবিন্দুই রবীন্দ্রনাথ, এক প্রান্তে তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' এবং অপর সীমায় 'সভ্যতার সঙ্কট'।

উল্লিখিত দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে ঋজু, ওজস্বী, সরস ও আক্রমণাত্মক করে গেছেন একক তাৎক্ষণিক দানে স্বামী বিবেকানন্দ। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর পত্রসাহিত্যও উল্লেখযোগ্য।'বাঙ্গালা ভাষা'প্রবন্ধটি তো অনন্যসাধারণ। 'সবুজপত্র'-এর সংগঠিত চলিত ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা-উৎসরূপে প্রবন্ধটিকে দেখতে হবে। তার আগে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' ও 'ছিন্নপত্র' বা পত্রাবলী কিন্তু 'চিঠিপত্র'-রূপেই লিখিত হয়েছিল। সেদিক থেকে 'বাঙ্গালা ভাষা'প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিদ্যমান।

রমাঁ রলাঁ বিবেকানন্দের গদ্য অনুবাদের মাধ্যমে পড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বোধ করতেন। বিবেকানন্দের বাংলায় লেখা প্রবন্ধের পাঠকও একই অভিভবে স্পন্দিত-শিহরিত হতে পারেন।

তিন

'বঙ্গদর্শন' এবং অংশত 'প্রচার' যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের মননচর্চার মঞ্চ, একাদিক্রমে 'ভারতী', 'হিতবাদী'-'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা রবীন্দ্রনাথের মননপ্রতিভার বিকাশের দর্পণস্বরূপ।

১৩৪৮ সালে প্রয়াণের অল্পদিন আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটিই প্রমাণ করে সাহিত্যবিষয়ক না হয়েও একটি রচনা কীভাবে কতটা প্রবন্ধসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। ১৩০১ থেকে ১৩৪৮ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত অগণিত রচনার তালিকা তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যের তালিকা নির্মাণও যেমন আমাদের এই বিশেষ প্রবন্ধে করণীয় বলে মনে করি নি, একই কারণে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যান্য প্রাবন্ধিকদের রচিত প্রবন্ধাবলীর তালিকানির্মাণও আমার লক্ষ্য নয়।

আমরা দেখেছি, বাংলা প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই প্রবন্ধসাহিত্য হয়ে উঠলো। বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রসাধনকলার দিক থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যসম্ভার অসামান্য। দুটি দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কর্মযোগী বঙ্কিমকে পথিকৃৎ রূপে অফুরন্ত শ্রদ্ধা জানালেন, আদর্শস্বরূপ গণ্য করলেন কিন্তু তাঁকে অনুকরণ করার কথা কল্পনাও করলেন না। তবু, বিষয়বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্যকে নিশ্চিতরূপেই ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধরচনার বঙ্কিমী ধাঁচ ও ধরনকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সযত্ন, সচেষ্ট ও সচেতন ছিলেন, সন্দেহ নেই।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, বঙ্কিমচন্দ্র যে-অর্থে প্রাবন্ধিক, সেই একই অর্থে রবীন্দ্রনাথ আদৌ প্রাবন্ধিক কি ?

প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত, মনন বা কল্পনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক গদ্যরচনা রবীন্দ্রনাথ সত্যিই ক'টি লিখেছিলেন ?

রবীন্দ্রনাথ একেবারেই তাঁর নিজস্ব ধরনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধরনে একেবারেই না। সুতরাং, তুলনা চলবে না।

যদি ভাবি, রবীন্দ্রনাথ ধ্যানযোগ আর কর্মযোগকে মেলাতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রবন্ধে ? তা-হলে বলতে হবে, খুব কম ক্ষেত্রেই সেই সম্মিলন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও প্রবন্ধসাহিত্যই লিখেছেন, এবং তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব ধরনে, তাঁর কোনো পূর্বসূরী যেমন নেই, তেমনই এক্ষেত্রে তাঁর কোনো উত্তরসূরীও নেই। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ মহিমায় দীপ্ত, একক ও সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গরূপে বিরাজিত। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই।

কখনো-কখনো বটে, কিন্তু এমন কোনো সরল একপেশে সিদ্ধান্তও চলবে না যে. রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কবির কলমেই লেখা, এবং সেইজন্যই তা ভিন্ন গোত্রের।

বিষয়বস্তু যতই গভীর-গম্ভীর হোক না কেন, তাঁর উপস্থাপনা ও রচনারীতি আস্বাদনমূলক, অনুভূতিনিবিড় এবং তাঁর বক্তব্য আবেগসূত্রে গ্রথিত, যুক্তি ও ন্যায়ের সূত্রে নয়।

অজিত চক্রবর্তী বা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ দীর্ঘায়ু হলে, আরও লিখলে হয়তো বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী দুর্লভ হতো না। তাই, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অক্ষয়চন্দ্র সরকার বা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো উত্তরসূরী পান, এমন-কী অনেক পরবর্তীকালে প্রমথনাথ বিশী বা নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো অনুরাগী অনুসরণকারীদের, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই অর্থে কোনো উত্তরাধিকারীকে রেখে যেতে পারেন নি।

জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা মূলত বিজ্ঞানসাধক হলেও তাঁদের প্রবন্ধ সাহিত্য-আবেদন-বর্জিত নয়। তাঁদের রচনারীতিও বিভিন্ন। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য তাঁদের দানেও সমৃদ্ধ এবং প্রসারিত।

'প্রবাসী' পত্রিকা বলতেই মনে হয়, তা বুঝি ছিল রবীন্দ্রসর্বস্ব কোনো পত্রিকা। সম্পাদক রামানন্দ একদিকে, আর-একদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঠিক যেমন 'সবুজ পত্র' বলতেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই কথা। এবং, তারপরেই বড়ো জোর, তার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর কথা। যদিও অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অবনীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, বরদাচরণ গুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারীতকৃষ্ণ দেব এবং অন্তত সম্পাদকপত্নী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর উল্লেখ করতেই হয় 'সবুজপত্র'-এর লেখকগোষ্ঠীর সূত্রে। তবু 'সবুজপত্র'-এর অধিকাংশ সংখ্যায় একা রবীন্দ্রনাথেরই তিনটি-চারটি-পাঁচটি পর্যন্ত লেখা ছাপা হতো। 'সবুজপত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী যা চেয়েছিলেন, তা হলো,

'সাহিত্য মানব-জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। .....সাহিত্য, জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না—কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।' —ওঁ প্রাণায় স্বাহা। মুখপত্র। সবুজপত্র। প্রথম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। ২৫ বৈশাখ ১৩২১।

বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকা যা-কিছু, প্রায় সবই এতকাল চলে এসেছে একক বা কৃচিৎ-কখনো বড়ো জোর দু-তিনজন রথী-মহারথী লেখকের আত্ম-উন্মোচন ও বিকাশের মঞ্চরূপে। সম্বাদ কৌমুদী, সম্বাদ চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, মাসিক পত্রিকা, অবোধবন্ধু, বঙ্গদর্শন, ভারতী, হিতবাদী, সাধনা, বালক, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), এমন-কী প্রবাসী পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ যুগোপযোগী নতুন কাগজ চেয়েছিলেন এটা ঠিকই, এই নতুন যুগের তাগিদটা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন বলেই প্রমথ চৌধুরীকে চিঠির পর চিঠি লিখে তিনি প্রাণিত করেছিলেন 'সবুজপত্র' প্রকাশের জন্য, 'সবুজপত্র'-এর মুখপত্রে সেই কথাটাই প্রমথ চৌধুরীও জানিয়েছিলেন,—

'একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করার জন্য। ....দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ....আমাদের বাংলাঘরের খিড়কি-দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা

করতে হবে, আমাদের গৌড়-ভাষার মৃৎ-কুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে চেষ্টা করতে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনো সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।'

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চেয়েছিলেন, 'সবুজপত্র'-কে কেন্দ্র করে একটি যোগ্য লেখকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে। কেননা, বহু কাগজ পরিচালনায় অংশগ্রহণের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ভালোই জানতেন, সমস্ত চাপটা তাঁর একার 'পরে এসে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধসাহিত্য নিয়েই প্রধানত ভাবিত ছিলেন, একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন—

'অন্যান্য মাসিকে যে সমস্ত আলোচ্য প্রবন্ধ বেরোয় তার সম্বন্ধে সম্পাদকের বক্তব্য বের হলে উপকার হবে। প্রথমত, যারা উৎসাহের যোগ্য সেইসব লেখকেরা পুরস্কৃত হবে, দ্বিতীয়ত, অন্যের লেখা সম্মুখে রেখে, বলবার কথাটাকে পরিষ্কার করে বলবার সুবিধা হয়। তাছাড়া আধুনিক সাহিত্যের মাঝিগিরি করতে হলে সমালোচকের হাল ধরা চাই। প্রতি মাসে সমালোচনার যোগ্য বই পাবে না কিন্তু মাসিকপত্রের লেখাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে কিছু-না-কিছু বলবার জিনিস পাবে। বিরুদ্ধ কথাও যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করে কীভাবে বলা উচিত তার একটা আদর্শ দেখাবার সময় এসেছে।'

এবং,

'যত পারো নতুন লেখক টেনে নাও—লিখতে লিখতে তারা তৈরি হয়ে নেবে। কাগজের আদর্শ সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি কড়া হলে নিষ্ফল হতে হবে।' —এই সতর্কবাণীও রবীন্দ্রনাথের।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার প্রমুখ প্রাবন্ধিক মূলত 'সবুজপত্র'-এরই দান। বিদায়ী বঙ্গীয় শতাব্দীর বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য এঁদের দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। অতুলচন্দ্র ও ধূর্জটিপ্রসাদ নিশ্চিতরূপেই বিগত শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে জায়গা পাবেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিনচন্দ্র পালের 'নারায়ণ' 'সবুজপত্র'-এর প্রগতিমূলক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করলো। চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র দু'জনেই কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু শতাব্দীপ্রান্তে পৌঁছে মনে হয় না, প্রবন্ধসাহিত্যে কোনো স্থায়ী ও মৌলিক কীর্তিস্থাপনার জন্য চিত্তরঞ্জন বা বিপিনচন্দ্র কেউ তেমন স্মরণীয়তা দাবি করতে পারবেন। তাঁদের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি তেমন উদার ছিল না। যদিও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরূপে তাঁরা সুচিহ্নিত।

'সবুজপত্র'কে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মার্জিতরুচি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ও মুক্তিবুদ্ধির প্রতীক একটি পত্রিকারূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু, অনুভব করেছিলেন, 'সবুজপত্র'কেই হয়ে উঠতে হবে, মিথ্যা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি শাণিত হাতিয়ার। অন্যত্র আমি এই প্রসঙ্গে যা লিখেছি ('বিভাব', এপ্রিল-জুন ১৯৯১, ৫৩তম বিশেষ সংখ্যা, সবুজপত্র প্রসঙ্গে), সেখান থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

'মিথ্যা ও ভণ্ডামির সঙ্গে আপসের দিন শেষ হোক, যুক্তির ও বুদ্ধির আলোয় চিনে নেওয়া যাক বন্ধু আর শত্রুর স্বরূপ, শুরু হোক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের পরেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই কি এই বক্তব্য খুব সোজাসুজি তুলে ধরেননি—

'মিথ্যার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে বাপুবাছা সম্বোধন করে আর চলবে না। আমাদের বর্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই—বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ—কিন্তু যেখানে যথার্থ বীর্যের দরকার—যেখানে শয়তানের সঙ্গে লড়াই, যে শয়তানের হাজার কণ্ঠ এবং হাজার বাহু, সেখানে দেখতে পাই বড়ো বড়ো সব সাহিত্যিক গুণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়ছে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে দিচ্ছে।.....

'অনেকদিন পর্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুলছিল—বিধাতা বরাবর তা সইবেন কেন? দেশের কোনো জায়গা থেকেই কি এরা ধাক্কা খাবে না? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়। রণক্ষেত্রে যখন দাঁড়িয়েছ তখন যদি একা লড়তে হয় তা-ও লড়তে হবে, পিছু হটলে চলবে না।'

ভাবা যায়, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন? লিখছেন, ১৯১৪ সালেই?

চার

এর পর 'কল্লোল'। ১৩৩০ সালের বৈশাখে প্রথম সংখ্যা, শেষ সংখ্যা ১৩৩৬ সালের পৌষে। সাত বৎসর বেঁচেছিল এই পত্রিকা। 'কল্লোল' বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে কোনো ছাপ রাখতে পারে নি। তার উদ্দেশ্যও ছিল ভিন্নতর। ১৩৪৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'কবিতা'য় 'কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন' রচনাটিতে লিখেছিলেন কল্লোল গোষ্ঠীরই অন্যতম মুখ্য ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু—

'সত্যি বলতে আজ পর্যন্তও আমি কল্লোলের অভাব অনুভব করি, কারণ ঠিক ঐ ধরনের আরেকটি সাহিত্যিক মাসিক পত্র এখনও আমাদের দেশে হলো না—মাঝখানে স্বদেশ ও তারপরে পূর্বাশা উঠেছিল, দুটির একটিও চললো না। উত্তরা এককালে জাত-লিখিয়ের লোভনীয় পত্রিকা ছিলো, এখন থেকেও নেই। আমাদের মতো লেখকরা, যারা দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখে না, যারা নেহাৎ-ই গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখে, অথচ যথেষ্ট রকম গতানুগতিকভাবে লেখে না, আমরা আমাদের আপন মনে করতে পারি, এমন একটি পত্রিকাও আজ বাংলাদেশে নেই।'

বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, 'কল্লোল'-এর সামনেই যদিও ছিল 'সবুজপত্র', কিন্তু 'সবুজপত্র'-এর 'সীরিয়াসনেস'-এর শতাংশও ছিল না তার। আসলে, 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'সবুজপত্র', বাংলা সাহিত্যেরই পত্র-পত্রিকার মননশীল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহনের দায় স্বীকার করেনি 'কল্লোল'—প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিকটিরই প্রতিবিম্বন 'কল্লোল' পত্রিকায়, তা-ও টি এস এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড ও উই আর দ্য হলোম্যান-এর গাম্ভীর্য ও গভীরতাবর্জিত তিমিরবিলাসিতা। যদিও 'কল্লোল'-এর আধুনিকতার বীজ বোনা হয়েছিল ঢাকার জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত 'বাসন্তিকা'র মাধ্যমে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর নেতৃত্বে। কিন্তু 'কল্লোল'-এর সীমাবদ্ধতার দায় নরেশচন্দ্রের নয়। 'কল্লোল'-এ নিষ্ঠাবান তরুণ কেউ-কেউ ছিলেন কিন্তু তাঁরা যুদ্ধোত্তর বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিস্থিতি অনুধাবন করার মতো সচেতনতা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না। পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিকভাবেই কটাক্ষ প্রকাশ করেছেন, কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকসম্প্রদায় একই সময়ে গোর্কি ও ন্যুট হ্যামসুনের অনুবাদকর্ম চালিয়ে গেছেন কীভাবে। আসলে প্রথম মহাযুদ্ধকালে ১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশ বিপ্লবের প্রেরণা কাজ করেছিল বাংলা সাহিত্যে সীমিতভাবে। বহুলাংশে পরোক্ষভাবেও। নজরুল ও নরেশচন্দ্রের গদ্যরচনাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিক নজরুলের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি এ-বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'-র একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' নামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাকে অবলম্বন করেই পত্রিকার পক্ষে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুলের প্রথমে পত্রালাপ, পরে সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে। ১৯২০ সাল থেকেই সাহিত্য সমিতির কার্যালয়ে নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ একসঙ্গে থাকতে লাগলেন। মাসিক পত্রিকা 'মোসলেম ভারত'

১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে আত্মপ্রকাশ করে। নামকরণ থেকে যাই মনে হোক্, দুটি পত্রিকারই চরিত্র ছিল অ-সাম্প্রদায়িক।

এরপর নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলেন। প্রকাশিত হলো 'নবযুগ' (১২ জুলাই, ১৯২০), পরে 'ধূমকেতু' (১২ আগস্ট, ১৯২২)। তারও পরে 'লাঙল' (২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৫)। বিষয় : সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি। কিন্তু প্রকাশিত রচনাগুলি প্রায়শ নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধসাহিত্য।

'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হলো ২৬ জুলাই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। সাহিত্যে শুচিতা রক্ষার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব গ্রহণ করে সজনীকান্ত দাস ও তাঁর গোষ্ঠী রুচিবিগর্হিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণেই ব্যস্ত ছিলেন। কোনোরকম সাহিত্যবোধ ও জীবনবোধের বালাই ছিল না। যা-কিছু নতুন ও আধুনিক, নির্বিচারে সে-সমস্তই ছিল 'শনিবারের চিঠি'-র আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনাগুলি অসূয়াবর্জিত হলে সেগুলির সাহিত্যগুণ উল্লেখ্য হতে পারতো।

'কল্লোল'কে সামনে রেখে সজনীকান্তরা আক্রমণ চালনা করলেন মূলত নজরুল ও নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে। আসলে, লড়াইটা ছিল প্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার। 'কল্লোল' উপলক্ষ মাত্র। এবং নানাভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে ও ফ্রয়েডজীবী কয়েকজন আধুনিকম্মন্য উঠতি লেখকের যৌনাত্মক রচনাংশ উদ্ধৃত করে 'শনিবারের চিঠি' কোনোক্রমে জীইয়ে রাখাই ছিল সজনীকান্ত দাসের উদ্দেশ্য। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকীর্তি বা সাহিত্যের 'স্বাস্থ্যরক্ষা' বিষয়ে তাঁর কোনো শিরঃপীড়া ছিল না।

'কালি-কলম' (বৈশাখ, ১৩৩৩)-এ প্রবন্ধ কিছু কিছু প্রকাশিত হতো (অনুবাদসহ)। 'কল্লোল'-এর তুলনায় একটু বেশি। মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, মুরলীধর বসু, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শরৎচন্দ্র, দিলীপকুমার রায়, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, নলিনীকিশোর গুহ প্রমুখ। প্রায় কেউ খুব নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন না। শ্রীঅরবিন্দ-রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ বেশ কিছু আছে, নলিনীকান্ত গুপ্ত-কৃত।

'প্রগতি' (আষাঢ়, ১৩৩৪)-ও 'কালি-কলম'-এর মতোই 'কল্লোল'-এরই পথিক। 'প্রগতি' বেশি ছাপাতো কবিতা। প্রবন্ধ দু'টি-একটি লিখেছেন অমলেন্দু বসু, বুদ্ধদেব বসু, প্রভু গুহঠাকুরতা, ভৃগুকুমার গুহ ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

'ধূপছায়া' (বৈশাখ, ১৩৩৪) বেরিয়েছিল মাত্র কয়েকটি সংখ্যা। 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির'ই মতো 'আধুনিক সাহিত্যের প্রবক্তা'। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী একটি করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, দেখা যাচ্ছে।

পাঁচ

'সবুজপত্র'-এর আগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে-সুউচ্চ মান বেঁধে দিয়েছিল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' সুদীর্ঘকাল ও 'সবুজপত্র' তারই যুগোচিত উত্তরাধিকার বহনে, প্রকৃত প্রস্তাবে এক দশকের মতো সময় জুড়ে সমস্ত সামর্থ্য উজাড় করে দিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' বলতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝি, 'প্রবাসী' বলতেও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে, রামানন্দ সত্ত্বেও, আবার 'সবুজপত্র' বলতেও বুঝি কৃষ্ণার্জুনের মতোই অবিচ্ছেদ্য রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীকে, সারথী ও রথী, রবীন্দ্রনাথই 'সবুজপত্র'-এর প্রযোজক-পরিচালক, লেখকরূপে প্রধান চরিত্রের ভূমিকাভিনেতাও তিনি, তবু প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ব দ্বিবিধ। প্রথমত, তিনি নিজে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে, বিতর্কিত হলেও, একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের দাবিদার, দ্বিতীয়ত, তিনি বাংলা গদ্যে চলিতরীতির প্রবর্তনে, সাধুরীতি-চলিতরীতি বিতর্কে সংগঠকের ভূমিকায় সুবিদিত ব্যক্তিত্ব। প্রাবন্ধিকরূপে বিতণ্ডাপরায়ণতা-বৈশিষ্ট্যেই তাঁর সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতা। ম্যানারিজম্ তাঁর গদ্য ও রচনাশৈলীকে বিক্ষত করলেও, 'পান' ও 'উইট'-এর আতিশয্য তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও গভীরতাকে হ্রাস করলেও, তাঁর গদ্যনির্মাণ সৃজনব্যাকুল ব্যক্তিত্বের প্রসাদগুণবঞ্চিত নয় বলেই মনে হয়।

'বিচিত্রা'র উল্লেখযোগ্যতা সত্ত্বেও এমন একটি পত্রিকার কথা ভাবাও কঠিন ছিল, যার প্রথম সংখ্যার লেখক-তালিকায় থাকবেন—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুশোভন সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু এবং গ্রন্থ সমালোচনা করবেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, আশোকনাথ বেদান্ততীর্থ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, পশুপতি ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রলাল বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর পাঠকগোষ্ঠীর চিঠিবিভাগে স্বয়ং বীরবল। যাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো, তাঁদের মধ্যে গল্প ও গ্রন্থসমালোচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ, কবিতা রচনায় সুধীরকুমার, অন্নদাশঙ্কর, বিষ্ণু ও বুদ্ধদেব এবং মৌলিক কবিতা ছাড়াও গ্রন্থের উপন্যাসের অংশবিশেষের অনুবাদে স্বয়ং বিষ্ণু দে। অবশিষ্ট সকলেই লিখছেন মৌলিক প্রবন্ধ সাহিত্য। প্রথম সংখ্যাতেই প্রবন্ধগুলির বিষয়বৈচিত্র্য এবং চলমান জগৎ ও জীবনের সর্বশেষ তথ্য, আবিষ্কার ও গবেষণা আজকের জিজ্ঞাসুকেও সম্ভ্রমে অবাক করে দেয়। যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধধর্মের দান, কাব্যের মুক্তি, রুশবিপ্লবের পটভূমিকা, বিজ্ঞানের সঙ্কট, শিল্পীর ব্যথা, হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান প্রভৃতি বিষয়ে লিখেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা, ডিউই-ডেরিজার-বারবুঁজের এবং রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর ধূর্জটিপ্রসাদকৃত সমালোচনা এবং মণীন্দ্রলাল ও সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বসাহিত্যের সর্বশেষ মণিমুক্তার সম্যক্ আলোচনা : পাঠককে সমৃদ্ধ করার এই সুচিন্তিত আয়োজন যদি কোনো একটি পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই লক্ষণীয় হয়, তা'হলে উত্তেজিত-শিহরিত সত্তরোর্ধ রবীন্দ্রনাথকেও দ্বিতীয় সংখ্যাতেই লিখতে হয় পত্রাকার প্রবন্ধ—

> 'আদর্শরক্ষা করতে গেলে প্রয়াসের দরকার, সাধনা না থাকলে চলে না। বারোয়ারির আসরে দাঁড়িয়ে সাধনা অসম্ভব। সেই সাধনাপেক্ষী সাহিত্যের জন্য সময়ও চাই বড়ো, ক্ষেত্রও চাই উদার। এ জায়গায় ভিড় জমাবার আশা নেই, কাজেই গুণজ্ঞের পরিতোষ ছাড়া অন্য পারিতোষিকের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতেই হবে।'

এইভাবেই ত্রৈমাসিকরূপে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর আড্ডায় সুধীন্দ্রনাথদের বাড়ির বৈঠকখানায় প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় জড়ো হতেন অপূর্বকুমার চন্দ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দি, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, যামিনী রায়, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুশীলকুমার দে, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, বিষ্ণু দে, কখনো কখনো বুদ্ধদেব বসু, তুলসী গোস্বামী, সমর সেন, ম্যালকম ম্যাগারিজ, অবনী চ্যাটার্জি, লিন্ডসে এমার্সন, এম এন রায় প্রমুখ। নেপথ্যে সদাজাগ্রত শুভাকাঙ্ক্ষী সুধীন্দ্রনাথের পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার চাহিদা বাড়ছিল, তাই ষষ্ঠ বর্ষ থেকে পত্রিকাটি মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। আকৃতি কিছু লঘু হলো বটে কিন্তু পত্রিকার চরিত্র ও মাহাত্ম্য অবিকৃত রইল। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫০ পর্যন্ত। ১৩৪৬ থেকে ১৩৫০ কালপর্বে হিরণকুমার সান্যাল ছিলেন যুগ্মসম্পাদক।

যথার্থ শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ জগৎ ও জীবনের যতরকম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু হতে পারেন, সেরকম সমস্ত প্রসঙ্গেই সুচিন্তিত, সুরচিত প্রবন্ধ

প্রকাশিত হতো 'পরিচয়' পত্রিকায়। কাব্যকবিতা, কথাসাহিত্য, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও সমান গুরুত্বসহ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সঙ্গীত-চারুকলা সংক্রান্ত এবং দর্শন-বিজ্ঞান ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব সমস্ত বিষয়েই সম্পাদক সুপরিকল্পিতভাবে সম্ভাব্য যোগ্যতম ব্যক্তিকে দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে প্রকাশ করতেন। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি ও কাব্য' গবেষণাগ্রন্থে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার পরম কল্যাণীয়া ড. কেকা ঘটক এই প্রসঙ্গে সঠিক ভাবেই মূল্যায়ন করেছেন, 'প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারাকে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রবাহিত করানোর দায়িত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকা। কখনো আলোচনার মাধ্যমে, কখনো মূলানুগ অনুবাদ করে, কখনো ভাষান্তরের সাহায্য নিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার দানগুলিকে পাঠকের কাছে হাজির করার ব্রত নিয়েছিল 'পরিচয়'। তার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল।....'

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যে কঠোর সম্পাদকীয় সতর্কতা ছিল, তার পরিচয় সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকর্মেও পাওয়া যায়। রচনার উচ্চমানই রচনাপ্রকাশের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি-জার্মান ভাষায় পারঙ্গম। তাই সাহিত্যের আন্তর্জাতিক মান রক্ষায় তাঁর ছিল সতত জাগ্রত দৃষ্টি, মূল থেকে অনুবাদেও ছিল তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। এই তথ্য আজ সুবিদিত যে, 'পরিচয়'-এর একটি বড়ো আকর্ষণ ছিল তার পুস্তক পরিচয় বিভাগ।

'পরিচয়' পত্রিকার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত প্রথম বারো বৎসরের তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট হবে, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বহু উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বেরই পরিপোষক ছিল 'পরিচয়'। প্রথম সংখ্যার লেখকসূচিতে যাঁদের নাম ছিল, তাঁরা ছাড়া আরও যাঁরা নিয়মিত লিখেছেন 'পরিচয়' পত্রিকায়, তাঁদের ত্বরিত-প্রস্তুত একটি তালিকার দিকে তাকালেও বিদায়ী বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধের এবং বহুলাংশে দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের লেখকবৃন্দের বিশিষ্টতা সহজেই অনুভব করা যাবে— রবীন্দ্রনাথ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র দত্ত, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, হিরণকুমার সান্যাল, সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সরোজকুমার দাস, নির্মলচন্দ্র দত্ত, কাজী আবদুল ওদুদ, প্রিয়রঞ্জন সেন, শাহেদ সুরহ্‌র্দি, লীলা রায়, খগেন্দ্রনাথ সেন, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, হুমায়ুন কবির, লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর), দিলদার হুসেন, জীবনময় রায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, সোমনাথ মৈত্র, প্রবোধকুমার মজুমদার, ছায়া দেবী, শোভা সরকার, স্বর্ণপ্রভা সেন, রাসবিহারী দাস, প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র সিংহ, লীলা মজুমদার, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মণিভূষণ ভট্টাচার্য (প্রয়াত), অনাথনাথ বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, ফণীভূষণ রায়, সুশীলকুমার ঘোষ, জ্যোৎস্নাকান্ত বসু, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, কালীপদ মিত্র, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, নির্মলচন্দ্র মৈত্র, ত্রিদিবনাথ রায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বটকৃষ্ণ ঘোষ, হরীতকৃষ্ণ দেব, মণিভূষণ আচার্য, রবীন্দ্রলাল রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, স্বর্ণনন্দন শর্মা, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, সুশীলকুমার দেব, পঞ্চানন চক্রবর্তী, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত, নীরদকুমার ভট্টাচার্য, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, যুধিষ্ঠির দাস, অচ্যুতানন্দ গোস্বামী, সরসী সরস্বতী, অমিয়নাথ সান্যাল, হমফ্রে হাউস, প্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক, পূর্ণেন্দু গুহ, অমলা দেবী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, সুধাময় ভট্টাচার্য, সুধাংশু দাশগুপ্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আদিত্য আচার্য, বটকৃষ্ণ ঘোষ, আশানন্দ নাগ, সরসীলাল সরকার, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, সৌরীন্দ্র মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ বসু, মণীন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশু মুখোপাধ্যায়, পুলকেশ দে সরকার, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র সেন, সত্যব্রত সেন, ক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শচীন সেন, রণেন মজুমদার, নিখিলনাথ চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় সেহানবীশ, নবেন্দু বসু, অন্নদাচরণ রক্ষিত, নরেশচন্দ্র রায়, বসুধা চক্রবর্তী, সমরেন্দ্রনাথ সিংহ, বিমলচন্দ্র সিংহ, নিখিল চক্রবর্তী, হরিদাস হালদার, সরোজকুমার দত্ত, ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, অমিত সেন, রাণী মহলানবীশ, শান্তিদেব ঘোষ, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ আলী আহসান, রাধাকান্ত চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র সেন, শুভেন্দু ঘোষ, শান্তিপ্রিয় বসু, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, রবীন্দ্র মজুমদার, রাণী চন্দ, ব্রজবিহারী বর্মণ, হরিদাস নিয়োগী, রবীন্দ্রনাথ সরকার, হিরণ্ময় ঘোষাল, করালীকান্ত বিশ্বাস, শিবনারায়ণ রায়, যদুনাথ সরকার, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দিলীপ সেনগুপ্ত, মিনতি দেবী, প্রমথনাথ বিশী, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জ্যোতির্বালা দেবী, সুশান্তকুমার সেন, প্রফুল্লকুমার দাস প্রমুখ।

ছয়

লক্ষণীয়, বিদায়ী বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৩৫০ পর্যন্ত উল্লিখিত লেখকবৃন্দ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ও/বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অনেকেই দ্বিতীয়ার্ধে ধারাবাহিক সাধনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

ক্ষিতিমোহন সেন ও রাজশেখর বসুর প্রবন্ধসাহিত্য এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। দুজন দুরকমের বিশিষ্টতায় অনন্য। ক্ষিতিমোহনের 'বাংলার বাউল' এবং বঙ্গীয় ও ভারতীয় সাধনায় লৌকিক উৎসসন্ধানে মরমী ব্যাকুলতা এখনও সাবলীল সঞ্চারের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। রাজশেখর বসুর গদ্য স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, শব্দপ্রয়োগে অমোঘ ও অভিজাত এবং পরিণামে লক্ষ্যভেদী। ক্ষিতিমোহন ও রাজশেখরের গদ্যরচনা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের শ্রী ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছে।

১৩৫০ বঙ্গাব্দে এবং তার পরবর্তী চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গভূমির উপর দিয়ে তথা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ এবং স্বাধীনতাও এসেছে অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছনীয় চেহারা নিয়ে।

তার আগের কয়েকটি বৎসরে, ১৩৪৩ নাগাদ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'মহাজনী সভ্যতা' লিখে মুন্সী প্রেমচন্দ সচকিত করেছেন দেশের লেখকশিল্পীদের। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণও সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ে ভাবিয়েছে সচেতন লেখকদের। কলকাতাসহ আলোড়িত হয়েছে অবিভক্ত বাংলা। ঢাকায় নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন সোমেন চন্দ। এই ঘটনাবলী বিহ্বল-বিক্ষিপ্ত করেছে লেখকশিল্পীদের মানসিকতা। তাঁর 'ইঁদুর' ছাপা হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দলমতনির্বিশেষে লেখকরা সংগঠিত হয়েছেন সাময়িকভাবে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মধ্যে। গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বস্তুত, বিদায়ী বঙ্গীয় শতকটির মধ্যভাগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় পরিস্থিতিও বেশ জটিল, বিভ্রান্তিকর ও ক্রমশ বেশি-বেশি অনিশ্চিত হয়ে উঠল। যুদ্ধ শেষ হলো কিন্তু তার জের চলতে লাগলো। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। এই যুদ্ধই

যে শেষ যুদ্ধ নয়, তা সবাই বুঝতে পারলো। শুধু তাই নয়। যুদ্ধ চলতেই লাগলো। চলছে। ঠাণ্ডা অথবা গরম।

শুধু যে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক শিবির বিভাজন স্পষ্ট হয়ে গেল, তাই তো নয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার মেরু ব্যবধান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের চেতনায়, মগজে স্থায়ী বিপর্যয়, বিভ্রম এবং আত্মকেন্দ্রিকতা তৈরি করে দিল, আত্মরক্ষার, স্বার্থান্ধতার চূড়ান্ত জৈবিক, মানবেতর, বস্তুত জন্তুসদৃশ মোহ আর লোভ আর লালসা মানুষের শুদ্ধতা বলে যা ভাবা হতো, তাকে গ্রাস করলো, প্রায় পূর্ণ গ্রাস।

যাঁরা চিন্তাশীল, যাঁরা ভাববেন, লিখবেন, কবিতা বা গল্প-উপন্যাস, গান বা প্রবন্ধ, ছবি আঁকবেন বা নির্মাণ করবেন, ভাস্কর্য বা অন্য কিছু, বলবেন, বোঝাবেন— অর্থাৎ যাঁরা নির্মাণের বা এমন কী সৃষ্টির কাজটা বুঝবেন, করবেন, সেই সব বুদ্ধিজীবীরই চেতনায় ঠাণ্ডা বা গরম যুদ্ধটা অব্যাহত চলতে লাগলো, জন্তুসদৃশ আত্মাদরপরায়ণতা, 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' মন্ত্র তাঁদের মগজেও অবিরাম ঘুরপাক খায়— এর মধ্যে কি সুস্থ, শুদ্ধ, সৃজনশীল ভাবনা আসে, ভালো লেখা হবে কী ভাবে যে ভালো প্রবন্ধ লেখা হবে ভুরিভুরি ?

বিশেষত, বুদ্ধিজীবী হলেই যখন বুদ্ধিযোগী হওয়া যায় না। তার জন্য সারা জীবনের সাধনা লাগে। 'গীতা'-য় কর্মযোগের একটি সার কথা বলেছেন কোনো ঋষি-কবি, 'যোগস্থ কুরু কর্মাণি'— সমস্ত কাজেই, বিশেষত চেতনার কাজে, ভাবনার কাজে, সৃষ্টির কাজে যোগযুক্ত কর্মানুষ্ঠান চাই-ই।

কবিতাটা ঠিক কী দাঁড়াল, আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে কবিতা বলা যাবে কী-না, তাও খুব বড়ো কথা নয়, আসলে কবিতাটা ভিতরে আছে কী না। কেননা, বহিরঙ্গে থাকলেই তো সে থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই ভাবছি। ব্যর্থ কবি নিশ্চিতভাবেই তিনি, আনুষ্ঠানিক কবিতা প্রণয়নের বিচারে। কিন্তু কবিতা তাঁর রচনার পরতে-পরতে অন্তর্গূঢ় অবয়বে বিদ্যমান। তাঁর অন্তর্ভেদী অনুভবের আলোয়, নাট্যমুহূর্তসন্ধানের ও সৃষ্টির প্রায় সহজাত দক্ষতায় শুধু তাঁর আখ্যানমূলক রচনাগুলিই নয়, ব্যাখ্যানমূলক প্রবন্ধাবলীও অসামান্য হয়ে ওঠে। তাঁর আখ্যানমূলক রচনার প্রসঙ্গে এ-পর্যন্ত দু'জন কবিই খুব ভালো আলোচনা করেছেন, একজন মোহিতলাল মজুমদার, আর-একজন প্রমথনাথ বিশী। দু'জনেই শিক্ষকতার কাজ করেছেন, কিন্তু সেই বৃত্তি কোনো চাপ তৈরি করে তাঁদের বঙ্কিম-বীক্ষণকে সংকীর্ণ ও ব্যর্থ করে দেয় নি। যেমন প্রায়শ হয়। মধুসূদনের জীবন-ভাষ্য রচনায়, কাব্য-বিশ্লেষণেও মোহিতলাল ও প্রমথনাথ শুদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। এই মোহিতলালই ব্যর্থ হয়ে যান, যখনই তিনি তন্ত্রসর্বস্ব সাধনতত্ত্বের মাপকাঠিতে জীবন ও সাহিত্যের ভাষ্যরচনায় মনঃসংযোগ করতে চান। আসলে, দু'জনেরই দূরের দৃষ্টি ছিল, উনবিংশ শতাব্দীকে বুঝতেন, তাঁদের সমকালের ভাবনা-বেদনাকে ততটা কি ? এই সব তত্ত্বের ভৌতিক উপদ্রব সাহিত্যসৃষ্টিকে এবং প্রবন্ধসাহিত্যকেও জখম করে, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ইতস্তত বীক্ষণে ও পর্যালোচনায় কথাটা মাথায় রাখা ভালো। আপাত-নীরস এবং শুষ্ক ভাষা ও জটিল বাক্যবিন্যাসে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাথমিক পাঠে যেমন অনাত্মীয় মনে হতে থাকে, সেটাই যে প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, তা স্পষ্ট হয় তাঁর রূপকথা বা বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত আলোচনায়, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অতুলনীয় ভূমিকা-প্রবন্ধ পাঠের পর। তাঁরই ভাষায় বলা যায়, তাঁর আলোচনায় এই 'অবতরণশীলতা'র পরিচয় পাঠককে রচনা ও রচয়িতার সৃজনশীলতার উৎসে নিয়ে যায়। আসলে, কবিসুলভ অন্তর্গূঢ় দৃষ্টি তাঁরও ছিল।

'ডাকঘর'-এর অমল কেন পণ্ডিত হতে চায় নি, পণ্ডিতদের সাহচর্যে এলেই তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের অন্যতম আমাদের মাস্টারমশাই সুকুমার সেন কীভাবে যে তাঁর অপরিমাণ বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে রসবোধকে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন, তা ভেবে বিস্ময় জাগে। ওঁর লেখাতেও যখনই তৈরি হতো একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের তীব্রতম চাপ, তখনই সব এলোমেলো হয়ে যেত। তবু, কচিৎ-কদাচিৎ এই 'অহং'-এর বহিরঙ্গ চাপটা সরিয়ে নিলেই 'সহৃদয় সামাজিক'-টিকে অনুভব করা যায়, তাঁর সুবিস্তীর্ণ গদ্যবন্ধেই। আজও তিনি বাংলা সাহিত্যের অনন্য ঐতিহাসিক। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো দোসর নেই। কতরকম কাজ করেছেন, তবু 'বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস'টাই পড়তে হবে কী ভাবে, তার ঠিকানা জানতে হলে বহুমুখী প্রবণতা-সম্পন্ন সংস্কৃতিবিদ্ গোপাল হালদার ছাড়া জিজ্ঞাসু মানুষের গতি নেই। ঈষৎ হালকা চালের গদ্যরচনাতেও তিনি সমপরিমাণেই সিদ্ধকাম। বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য রচনাবলীর ভূমিকাংশগুলি তাঁর পরিশীলিত মননের ছাপ বহন করছে। সমাজ-প্রগতির পালাবদলের ইতিহাসবোধ তাঁর চিন্তাকে স্বচ্ছ ও বিশ্লেষণকে সুস্পষ্ট করেছে। বাংলা সাহিত্যে মানবস্বীকৃতির সূত্রানুসন্ধানে তাঁর পরিচ্ছন্ন চেতনার নির্ভুল স্বাক্ষর আছে।

এই দু'জনেরই শিক্ষাগুরু সুনীতিকুমারের রচনায়, প্রবন্ধসাহিত্যে লেখকের উদার-ব্যাপ্ত সহজ জীবনরসরসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট। অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁর গদ্যকে কোথাও ভারাক্রান্ত করে নি। তাঁর গদ্যের নির্ভার লাবণ্য তাঁর সমকালীন বড়ো মাপের পণ্ডিতদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সুকুমার সেন ও গোপাল হালদার কেউ তাঁদের গুরুর গদ্যরীতি অনুকরণ করেন নি কিন্তু পাণ্ডিত্যকে তাঁরা যে বোঝার মতো বহন করেন নি, এখানেই তাঁদের গুরুর শিক্ষা ও প্রেরণার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। সুশীলকুমার দে কবিতাও লিখেছেন কিন্তু ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা, অন্যূন তিনটি ভাষাসাহিত্যেই তাঁর অসামান্য অধিকার তাঁর প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু-নির্বাচনে পরিস্ফুট। দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে তাঁর পুস্তিকাটিসহ নানা নিবন্ধের মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর কবিমনের সান্নিধ্য। প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলাভাষায় তাঁর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক সাধনায় যে আশ্চর্য পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। ছন্দবিষয়ক ধারাবাহিক আলোচনায় তাঁর যে গাণিতিক নিষ্ঠার পরিচয় পাই, সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় সেই একই লক্ষ্যভেদী অবতরণশীলতায় মুগ্ধ হতে হয়। ক্ষুদিরাম দাস তাঁর ভাষাভঙ্গির নিজস্বতায় পাঠককে আকর্ষণ করেন। রসবোধ ও মুক্তবুদ্ধি তাঁর পাণ্ডিত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে। তাঁর ভাষার শাণিত ঋজুতা তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। অমলেন্দু বসুর বাংলা প্রবন্ধাবলী সুচিন্তিত ও সুরচিত। এতক্ষণ এই পর্বে যাঁদের কথা বলা হলো, তাঁরা সকলেই পণ্ডিতমানুষ। বৃত্তিতে অধ্যাপক। গত পঞ্চাশ বৎসরে যত বাংলা প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ-সংকলন বা বই প্রকাশিত হয়েছে, তার সিংহভাগই অধ্যাপনা-গবেষণাসূত্রে লিখিত। অধিকাংশই আবর্জনাস্তূপে পর্যবসিত। বৃত্তিগত প্রয়োজনের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা এই সব আবর্জনার জনক। কিন্তু যাঁরা পেশার স্বার্থে বা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার দিকেই লক্ষ্য রেখে প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের বই লেখেন নি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, অজিতকুমার ঘোষ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ভূদেব চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত, উমা রায়, দীপ্তি ত্রিপাঠী, অরুণা হালদার, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পশুপতি শাসমল এই রকম কিছু নাম। সদ্যপ্রয়াত শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও সুবীর রায়চৌধুরীও অবশ্যস্মরণীয়।

অন্নদাশঙ্কর রায় ও আহমদ শরীফ প্রমুখের মতো মনস্বী প্রাবন্ধিক দুই বাংলাতেই প্রায়শ এমন ভূমিকা পালন করেছেন, যা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক প্রবন্ধ লেখকদের সম্পর্কে দাবি করা কঠিন। এই কাজটা ছিল রবীন্দ্রনাথের। জাতীয় সঙ্কটের মুহূর্তে জাতির বিবেকের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা। এবং প্রবন্ধ লিখেও তা করা যায়। অবশ্য, আগেই বলেছি, বুদ্ধিজীবী

হলেই বুদ্ধিযোগী হয় না। এবং, এ-ও দেখা গেছে, সব সিদ্ধান্তই, সব ভূমিকাই মানুষের সপক্ষে যায় না। সারা দেশের সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থে তাঁদের হয়ে যে ভূমিকা গ্রহণ, প্রাবন্ধিকেরও সেই দায় আছে।

এই দায়িত্ব বোধ সকলের নেই। থাকে না। তাই 'দায়বদ্ধতা' শব্দটাতেই অনেকে বিরক্ত হন। কেমন 'বদ্ধ-বদ্ধ' 'বন্দী-বন্দী' 'শৃঙ্খলিত ভাব'! আসলে, তাঁরাই বদ্ধ, বন্দী বা শৃঙ্খলিত। কেউ জেনে-বুঝে, কেউ-বা পরোক্ষভাবে। প্রবন্ধসাহিত্য যখন, তখন প্রবন্ধকে তো 'সাহিত্য' হতেই হবে। কিন্তু বেশ ভালো নির্মাণ, সুখপাঠ্য প্রবন্ধ, অথচ বক্তব্যটা মানুষের পক্ষে যায় না, শুধুই বুদ্ধিজীবীর স্বার্থের সপক্ষে গেল।

'পথে-প্রবাসে'র দিন থেকেই, এবং 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে' ছড়ার সময় থেকেই অন্নদাশঙ্কর অনন্য হয়ে আছেন। আহ্‌মদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় প্রণিধানযোগ্য হয়ে আছেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী', সর্বত্র তাঁর মানুষের প্রতি ভালোবাসা অপরিম্লান। যেমন, শিবরাম চক্রবর্তী। 'মস্কো থেকে পণ্ডিচেরী'-ই হোক, কিংবা 'ঈশ্বর-পৃথিবী-ভালোবাসা' সর্বত্র তিনি মৌলিক ভাষণে ঝল্‌মল্ করছেন। মহাস্থবির জাতক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও নিজত্ব-চিহ্নিত প্রবন্ধ লিখেছেন।

সাংবাদিক-রাজনীতিকদের অনেকেই প্রাবন্ধিকরূপে স্মরণীয় কাজ করেছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মোহিত মৈত্র, সরোজ আচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ, সুধাংশু দাশগুপ্ত, সরোজ মুখোপাধ্যায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত প্রমুখ (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল ইসলামের কথা আগেই বলেছি) এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণীয়। সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষ, নিখিল সরকার, অনিল বিশ্বাস, অশোক দাশগুপ্ত: এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি যাঁর যাই হোক, প্রাবন্ধিকরূপে এঁদের ভূমিকা বিবেচনা-যোগ্য বলে মনে করি।

সুধী প্রধান, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, তাপস সেন, শম্ভু মিত্র, মৃণাল সেন, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা থিয়েটার ও চলচ্চিত্র বিষয়ে এবং তার বাইরেও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গে স্মরণীয় প্রবন্ধসাহিত্য রচনা করেছেন।

সাহিত্য-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-ইতিহাস প্রভৃতি প্রসঙ্গে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, ভবতোষ দত্ত, নেপাল মজুমদার, অশোক মিত্র, রবীন সেন, বিনয় ঘোষ, অম্লান দত্ত, সৌরেন্দ্র ভট্টাচার্য, নিশীথরঞ্জন রায়, অশীন দাশগুপ্ত, অমলেন্দু দে, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাশ, গৌতম ভদ্র, বেলা দত্তগুপ্ত, সুকুমারী ভট্টাচার্য, মালিনী ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, অতীশ দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেকের কথা মনে হয়, প্রাবন্ধিক হিসাবে যাঁদের রচনার আকর্ষণ পাঠককে অনুভব করতেই হয়। তবু, মনে হয়, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে কবিদেরই প্রতিপত্তি অব্যাহত। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত- মোহিতলাল-প্রমথনাথ বিশীর পরে আমার মনঃপূত প্রথম নাম: জীবনানন্দ দাশ। তারপরে সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খুব কম সংখ্যক কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু আমি পরিমাণ দেখছি না, দেখছি রচনার চারিত্র্য, চরিত্রদ্যোতক প্রবন্ধ, নিজস্বতায় চিহ্নিত রচনা), বিষ্ণু দে, মঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শিশিরকুমার দাশ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের সকলেই আমার মনঃপূত কবি না হতেও পারেন, কিন্তু প্রণিধানযোগ্য প্রাবন্ধিক নিঃসন্দেহে।

'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথই ব্যবহার করেছিলেন, সাহিত্যে 'ধ্যানযোগী' ও 'কর্মযোগী' অভিধাদু'টি। আমি তো দেখছি, সাহিত্যে 'ধ্যানযোগী' (কোনো-না-কোনো তাৎপর্যে বিরল সাধনায় ব্রতী) না-হলে সাহিত্যে 'কর্মযোগী'-ও হওয়া যায় না।

'ধ্যানযোগী' না হয়ে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কি 'কর্মযোগী' হওয়া যায়? যে-কাজ সম্পূর্ণ 'যোগ'-স্থ হয়েই করতে হবে, অর্থাৎ একাগ্র আত্মনিবেদন ছাড়া যা সম্ভবই নয়?

তারাপদ রায়

১লা বৈশাখ ১৩০১—৩১ চৈত্র ১৪০০

মহাকালের অনন্ত অরণ্যে একটি বৃক্ষ থেকে একটি হলুদ পাতা নিঃশব্দে ঝরে গেল। একটি শতাব্দী শেষ হয়ে গেল। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায়, রক্তাক্ত অশ্রুঝরা, স্বপ্নভরা বাঙালির চতুর্দশ শতক। ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষায় কথাকারের মতো হয়তো বলা যায়, সেই ছিল সবচেয়ে ভালো সময়, সেই ছিল সবচেয়ে খারাপ সময়।

একশ' বছর আগের কথা। বাংলার তেরশ' সনের পয়লা বৈশাখ, বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র পাঁচ দিন আগে মারা গেছেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পরে তেত্রিশ বছর পূর্ণ করে চৌত্রিশ বছরে পা দেবেন। স্বামী বিবেকানন্দের বয়স বত্রিশ। আগের বছরেই শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি আন্তর্জাতিক আলোড়ন তুলেছিলেন।

দোর্দণ্ড প্রতাপে চলেছে ভারতে ইংরেজ শাসন। ইংলন্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তখনও সিংহাসনে। তিনি ভারতের মহারাণী। বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তখন সূর্য অস্ত যায় না। এক উপনিবেশে সূর্য ডোবে তো অন্য উপনিবেশে সূর্য ওঠে। অন্যদিকে বৃহত্তর ইউরোপে, রাশিয়ায় বাড়ছিল নৈরাজ্য। জাপান আক্রমণ করেছে চীন। এশিয়ায়, আফ্রিকায় শোষণ চলেছে অবাধে। এরই মধ্যে অল্প কিছুদিন আগে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নতুন আইন সংশোধন হয়েছে। ভারতের নেতাদের দাবি ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রবর্তনের। সে দাবি পূরণ হয়নি। বরং সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার নীতি চালু হল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

ল্যান্ডো গাড়ি আর ঝাড়লণ্ঠনের দিন শেষ হয়ে গেল। দিন শেষ হল ঘোড়ায় টানা ট্রামেরও, এল মোটর, এল বিদ্যুৎ। রেলপথ ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তে। তখনও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছায়ানিবিড় কুটিরে তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে, হেমন্তের আকাশে ওঠে আকাশ প্রদীপ।

সে খুব সুখের দিন নয়। এল বঙ্গভঙ্গ, এল রাখীবন্ধনের দিন। বাঙালি কবি গান ধরলেন, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। বড়ো দুঃখের দিনে কবি আহ্বান জানালেন, 'বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন এক হউক, এক হউক, হে ভগবান'।

কিছু হল, কিছু হল না, এরই মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছে বাঙালির বিদ্রোহী সত্তা। অগ্নিযুগের দামাল দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম, তরাই থেকে বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত, আলোড়িত বঙ্গভূমি। কলকাতা থেকে রাজধানী সরে গেছে দিল্লিতে। মানুষের মনে দিল্লির লালকেল্লায় নিশান উড়ানোর স্বপ্ন।

অন্যদিকে রাশিয়ায় উড়েছে সাম্যবাদের নিশান। নতুন যুগ, সেখানে সর্বহারা মানুষের নতুন পৃথিবী রচিত হচ্ছে। সেই নবযুগ রচনার স্বপ্ন বাঙালি মনকেও আলোড়িত করেছে। তারও পরে একদিন মরণজয়ী চীন, একদিন আমার নাম, তোমার নাম ভিয়েতনাম—হাজার হাজার বাঙালি তরুণকে উদ্বেল করে তুলল।

দশকের পর দশক কেটে গেছে রাজনৈতিক উত্তালতায়। সে ছিল গভীর বৈপরীত্যের যুগ। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দিন। অরন্ধন ও হরতাল, অসহযোগ ও খিলাফৎ একদিন পৌঁছে গেছে অগ্নিক্ষরা বিয়াল্লিশের ডু অর ডাই-এ। তারই পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলন, মাটি কামড়িয়ে তেভাগা লড়াই, ক্ষেত-মজুরের জীবনপণ সংগ্রাম, সকলের হৃদয় কন্দরকে প্রকম্পিত করে বোম্বাইয়ের দরিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় নৌ-সেনাদের কামান গর্জন।

এই শতকে পঁচিশ বছর আগে পরে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী বিরাট মারণযন্ত্রের অসহায় দায় বইতে হয়েছে বাঙালিকে। মহা-মন্বন্তরে ছারখার হয়ে গেছে দেশ। দাঙ্গার আগুনে, স্বজননিধনের হাহাকারে প্লাবিত হয়েছে গ্রাম ও নগর।

এরই মধ্যে শতাব্দীর প্রথমভাগে একদিন বাঙালি আনন্দে ও গৌরবে অধীর হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। শতকের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যুশয্যায় সত্যজিৎ রায় পেলেন 'অস্কার'। বিশ্বজয়ের গৌরব-টিকায় চর্চিত হল অদমিত, অপরাজিত বঙ্গমানসের ললাট। অতি দুঃখের দিনেও বাঙালি নিজের নান্দনিক ঐতিহ্য, নিজের কৃষ্টিসত্তাকে ভোলেনি। সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত, লোকসংস্কৃতি—অতি দুর্দিনের ঝোড়ো বাতাসেও সেই দীপশিখাগুলি নিভে যায়নি।

চোদ্দশ' শতক বাঙালির বড়ো অভিমানের শতক। সুভাষচন্দ্র ঘরে ফিরলেন না। বাঙালির দুই প্রিয় কবি, একজনের অকাল মৃত্যু হল যক্ষ্মায়, আর একজন ট্রামে কাটা পড়ে মারা গেলেন। স্বাধীনতার আনন্দ মুছে গেল দেশ বিভাগের বেদনায়। তবু আমরা বেঁচে আছি। দু-চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে।

আগামী দিনের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। আগত শতাব্দীর জন্যে আমাদের চোখভরা স্বপ্ন। এক ঘৃণাহীন, ভিক্ষাহীন, সুস্থ সুন্দর সময়ের জন্যে আমরা প্রতীক্ষারত।

কোনও আলাদিনের মায়াপ্রদীপ কারও হাতে নেই যা দিয়ে রাতারাতি বদলানো যাবে সব। তবু একদিন সব ক্ষুধিতের জন্যে অন্ন, ভূমিহীনের জন্যে ভূমি, গৃহহীনের জন্যে গৃহ, রোগীর জন্যে পথ্য ও চিকিৎসা, সকলের জন্যে শিক্ষা—মন বলে সব হবে। একদিন সব মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াবে, সব শিশু বিদ্যালয়ে যাবে, সকলের কাজ হবে, হাঘরের ঘর হবে, হাভাতের ভাত হবে। আনন্দে ও আহ্লাদে, রোদে ও জ্যোৎস্নায় ঝলমল করবে আমাদের সামান্য পৃথিবী—আবহমান, চিরন্তনী বাংলার এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। একে নিয়েই এখন আমাদের সব স্বপ্ন।

এই শতকের প্রথম দিনে, তেরশ' এক সনের পয়লা বৈশাখের উষালগ্নে বাঙালির চিরকালের কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> 'বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,
> ক্ষমা করো আজিকার মতো,
> পুরাতন বরষের সাথে
> পুরাতন অপরাধ যতো।'

একশ' বছর পরে আজ এই পুণ্য-দিবসে আমাদেরও সেই একই আবেদন, একই প্রার্থনা। হাতে হাত রাখো, ক্ষমা করো, ভালোবাসো, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন এক হও, এক হও।

১৩০১-১৪০০ : বঙ্গসংস্কৃতি

১৩০১-১৩১০

১৩০০ বঙ্গাব্দে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিনিধিরূপে ভাষণ দান।

১৩০১ রমেশচন্দ্র দত্তকে সভাপতি ও রবীন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্রকে সহ-সভাপতি করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গঠিত হয়।

১৩০১-এ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী কাব্য' ও 'বিদায় অভিশাপ' প্রকাশিত হয়। ১৩০৩-এ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'মালিনী' প্রকাশিত হয়। ১৩০৪-এ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রথম অভিনীত হয়।

১৩০১-এ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণ। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'। তারপর 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'দেবযান', 'ইছামতী' প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া গল্পগ্রন্থ হিসেবে উল্লেখযোগ্য, 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রাবদল'।

১৩০২-১৩০৪, ১৩০৬-১৩১৪ ও ১৩৩১ থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রতিভাময়ী সাহিত্যিক দেশপ্রেমিক সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তা ছাড়া প্রতাপাদিত্য উৎসব ও বীরাষ্টমী ব্রত পালনের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

১৩০৫ বঙ্গাব্দ থেকে সরলাবালা সরকার নিয়মিতভাবে কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প লিখেছেন, সাহিত্য, প্রদীপ, উৎসাহ, জাহ্নবী, উদ্বোধন, অন্তঃপুর, সুপ্রভাত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায়। ১৩০৬ সালে তিনি ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ' লেকচার-এ নিযুক্ত হন। তাঁর 'প্রবাহ' ও 'অর্ঘ্য' কাব্যগ্রন্থ দুটি উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া তিনি আরও প্রায় দশখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ বছরই বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে এক নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুরু হয়। হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের সমন্বয়ে এক নতুন ধারা সংযোজিত হয়।

১৩০৫-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে মহামহোপাধ্যায় ও ১৯১১তে তাঁকে সি আই ই উপাধি প্রদান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধজ্ঞান ও দোঁহা, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বাল্মীকির জয়, মেঘদূত, ভারত মহিলা, কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে ইত্যাদি।

১৩০৬-এ স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা।

১৩০৭-এ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ হোম, রামকৃষ্ণ পাঠশালা স্থাপন। বিবেকানন্দের রচিত গ্রন্থসমূহ : পরিব্রাজক, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইত্যাদি।

১৩০৩-১৩২৩-র মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত ও মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর' ও 'ডমরু চরিত' প্রকাশিত হয়।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মগ্রহণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, রূপসী বাংলা, সাতটি তারার তিমির।

১৩০৮-এ বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতে প্রথম রাসায়নিক ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : Life and Experience of a Bengali Chemist, History of Hindu Chemistry ২ খণ্ডে। তিনি সি আই ই ও নাইট উপাধিতে আখ্যায়িত হন। স্বদেশবাসী কর্তৃক আচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। ইংরেজি ও বাংলায় তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

১৩০৮-এ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্মগ্রহণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ : তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, উত্তরফাল্গুনী, সংবর্ত, প্রতিদিন, দশমী ; গদ্যগ্রন্থ দুটি—স্বগত এবং কুলায় ও কালপুরুষ। বারো বছর পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তা ছাড়া লিটারেরি, ফরওয়ার্ড ও সবুজপত্র পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন পরে একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ করায় ওই স্থানেই বিশ্বভারতী নামে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

১৩০৮-এ মহারানি ভিক্টোরিয়ার জীবনাবসানের পর বড়লাট লর্ড কার্জন একটি স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন যা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রূপ পায় এবং যার ভিত্তি স্থাপন হয় ১৩১৩-তে।

১৩০৯-এর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির নাম স্বাধীনতার পর হয় জাতীয় গ্রন্থাগার। বঙ্গ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম।

১৩১০-এ কথাশিল্পী, হাসির গল্প রচনায় অসামান্য দক্ষ শিবরাম চক্রবর্তীর জন্মগ্রহণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : প্রেমের পথ ঘোরালো ; গল্পগ্রন্থ : আজ এবং আগামীকাল ও মেয়েদের মন ; কবিতা : মানুষ, চুম্বন। তাঁর নিজের সম্পাদনায় শিব্রাম রচনাবলী (মোট ৫ খণ্ড) প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ করে।

১৩১১-১৩২০

১৩১১ বঙ্গাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৩১২-১৩১৭-সংবাদপত্রের প্রথম পর্যায়, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তার রেখাপাত।

১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা বিরোধী আন্দোলনে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' (রবীন্দ্রনাথ) গানে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না/যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা'। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন লিখলেন 'চরণতলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগেরে/ বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে'। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাস চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কেরে/ এ দেশ তোদের নয়।' বিদেশি শাসককে উপেক্ষা করায় তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছে।

১৩১২-তে অখণ্ড বঙ্গভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে ফেডারেশন হলের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় গণিত-বিষয়ক সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু শায়িত অবস্থায় সভাপতিত্ব করেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত ও নির্দেশিত 'বলিদান' মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়েছিল।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে আনন্দমোহন বসুর জীবনাবসান। ওই বছরেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'যুগান্তর', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা'য় সাম্রাজ্যবাদের চেহারা উদ্ঘাটিত হয়।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে সরসীকুমার সরস্বতীর জন্মগ্রহণ। তিনি ছিলেন গবেষক-ইতিহাসবেত্তা ও শিল্পশাস্ত্রী। পাহাড়পুরের মন্দিরের স্থাপত্যকলা ও শিল্পরীতি সম্পর্কে প্রামাণ্য দলিল তিনিই প্রথম উপস্থাপন করেন।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ-এর জন্মগ্রহণ। চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর রামকিঙ্কর চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের মধ্যবর্তী পর্বে রঙ্গমঞ্চের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর মঞ্চসজ্জা ও নির্দেশনায় সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল', রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা' অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর বিশ্বখ্যাতি ভাস্কর হিসেবে। তাঁর অক্ষয় কীর্তি রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি যেটি হাঙ্গেরির বালাতন হ্রদের তীরে স্বাস্থ্যনিবাসে প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ খেতাবে ভূষিত করে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত।

১৩১২ বঙ্গাব্দে অবনীন্দ্রনাথ 'ভারতীয় শিল্পের জন্মদাতা' রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পপ্রতিভার দ্বারাই যে ভারতীয় শিল্পের নবজাগৃতি শুরু হয় এ কথা অনস্বীকার্য। তিনি শুধু শিল্পী নন, সাহিত্যিকও বটে। ভারতীয় রীতিতে তাঁর প্রথম প্রয়াস কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক চিত্রাবলী। এই রীতির অন্যান্য চিত্রকর্ম 'বজ্রমুকুট', 'ঋতুসংহার', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', জাপানি রীতিতে আঁকা ওমর খৈয়াম। অন্যান্য বিখ্যাত চিত্রের মধ্যে সাহাজাদপুরের দৃশ্যাবলী, আরব্যোপন্যাসের গল্প, কবিকঙ্কন চণ্ডী, প্রত্যাবর্তন, জারনিস এন্ড, সাজাহান প্রভৃতি। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি অধিকাংশই ছোটদের জন্য হলেও বড়দের আকর্ষণ করে। যেমন, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা, মাসি ইত্যাদি।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবর্তী নন্দলাল বসু 'শিব-সতী' ছবি এঁকে ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলের প্রথম প্রদর্শনীতে ৫০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে শিল্পচর্চা ও রূপাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩১৬-১৩১৮-র মধ্যে নন্দলাল বসু অজন্তা-ইলোরার চিত্রগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করেন ও লেডি হ্যারিংহামকে সাহায্য করেন। তিনি বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ও দাদাভাই নওরোজী পুরস্কার লাভ করেন এবং পদ্মবিভূষণ খ্যাতি অর্জন করেন।

১৩১৫-তে শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্মগ্রহণ। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, পদি পিসির বর্মি বাক্স, বাতাসবাড়ি, ভূতের গল্প, মাদার টেরেসা, সুকুমার ইত্যাদি।

১৩১৯-এ শিশুসাহিত্যিক-শিল্পী সুকুমার রায়ের ম্যাঞ্চেস্টারে যাত্রা Municipal School of Technology -তে Chrome lithography আর lithodrawing-এ পাঠ নেবার উদ্দেশ্যে। ১৩২০-তে British Jounrnal of Photography-তে 'The Halftone Dot' প্রবন্ধ প্রকাশ। তারপর 'সন্দেশ', 'প্রবাসী', 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ। পরে তিনি 'সন্দেশ' সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর বিখ্যাত শিশুসাহিত্য 'হ-য-ব-র-ল', 'আবোলতাবোল', ও বড় কাব্যগ্রন্থ 'অতীতের ছবি'।

সমসাময়িক কালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ও অনুবর্তীদের মধ্যে ছিলেন : সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, মুকুল দে ও যামিনী রায়। যামিনী রায় ও মুকুল দে-র নাম সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

যামিনী রায়ের সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ তারপর 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত। তৎকালীন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিলাডী সাহেবের নিকট তেলরং ও পাশ্চাত্য রীতিতে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে জলরঙের নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে তোলেন। তাঁর ছবি মূলত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে অঙ্কিত। কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা ছবির শৈলীতে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হন।

সমসাময়িক কালের অবনীন্দ্রনাথের ঘরানার Wash Painting ও মিনিয়েচার ছবির জন্য শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট স্থপতিও ছিলেন। বঙ্গাব্দের গোড়া থেকেই এই সম্প্রদায় থেকে ভিন্নতর শৈলীসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতে কালি-তুলির কাজের তিনিই পথপ্রদর্শক। বাংলায় কারুশিল্পের ব্যবহার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৩২৩-এ বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথম জাপানি শিল্পী ইওকোহামা টাইফানের দ্বারা প্রভাবিত। পদ্ধতিগত ব্যাপারে তাঁর শিল্পকলায় ইয়োরোপীয় জলরং ও জাপানি কালি-তুলির সমন্বয় ঘটেছে। ফরাসি শিল্পের নানা উপাদান সাঙ্গীকরণের প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারেও এ দেশে তিনি প্রথম শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে চিত্রালঙ্কার করেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভোঁদড় বাহাদুর' তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ এবং ব্যঙ্গচিত্র 'নব হুল্লোড়'ও খ্যাতি লাভ করে।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের 'নায়ক' ও বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউজ ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হয়। ওই একই বছরে কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি, ইংরেজ শাসন-বিরোধী রাজনৈতিক ভাবনায় বাঙালি উজ্জীবিত। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'। সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন 'হোমশিখা'র মত বৈপ্লবিক কাব্যগ্রন্থ।

১৩১৫-১৩৩২ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নাটক, স্বাদেশিকতা অবলম্বনে নাটক জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিল। যেমন : মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহলবিজয়, পরপারে, বঙ্গনারী ইত্যাদি। সমসাময়িক কালে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকও খ্যাতি অর্জন করেছে।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের কুন্তলীন পুরস্কার লাভ।

১৩১৬ থেকে পত্রিকা সম্পাদনা ও কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। 'মানসী' 'যমুনা', 'পূর্বাচল' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'নাগকেশর', 'বন্ধুর দান', 'জাগরণী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১৩১৮-য় শিশুসাহিত্যিক হাসিরাশি দেবীর জন্মগ্রহণ। বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতীর নিয়মিত লেখিকা।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক' অর্জনকারী কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যগ্রন্থে আত্মপ্রকাশ। তাঁর কবিতায় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ, বাংলার প্রকৃতি ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : উজানী, বনতুলসী, শতদল, একতারা, বীথি, বনমল্লিকা, নূপুর প্রভৃতি। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

১৩১৮ থেকেই ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী বাংলা উপন্যাস-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর পোষ্যপুত্র, বাগদত্তা,, জ্যোতিহারা, মহানিশা, মা, উত্তরায়ণ, পথহারা উল্লেখযোগ্য। অনুরূপা দেবী 'ভারতী', 'রত্নপ্রভা'

উপাধি অর্জন করেন, 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। সর্বশেষে 'লীলা লেকচার' পদে অধিষ্ঠিত হন।

নবজাগরণের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ নতুন দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্রাসভা' এবং ১৩২০ বঙ্গাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ১৩৯ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিট থেকে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'বঙ্গের রঙ্গালয়' সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা 'নাট্যমন্দির' প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, স্টার থিয়েটার বাংলার সংস্কৃতি-জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। ১৮৮৩ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটারের যাত্রা শুরু।

বঙ্গাব্দের প্রারম্ভেই শুরু হয়েছিল মুসলিম নারীমুক্তির নেত্রী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের দুঃসাহসিক অভিযান।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে তিনি প্রয়াত স্বামীর নামে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩১৯ থেকে শিশুসাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী সুখলতা রাও বঙ্গসংস্কৃতির আঙিনায় একটি উজ্জ্বল নাম। শিশু-কিশোদের জন্য তিনি বহু আকর্ষণীয় লেখা লিখেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : আরো গল্প, খোকা এল বেড়িয়ে, গল্প আর গল্প, গল্পের বই, নতুন ছড়া, নিজে পড়ো, নিজে শেখো, সোনার ময়ূর, হিতোপদেশের গল্প, ঈশপের গল্প ইত্যাদি।

বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকেই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবি-ফারসি অধ্যাপক মওলভী রেয়াজুদ্দিন মাশহাদী, রেয়াজুদ্দীন, মোজামুল হক, শেখ আব্দুর রহিম প্রমুখ কয়েকজন শক্তিশালী লেখক একত্র হয়েছিলেন। এঁদেরই উদ্যোগে কলকাতার প্রথম বাঙালি মুসলিম সাহিত্য গোষ্ঠীর সূচনা হয়। শেখ আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকা, যেমন সুধাকর, মিহির, মোসলেম ভারত, মোসলেম হিতৈষী (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) এবং ইসলাম দর্শন (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)।

১৩২০ বঙ্গাব্দে গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা ও অন্যান্য আরও কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ Song Offerings কবিতা গ্রন্থের জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি, বঙ্গসংস্কৃতির জগতে এ এক নতুন গৌরবময় সংযোজন। তারপর ওই বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি.লিট উপাধি অর্পণ করে।

১৩১৫ থেকে রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত ও রাজা নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হতে শুরু করে।

১৩২০ বঙ্গাব্দে শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অঙ্কিত চিত্রসহ শিশুদের 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রকাশ। উপেন্দ্রকিশোরের বিখ্যাত অঙ্কিত চরিত্র 'বলরামের দেহত্যাগ'। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, সেকালের কথা, টুনটুনির বই, হারমোনিয়াম শিক্ষা, বেহালা শিক্ষা, গুপী গাইন ও বাঘা বাইন।

১৩২১-১৩৩০

১৩২১-১৩২৯ বঙ্গাব্দ সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্বে কয়েকজন মহিলা কবিকে পাওয়া যায় যেমন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু ও স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী। এঁদের কিছু কিছু গীতিকবিতা সমসাময়িক যুগের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে তাঁদের স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থও আছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্য-উপন্যাস ও সাহিত্যের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। দীর্ঘদিন তিনি ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, কামিনী রায় পরাধীন জাতির বেদনা ও যন্ত্রণাকে কাব্যে তুলে ধরলেন। ঘরোয়াজীবনকে কেন্দ্র করে লিখলেন মানকুমারী বসু। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন সীতাদেবী ও শান্তাদেবী একযোগে হিন্দুস্তানী উপকথার বঙ্গানুবাদ করেছেন সংযুক্তা দেবী নামে। দু-জনেই পৃথকভাবে গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বারুদের ধোঁয়ায় ভারতবাসীর দমবন্ধ অবস্থা। মুকুন্দ দাস-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুলের প্রতিবাদী কণ্ঠ গর্জে উঠল। বিদ্রোহী কবি নজরুল লিখলেন : 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'প্রলয়োল্লাস', 'ভাঙার গান'। ওই একই সময়ে ভারতবন্ধু নিকোলাই রোয়েরিখের চিত্রশিল্প, যুদ্ধবিরোধী পোস্টার বাঙালির জীবনে প্রেরণাস্বরূপ। তিনি বহু যুদ্ধবিরোধী ছবি আঁকলেন, পোস্টার আঁকলেন,—'মানবজাতির শত্রু যা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও ভয়লেশহীন সংগ্রামী সৈনিক'।

১৩২১-এ প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সবুজ পত্র'। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে জাপান সফরে গিয়ে উগ্রজাতীয়তাবাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করলেন। তারপরই প্রকাশিত হল তাঁর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ। ওই একই বছরে প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত নাটক 'রক্তকরবী'। অন্ধকারের যক্ষপুরীতে শ্রমিকের দল তাল তাল সোনা তোলে কিন্তু তাদের জীবনে হাহাকার, অবকাশ নেই, তাদের জন্য মধুময় পৃথিবী নেই, মুক্ত বাতাস নেই, আনন্দ নেই। কারখানাঘরের এক রুদ্ধশ্বাস মানব-জীবন তিলে তিলে মরণ-ফাঁদের দিকে কীভাবে এগিয়ে চলেছে তারই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে 'রক্তকরবী' নাটকে।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বসুবিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনী সঙ্গীত লিখে দেন,—'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো উজ্জ্বল হে'।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে সোভিয়েট বলশেভিক পার্টির বিপ্লবের বাণী পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মত বাংলার বুকেও তার ঢেউ আছড়ে পড়ল। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পতনের ও শ্রমশীল মেহনতী মানুষের বিজয় লাভের যুগ বলেও চিহ্নিত হল। বিশ্বকবি ঘোষণা করলেন, —'ওই নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়/ তোরা সব জয়ধ্বনি কর'। সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন, সাম্যাসাম্য, ধর্মঘট, নফর কুণ্ডু, জাতির পাতি, নজরুলের বিদ্রোহী, সাম্যবাদী, মানুষ, আমার কৈফিয়ৎ, যতীন্দ্রনাথের চাষার বেগার, বারনারী, লোহার ব্যথা।

সমসাময়িক কালে প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'কল্কিপুরাণ', সাজি, রণভেরী, ইয়োরোপের মহাসমর, ছিন্নহস্ত, আগমনী, বঙ্কিম প্রসঙ্গ।

১৩২৬-এ পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে বিশ্বকবি 'স্যার' খেতাব প্রত্যাখ্যান করেন। একই বছরে এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত। শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনাবসান।

১৩২৬ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবনাবসান। সাহিত্য-প্রকৃতি-পদার্থবিদ্যা-ভূগোল বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে : প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, মায়াপুরী, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বিচিত্র প্রসঙ্গ, **Aids to Natural Philosophy, A Geographical Reader** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন প্রথমে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পাঁচ বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তারপর স্যার রাজেন্দ্রলাল মুখার্জি (১৩২৮), বিশ্বেশ্বরাইয়া (১৩৩০), জগদীশচন্দ্র বসু (১৩৩৪),, রামন (১৩৩৬), রায়বাহাদুর শিবরাম কাশ্যপ (১৩৩৯), মেঘনাদ সাহা (১৩৪১), স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী (১৩৪৩)।

১৩২৭ বঙ্গাব্দে কম্যুনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহমদের ও নজরুলের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হল। 'ধূমকেতু'র পাতায় আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা লেখার অপরাধে নজরুলের কারাবাস। ১৩২৭ থেকেই কবি-শিল্পী-শিশু- সাহিত্যিক সুনির্মল বসুর অবদান স্মরণীয়। তখনকার

একমাত্র শিশুপাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর এশিয়ার' পরিচালক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের দু-চারটি হল: ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈচৈ, পাততাড়ি, মরণের ডাক, কিপটে ঠাকুর্দা, বীর শিকারী।

১৩২৭ বঙ্গাব্দে বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ মেঘনাদ সাহা 'থিওরি অব থার্মাল আয়োনাইজেশন' বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। তারপর গড়ে তোলেন ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স যা পরে 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার্স ফিজিক্স' বলে পরিচিত। পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সদস্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স ও গ্লাসসিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ: The Principle of Relativity on Heat, Treatise on Modern Physics, Junior Text Book of Heat with Meteorology প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে তিনি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হল বিশ্বভারতী পরিষদ গঠন ও সংবিধান প্রণয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'The Origin and Development of Bengali Language' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডি. লিট উপাধি লাভ। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁকে ভাষাচার্য উপাধি প্রদান। একে একে তিনি পদ্মবিভূষণ উপাধি ও জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ: 'The Origin and Development of Bengali Language, Bengali Phonetic Reader, ভারত সংস্কৃতি, জাতি সংস্কৃতি, সংস্কৃতি কী, পশ্চিমের যাত্রী, রবীন্দ্র সঙ্গমে।

১৩২৯ বঙ্গাব্দে নজরুলের কারাবাসকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক তাঁকে উৎসর্গ করেন।

১৩২৯ বঙ্গাব্দ থেকে কথাশিল্পী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিজিতা' যা নাকি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন কর্তৃক সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত হন।

১৩২৮ থেকেই বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি কোয়ান্টাম স্ট্যাটিসটিক্সের উদ্ভাবক। পদার্থ তত্ত্ববিদ ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ। তাঁর প্লাঙ্ক সূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ শুনে চমৎকৃত হয়ে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় তা অনুবাদ করেন। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি 'বোস-আইনস্টাইন' সংজ্ঞা নামে পরিচিত। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করে। তিনি 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও সংগীতেও ছিল তাঁর অনুরাগ। 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

সমসাময়িক কালে প্রশান্ত মহলানবীশ ছিলেন সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও নৃতাত্ত্বিক, রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর। তাঁর গবেষণার বিষয় Analysis of Rare Mixture in Bengal। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে তাঁর 'The Statistical Analysis of Anglo Indian Stature'। ১৩২৮ থেকে ১৩৩১ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে তিনি রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহচর ও কর্মসচিবরূপে দায়িত্ব পালন করেন।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে সাহিত্যকীর্তির জন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' প্রদান।

১৩৩০-এ প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী শচীনদেব বর্মণের কলকাতা বেতারে প্রথম গান পরিবেষণ। ওস্তাদ বাদল খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ সংগীতজ্ঞদের কাছে রাগসংগীতে তালিম গ্রহণ। ত্রিশের দশকে চলচ্চিত্র জগতে গায়ক ও সুরকার হিসেবে যোগদান। আশিটির অধিক বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশপত্রিকায় 'সরগমের নিখাদ' শিরোনামা লেখায় তাঁর সাধনা ও অভিজ্ঞতার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

১৩২১-১৩২৮-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'বৈরাগ্য সাধন', 'ডাকঘর', 'গুরু' ও 'ঋণশোধ' নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বৈরাগ্য সাধন নাটকে ফাল্গুনীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করেছিলেন।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে গিরিশযুগ ও শিশির ভাদুড়ীর যুগে নাট্যমঞ্চে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরা হলেন: প্রভাবতী, কঙ্কাবতী, সরযূবালা, ইন্দুবালা, নীহারবালা প্রমুখ।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে সুকুমার রায়-এর জীবনাবসান।

১৩৩১-১৩৪০

১৩৩০-১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু-শো উপন্যাসের রচয়িতা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস হল: মাটির ঘর, ঝড়ো হাওয়া, রাঙা শাড়ি, বাংলার মেয়ে, জোয়ারভাটা, পূর্ণচ্ছেদ, অনাহূত, অনিবার্য প্রভৃতি।

১৩৩০-১৩৩৯-র মধ্যে শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক লোকসাহিত্য সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেনের আট খণ্ডে ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশ। সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর Eastern Bengal Ballads. ১৩৩৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট ও ১৩৩৮ জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ।

১৩৩২-এ হেমন্তকুমার সরকার ও আরও অনেকের সহযোগিতায় 'নজরুল লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে গঠিত দলের মুখপত্র 'গণবাণী'-র প্রকাশ।

১৩৩৩-এ শরৎচন্দ্রের একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'র বৈপ্লবিক কাজের প্রেরণাস্বরূপ প্রকাশ। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র শোষিত দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের কথাই এখানে তুলে ধরেছেন, আর রয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা।

১৩৩৩-এ পেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। আশঙ্কা ছিল ধর্মভীরু দর্শকচিত্তে রঘুপতির প্রতিমা বিসর্জন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত বাংলা নাটকের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি ছিল অনেক অগ্রবর্তী।

১৩৩১ থেকে ১৩৩৮-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলি প্রথম মঞ্চস্থ হয় সেগুলি হল: অরূপরতন, নটীর পূজা, তপতী ও শাপমোচন।

১৩৩৫ থেকেই প্রমথেশ বড়ুয়া চলচ্চিত্র শিল্পজগৎকে আলোকিত করেছিলেন। সবাক ছায়াচিত্রের পরিচালক হিসেবে তিনিই প্রথম। ১৩৩৮-এ 'বড়ুয়া ফিল্ম' নামে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং এই প্রতিষ্ঠানের 'অপরাধী' ছায়াছবিতে নায়কের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। 'দেবদাস' ও 'গৃহদাহ' ছবিতে অভিনয় করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। নাট্যকার ও অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীও তখন খ্যাতির শীর্ষে।

১৩৩৬-এ সত্যরঞ্জন বক্সীর সম্পাদনায় 'লিবার্টি' প্রকাশিত হয়। শিশুসাহিত্যজগতে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম তখন উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর 'হাসি ও খেলা' 'খুকুমণির ছড়া', 'জ্ঞানমুকুল', 'ছবি ও গল্প', 'রাঙা ছবি', 'হাসিখুশি', 'হাসিরাশি' প্রভৃতি। তাছাড়া স্কুলপাঠ্য 'চারুপাঠ' ও 'সাহিত্য শিক্ষাসঞ্চয়ও' উল্লেখযোগ্য।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দ থেকে তৃতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রের প্রকাশ।

১৩৩৭-এ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের নবপর্যায় শুরু। প্রকাশিত হয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'এডভান্স'।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দেই রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন, তাঁর চিত্তে পরিবর্তনের আকাঙ্খা তীব্র হয়। বেদনায় বাজে, রাশিয়ার চিঠিতে লিখলেন : 'এ যুগের তীর্থযাত্রা পূর্ণ হলো'।

১৩৩৭-এ 'যাদুঘর' ও 'আকাশকুসুম' বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি শিশু সাহিত্যের জন্য 'মৌচাক' পুরস্কার, তারপর শিশিরকুমার পুরস্কার ও ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৩৩৭ সংগীতশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক ও অভিনেতা পঙ্কজকুমার মল্লিক বেতারে সংগীত শিক্ষার আসর পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুরারোপ করে খ্যাতি অর্জন, নির্বাক চলচ্চিত্র যুগে 'চাষার মেয়ে' ছবির নেপথ্যে অর্কেস্ট্রা দলের সঙ্গে বাজনা বাজিয়ে সুনাম অর্জন, বিভিন্ন ছবিতে সুর সংযোজনা, যেমন : দেশের মাটি, ডাক্তার, নর্তকী, জীবনমরণ, কাশীনাথ, বড়দিদি, রামের সুমতি, রাইকমল, মহাপ্রস্থানের পথে, দুই পুরুষ, লৌহকপাট, বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ইত্যাদি। প্রথম অভিনীত ছায়াছবি—'মুক্তি', তারপর আরও অনেক।

১৩৩৭-এ সি ভি রামণকে নোবেল পুরস্কার প্রদান। ১৩৩৭-এ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান। কনিষ্ক ও পালরাজাদের বহু প্রামাণ্য তথ্যের আবিষ্কারক। পাহাড়পুরের খননকার্যেরও পরিচালক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন মুদ্রা, পাষাণের কথা, ত্রিপুরার হৈহয় জাতির ইতিহাস, উড়িষ্যার ইতিহাস, বাঙালীর ভাস্কর্য, The Origin of Bengali Script ইত্যাদি আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ।

১৩৩৯-এ সারস্বত মহামণ্ডল কর্তৃক সুরসাগর উপাধি, তারপর পদ্মশ্রী ও দাদাসাহেব ফালকে উপাধি লাভ।

১৩৩৯ পর্যন্ত কথাশিল্পী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের অবদান বড় কম নয়। 'মানসী'-'মর্মবাণী'-'প্রদীপ'-'ভারতী'-'প্রবাসী'তে সম্পাদনার তিনি দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় ১৪টি উপন্যাস রচনা করেছেন ও শতাধিক গল্প রচনা করেছেন, উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : রমাসুন্দরী, নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদ্বীপ, জীবনের মূল্য, সিন্দুর কৌটা, মনের মানুষ ইত্যাদি।

১৩৩৯-এ বৈদ্যনাথ মুখার্জির সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'চাষী-মজুর'।

১৩৩৯-১৩৪০ পর্যন্ত কবি কামিনী রায় সাহিত্য-পরিষদের সহ সভানেত্রী ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ : আলো ও ছায়া, নির্মাল্য, পৌরাণিকী, মাল্য ও নির্মাল্য, দীপ ও ধূপ, জীবনপথে প্রভৃতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদানে সম্মানিত করে।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে আব্দুল হালিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'মার্কসপন্থী'। এবং অবনী মুখার্জির সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'মার্কসবাদ'।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' প্রকাশিত হয়। 'বাঁশরী'ও তখনই প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে 'ভারতী', 'কল্লোল' ও 'কৃত্তিবাস'-এ তিন যুগের লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম কবি-ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব, দীর্ঘ পনেরো বছর ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'পাঠশালা' সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন।

১৩৩৩-এ নরেন্দ দেব সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করলেন রাজপুতের দেশে সাহেব বিবির দেশে, পদ্যে মেঘদূত ও ওমর খৈয়ামের বাংলা তর্জমার জন্য। প্রবাহিনী পত্রিকায় প্রথম রচনা 'অভিমন্যু বধ কাব্য' প্রকাশিত হয়। তারপর গল্পগ্রন্থ চতুর্বেদাশ্রম, প্রথম উপন্যাস 'গরমিল', প্রথম কাব্যগন্থ 'বসুধারা'। এ 'প্রসঙ্গে' কবি রাধারাণী দেবীর নামও উল্লেখযোগ্য।

১৩৩২ থেকে কবি ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক-নাট্যকার-অনুবাদক-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুকে পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্য জগতে। মোট প্রায় ১৪০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। দীর্ঘ ২৫ বছর 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কবিতা—মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, পৃথিবীর পথে, কঙ্কাবতী, দ্রৌপদীর শাড়ি, দময়ন্তী ইত্যাদি। উপন্যাস—সাড়া, রডোডেনড্রন গুচ্ছ, সানন্দা, লাল মেঘ, পরিক্রমা, রাতভোর বৃষ্টি ইত্যাদি গল্পগুচ্ছ—অভিনয়, অভিনয় নয়, রেখার চিত্র, হাওয়া বদল, একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু কালোহাওয়া তিথিডোর ইত্যাদি। প্রবন্ধ মহাভারতের কথা—হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল, সাহিত্যচর্চা, সঙ্গ-নিঃসঙ্গতাঃ রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যচর্চা, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, ভ্রমণকাহিনী, সব পেয়েছির দেশে, জাপানি জার্নাল, দেশান্তর; নাটক—প্রথম পার্থ, অনাম্নি অঙ্গনা মায়ামালঞ্চ, তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যসন্ধ— ইংরেজি। An Acre of Green Grass, Tagore: Potrait of a Poet তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের জন্য আকাদেমি পুরস্কার ও ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে রামেন্দ্রনাথ দাস ব্রহ্ম 'অবধূত' নামে জনৈক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী লোধা সমাজে গিয়ে সেখানকার অসংস্কৃত বিষয়গুলো ত্যাগ করার জন্য এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেন।

১৩৪১—১৩৫০

১৩৪১-এ রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ওই বছরই রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক দল নিয়ে সিংহলের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

১৩৪১ সরোজ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'গণশক্তি' প্রকাশিত হল।

১৩৪২ বঙ্গাব্দে বিশ্বের সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিকরা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে একত্রিত হলেন, তৎকালীন বঙ্গসমাজের কাব্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক-পথিকৃতেরা তাতে যোগ দিলেন। যেমন: রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর, পি সি রায়, শরৎচন্দ্র প্রমুখ। গড়ে উঠল ফ্যাসিবাদবিরোধী সংস্কৃতির সপক্ষে আন্তর্জাতিক লেখক সংঘ।

১৩৪৩-র ১৮ জুন মস্কোতে ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনাবসান। ১১ জুলাই এলবার্ট হলে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে ১৬ আগস্ট 'গোর্কি দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন।

১৩৪৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্রের ডি লিট উপাধি লাভ, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জয়মালা পরিয়ে দেন।

১৩৪৪-এ হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

১৩৪৪-এ মুজফ্‌ফর আহমেদের সম্পাদনায় 'আগে চলো' প্রকাশিত হয়। গণসংস্কৃতির ওপরে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে।

১৩৪৪-এ আন্দামানে অনশনকারী বন্দিদের সমর্থন জানিয়ে কলকাতার টাউন হলের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং অভিমত দেন—'দেশের বিধিবদ্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার বিধিসঙ্গত দাবির প্রতি ভারত সরকারের শ্রদ্ধাহীন মনোভাবই ফ্যাসিস্ট মনোভাব'।

১৩৪৪-র ১১ মার্চ League Against Fascism and War'-এর উদ্যোগে এলবার্ট হলে স্পেনের সাহায্যকল্পে 'স্পেন সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। উদ্বোধন করেন সরোজিনী নাইডু, বক্তা ছিলেন : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন মুখার্জি, সুরেন গোস্বামী, গুণদা মজুমদার প্রমুখ।

১৩৪১-৪২-এ মন্মথ রায়ের নতুন রীতিতে 'কারাগার' ও 'অশোক' নাটক বেশ সাড়া জাগিয়েছে, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'রাষ্ট্রবিপ্লব'ও উল্লেখযোগ্য।

১৩৪৪-এ র‍্যালফ ফক্স-এর মৃত্যু উপলক্ষে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে স্মরণ সভা।

১৩৪৩-এ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশিত হয়।

১৩৪৪-এ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' প্রকাশিত হয়।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৯ ও ১০ পৌষ দু-দিন ব্যাপী প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওই বছরেই জাপানিদের চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়ে 'চণ্ডালিকা'র অভিনয় করিয়ে সংগৃহীত অর্থ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ আক্রান্ত চিনবাসীদের কাছে পাঠিয়ে দেন। একই বছরে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে।

১৩৪৬-এ হিজলি জেলে রাজবন্দী হত্যায় রবীন্দ্রনাথ গর্জে উঠলেন,—লিখলেন 'প্রশ্ন'—'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'বঙ্গসমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সংকট জর্জর অবস্থা দেখে।

১৩৪৬-এ রাভারা হিন্দু বলে পরিচিত হবার জন্য এবং সামাজিক মর্যাদায় হিন্দুদের সমান হওয়ার জন্য একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল—এই কর্মসূচিতে অন্যতম ছিল মাদক দ্রব্য বর্জন ও শুয়োর মুরগি পালন বন্ধ।

১৩৪৮-র ১ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংস্কৃতির সংকট'-এ বললেন—'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'

১৩৪৬-১৩৫৪ পর্যন্ত সংবাদপত্র জগতের চতুর্থ পর্যায়, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মহামারী-পৃথিবীময় ধ্বংসের ছবি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সভ্যতার সংকট সংবাদপত্রে প্রতিদিন তুলে ধরা হল।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দ থেকে সাম্যবাদী কাজের প্রসার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। কাকদ্বীপ-তেলেঙ্গানা-নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ময়মনসিংহের হাজং বিদ্রোহ, রসিদ আলি দিবস ইত্যাদি সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে প্রভাব ফেললো। এই পর্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেহারা বিধৃত হয়েছে কবি অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তেহার', 'কসাকের ডাক', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিকোণ, মে দিনের কবিতা, বিষ্ণু দে-র সাত ভাই চম্পা, পূর্ব লেখ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি, দিনেশ দাসের কাস্তে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়, তেলেঙ্গানা, হিমাচল্ল আসমুদ্র, রুদ্র ইত্যাদি কাব্য-কবিতা বাংলার আকাশ-মাটি উত্তাল করে তোলে। সুকান্তের কবিতায় জাপানি বোমাবর্ষণ, ব্ল্যাক আউটের কলকাতা, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-লাঞ্ছিত দেশের অবস্থা কাব্য-চিত্ররূপ পেয়েছে। মধ্যবিত্ত ৪২, কৃষকের গান, দিন বদলের পালা, একুশে নভেম্বর ইত্যাদি। সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘোষণা করলেন, 'দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে/ বসে থাকবার বেলা নেই মোটে'।

১৩৪৭-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে ডি লিট প্রদানে সম্মানিত করে।

১৩৪৮-এ সোভিয়েট আক্রমণের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও কবিকণ্ঠ নীরব থাকতে পারল না। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হল,—'মামা হিংসী', লিখলেন—'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা/ এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা', এই পর্বে কবি কল্লোলিত বাস্তব ও পরিচিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নিয়ে পৃথিবীর কবি হতে চেয়েছেন। সেই ভাবনার ফসল তাঁর 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' জন্মদিনে এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত ছড়া ও শেষ লেখায়।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ বিশ্বকবি প্রয়াত হলেন। বঙ্গসংস্কৃতি জগতের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

১৩৪৭-'৫০-এ আজাদ, কৃষক, নবযুগ, প্রত্যহ, ন্যাশনালিস্ট ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা সাধারণ মানুষের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবাদ- প্রতিরোধের সুর ধ্বনিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ, সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার পীড়ন, কলকারখানায় পুঁজিতন্ত্রের নির্মম আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল, ফ্যাসিবাদের বিভীষিকা, দুর্ভিক্ষ-অনাহার—এ সব কিছুর বিরুদ্ধে সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিকরা যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা হলেন: তারাশঙ্কর, মানিক, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ। তারাশঙ্করের মন্বন্তর, গোপাল হালদারের ত্রিদিবা, মানিকের শহরতলী, দর্পণ, সোনার চেয়ে দামী, গৌরীশঙ্করের এলবার্ট হল, ইস্পাতের স্বাক্ষর ইত্যাদি। অজস্র প্রতিবাদী নাটক লেখা হতে থাকল এবং যাত্রা-গান-কবিতা-ছোটগল্প ও প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করল। ছোটগল্পের মধ্যে খুবই সাড়া জাগানো গল্প হল: সোমেন চন্দ-র দাঙ্গা, নবেন্দু ঘোষের ফিয়ার্স লেন, সমরেশ বসুর আদাব, রমেশচন্দ্র সেনের সাদাঘোড়া, মুস্তাফা সিরাজের অন্ধকার দর্পণে নদী। মহিলাদের মধ্যে উপন্যাস ও গল্প রচনায় এগিয়ে এলেন: প্রিয়ম্বদা দেবী, নিরুপমা দেবী, সুরুপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষ-জায়া, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা সিংহ, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখা।

১৩৪৯-এ সতীনাথ ভাদুড়ীর ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে লেখা 'জাগরী' উপন্যাসও তখন খুবই সাড়া জাগানো উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পায়।

১৩৪৯-এ ফ্যাসিবিরোধী ঘাতকের হাতে তরুণ কথাসাহিত্যিক সোমেন চন্দের হত্যায় বাংলার প্রবীণ-নবীন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা তীব্র বিদ্রোহে গর্জে উঠলেন।

১৩৪৯-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূত্রপাত। তখনই এম এস যোশীর সভাপতিত্বে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গঠিত হল নিখিল ভারত গণনাট্য সংঘ।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের সূচনা থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক রাজনীতি সচেতন মহিলা সনাতন প্রথা কুসংস্কার-রক্ষণশীল সমাজের দেওয়াল ডিঙিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করলেন, সমস্ত দিক থেকেই উদ্ভূত হল গণ সাংস্কৃতিক চেতনা, যাঁদের নাম এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন: মণিকুন্তলা সেন, চন্দ্রাবতী দে, সীতা মুখোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র (ভাদুড়ী) শোভা সেন, রেবা রায়চৌধুরী, সাধনা রায়চৌধুরী, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিনী রায়চৌধুরী, রুমা গুহঠাকুরতা প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ কাব্যে-গল্পে-উপন্যাস রচনায়, কেউবা সঙ্গীতে, কেউবা নাটকাভিনয়ে, কেউবা চলচ্চিত্রে উজ্জ্বল সাক্ষর রাখতে সমর্থ হলেন।

১৩৫০-এ গঠিত হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সুসংবদ্ধ এই সংগঠনের উদ্যোগে সৃষ্টি হতে লাগল একের পর এক গণসংগীত ও অজস্র নাটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, নিবারণ পণ্ডিত, হরিপদ কুশারী, সাধন দাশগুপ্ত, বঙ্কিম সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ। নাটক পরিচালনা-রচনা-অভিনয়ে যাঁরা আলোড়ন সৃষ্টি করলেন তাঁরা হলেন, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, গোপাল হালদার, তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র) প্রমুখ।

১৩৫০-এ গঠিত হল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। মন্বন্তর-মহামারী প্রতিরোধে সংগঠন ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাশাপাশি তৈরি হতে থাকল জীবনজয়ী গান-কবিতা-নাটক-চিত্রশিল্প।

এই কঠিন পরিস্থিতির প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন: তারাশঙ্কর, রবিশঙ্কর, যামিনী রায়, বিষ্ণু দে, হেমন্ত মুখার্জি, সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ। সুকান্ত ঘোষণা করলেন 'ঘরেতে টাকার অভাব/তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া/, পিঠেতে টাকার বোঝা/তবু এই টাকা যাবে না ছোঁয়া।'

১৩৫১—১৩৬০

১৩৫১ বঙ্গাব্দে নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে 'নবান্ন' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক। এই নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্য আন্দোলন দেশের

বৈপ্লবিক গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। 'নবান্ন' নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, শম্ভু মিত্র, গোপাল হালদার, সজল রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন বড়াল প্রমুখ। মহিলাদের মধ্যে তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র), মণিকুন্তলা সেন, বিভা সেন, ললিতা বিশ্বাস, কল্যাণী মুখার্জি প্রমুখ। বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক 'জবানবন্দী'তে ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক জীবনের পরিচয় আর 'গোত্রান্তরে' এসে নাট্যকার লিখছেন— 'নীতিবাদের প্রশ্নময় জীবনের ক্ষেত্রেই গোত্রান্তর আজ যুগসত্য'। এই পর্বে আর যাঁরা নাটক রচনায় এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে আছেন: তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন প্রমুখ।

১৩৫২-১৩৫৩ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জনগণের সংঘাত সুস্পষ্ট হল। সুকান্ত কলমকে হাতিয়ার করে বৈপ্লবিক আদর্শ নিয়ে সংগ্রামের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ তার তৃতীয় সম্মেলনে সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন করে আদিনামে প্রগতি লেখক সংঘ রাখল।

১৩৫৩তে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পাশাপাশি গড়ে উঠল ক্রান্তি শিল্পী সংঘ। তখন তাঁদের প্রধান কয়েকটি নাটক হল: অরুণ দাশগুপ্তের 'বাইশে শ্রাবণ', অতীশ মজুমদারের 'জাগরণ', সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি', অমল মজুমদারের 'সংঘাত', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমগ্র বাঙালি জীবনে এক চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করল। বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে জীবিকার সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ছুটলেন। এমন সর্বনাশা স্বাধীনতায় শঙ্কিত কবি বিষ্ণু দে লিখলেন, 'জল নেই, মানুষের চোখে মুখে জল নেই, শুধু ঘৃণা, অবিশ্বাস, দীর্ঘকাল বঞ্চিতের সন্দেহ সংশয়।' একই নৌকোর সহযাত্রী হলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি কৃষ্ণ ধর, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, সিদ্ধেশ্বর সেন, রাম বসু, ধনঞ্জয় দাস, কনক মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৩৫৫-৫৬ বন্দিমুক্তি আন্দোলন। কৃষকদের ফসল রক্ষার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা অজস্র গান-কবিতা-নাটক রচনা করলেন।

১৩৫৭বঙ্গাব্দ থেকে গ্রুপ থিয়েটার পশ্চিমবঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। যেমন অশনি চক্র, শিল্পীমন, রূপকার, গন্ধর্ব, থিয়েটার ইউনিট, চতুরঙ্গ, চতুর্মুখ ইত্যাদি, পরবর্তীকালে মাস থিয়েটার, নান্দীকার ইত্যাদি।

১৩৫৭বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি থেকে ১৩৬৭ পর্যন্ত ঠুনকো স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, ক্ষুধার যন্ত্রণা, জীবনের অস্থিরতাকে উপলব্ধি করে যাঁরা কাব্য রচনায় এগিয়ে এলেন তাঁরা হলেন অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, অরুণ মিত্র প্রমুখ।

১৩৫৯-এ কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের জীবনাবসান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ: বিস্মরণী, স্বপনপসারী, স্মরগরল ইত্যাদি।

এই পর্বে যাঁরা গল্প উপন্যাস রচনায় সাড়া জাগালেন তাঁরা হলেন গোপাল হালদার, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, মনোজ বসু, বিমল কর, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তা ছাড়া অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম', সমরেশ বসুর 'গজা', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথাসাহিত্যিক নরেন মিত্রও উল্লেখযোগ্য।

১৩৫৬বঙ্গাব্দে খাদ্যের দাবিতে ও বন্দিমুক্তির দাবিতে আন্দোলনে সামিল হলেন লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতা। পুলিশের গুলিতে এই চারজনই নিহত হলেন। আরও একজন নিহত হলেন তিনি যুবক বিমান। কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়সহ বহু কবি-সচেতন শিল্পীরা প্রতিবাদে গর্জে উঠে কবিতা-গান-নাটক রচনা করলেন।

১৩৫০-১৩৬০-র মধ্যে বেশ কিছু ভাল নাটক অভিনীত হল যাতে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন মহিলা নাট্য-শিল্পীরা। যেমন: মহামারী নৃত্য, জনান্তিক, নীলদর্পণ, সূর্যগ্রাস, রাহুমুক্তি, সংক্রান্তি, মুক্তির উপায়, দেবী গর্জন উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন রেবা রায়চৌধুরী, সাধনা রায়চৌধুরী, শোভা সেন প্রমুখ।

১৩৫৯-১৩৬০ ঋত্বিক ঘটকের প্রথম পরিচালিত ছবি 'নাগরিক', মুক্তি পেয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর।

১৩৫৯ ওপার বাংলায় সংঘটিত বাংলা ভাষা আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল এপার বাংলায়। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের উদ্দেশে এপার বাংলার কবি-শিল্পীরা কবিতা-গান লিখলেন। এখনও এই দিনটিকে স্মরণ করে কবিতা-গান-প্রবন্ধ লেখা হয়। এই সময়েই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-হো-চি-মিন-চে-গুয়েভারা প্রমুখের সমাজ বদলের আদর্শ ও দর্শন দ্রুতগতিতে প্রভাব বিস্তার করল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে।

১৩৬১-১৩৭০

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে মুক্তি পাওয়ার পরই সত্যজিৎ রায়-এর সার্থক আত্মপ্রকাশ। ছবিটি দেশ-কাল অতিক্রম করে আবেদন সৃষ্টি করল সর্বজনীন। তারপর সত্যজিৎ রায় সমাজের কঠিন বাস্তবতাকে সামনে রেখে শিল্পোত্তীর্ণ করলেন 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার'কে।

১৩৬৪ থেকে পাওয়া গেল বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রামমোহন, ভাড়াটে চাই, কিরণ মৈত্রের বারো ঘণ্টা, চোরাবালি, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোর, ধনঞ্জয় বৈরাগীর রূপোলি চাঁদ, উৎপল দত্তের ছায়ানট, অঙ্গার, বীরু মুখোপাধ্যায়ের সংক্রান্তি, সুনীল দত্ত-র হরিপদ মাস্টার, জতুগৃহ, বর্ণপরিচয়, সোমেন্দ্র চন্দ নন্দীর সমান্তরাল, রমেন লাহিড়ীর 'অপরাজিত নাটক'। তা ছাড়া আরও অজস্র নাটক তখন রচিত হয়েছে ও অভিনীত হয়েছে, যার সামাজিক মূল্য অনেকখানি। উৎপল দত্তের অঙ্গার মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার সময় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এই পর্বে নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র 'দূরভাষিণী': নাট্যরূপ সলিল সেন, নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা', বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-র পরিচালনায় মনোজ বসুর 'শেষলগ্ন', ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক মুঠো আকাশ' মঞ্চস্থ হয়।

১৩৬৫-তে সংগীতশিল্পী কলাকার ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। তারপর 'পদ্মবিভূষণ', 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। সংগীতে 'দিরি দিরি' সুর-ক্ষেপণের পরিবর্তে 'দারা দারা' সুর-ক্ষেপণ প্রয়োগ চালু করেন আলাউদ্দিন খাঁ। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তিনি 'খাঁসাহেব' উপাধিতে ভূষিত হন। শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন। তিনি অনেক রাগ-রাগিনীর স্রষ্টা। যেমন, হেমন্ত, দুর্গেসশ্বরী, মেঘবাহার, প্রভাতকেলী, হেমবেহাগ, মদনমঞ্জরী (মদিনামঞ্জরী), আরাধনা ইত্যাদি। এই পর্বে যন্ত্র-সংগীতে খ্যাতনামাদের মধ্যে আছেন: রবিশঙ্কর, বাহাদুর হোসেন, পাপেট ব্যালের সৃষ্টিকর্তা শান্তি বর্ধন, আলি আকবর খাঁ, বিলায়েত খাঁ, তিমিরবরণের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কণ্ঠসংগীতে যাঁদের নাম প্রথম সারিতে তাঁরা হলেন: আমীর খাঁ, ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়, তারাপদ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিসমিল্লা খাঁ, আলি হুসেন, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, শান্তিদেব ঘোষ, অমিয়া ঠাকুর, মেনকা ঠাকুর প্রমুখ। নৃত্যশিল্পে উদয়শঙ্কর।

১৩৬৫-তে ঋত্বিক ঘটকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি অযান্ত্রিক, তারপর একে একে বহু বিখ্যাত ছবি যেমন : বাড়ি থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, তিতাস একটি নদীর নাম, যুক্তি তক্কো গপ্পো। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত। যুক্তি তক্কো গপ্পো-র জন্য ভারতের জাতীয় পুরস্কার লাভ। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ঋত্বিক ঘটক একটি উজ্জ্বল নাম।

এই পর্বের বলিষ্ঠ সংযোজন ভূমিহীনের জমির অধিকারের দাবি সম্বলিত নাটক যেমন : আবর্ত-নাট্যরূপ সমরেশ বসু, নির্দেশনা—বরুণ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাদ' 'আমার মাটি জননী' ইত্যাদি।

১৩৬৮ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ১৩৬৯-এ চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। সেই বছরই উৎপল দত্তের স্পেশাল ট্রেন সানা জাগানো নাটক। তা ছাড়া তাঁর 'মৃত্যুর অতীত', 'গেরিলা যুদ্ধ', 'সমাজতান্ত্রিক চাল' খুবই আলোড়ন তুলেছিল। সেই সময়ে চিন-বিরোধী লেখার অনুরোধ এলে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সুপরিচিত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় ও দেবেশ রায়। এই পর্বে অপেশাদার বাংলা নাট্যমঞ্চে গ্রুপ থিয়েটারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেল। যেমন, এল টি জি, বহুরূপী, শৌভনিক, নান্দীকার, চতুর্মুখ, চতুরঙ্গ, পি এল টি, মুক্তাঙ্গন। মুক্তাঙ্গনের স্মরণীয় প্রযোজনা: মা, কর্ণিক, মরাচাঁদ, মৃত্যুসংবাদ, ফরিয়াদ, শেষ রক্ষা, গোরা, তাসের দেশ, ডিরোজিও, জনৈকের মৃত্যু, ওথেলো, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, কিউবা, শতাব্দীর স্বপ্ন, দুঃখীর ইমান ইত্যাদি।

এই পর্বে এসে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এই শতকেই একদল রইলেন প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদারী লেখার দলে, আরেকদল সংগ্রামী আদর্শে বিশ্বাস রেখে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টিতে প্রয়াসী হলেন। একদল রইলেন ভাববাদী শিল্পের জগতে, অপরদল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চায় সচেষ্ট হলেন। কাব্য-সাহিত্য-উপন্যাস রচনায় এই পর্বে আলোকিত করে আছেন : শঙ্খ ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীরেন চক্রবর্তী প্রমুখ। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ার বইগুলো খুবই জনপ্রিয় ও শিশুমনের উপযোগী, বড়দের ছড়ার বইও আছে। ছড়ার বই : শালিধানের চিঁড়ে, রাঙা ধানের খই, ডালিম গাছে মৌ, বিন্নি ধানের খই, রাঙা মাথায় চিরুনি।

১৩৬৪-১৩৬৫-তে সাহিত্যিক ও অভিধান প্রণেতা রাজশেখর বসুকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান—চলন্তিকা অভিধান। বাংলা সাহিত্যে রস রচনার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রসরচনা : গড্ডালিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন। ১৩৬২-তে 'কৃষ্ণকলি' গল্পগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার এবং 'আনন্দবাঈ' গল্পগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

এই পর্বে সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী—বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি মাতৃভাষা ছাড়া উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, গুজরাটী ইত্যাদি দেশীয় ভাষাসহ ইংরেজি, ফরাসি, ইতালি, জার্মান, আরবি ইত্যাদি মোট পনেরোটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মোট ২২ খানা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা, তা ছাড়া পত্র-পত্রিকায় 'সত্যপীর' ছদ্মনামে লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য যেমন, দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, অবিশ্বাস্য, ময়ূরকণ্ঠী, জলে-ডাঙায়, ধূপছায়া ইত্যাদি।

এই সময়ে কবি জসীমউদ্দিনকে পাওয়া যায়। তাঁর লেখা নক্সী কাঁথার মাঠ, বালুচর, ধানক্ষেত, সোজনবাদিয়ার ঘাট, পদ্মাপার, মাটির কান্না, ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়, হলদে পরীর দেশে ইত্যাদি গ্রন্থ।

সেই সময়ে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁরা সাহিত্যচর্চা সাংস্কৃতিক সংগ্রামের শরিক তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন : গোপাল হালদার, হীরেন মুখার্জি, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নেপাল মজুমদার, অরুণ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, সমর সেন, আশু সেন, সাধন গুপ্ত, কল্পতরু সেনগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, কনক মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

১৩৭১-১৩৮৪ (প্রথম অর্ধভাগ)

এই অধ্যায় দুই শিবিরের পত্র-পত্রিকাকে ঘিরে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা চলতে থাকে। একদিকে 'দেশ'-'আনন্দবাজার'কে কেন্দ্র করে একদল সাহিত্যগোষ্ঠী তাঁদের সাংস্কৃতিক ভাবনা অনুযায়ী সাহিত্যচর্চায় রত থাকলেন এবং এর পাশাপাশি গণশক্তি-নন্দন-একসাথে-গণনাট্য-গ্রুপ থিয়েটারকে কেন্দ্র করে আরেক দল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে তুললেন। পেইন্টার্স ফ্রন্ট সংকলিত ও সম্পাদিত দেশ-বিদেশের যুদ্ধবিরোধী চিত্র সংকলনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গ্রন্থ।

গণসংগীতের সুরে তখন উত্তাল বাংলার মাটি। মানুষের অধিকারের দাবি জানিয়ে সহস্রকণ্ঠে মিলিত আওয়াজ উঠল (১) 'তুফানে তুফানে উঠেছে আওয়াজ/ সইবোনা মোরা সইবোনা/ আজন্ম কাঁধে শোষণের চাকা বইবো না মোরা বইবো না।' (২) লাখ লাখ করতালে হরতাল হেঁকেছে/ আজ হরতাল/ আজ চাকা বন্‌ধ্। (৩) 'অহল্যামা তোমার সন্তান জন্ম নিল না/ ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা/ শত কংস ধ্বংস করে শিশু জন্মিবে/ মাঠে মাঠে তারই জল্পনা।' তা ছাড়া গণনাট্য সংঘের 'রানার', 'মে দিবসের ডাক', 'কুইট ইন্ডিয়া', 'মালতী', 'শহীদের ডাক' ও নানাবিধ লোকনৃত্য।

১৩৭৪-এ পশ্চিমের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। সে যেন এক বাঁধভাঙা উল্লাসে মুখরিত গ্রামবাংলার মাটি, গণসংস্কৃতিতে তার ছায়াপাত ঘটল।

১৩৭৬ রবীন্দ্র-সরোবরের ইয়ংস কর্ণার আয়োজিত 'অশোককুমার নাইট'-এর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছু উচ্ছৃঙ্খল দর্শকের আচরণে অনুষ্ঠান ভণ্ডুল হয়ে যায়। তারপর যুক্তফ্রন্ট সরকারও ভেঙে যায়।

১৩৭৭-এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারও ভেঙে যায়, ১৩৭৪-৭৭ মধ্যে দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় ও মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৩৭৮-১৩৮২ পশ্চিবঙ্গের মাটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা খুন-হত্যা-নারীর অবমাননা বেপরোয়াভাবে চলতে থাকল। মনীষীদের মূর্তির শিরচ্ছেদ চলতে থাকল। বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের শিরও তার থেকে বাদ গেল না। পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি, পরীক্ষা বন্‌ধ্, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা হয় বন্ধ নয়তো রণক্ষেত্র। দেশে জরুরি অবস্থা জারি হল। সাধারণ মানুষের জীবন্মৃত অবস্থা আর সংস্কৃতির খুঁড়িয়ে চলা অবস্থা।

১৩৭৪-এ পি এল টি-র কল্লোল, ১৩৭৬-এ রাইফেল মঞ্চস্থ হল।

১৩৭৭-এ শোনরে মালিক, বার্গ এল দেশে, ১৩৭৮-এ দাদন, ১৩৮০-তে পদাতিক রচিত ও অভিনীত হল। রূপান্তরীর কর্ণিক, অমর ভিয়েৎনাম-রচনা ও পরিচালনা: জোছন দস্তিদার, আঙ্গিকের ক্যারাবিয়ানের স্বপ্ন, গন্ধর্বের সূর্যলগ্ন ও থানা থেকে আসছি।

১৩৮১বঙ্গাব্দে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে মানুরাইয়ের রামস্বামী রক্ত-পতাকা ধরে থাকা অবস্থায় পাইলটকারের নিচে শহিদ হন। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন কবিসমাজ-শিল্পী-সাহিত্যিকরা এমন নিষ্ঠুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কবিতা-গান রচনা করলেন।

১৩৮২-তে সাংবাদিক-সাহিত্যিক অমল হোমের জীবনাবসান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পুরুষোত্তম, রবীন্দ্রনাথ, Rammohan Roy and his works.

দেশ-আনন্দবাজারকে কেন্দ্র করে তখন গল্প-উপন্যাস-সাহিত্য রচনায় যাঁদের দিকে প্রথমেই দৃষ্টি যায় তাঁরা হলেন: নীরেন চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন, অলকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ। কবি তারাপদ রায়ের রসরচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন : কাণ্ডজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি ইত্যাদি। পাশাপাশি এগিয়ে এলেন নন্দন-গণশক্তি-একসাথে—গণনাট্য-গ্রুপ-থিয়েটার-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করছেন এবং মার্কসবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন। সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনাকে স্বীকৃতি জানিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙিনাকে যাঁরা সুস্থভাবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে সাহিত্য রচনা করলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নন্দগোপাল সেনগুপ্তের বস্তুবাদী ভারত জিজ্ঞাসা, নেপাল মজুমদারের জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, গোপাল হালদারের রূপনারায়ণের কূলে, অমলেশ ত্রিপাঠীর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। লিখলেন সোমনাথ লাহিড়ী, নারায়ণ চৌধুরী, কল্পতরু সেনগুপ্ত, পবিত্র সরকার, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, আশু সেন, শিশির সেন, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ, জিয়াদ আলী, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, গোপীনাথ দে, রামশঙ্কর চৌধুরী, অমল দাশগুপ্ত, নির্মাল্য নাগ, দেবদত্ত রায়, সমীর রক্ষিত, অরুণ চক্রবর্তী, ইরা সরকার প্রমুখ। 'একসাথে'কে কেন্দ্র করে অনেক মহিলা কবি-গল্পকার-সাহিত্যিকরা এগিয়ে এলেন। উল্লেখযোগ্য ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাসও।

১৩৮৪-র মধ্যভাগে নির্বাচনের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-সাহিত্য-নাটক-যাত্রা-রঙ্গমঞ্চ-ছায়াছবি, লোকসংস্কৃতি-চিত্রকলা-সংগীত সমস্ত দিক থেকেই নতুন ঢেউ এল। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের লোকরঞ্জন শাখাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। রাজ্য সরকার দুঃস্থ শিল্পীদের অনুদানের ব্যবস্থা করল। লেখককে গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ ও উৎসাহ দেবার জন্য সরকারি অনুদানের প্রচলন হল। গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হল। গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধনে বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করল।

১৩৮৪ (দ্বিতীয়ার্ধ)—১৪০০

১৩৮৬-তে মাদার টেরেসা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। জ্যোতি বসু মাদার টেরেসাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

পর পর চারবার বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে বঙ্গসংস্কৃতিতে নতুন জোয়ার এল। ময়দানে বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে দশ-পনেরো দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-আলোচনাচক্র-কবিতার আসর বসে প্রতি বছর। যদিও তার মূল দায়িত্ব থাকে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিভাগের। তথাপি সাংস্কৃতিক দিকটি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতা থাকে। আগেও ময়দানে বইমেলা-বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন হয়েছে কিন্তু তা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল তথাকথিত পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। এখন যা সর্বসাধারণে উপভোগ করে।

পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পালিত হচ্ছে রবীন্দ্র জন্মোৎসব, ডিরোজিও জন্মোৎসব, শরৎচন্দ্র জন্মোৎসব, নজরুল জন্মোৎসব, সুকান্ত জন্মোৎসব, সুকুমার রায় জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান। চলছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, কলকাতার তিনশত বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান।

সাংস্কৃতিক বিকাশ যথাযথভাবে হওয়ার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে পৃথক পৃথক শাখা খোলা হল যেমন, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, চিত্রভাস্কর্য, রাজ্য সংগীত আকাদেমি, নাট্য আকাদেমি, বাংলা আকাদেমি। লোকরঞ্জন শাখা বহু আগে থেকেই ছিল।

১৩৮৯-এ রাজ্য সংগীত আকাদেমি গঠিত হল, সভাপতি : অন্নদাশঙ্কর রায়।

১৩৯৩ বাংলা আকাদেমি গড়ে উঠল। ১৩৯৫-তে বাংলা আকাদেমির মুখপত্র প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল। বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, কবিতাসংগ্রহ: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা তিন শতক : কৃষ্ণ ধর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজিতকুমার দত্ত, ভারতের কৃষি ও গ্রামীণ সমাজ: গৌতম সরকার, সুনীলকুমার, ভবতোষ দত্ত, প্রসঙ্গ: বাংলা ভাষা ইত্যাদি। সরকারি পরিভাষা, বানান সংস্কার, অভিধান ইত্যাদি।

১৩৯৪-এ বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা-বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে শিশির মঞ্চে। রাজ্য সংগীত আকাদেমির পক্ষ থেকেও নিয়মিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যন্ত্রসংগীত-কণ্ঠসংগীতের আয়োজন করা হয় সর্বসাধারণের জন্য। সংগীতে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়। পুরস্কার প্রদান-বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। প্রতি বছরই বছরের সেরা লেখক—সেরা শিল্পীকে বিদ্যাসাগর পুরস্কার-রবীন্দ্র পুরস্কার-বঙ্কিম পুরস্কার-দীনবন্ধু পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

১৩৯৪-এ নাট্য আকাদেমি গঠিত হয়।

১৩৯২-তে সর্ববৃহৎ চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়। যার নাম 'নন্দন'—তার নামকরণ ও অলংকরণ সত্যজিৎ রায়ের, আমরণ সত্যজিৎ রায় নন্দন-এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

নতুন মঞ্চ তৈরি হল : শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, অহীন্দ্র মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, নজরুল মঞ্চ, মুক্ত মঞ্চ তৈরি হল তথ্যকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে এল রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল।

১৩৯৩-তে কবি অমিয় চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল ও নালক এবং রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারার অনুবাদ, জার্মান ভাষাতে তিনি রবীন্দ্র রচনার সংকলন অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: The Indian Testimony. The Emergent Design. Hinduism in Great Religions of the world. বিশ্বভারতীর দেশকোত্তম, ভারতের পদ্মভূষণ ও রবীন্দ্রভারতীর ডি লিট উপাধিতে ভূষিত হন।

১৩৯১-তে লোকবিজ্ঞানী, সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের জীবনাবসান। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা তথাপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: বাংলা লোকসাহিত্য (মোট ৬ খণ্ড) বাংলা লোকসংগীত (৯ খণ্ড), বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর (পাঁচ খণ্ড)।

বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগী সাংস্কৃতিক সংগঠন, অনুকূল পরিবেশ পেয়ে সংস্কৃতির জগৎকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট। সংঘটিত হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিমিছিল, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সভা—পথ পরিক্রমা শহর থেকে গ্রামবাংলা পর্যন্ত। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে সর্বহারার সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে একসূত্রে গ্রথিত করে লেখা কনক

মুখোপাধ্যায়ের 'মার্কসবাদের আলোকে' ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের মার্কসবাদ ও সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১৩৬২-তে 'পথের পাঁচালী'র মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তারপর তিনি একে একে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন মোট ৩৬টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করে। তার মধ্যে ৮টির কাহিনীকার সত্যজিৎ রায় নিজে। তথ্যচিত্র করেছেন ৫টি, দূরদর্শন চিত্র করেছেন ৩টি। সত্যজিতের প্রতিটি ছবিই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তথাপি বিশেষ দু'চারটি উল্লেখ করছি। যেমন, পথের পাঁচালী, জলসাঘর, দেবী, চারুলতা, শিশুমনের উপযোগী, গুপীগাইন বাঘাবাইন, হীরক রাজার দেশে, জীবনের শেষ প্রান্তে শাখাপ্রশাখা ও আগন্তুক।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের গবেষক ডঃ সুকুমার সেনের জীবনাবসান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলাভাষার ইতিবৃত্ত।

১৩৯৯-এর বৈশাখে সত্যজিৎ রায়-এর জীবনদীপ নিভে গেল। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৪০০ বঙ্গাব্দে সত্যজিৎ রায় স্মরণে 'নন্দন' আয়োজিত বক্তৃতামালা/ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৪০০-র নববর্ষে কয়েকদিন ব্যাপী কলকাতা ময়দানে বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যের শিল্পী-সাহিত্যিক-লোকশিল্পী-সমবেত হয়েছেন অনুষ্ঠানে। শতবর্ষের বঙ্গদেশের ঐতিহ্য সম্বলিত সব কিছু প্রদর্শিত হয়েছে এই সম্মেলনে। মনীষীদের জীবনচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রদর্শিত হয়েছে, বয়নশিল্পের-কুটীরশিল্পের নানাবিধ দ্রব্যাদি কেনাবেচা হয়েছে, সম্মেলনে পাওয়া গেছে বাঙালির প্রিয় মিষ্টি খাবার, মাছের তৈরি খাবার।

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যামিনী রায়ের জীবনাবসানের পর তাঁর বাসভবন পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে সেখানে তাঁর চিত্রকলার স্থায়ী গ্যালারি স্থাপন করেছে।

স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনীকক্ষ এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে, রাজ্য সরকারের তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনীকক্ষ এবং বিড়লা আর্ট অ্যাকাডেমিতে সারা বছর ধরেই চিত্র প্রদর্শিত হয় নানা শিল্পীর হরেকরকম কাজের, লোকায়ত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নগররুচির মিশ্রণে পটুয়াদের চিত্রিত পটের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পশুপাখি, নাচওয়ালী, কলকাতার বাবু কিংবা কোনও সামাজিক ঘটনার ব্যঙ্গচিত্র চিত্রিত হয়েছে। কলকাতা তথা বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে কালীঘাটের পট তার নান্দনিক ভূমিকা পালন করেছে।

সংকলন : অনুশীলা দাশগুপ্ত

রাখীসংগীত

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান —
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান —
বাঙালীর পণ বাঙালীর [illegible] আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান —
(বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ)
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান

রাজনৈতিক পটভূমি

১৩০১ বঙ্গাব্দ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একশ বছর পার হয়েছে। লর্ড কর্নওয়ালিশের এই জমিদারি আইন কৃষক-জনসাধারণের বিক্ষোভকে পুঞ্জীভূত করছে। দেশের নানা প্রান্তে ছোট-বড় আকারে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র আট বছর আগে রচিত হয়েছে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।

বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। আট বছর আগে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৯৩ সালের (১৩০১ বঙ্গাব্দ) কংগ্রেস অধিবেশন থেকে কংগ্রেস ভারতীয় সমাজের মধ্যে তার ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করতে শুরু করেছে।

১৩০৩ : রাঁচির ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে বাংলার পুরুলিয়া পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে সংগঠিত হল আদিবাসী বিদ্রোহ। বনভূমির উপর অধিকারের দাবিতে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে সংগঠিত হল 'উলগুলান'। ব্রিটিশরাজের অকথ্য নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে এই বিদ্রোহকে দমন করা হল। আন্দামানে সেলুলার জেল নির্মাণ।

১৩০৫ : ২৩ জানুয়ারি জন্ম হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর।

১৩০৫-১৩০৭ : বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রকৃতির প্রকোপ ও জমিদারি খাজনা আদায়ের প্রতাপে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ।

এই সময়কালেই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ যাতে বিদ্রোহে ফেটে না পড়ে তার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা ফৌজদারি আইনকে সংশোধন করলেন। অস্ত্র-আইন কঠোরতর করা হল।

১৩০৬ : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য তৈরি করা হল গোপন কমিটি।

১৩০৭ : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ব্রিটিশরাজের নিয়ন্ত্রণের আঘাত নেমে এল। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল রচনা করে প্রতিনিধির সংখ্যা ৭৫ থেকে ৫০-এ কমিয়ে আনা হল। ৫০-এর মধ্যে ২৫ জন মিউনিসিপ্যাল করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, ১৫ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং ১০ জনকে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি নির্বাচন করবেন।

১৩০৯ : ঢাকায় সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হল।

১৩১১ : ইন্ডিয়ান অফিসিয়ালস সিক্রেটস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল।

রিসলের পত্র প্রকাশিত হল। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও আসাম এই নিয়ে আসাম ও পূর্ববঙ্গ নামে একটি আলাদা প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হল।

১৩১১-১৩১৩ : ১৩১১ বঙ্গাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করে সেনেটে নির্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা হ্রাস করা হল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে শুরু করল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভা হল। ষাট হাজার মানুষের স্বাক্ষরসংবলিত স্মারকলিপি পেশ করা হল। বহু প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশিত হল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। প্রকাশিত হল 'বঙ্গদর্শন'।

১৩১৩ : বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হল। ১৬ অক্টোবর এই বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধনের আহ্বান জানালেন বাংলাদেশ জুড়ে। সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই দিন অরন্ধন ও রাখীবন্ধন পালিত হল।

অক্টোবরে ব্রিটিশ সরকার কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার জারি করল।

ভারতীয় বিপ্লবীদের মুখপত্র হিসেবে 'যুগান্তর' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটল।

কলকাতায় কলকাতা করপোরেশনের ঝাড়ুদারদের ধর্মঘট প্রবল আকার ধারণ করে। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রেস কর্মচারীরা সফল ধর্মঘট করে।

১৩১৪ : জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হল। কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরম ও নরমপন্থীদের সংঘাত চূড়ান্ত আকার ধারণ করল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সর্বস্তরে ব্রিটিশরাজকে বয়কটের ডাক দিলেন চরমপন্থীরা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক জনসমাগম ঘটতে লাগল। একমাত্র বাংলাদেশেই ৫৫০টি রাজনৈতিক মামলা করলেন ব্রিটিশ সরকার।

৭ আগস্ট কলকাতার পার্সিবাগানে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল। তখন পতাকাটি ছিল লাল, হলুদ, সবুজের লম্বালম্বি ডোরাকাটা। ভারতে মুসলিম লিগ নামে ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক দলের প্রতিষ্ঠা হল।

'যুগান্তর পত্রিকার' প্রথম প্রকাশ।

১৩১৫ : ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহাত্মক সভা-সমিতি আইন পাশ করলেন। নিষিদ্ধ হল ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি', বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী' সমিতি, ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' ও 'সাধনা সমিতি'।

মজফ্‌ফরপুরে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর বড়লাট কিংসফোর্ডকে হত্যাপ্রচেষ্টা।

১৩১৬ : ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রমুখ জাতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার; আলিপুর বোমা মামলা দায়ের। 'যুগান্তর' সমিতির স্বাধীন পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণা।

১৩১৭ : মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনবলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কিছু সংখ্যক এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিকাংশ প্রতিনিধিকে অগণতান্ত্রিক পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হল।

লন্ডনে মদনলাল ধিংড়ার ব্রিটিশ অফিসার কার্জন উইলিকে হত্যা।

১৩১৮ : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী প্রেস বিল চালু করা হল।

দেশব্যাপী বিক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশরাজ পিছু হটতে বাধ্য হল। বঙ্গভঙ্গ রদ করা হল। জামশেদপুরে প্রথম ভারতীয় ধাতুশিল্প কারখানা নির্মাণ।

১৩২০ : দিল্লিতে ভাইসরয়ের শোভাযাত্রার উপর রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বোমা নিক্ষিপ্ত হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয় মূলত শিখ যুবকদের নিয়ে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ।

'রাজাবাজার বোমা মামলা' শুরু হয়।

১৩২১ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। এটা ছিল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিশ্বজোড়া বাজার দখলের লড়াই। এই বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, জাপান প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয় জনগণের সম্মতি ব্যাতিরেকেই ব্রিটিশরা ভারতের অর্থ ও মানবসম্পদকে এই যুদ্ধে ব্যবহার করেছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী ও রসদ নিয়ে কোমাগাতামারু জাহাজ বজবজ বন্দরে নোঙর ফেলল।

বালেশ্বর জঙ্গলে ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের শেষে বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন নিহত হলেন।

মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লাহ ও ওয়েদুল্লাহর নেতৃত্বে কাবুলে নির্বাসিত অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

১৩২৩ : গান্ধীজির নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা হল।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, লালা হরদয়াল প্রমুখ জাতীয় বিপ্লবীদের উদ্যোগে বার্লিনে 'ভারত স্বাধীনতা কমিটি' গঠিত হল।

সারা ভারত হোমরুল লিগ গঠন; জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের লক্ষ্ণৌ চুক্তি। তিলকের প্রতিষ্ঠিত এই হোমরুল লিগের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হোমরুল বা স্বশাসন অর্জন করা ও সেই উদ্দেশ্যে দেশের জনগণকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তোলা।

১৩২৪ : রাশিয়ার জার শাসনকে পরাভূত করে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

১৩২৫ : মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা। গান্ধীজির 'আমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন' গঠন।

জাতীয় কংগ্রেসে ভাঙন; সারা ভারত লিবারেল ফেডারেশন গঠন। মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার। এর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল।

১৩২৬ : স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সরকারের 'রাওলাট আইন' প্রণয়ন। রাওলাট বিল দুটির একটিতে রাজদ্রোহ মামলা বিচারের জন্য একটি পৃথক বিচারালয় গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল—যে বিচারালয়ে কোনও আপিল করা চলবে না এবং দ্বিতীয় বিলে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়াই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতেই মামলা রুজু করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

রাওলাট আইন-বিরোধী আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা ভারতে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে হরতাল প্রতিপালিত হয়। রাওলাট আইন-বিরোধী আন্দোলনে বহু মানুষ নিহত, আহত ও গ্রেপ্তার হন।

পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা ডাকা হয়। দশ হাজার জনতার এই সমাবেশের উপর কোনও সতর্কীকরণ ছাড়াই কর্নেল ও ডায়ার একটিমাত্র প্রবেশপথ আটকে নির্মমভাবে গুলি বর্ষণ করেন। ঘটনাস্থলেই প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত হন।

বাংলাদেশে এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কলকাতায় এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ-সহ বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক মানুষেরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে ইংরেজের দেওয়া স্যার উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৩২৭ : খিলাফৎ আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা খলিফার নেতৃত্বাধীন তুরস্ক সম্পর্কে সুবিচারের প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তুরস্কের স্বাধীনতা হরণ করল। এই স্বাধীনতার দাবিতেই গড়ে ওঠে খিলাফৎ আন্দোলন। গান্ধীজি এই আন্দোলনের দাবিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করলেন।

১৩২৮ : কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। খিলাফৎ কমিটি কর্তৃক প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলনকে এই অধিবেশন থেকে দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করা হল। সরকারি খেতাব প্রত্যাখ্যান, সরকার মনোনীত সদস্যদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা থেকে পদত্যাগ, সর্বপ্রকার জাঁকজমকপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠান বর্জন, সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ বয়কট, ব্যবহারজীবী ও মামলাকারীদের ব্রিটিশ আদালত বর্জন, আইনসভার নির্বাচন ও ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট ইত্যাদি প্রস্তাব ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

পশ্চিমবাংলার চটকলগুলিতে শ্রমিকরা সংগঠিত ধর্মঘট করল।

ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট এই সময়কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বোম্বাই শহরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুলের যুগ্ম সম্পাদনায় শ্রমিক-কৃষকের মুখপত্র 'নবযুগ' প্রকাশিত হল।

খিলাফৎ কমিটির আহ্বানে সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা অত্যাচারীর হাত থেকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে 'হিজরৎ আন্দোলনে' সামিল হন, হাজারে হাজারে আফগানিস্তানে চলে যান।

১৩২৯ : অসহযোগ আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণ এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বছর ভারতে ৪০০টি শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়। আসামের চা-বাগানে ১২ হাজার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ধর্মঘট করেন। বহু শ্রমিক বরখাস্ত হন। বরখাস্ত শ্রমিকরা চাঁদপুর স্টিমারঘাটে সমবেত হলে পুলিশ তাদের উপর অত্যাচার করে ও জলে ফেলে দেয়। এর প্রতিবাদে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ভারতীয় কর্মচারীরা এবং স্টিমার কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করে।

মেদিনীপুর জেলায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে খাজনা বন্ধের আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইউনিয়ন বোর্ডের বাড়তি করের বোঝার বিরুদ্ধে কৃষকরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন করেন। যুবরাজ ওয়েলসের ভারতে আগমন উপলক্ষে সারা ভারতে হরতাল প্রতিপালিত হয়।

ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্যোগে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ সরকার খিলাফৎ কমিটি ও কংগ্রেস সেবাদলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সারা দেশে গণআইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। সারা ভারতে তিরিশ হাজারেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়।

১৩৩০ : চৌরিচৌরায় অসহযোগ আন্দোলন হিংসাত্মক চেহারা নেওয়ায় গান্ধীজি একতরফাভাবে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

কংগ্রেসে গয়া অধিবেশনে মতানৈক্যের ফলে কংগ্রেস সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের পদত্যাগ।

আইনসভা বয়কটের বিকল্প কর্মসূচি নিয়ে মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে স্বরাজ্য পার্টি গঠন।

ভারতে কমিউনিস্ট-বিরোধী পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হল।

১৩৩১ : কলকাতা, ঢাকা-সহ সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিল।

শচীন সান্যাল ও যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হল।

১৩৩২ : কমিউনিস্ট-বিরোধী কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হল।

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী কিছু কর্মীর 'লেবার স্বরাজ পার্টি অফ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' গঠন। 'লাঙল' নামে মুখপত্র প্রকাশ।

১৩৩৩ : কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল।

কৃষ্ণনগরে কৃষক সম্মেলন। লেবার স্বরাজ পার্টির নাম পরিবর্তন করে পেজেন্টস্ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেঙ্গল গঠন।

১৩৩৪ : ব্রাসেলসে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত মানুষের আন্তর্জাতিক সংঘে ভারতের যোগদান।

১৩৩৫-৩৬ : কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অভূতপূর্ব কুচকাওয়াজ ও মিছিল।

একই সময়ে ওয়ার্কার্স্ ও পেজেন্টস্ পার্টির সর্বভারতীয় অধিবেশন কলকাতায়। ত্রিশ হাজার শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মিছিল কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত হয় ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানায়।

ব্রিটিশরাজের অত্যাচার কঠোরতর করার উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশন গঠন। দেশব্যাপী সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলন, পুলিশের লাঠির আঘাতে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু।

মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালিতে ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুত্থান।

১৩৩৬ : কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। মুজফ্‌ফর আহমদ, এস বি ঘাটে, এস এ ডাঙ্গে, পি সি যোশী, ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী, বি এফ ব্রাডলে, ফিলিপ স্প্রাট এবং এইচ এল হাচিনসন প্রমুখ গ্রেপ্তার। এই মামলা চলে সাড়ে চার বছর এবং মামলা চালাতে ব্রিটিশ সরকারের ব্যয় হয় ১,৬০,০০০ পাউন্ড।

লাহোর কংগ্রেসে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর পরিবর্তে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব পাশ।

পুঁজিবাদী বিশ্বে এই সময় তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা এবং সংকট দেখা দেয়। এই মন্দা চলে প্রায় ১৩৩৯ সাল অবধি।

১৩৩৭ : ২৬ জানুয়ারি প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন। গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা, লবণ সত্যাগ্রহ ও ডান্ডি অভিযান।

প্রথম গোল টেবিল বৈঠক।

গাড়োয়ালি সৈন্যদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষুব্ধ জনতার গুলিবর্ষণে অস্বীকৃতি।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। বিনয়, বাদল, দীনেশের সশস্ত্র সংগ্রাম—রাইটার্সে বীর যুবকদের মরণপণ 'অলিন্দযুদ্ধ'। বিনয় ও বাদলের স্বেচ্ছামৃত্যু, দীনেশের ফাঁসি।

১৩৩৮ : গান্ধী-আরউইন চুক্তি। ভগৎ সিং-সহ দুজন বিপ্লবীর ফাঁসি।

১৩৩৯ : গান্ধীজির নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলন। ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস বিপ্লবীদের হাতে নিহত।

চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ।

বীণা দাসের গভর্নর অ্যান্ডারসনের উদ্দেশ্যে সিনেটে গুলিবর্ষণ।

১৩৪১ : ২ আগস্ট হিটলারের উত্থান।

মেদিনীপুর শহরের ফুটবল খেলার মাঠে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ পুলিশের গুলিতে নিহত।

মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি।

১৩৪২ : নতুন ভারত শাসন আইন—আংশিক স্বায়ত্তশাসন।

জার্মানিতে হিটলারের উত্থান।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কংগ্রেসে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান।

১৩৪৩-৪৪ : সারা ভারত কিষাণসভা ফ্যাসিবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ ও ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গঠন।

ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতের যোগদান। ভারতে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের ঢেউ।

১৩৪২-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচন। প্রাদেশিক সরকারগুলিতে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন।

গভর্নর বিশেষ ক্ষমতাবলে মন্ত্রীদের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ কোনও রকম বাধা সৃষ্টি করবেন না—এই প্রতিশ্রুতি বৃটিশরাজের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। ব্রিটিশ সরকার একতরফাভাবে নতুন সংবিধান বলবৎ করে। এর বিরুদ্ধে সারা ভারতে ১ এপ্রিল পরিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। জুলাইতে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কিছু কিছু প্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৩৪৫—৪৬ : পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচন। গান্ধীজির পট্টভি সীতারামাইয়াকে সমর্থন।

এপ্রিলে সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা। মে মাসে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন।

৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ ও প্রত্যুত্তরে ফ্রান্সের জার্মানি আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে ফ্যাসিবাদী-নাৎসী জোটের এই যুদ্ধ প্রাথমিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী।

ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতীয় জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করে ভারতকে এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে জড়িয়ে ফেলা হল।

১৩৪৭-৪৮ : বোম্বাইয়ে নব্বই হাজার শ্রমিক যুদ্ধবিরোধী মিছিলে অংশগ্রহণ করলেন।

মুসলিম লিগের লাহোর কংগ্রেসে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হল।

গান্ধীজির আহ্বানে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে বহু সহস্র মানুষের কারাবরণ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহ-অন্তরীণ অবস্থা থেকে অন্তর্ধান এবং বিদেশ যাত্রা।

১৩৪৯ : রেঙ্গুনে ব্রিটিশ শক্তির পতন।

ভারতে ক্রিপস্ কমিশন ও ক্রিপস্ প্রস্তাব।

ক্রিপস্ প্রস্তাবে দেশবাসীর অসম্মতি।

গান্ধীজির নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আহ্বান।

অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'বিদ্যুৎ বাহিনী' মেদিনীপুরের এক বড় অঞ্চল দখল করে 'তাম্রলিপ্ত সরকার' প্রতিষ্ঠা করে। বৃটিশ সরকারকে এই অঞ্চলে নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়।

গান্ধীজি-সহ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার। জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতে আগমন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন।

১৩৫০-৫১ : পঞ্চাশের মন্বন্তর। বাংলাদেশ জুড়ে মহামারী এবং মজুতদার-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

এই বছর দুটি যেন মানুষের জীবনে দুঃসহ অভিজ্ঞতার ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছে। আকাল-মহামারী-অবক্ষয়-মৃত্যু—এই বুঝি তার বিধিলিপি, সর্বাত্মক ধ্বংসের কিনারায় এসে পৌঁছেছে গোটা দেশ ও সমাজ—তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

বাংলার কমিউনিস্টরা এই পরিস্থিতিতে রিলিফের কাজে নেমে পড়েন, খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' তৈরি হয়। শিল্পী-সাহিত্যিকরা তুলির আঁচড়ে-কলমের ডগায় সেই যুগকে প্রতিফলিত করেন।

গণনাট্যের শিল্পীরা নাটক ও গানের মধ্য দিয়ে সারা ভারতে রিলিফ সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সারা ভারত কৃষকসভার 'তেভাগা প্রস্তাব' পাশ।

'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হল।

১৩৫২-৫৪ : সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজের বার্লিন দখল। ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়। কমিউনিস্টদের এই বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে কলকাতায় লালঝান্ডার বিশাল মিছিল।

হিরোসিমার আণবিক বোমা বিস্ফোরণ। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড়।

শান্তির স্বপক্ষে আন্দোলন। বাংলায় কমিউনিস্টরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। সভা, সমিতি, স্বাক্ষর সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টি হল, ছবি আঁকলেন শিল্পী, গান-নাটক নিয়ে পথে নামলেন গণনাট্যের শিল্পীরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল। ইংল্যান্ডের নির্বাচনে রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শ্রমিক দলের জয়।

২৫ অক্টোবর সারা ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দিবস পালন, ডক শ্রমিকদের জাহাজে সামরিক সম্ভার তুলতে অস্বীকার।

দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের শাহনওয়াজ, শেগল ও ধীলনের বিচার শুরু।

আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছাত্র ধর্মঘট।

'রশিদ আলি দিবস'—আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন আব্দুর রশিদের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের উত্তাল বিক্ষোভ। সারা বাংলায় চারদিনব্যাপী লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট, মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ।

ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম লিগের ডাকে ক্যাপ্টেন রশিদের মুক্তির দাবিতে একটি ছাত্রসভা হয়। এরপর দলমতনির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রের একটি শোভাযাত্রা কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ার অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশ সেই মিছিলে নির্মমভাবে লাঠিচালনা করে।

এর প্রতিবাদে পরদিন ওয়েলিংটনে সর্বদলীয় সভা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতায় ট্রাম, বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়. দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, বিক্ষুব্ধ জনতার বিরুদ্ধে পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতাও প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়, পথে-পথে ব্যারিকেড গড়ে তোলে, মিলিটারি লরিতে আগুন দেয়।

এই ঘটনায় ১২ ফেব্রুয়ারি ৮ জন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৫ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সর্বদলীয় শান্তি মিছিল হয়। পরবর্তী কয়েকটি দিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ, ধর্মঘট ও মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে। হুগলি, হাওড়া, ২৪-পরগনা ছাড়াও সুদুর রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকা থেকেও এই প্রতিবাদের জোয়ারে সামিল হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।

বোম্বাইতে নৌ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বোম্বাই ও করাচিতে বৃটিশ সৈনাদের নৌ-সেনাদের সশস্ত্র সংগ্রাম হয়।

ধর্মঘটী নৌ-সেনাদের সমর্থনে দেশজোড়া বিক্ষোভ দেখা দেয়। বোম্বাইতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়, মিলিটারি গুলিচালনা করে। বোম্বাইতে নৌ-ধর্মঘট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌ-ধর্মঘট শুরু হয় কলকাতা, করাচি ও মাদ্রাজে।

২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় নৌ-সেনাদের সমর্থনে শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

এই বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পে সংগঠিত শ্রমিক ধর্মঘট হয়। চা-বাগান থেকে চটকল সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

এই সময়কালেই বাংলাদেশের সর্বত্র বর্গাচাষীদের তেভাগার দাবিতে লড়াকু কৃষক-আন্দোলন শুরু হয়। কাকদ্বীপ, নামখানা, হুগলি, দিনাজপুরে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। জোতদারের গুণ্ডাবাহিনী ও নির্মম পুলিশি আক্রমণের মোকাবিলা করে চাষীরা খামারে ধান তোলে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ এই তেভাগার লড়াইয়ে জীবন দেন।

১৩৫৪ সালের নির্বাচনে প্রথম কমিউনিস্টরা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়। রেল শ্রমিক কেন্দ্র থেকে জ্যোতি বসু ও চা-বাগিচা থেকে রতনলাল ব্রাহ্মণ কমিউনিস্ট সদস্য হিসেবে বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য এই সময়কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বহু বিখ্যাত চিত্রকর, শিল্পী, সাহিত্যিক এ সময় লড়াইয়ের ময়দানে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাহিত্য রচনা করেন ও দক্ষ প্রচারক-সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৩৫৩-৫৪ : ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর ডাক দেওয়া হয়। ওইদিনই কলকাতা জুড়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের উন্মত্ত সমর্থকদের তাণ্ডবে কলকাতার জীবনস্পন্দন প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। এই নির্মম হত্যালীলায় বহু মানুষ হারান তাঁদের স্বজন, সম্পত্তি, সম্মান, বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শান্তি ও সম্প্রীতির সপক্ষে আবেদন জানানো হয়।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার পর বোম্বাই, নোয়াখালি, গড়-মুক্তেশ্বর, বিহার-সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে। অবশেষে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক মরণকামড় দেয়। পাঞ্জাবের ১৪টি জেলায় সম্প্রদায়ের ধূয়া তুলে বীভৎস হত্যালীলা সংগঠিত হয়। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে অন্তত ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ প্রাণ হারান। পাঞ্জাবের বুকে ৬০ লক্ষ মুসলমান ও ৪০ লক্ষ হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তু সৃষ্টি হয়। (মডার্ন ইন্ডিয়া)

লর্ড অ্যাটলি ১৩৫৫-র জুন মাসের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন।

১৩৫৫ : গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড মাউন্টব্যাটেন নির্বাচিত হন এবং ভারত বিভাগের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। কংগ্রেস এই মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুমোদন করে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হয়।

১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ভারত ও পাকিস্তান নামে এই উপমহাদেশে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও জওহরলাল নেহরু প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

৪৭-এর ২১ নভেম্বর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন হয়।

ওইদিন কৃষক সভা জমিদার প্রথা উচ্ছেদ ও তেভাগা আইনের দাবিতে ও নবগঠিত আইনসভাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য শোভাযাত্রা সংগঠিত করে। কিন্তু পুলিশ এই শোভাযাত্রার পথ রোধ করে।

'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা বিল' নামক অগণতান্ত্রিক দমনমূলক বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিশেষ ক্ষমতা বিল প্রত্যাহৃত হল।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

হিন্দু মহাসভার নাথুরাম গড়সের গুলিতে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজির আকস্মিক জীবনাবসান। দেশজুড়ে শোক, অরন্ধন।

১৩৫৬-৫৮ : ২৬ মার্চ, ১৯৪৮ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হল।

জ্যোতি বসু, মুজফফর আহমেদ-সহ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার। 'নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স-বিরোধী দিবস পালিত হল ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষক-বুদ্ধিজীবীর যৌথ আহ্বানে।

১ সেপ্টেম্বর ছাত্র-শিক্ষক ধর্মঘট হয়।

সেপ্টেম্বরেই পোর্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ধর্মঘট হয়।

৯ মার্চ, ১৯৪৯ সারা ভারত রেল ধর্মঘট, উদ্বাস্তু বিক্ষোভ এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

২৭ এপ্রিল, ১৯৪৯ রাজবন্দিদের রাজনৈতিক মর্যাদার দাবিতে মহিলা মিছিলের উপর কলকাতার বৌবাজারে পুলিশের গুলিচালনায় চারজন মহিলা নিহত হন।

নভেম্বর ১৯৪৮-এ কাকদ্বীপ, সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে 'লাঙল যার জমি তার' লড়াই চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। অহল্যা, বাতাসী-সহ বহু কৃষক এই লড়াইতে জীবন বিসর্জন দিলেন।

কলকাতায় শান্তি সম্মেলনের প্রথম সমাবেশ।

১৩৫৯-৬০ : কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতা জুড়ে আন্দোলন।

পূর্ববঙ্গে সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৫১ জন কংগ্রেস ও ২৮ জন কমিউনিস্ট সদস্য নির্বাচিত।

তেনজিং ও হিলারি কর্তৃক এভারেস্ট বিজয়।

কোচবিহারে পুলিশের গুলি চালনায় মহিলা সহ আন্দোলনকারীরা নিহত।

১৩৬১-৬৩ : ফরাসি চন্দননগর ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হল। ভারতের প্রদেশগুলি ভাষাভিত্তিতে পুনর্বিন্যস্ত হল। বাংলাদেশের পূর্ণিয়া জেলা বিহারের সঙ্গে যুক্ত হল।

১৩৬৪-৬৭ : দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস—১৫২ ও কমিউনিস্ট পার্টি ৪৬টি আসন লাভ করল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

মাপ ও ওজনের মেট্রিক ব্যবস্থা চালু হল।

বোম্বে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বিভক্ত হল।

১৩৬৮-৬৯ : সারা বাংলা জুড়ে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন, পুলিশের গুলিচালনা।

পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ।

নিরাপত্তা আইনে জ্যোতি বসু সহ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার।

তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কংগ্রেসের ১৫৭ ও কমিউনিস্টদের ৫০টি আসন লাভ।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভাজন, সি পি আই (এম) গঠিত।

১৩৭০-৭৩ : জওহরলাল নেহরুর জীবনাবসান। লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

কেরোসিন ও খাদ্যের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গব্যাপী আন্দোলন। নুরুল আমিন, আনন্দ হাইত-সহ পুলিশের গুলিচালনায় ৭০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জীবনাবসান। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শপথ গ্রহণ। উত্তাল কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন।

১৩৭৪-৭৫ : পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসে ভাঙন। অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস গঠন। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস ১২৭টি আসন পেল এবং কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিগুলি পেল ১৫৩টি আসন। অজয় মুখার্জি নেতৃত্বে দলের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হল। জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব পেলেন।

১৩৭৬-৭৭ : নকশাল বাড়িতে কৃষকদের উপর গুলিচালনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে চারু মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জি, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে 'নকশাল আন্দোলন' শুরু হল। নকশাল আন্দোলনে ব্যক্তিসন্ত্রাস ও শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের পথে সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্লোগান দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের কর্মীরা বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের মূর্তি ভাঙাকেও তাদের কাজ হিসেবে বেছে নিল।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ভাঙন ধরল। অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস সহ আরও কয়েকজন সদস্য যুক্তফ্রন্ট থেকে সরে এলেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল। স্পিকার বিজয় ব্যানার্জি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ঐতিহাসিক রুলিং জারি করলেন। সরকার গঠনের নামে দল-বদলের ষড়যন্ত্র শেষে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়কাল জুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত হতে শুরু করল।

বিধানসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের দলগুলি যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। কংগ্রেস মাত্র ৫৫টি আসনে জয়ী হল। অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী এবং জ্যোতি বসুকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠিত হল। এই মন্ত্রিসভারও পতন ঘটানো হল অগণতান্ত্রিকভাবে।

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হল। নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসু নিহত হলেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের দলগুলি পৃথক পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সি পি আই (এম)কে সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হল না। সমঝোতার ভিত্তিতে ডেমোক্রাটিক কোয়ালিশন সরকার শপথ গ্রহণ করল। তিনমাস পূর্ণ হওয়ার আগেই মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। এই মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অজয় মুখার্জি ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার।

সারা ভারতে কংগ্রেস আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস নামে দুই-ভাগে বিভক্ত হল।

১৩৭৮-৭৯ : লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম, শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী।

পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর আক্রমণ অব্যাহত।

পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ২১৬টি আসন লাভ করল। সি পি আই (এম)সহ বিরোধীরা নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তুলে বিধানসভা বয়কট করলেন।

নতুন রাজ্য মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মণিপুর গঠন করা হল। সিদ্ধার্থশংকর রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

১৩৮০-৮২ : পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর সন্ত্রাস অব্যাহত। কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত আন্দোলনকেই দমন-পীড়নের শিকার হতে হয়। সারা ভারতবর্ষেই গণতন্ত্রের উপর আঘাত নেমে এল।

সারা ভারতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠল।

ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সরকার আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করল। প্রেস সেন্সরশিপের নামে সমস্ত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল। 'মিসা' আইন জারি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হল।

জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দেশজুড়ে সর্বাত্মক বিক্ষোভ শুরু হল। কলকাতায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঐতিহাসিক মিছিল অনুষ্ঠিত হল।

১৩৮৩-৮৪ : লোকসভা ভেঙে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ঘোষণা করলেন। লোকসভায় কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটল, মোরারজী দেশাইয়ের

নেতৃত্বে জনতা সরকার কেন্দ্রে শপথ গ্রহণ করল। সরকার দেশ জুড়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করল।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হল। বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি ও রাজনৈতিক কারণে কর্মচ্যুত মানুষদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ ছাড়া বামফ্রন্টের ৩৬-দফা কর্মসূচি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

বর্গাদারদের দাম নথিভুক্ত করার লক্ষ্যে 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচি ঘোষিত হল।

১৩৮৫-৮৬ : মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। গণতন্ত্রকে তৃণমূলে প্রসারিত করার লক্ষ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আইন প্রণীত হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পঞ্চায়েত গ্রাম, ব্লক ও জেলা-পরিষদ স্তরে কাজ শুরু করে। এই বছর শারদোৎসবের আগেই এক বিরাট বন্যা সারা পশ্চিমবঙ্গকে প্লাবিত করল। বিভিন্ন গণসংগঠন ও পঞ্চায়েতগুলি যৌথভাবে এই বন্যা প্রতিরোধে ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণে উদ্যোগী হল। প্রশাসনিক উদ্যোগের সঙ্গে গণউদ্যোগের মিলনে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা দিল। যা ছিল যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরবর্তী ছবি, তেমনভাবে একজন মানুষকেও গ্রাম থেকে শহরে ভিক্ষা করতে আসতে দেখা গেল না। গ্রামের অধিকাংশ মানুষকেই পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়। এর ফলে পরবর্তী বছরে পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়।

১৩৮৬-৮৭ : প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়ে পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি চরণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২৩ দিন বাদে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দেন। সপ্তম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

১৩৮৮-৮৯ : পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট আরও বেশি আসন পায়, দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায়ও মুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু।

পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তান আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী চেহারা নেয়।

১৩৯১-১৩৯৪ : স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মার নেতৃত্বে দুজন সোভিয়েত মহাকাশযাত্রীসহ মহাকাশযান সয়ুজ টি-১১ মহাকাশে অবতরণ করে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজ বাসভবনে নিহত হন। সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। কোথাও কোথাও শিখদের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ সংগঠিত হয়। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

দার্জিলিং-এ গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু হয়। দু-বছর এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলে, এর ফলে দার্জিলিং-এর পর্যটন শিল্পে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়।

রাজস্থানে রূপ কানোয়ারের 'সতীদাহ' সারা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সতীপ্রথা-বিরোধী আইন লোকসভায় পাশ হয়।

১৩৯৫-৯৭ : নবম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বামপন্থী দলসমূহ ও বি জে পি-র সমর্থনে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু।

বাবরি মসজিদ-রামমন্দির বিতর্ক ঘিরে বি জে পি ভি পি সিং সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। ভি পি সিংহ পদত্যাগ করেন। চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৩৯৮-৯৯ : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচনের মাধ্যমে চতুর্থবারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত নবম লোকসভা নির্বাচন। দুই পর্বে এই লোকসভা নির্বাচনে প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর শ্রীপেরামবুদুরে রাজীব গান্ধী বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন।

নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকার সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বামপন্থী শক্তির সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

'৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িক বি জে পি ও তার সহযোগীদের চক্রান্তে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়।

সারা দেশজুড়ে এর প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত হলেও কলকাতার কয়েকটি স্থানে বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সম্প্রীতির সপক্ষে মিছিল, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় অস্কার পুরস্কার লাভ করেন।

বিশ্ববন্দিত শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের জীবনাবসান ঘটে।

১৪০০ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নতুন শতককে স্বাগত জানিয়ে, বিগত শতাব্দীকে স্মরণ করে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

পঞ্চায়েত ও পুরসভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ আইন পাশ ও তার ভিত্তিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন।

সংকলন : মন্দিরা ঘোষাল

শতবর্ষ : স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান

প্রাক্-কথন

সতত প্রবহমান কালের যাত্রাপথে ইতিহাস রূপান্তরিত হচ্ছে এক অনিবার্য ভাঙা-গড়ার দ্বন্দ্ব সংঘাতে। যার প্রধান রূপকার মানুষ। সভ্যতার অগ্রগমনে মানবমনের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, কৌতূহল ও প্রকৃতিকে জয় করার অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে যে লড়াই-সংগ্রামের সূত্রপাত তা থেকেই নতুন পৃথিবীকে খুঁজে পাই আমরা। ইতিহাসের ঘটমান সত্যকে অকৃপণভাবে তার বুকে স্থান করে দেয় মহাকাল। এ দিক থেকে প্রতিটি মুহূর্ত, দিন, মাস, বছর তথা এক শতাব্দীর গুরুত্ব কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না। যদিও অখণ্ড কালপ্রবাহে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়কে আলাদা করে দেখার বা ভাবার মধ্যেও একটা অপূর্ণতা বা বিচ্ছিন্নতা থেকে যেতে বাধ্য। কারণ অতীতের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যতের স্বপ্নভূমিতেই গড়ে ওঠে বর্তমানের সৌধ ইমারত। তাই সাময়িক বিচারে যাকে মনে হয় 'চূড়ান্ত বর্তমান' পরক্ষণেই তা হয়ে পড়ে পুরাতন-আপেক্ষিক।

এ সব সত্ত্বেও মানুষ তার জীবনপরিধিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করতে চায়। মৃত্যুভোলা গানে সৃষ্টির আবেগে এগিয়ে চলে শেষ পরিণতির দিকে। প্রকৃতির নিয়মেই একদিন তার বিদায়ের ডাক আসে। পেছনে পড়ে থাকে সাধনার ফসল। যাকে স্থান করে দেয় মহাকালের সোনার তরী। এভাবেই মানুষ বেঁচে থাকে তার পরবর্তী প্রজন্মের রক্তস্রোতে, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতির মানসপটে অধীত জ্ঞান সাধনার উত্তরাধিকার নিয়ে।

সামনের দিকে সঠিকভাবে চলার পথে তাই অতীত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান সত্যদ্রষ্টা চলিষ্ণু জীবনের এক মহত্তর শর্ত। দায়বদ্ধতা।

আমরা সৌভাগ্যবান কারণ একই জীবনকালে যেমন ১৪০০ শতাব্দীর বিদায়কে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটছে তেমনই নতুন আর এক শতাব্দীর যাত্রাপথেরও সাক্ষী। এই প্রাসঙ্গিকতা মনে রেখেই ১৪০০ শতাব্দীর পূর্তি বছরে যে-সব মনীষীর শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে এবং যাঁরা বাংলা দেশে শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, শিক্ষা, রাজনীতি ও জাতীয় চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের নির্বাচিত কয়েকজনের সৃষ্টি ও কর্মসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল। সময়-কালের তথ্য নির্ধারণে জন্ম ও মৃত্যুবর্ষ উল্লেখ করায়—দিন ও মাসের কিছু ব্যবধান থেকে যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিপাদ্য বিষয়টি সংকলিত হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে না। তবু পাঠক-সমাজের কাছে অনুরোধ, অনিচ্ছা- সত্ত্বেও যদি কোনও বড় রকমের ত্রুটি ঘটে তা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। এ ব্যাপারে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, নির্বাচিত এই তালিকায় যাঁরা যুক্ত হলেন তাঁদের বাইরেও স্বাভাবিকভাবে রয়ে গেলেন অনেকেই—জায়গা ও সময়ের অভাবে তাঁদের স্থান দেওয়া গেল না—ভবিষ্যতে সুযোগ হলে সে চেষ্টা করা যাবে।

এই সংকলনের দ্বিতীয় পর্বে যুক্ত হল এই শতকে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাসনন্দিত প্রতিষ্ঠান ও ভবনের শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-বিজ্ঞান এবং দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় জাগরণে রয়েছে যাঁদের অবিস্মরণীয় অবদান। এ ক্ষেত্রেও বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করতে পারলে ভালো হত—সময় ও স্থানাভাবে যা দেওয়া সম্ভব হল না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন—বিভিন্ন ব্যক্তিকে যে-সব শাখায় বিভাজন করা হয়েছে তাও চূড়ান্ত নয় কারণ কোনও সৃষ্টিশীল মহৎ ব্যক্তিই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে কোনও একটি নির্দিষ্ট শাখায় সীমাবদ্ধ রাখেননি, সৃষ্টির বহুমুখী শাখায়ই ঘটেছে তাঁদের অবাধ বিচরণ। তাই এ বিভাজনও কেবলমাত্র সংকলনের সুবিধার্থে।

সংকলক

সাহিত্যিক

অমল হোম : ১৮৯৩—১৯৭৫

জন্ম ২৪-পরগনার মজিলপুর। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক। ছাত্রাবস্থায়ই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন। এর পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলি' পত্রিকায়, ১৯১৮ খ্রিঃ লাহোরের 'দি পাঞ্জাবি' ইংরেজি পত্রিকায় এবং কালীনাথ রায়ের 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯১৯ খ্রিঃ 'কালা আইনে'র গোলমালে কালীনাথ রায় কারারুদ্ধ হলে তিনি ওই পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রিঃ এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর 'দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট' দৈনিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পালের সহকারীরূপে যোগ দেন। ওই সময় পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২১ খ্রিঃ তিনি কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' কাগজের সহ-সম্পাদক হন। ১৯২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন। ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে কর্পোরেশনের মেয়র দেশবন্ধুর পরিকল্পিত একটি মিউনিসিপ্যাল পত্রিকার দায়িত্ব তিনি ও সুভাষচন্দ্র বসু গ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ থেকে ৪৯ খ্রিঃ পর্যন্ত এর সম্পাদনার কাজ করেন। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার প্রথম দিকে তিনি রবিবাসরীয় বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯২০ খ্রিঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া সোশ্যাল সার্ভিস কনফারেন্সে' মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনিই ১৯৩১ খ্রিঃ কলকাতায় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেন। ১৯৪৯ খ্রিঃ রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টর অফ পাবলিসিটির পদে যোগ দেন। তিন বছর পরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের চিফ ইনফর্মেশন অফিসার নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতিভাজন ও স্নেহধন্য ছিলেন। রবীন্দ্র-জীবনের বহু অপ্রকাশিত খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি একজন অথরিটি এবং কবির বহু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ও তথ্যের সংগ্রহ তাঁর নিজস্ব সম্পদরূপে সংরক্ষিত আছে। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে অল ইন্ডিয়া রেডিওর রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর প্রধানরূপে তিনি দিল্লিতে যোগ দেন।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ', 'রামমোহন রায় অ্যান্ড হিজ ওয়ার্কস', 'সাম আসপেক্টস্ অফ মডার্ন জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া' প্রভৃতি। তিনি রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ১৮৯৪—১৯৬১

জন্ম পিতার মাতুলালয়ে হুগলির শ্রীরামপুরে। শৈশব কাটে পিতার কর্মস্থল বারাসতে। বৈচিত্র্যে ঠাসা জীবন। ১৯০৯ খ্রিঃ ইংরেজি ও সংস্কৃতে প্রথম হয়েও দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে দু বছর আই এস সি পড়েন। পরের বছর ১৯১২ খ্রিঃ রিপন কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স ও রসায়ন এবং গণিত নিয়ে বি এ পড়া শুরু করেন। ইংরেজিতে ভালো নম্বর পেলেও রসায়নে ফেল করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলম্বো থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯১৬ খ্রিঃ বি এ, ১৯১৮ খ্রিঃ এম এ পাশ করেন। ১৯২০ খ্রিঃ অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন।

কর্মজীবনে প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে এক বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯২২ খ্রিঃ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন। এখানেই বহু বছর কাটে। ১৯৩৮-৪০ খ্রিঃ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন পদে কাজ করেন।

১৯৪৭ খ্রিঃ এক বছরের জন্য যুক্তপ্রদেশ সরকারের লেবার এনকোয়ারি কমিটির সদস্য হন। ১-১০-৫৪ থেকে ৩০-৯-১৯৫৯ খ্রিঃ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিঃ ইকনমিক ডেলিগেট হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। এই বছরেই হল্যান্ডের হেগ শহরে ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সমাজতত্ত্ব বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর পদে কাজ করার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯-১০-১৯৫৩-১৪-৫-১৯৫৪ খ্রিঃ সেখানে 'Sociology of Culture' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯৫৫ খ্রিঃ বান্দুং সম্মেলনে যোগ দেন এবং তিনদিন এশিয়ার দেশগুলির ইকনমিক কো-অপারেশন সেমিনারে বক্তৃতা করেন। এই বছরই ক্যান্সার রোগের সূচনা হয়। ১৯৫৬ খ্রিঃ চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যান। অবসর জীবন তিনি দেরাদুনে কাটান। কলকাতায় মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত ইংরেজি গ্রন্থ ৯টি ও বাংলা গ্রন্থ ১১টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'Basic Concepts of Sociology', 'On Indian History', 'Views and Counter Views', 'Diversities', 'আমরা ও তাঁহারা', 'রিয়ালিস্ট', 'চিন্তয়সী', 'মনে এলো', 'ঝিলিমিলি', 'সুর ও সঙ্গীত' প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের সংকলন। এ ছাড়া তাঁর রচিত উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়' পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। অর্থনীতির প্রয়োগে মার্কসীয় পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। অর্থনীতির অধ্যাপনায় সারা জীবন কাটালেও এ বিষয়ে কোনও মূল গ্রন্থ রচনা করেননি। উল্লেখ্য যে তাঁর এবং অধ্যাপক ধারাকমল মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের যে বিভাগের পত্তন ঘটেছিল, যা সাধারণ 'লখনউ স্কুল' বলে পরিচিতি লাভ করেছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বন্ধ করে প্রাচ্যের ঐতিহ্যের নিরিখে সারা দেশে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা গড়ে তোলা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৮৯৪-১৯৫০

পল্লীবাংলার মরমী কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম চব্বিশ পরগনার মুরারী'পুকুর মাতুলালয়ে। ১৯১৪ খ্রিঃ প্রবেশিকা, ১৯১৬ খ্রিঃ আই এ এবং ১৯১৮ সালে রিপন কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। বিভূতিভূষণের বাল্য ও কৈশোর কাটে চরম দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যে। তিনি এম এ ও ল ক্লাশে ভর্তি হয়েও আর্থিক কারণে পড়া অসমাপ্ত রেখে প্রথমে জাঙ্গিপাড়ার স্কুলে এবং পরে সোনারপুর হরিনাভিতে শিক্ষকতা করেন। প্রথমে গোরক্ষিণী সভার প্রচারক, পরে খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে সেক্রেটারি, গৃহশিক্ষক ও এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররূপে ভাগলপুর সার্কেলে কাজ করলেও মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ২৪-পরগনার গোপালনগর স্কুলে যুক্ত ছিলেন। পল্লী প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'উপেক্ষিতা' নামক গল্প জানুয়ারি ১৯২২ খ্রিঃ 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'পথের পাঁচালী' ভাগলপুরে রচিত। শেষ জীবনে অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় কাটাতেন। মাত্র ২১ বছরের সাহিত্য সাধনায় তিনি বহু উপন্যাস, দিনলিপি, ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, ইছামতী, কিন্নরদল, দেবযান, আদর্শ হিন্দু হোটেল, বিপিনের সংসার, যাত্রা বদল প্রভৃতি। কিশোরদের জন্যে রচিত—বনে পাহাড়ে, মরণের ডঙ্কা বাজে, চাঁদের পাহাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখায় গ্রাম্য জীবনের বাস্তব রূপ ধরা পড়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য-স্বপ্ন-আশা তাঁকে সৃষ্টির আনন্দে সব সময়েই উজ্জীবিত রাখত। শুধু পল্লীপ্রকৃতি নয় অরণ্যপ্রকৃতিও তাঁর উপন্যাসে অপরূপ সজীবতা লাভ করেছে। 'আরণ্যক' গ্রন্থে প্রকৃতির এক অপরিচিত রূপ লীলায়িত হয়েছে। তাঁর 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থ ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বিভূতিভূষণের বহু গ্রন্থ সাহিত্য আকাদেমি সংস্থা ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছে। মৃত্যুর পর ১৯৫১ খ্রিঃ 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তাঁকে রাজ্য সরকার প্রবর্তিত রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : ১৮৯৩-১৯৭৪

জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরে। বাংলা ভাষার অনুবাদ সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নুট হ্যামসন, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ বিদেশি সাহিত্যিকদের তিনি বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অসমের জোড়হাটে মুহুরির কাজ করার সময় তিনি সেখানে সাহিত্য সংগঠন গঠন করেছিলেন। ওই সময় থেকেই তিনি কলকাতার পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরী ও যোগেন্দ্রনাথের (গুপ্ত) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ১৯১৮ খ্রিঃ প্রথম কলকাতায় এসে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্রে' চাকরি নেন। দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কলকাতার সমস্ত রকম সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁকে কল্লোল যুগের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে গণ্য করা হয়। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থ—'চলমান জীবন'। বহু সাহিত্য, প্রতিষ্ঠান পত্রিকা দপ্তর ও সাহিত্য মজলিশের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। জামশেদপুর চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। সারা জীবনে তিনি নিজে লিখেছেন প্রচুর এবং নবীন লেখকদেরও উৎসাহ জুগিয়েছেন আন্তরিকভাবে।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত : ১৮৯৩-১৯৮৬

জন্ম উখড়া, বর্ধমানে। স্বদেশপ্রেমিক কবি। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক ছিলেন। 'সাঁজের প্রদীপ', 'মন্দিরের চাবি' ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় (১৯৩১ সালে)।

রমেশচন্দ্র সেন : ১৩০১-১৩৬৯ বঃ

জন্ম ও কর্মস্থল কলকাতায়। প্রাথমিক পাঠ সংস্কৃত। ১৯১৭ খ্রিঃ ইংরেজিতে অনার্স পাশ করেন এবং পৈতৃক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শুরু

করেন। তিনি সাহিত্য সেবক সমিতি নামে একটি সাহিত্যচক্রের প্রতিষ্ঠা করেন (১২ আষাঢ় ১৩১৮ বঃ)। রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'শতাব্দী' (১৩৫২ বঃ), বিখ্যাত উপন্যাস 'কুরপালা' ও 'গৌরীগ্রাম'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মালঞ্চীর কথা, চক্রবাক, কাজল, পূব থেকে পশ্চিম, সাগ্নিক। ছোট গল্প—মৃত ও অমৃত, তারা তিন জন, সাদা ঘোড়া, রাজার জন্মদিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। রাজনৈতিক কার্যকলাপেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

শৈলবালা ঘোষজায়া : ১৮৯৩-১৯৭৩

মহিলা লেখকদের মধ্যে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রায় ৫২ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শেখ আন্দু, নমিতা, জন্ম অপরাধী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য।

শিল্পী ও অভিনেতা

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৮৯৩-১৯৪৩

জন্ম কালিকাপুর— চব্বিশ পরগনায়। প্রখ্যাত অভিনেতা। জমিদার বংশে জন্ম। প্রথম জীবনে অঙ্কন শিল্পী ছিলেন এবং সেই সূত্রে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি এবং আর্ট থিয়েটারে যোগ দেন। পরে ওই দুই প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন চরিত্রে এবং নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৩ খ্রি. স্টারে কর্ণার্জুন নাটকে বিকর্ণের ভূমিকায় তাঁর প্রথম মঞ্চে অবতরণ। ১৯৪২ খ্রি. অবসরগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই সুদর্শন ও সুকণ্ঠ অভিনেতা চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দে : ১৮৯৩-১৯৬২

জন্ম কলকাতায়। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে চোদ্দ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। ষোল বছর বয়সে শশিমোহন দে-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। ক্রমে টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরোদিয়া কেরামৎউল্লা, ওস্তাদ বাদল খাঁ, শিবসেবক মিশ্র, দবীর খাঁ, দর্শন সিং, জমিরুদ্দীন খাঁ, কীর্তনীয়া রাধারমণ দাস প্রমুখ গুণীদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। গ্রামোফোন রেকর্ড, সিনেমা, বেতার, রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদিতে বিভিন্ন রীতির সঙ্গীত পরিবেশন করে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। ১৯৩১ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত রঙমহল থিয়েটারের পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর দেওয়া সুর রঙমহল, মিনার্ভা ও অন্যান্য থিয়েটারে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও গুজরাতি ভাষায় সহস্রাধিক গানের রেকর্ড আছে। এক সময়ে তাঁর গান বাংলা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ছায়াছবিতে এবং শিশির ভাদুড়ীর রঙ্গমঞ্চ ও রঙমহলে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি একাধারে সুরস্রষ্টা, গায়ক, ট্রেনার, অপেরা মাস্টার ও অভিনেতা ছিলেন।

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ : ১৮৯৩-১৯৬৮

যাত্রাজগতে বড় ফণী নামে প্রসিদ্ধ। প্রবেশিকা পাশ করে উচ্চতর বিদ্যায় শিক্ষার্থী হয়েও কোনও এক সময় যাত্রা জগতে চলে আসেন। সুনিপুণ নট, পরিচালক ও যাত্রা পালাকাররূপে দীর্ঘকাল বাংলার যাত্রাশিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিলেন। 'বাঙালী', 'রাজা দেবদাস' প্রভৃতি পালায় এবং 'সোনাই দীঘিতে' একটি ছোট চরিত্রে বৃদ্ধ বয়সেও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। প্রায় শতাধিক পালায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে ৫০ বছরের অধিককাল বাংলা যাত্রাশিল্পে প্রেরণা যুগিয়েছেন। এক সময় গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। ইতিহাস, পুরাণ ও সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কয়েকটি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। বহু যাত্রাপালা এবং যাত্রা বিষয়ক কয়েকটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। যাত্রা জগতে তিনি প্রথম সঙ্গীত নাটক আকাদেমির পুরস্কার পান (১৯৬৮)। 'বাঁশের কেল্লা' পালা নাটকে অভিনয় করবার সময় অসুস্থ হয়ে কিছুক্ষণ পরেই মারা যান।

সতীশচন্দ্র সিংহ : ১৮৯৪-১৯৬৫

ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে এক সময় তিনি দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সচিব এবং ভারতীয় শিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক

মেঘনাদ সাহা : ১৮৯৩-১৯৫৬

জন্ম সেওড়াতলী, ঢাকায়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও দেশসেবক। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদ সভায় যোগদানের অপরাধে পরবর্তী পর্যায়ে জুবিলি স্কুল। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম এবং অংক সমেত চারটি বিষয়ে শীর্ষস্থান দখল করে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আই-এস সি এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৩ খ্রিঃ গণিতে অনার্স-সহ বি এসসি ও ১৯১৫ খ্রিঃ ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে এম এসসি পাশ করেন।

বাঘা যতীন, পুলিন দাস প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের অপরাধে তৎকালে ফিনান্স পরীক্ষায় বসার অনুমতি লাভে বঞ্চিত হন। ১৯১৮ খ্রিঃ নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এখানে গবেষণা করে পরপর দুই বছরে ডি এস সি ও পি আর এস হন। গবেষণার বিষয় ছিল— রিলেটিভিটি প্রেসার অফ লাইট ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। ১৯২০ খ্রিঃ 'থিওরি অফ থার্মাল আয়নিজেশন, বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। দুই বছর লন্ডন ও বার্লিনে গবেষণা করার পর দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খয়রা' অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রিঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সেখানে ১৫ বছর কাজ করে স্কুল অফ ফিজিক্স নামে পদার্থবিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার গড়ে তোলেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ মেঘনাদ সাহা কলকাতায় এসে বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক হন এবং পরে গড়ে তোলেন 'ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। ১৯৩৪ খ্রিঃ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞানের সার্বিক প্রয়োগের প্রবক্তা ছিলেন মেঘনাদ সাহা, ১৯৫০ খ্রিঃ উদ্বাস্তুদের জন্য ইস্টবেঙ্গল রিলিফ কমিটি গড়ে তোলেন। মেঘনাদ সাহা লন্ডনের রয়াল সোসাইটি, ফ্রেঞ্চ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, বোস্টন অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স প্রভৃতির ফেলো এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিকাল ইউনিয়ন, ভারতীয় বিজ্ঞানোৎকর্ষিণী সমিতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ও

১৯৪৫ খ্রিঃ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিঃ ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক শুভেচ্ছা কমিশনের সদস্যরূপে ইউরোপ আমেরিকা সফর করেন। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়া যান। ১৯৪৭ খ্রিঃ নিউটনের ত্রিশততম বার্ষিকীতে লন্ডন রয়্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি আলেকজান্দ্রা ভোলটার শতবার্ষিকীতে ইতালি সরকারের অতিথি ছিলেন। মেঘনাদ সাহার চেষ্টায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স ও গ্লাস সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থ—'The Principle of Relativity', 'Treatise on Heat', 'Treatise on Modern Physics', 'Junior Textbook of Heat with Meteorology' প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : ১৮৯৪-১৯৭৪

জন্ম কলকাতায়। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞান সাধক। কোয়ান্টাম স্ট্যাটিসটিক্সের উদ্ভাবক, পদার্থবিদ ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রবক্তা। ১৯০৯ খ্রিঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯১১ খ্রিঃ আই এস সি-তেও প্রথম হন। ১৯১৩ খ্রিঃ গণিতে অনার্স এবং ১৯১৫ খ্রিঃ এম এস সি পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে মিশ্রগণিতে ও পদার্থবিদ্যায় পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ খ্রিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার রিডার হিসাবে যোগদান করেন। ২৪ বছর গবেষণায় তিনি বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করেন যার মধ্যে অন্যতম 'এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি'। ১৯২৪ খ্রিঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'প্ল্যাঙ্কসূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প', শিরোনামে প্রবন্ধ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে বিশেষ চমৎকৃত করে। তিনি নিজে এই প্রবন্ধের জার্মান অনুবাদ করেন এবং বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। যা পরবর্তী পর্যায়ে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি 'বোস আইনস্টাইন সংজ্ঞা' নামে বিশ্বে সমাদৃত হয়। ১৯২৯ খ্রিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থ বিদ্যাশাখার সভাপতি এবং ১৯৪৪ খ্রিঃ মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ খ্রিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রিঃ পর্যন্ত 'খয়রা' অধ্যাপক ও কয়েক বছর স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডিন পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরে ১৯৫৮ খ্রিঃ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'এমিরিটাস' প্রফেসরের পদে নির্বাচিত করেন। দুই বছর তিনি বিশ্বভারতীরও উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রিঃ তিনি জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৮ খ্রিঃ তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫২ খ্রিঃ থেকে কিছু কাল রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ মূলত বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হলেও তাঁর ব্যক্তিমানসে সাহিত্যের ধারা, সঙ্গীতের ধারা এবং বিশেষভাবে মানবিকতার ধারা উজ্জ্বলভাবে বর্তমান ছিল। তিনি দেশের উন্নতি ও কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রসার ও ব্যাপ্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাবার প্রশ্নে তিনি মাতৃভাষাকেই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার মুখপত্র মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ করেন। মনে প্রাণে তিনি খাঁটি বাঙালি ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। সাহিত্য, সংগীত ও ললিতকলা সম্পর্কেও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি 'সবুজ পত্র' ও 'পরিচয়' সাহিত্য গোষ্ঠীর অন্যতম সভ্য ছিলেন। বেহালা ও এসরাজ বাজাতে পারতেন। দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করতেন। তিনি বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : ১৮৯৩-১৯৭২

জন্ম কলকাতায়। প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। পরবর্তী পর্যায়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেম্ব্রিজ থেকে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স-সহ ট্রাইপস্ পেয়ে ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে যোগদান করেন ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজে প্রথমে অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষ এবং অবসর গ্রহণের পরে 'এমিরিটাস' প্রফেসররূপে যুক্ত ছিলেন। পদার্থবিদ্যা ছাড়া নানা বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রসারিত হয়। নৃতত্ত্ব-সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ 'The Statistical Analysis of Anglo-Indian Stature' ১৯২২ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। নৃতত্ত্বে তাঁর সব থেকে প্রসিদ্ধ গবেষণা 'Analysis of Race Mixture in Bengal'। এই সব গবেষণা সূত্রগুলির নাম মহলানবীশ ডিস্ট্যান্স। আবহাওয়াতত্ত্বেও তাঁর দান স্মরণীয়। ১৯২২ খ্রিঃ তিনি এ দেশে বন্যার উৎপত্তি সম্পর্কে ফলপ্রসূ গবেষণা করেন। ওড়িশায় হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মাণে তার পরিচয় মেলে। সংখ্যাতত্ত্ব গবেষণার জন্যই তিনি পৃথিবী জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতবর্ষে এ বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ। তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি—ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ও আমরণ এর কর্ণধার ছিলেন। সংখ্যাতত্ত্ব গবেষণার জন্য তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ভারত সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামো তিনিই ফরমা করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক হয়েও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। ১৯২১-৩১ খ্রিঃ, শান্তিনিকেতনের কর্মসচিব ছিলেন। রবীন্দ্র-গবেষণার কাজেও তাঁর বিশেষ অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্র-স্নেহধন্য রানি মহলানবীশ তাঁর স্ত্রী ছিলেন।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ : ১৮৯৪-১৯৫৯

জন্ম পুরুলিয়ায়। প্রখ্যাত রসায়নবিদ। গিরিডি থেকে প্রবেশিকা ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৫ খ্রিঃ রসায়নে এম এস সি পাশ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার সতীর্থ ছিলেন। গাঢ় দ্রবণের ভিতরে লবণের অণুগুলি কীভাবে আয়নিত হয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে এই বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে ১৯১৮ খ্রিঃ ডি এস সি উপাধি লাভ করেন ও পরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। তার গবেষণালব্ধ তত্ত্ব 'ঘোষের আয়নবাদ' নামে বিখ্যাত। পরে বহু বিজ্ঞানী আয়নবাদের পরিবর্তন সাধন করলেও, এই জটিল সমস্যার সঠিক সন্ধান তিনিই প্রথম দেখান। ১৯২১-৩৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে আরও নানা ধরনের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তার মধ্যে আলোক রসায়ন বা ফোটো কেমিস্ট্রি সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ গ্যাস থেকে ফিসারট্রপস্ পদ্ধতিতে অনুঘটকের সাহায্যে তরল জ্বালানির উৎপাদন বিষয়ে তাঁর গবেষণা দেশবিদেশে সমাদৃত হয়েছে। এই গবেষণা বিষয়ে 'সাম ক্যাটালিটিক রিয়্যাকশনস্ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পরট্যান্স' নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ১৯৩৯ খ্রিঃ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিঃ থেকে দেশে নানা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার তিনি বহন করেছেন। ১৯৪৩ খ্রিঃ 'নাইট' উপাধি

পান, ১৯৪৯ সালে ইউনেস্কোয় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ও ১৯৫৪ খ্রিঃ 'পদ্মভূষণ' উপাধিদ্বারা সম্মানিত হন।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : ১৮৯৩-১৯৮১

জন্ম নৈহাটিতে। বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক ও সাহিত্যিক। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৭ খ্রিঃ ব্যবহারিক গণিতে এম এস সি পাশ করে কিছু দিন প্রশান্ত মহলানবীশের কাছে গবেষণা করেন। ১৯১৯ খ্রিঃ বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। ১৯২০ খ্রিঃ ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কসে যোগ দিয়ে 'নির্মলিনা', 'ডালি', 'বাংলা গোলা' নামে কয়েকটি জনপ্রিয় সাবান তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্য 'তরলিকা' নামে সাবান তৈরি করেছিলেন। মহিশূর ও কালিকটের সরকারি সাবান কারখানা থেকে সোপ টেকনোলজি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আধুনিক সাবান তৈরির জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য ফ্রান্স, ইংলন্ড ও জার্মানিতে গিয়েছিলেন। ১৯২৭-৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজে সোপ টেকনোলজি বিভাগের লেকচারার ছিলেন। Adair Dutt & Co.-এ যোগ দেন, পরে কোম্পানিটি ১৯৪৯ খ্রিঃ ভারতীয়করণ হলে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ খ্রিঃ গঠিত Indian Manufactures and Dealers Association-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পরে ইস্টার্ন রিজিওনাল সেন্টারের চেয়ারম্যান ছিলেন। ভারত সরকারের সেন্ট্রাল সায়েন্টেফিক ইনস্ট্রুমেন্ট অর্গানাইজেশনের উপদেষ্টামণ্ডলীতে ও পরে কার্যকরী মণ্ডলীর সদস্য মনোনীত হন। কর্মজীবনে তিনি গবেষণার উপযোগী বহু জিনিস তৈরি করেন। তিনি সুসাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শিকার, ফটোগ্রাফি ও চিত্রাঙ্কনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। সঙ্গীত ও পুষ্পচর্চা-বিষয়েও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

পুলিনবিহারী সরকার : ১৮৯৪-১৯৭১

জন্ম কলকাতায়। বৈশ্লেষিক ও খনিজ রসায়নে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। পিতার স্থায়ী বাসস্থান মেদিনীপুরের তমলুক থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এস সি এবং এম এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখানে 'হিন্দু ছাত্রাবাসে' তাঁর সতীর্থ ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী। ১৯১৬ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং গবেষণার কাজও শুরু করেন। ১৯২৫ খ্রিঃ 'ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ' নিয়ে তিনি ইউরোপে যান এবং প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে থাকেন। স্কানডিয়াম, গাডোলিয়াম এবং ইউরোপিয়ামের ওপর তাঁর কাজের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'স্টেট ডক্টরেট অফ ফ্রান্স' লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রিঃ দেশে ফিরে পূর্ব পদে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রিঃ ঘোষ অধ্যাপক এবং ১৯৫২ খ্রিঃ রসায়ন বিভাগের প্রধান পদে উন্নীত হন। ১৯৬০ খ্রিঃ ওই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। তিনি ৪০টিরও বেশি ভারতীয় খনিজ পদার্থের রাসায়নিক উপাদান বার করে তাদের রাসায়নিক সংকেতও নির্ধারণ করেছেন। তেজস্ক্রিয়তা এবং ভূতাত্ত্বিক বয়স বার করার কাজে তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়। তিনি আতপ চাল, মসুর ডাল প্রভৃতি সাধারণ খাদ্যবস্তু বিশ্লেষণ করে তাদের মৌলিক উপাদান দেখিয়েছেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি এবং ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের ফেলো ছিলেন।

গণপতি পাঁজা : ১৩০০-১৩৬৬ ব.

বাংলার খ্যাতনামা চিকিৎসক। চর্মরোগ বিষয়ে গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন হাসপাতালে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল ও ভেটারেনারি শাখার সভাপতি হয়ে ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ১৮৯৩-১৯৮৩

জন্ম রাজশাহীতে। রসায়ন বিজ্ঞানের কলয়েড বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী। স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী অনুশীলন দলে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস সি পাশ করেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ছাত্রাবস্থায় লিখিত তাঁর গবেষণাপত্র ১৯১৫ খ্রিঃ আমেরিকান সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৯১৯ খ্রিঃ তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভৌত রসায়ন বিভাগে গবেষণার কাজে যোগ দেন। লন্ডনের ফারাডে সোসাইটি ও ফিজিক্যাল সোসাইটির যুক্ত উদ্যোগে এক আলোচনাচক্রে 'অরিজিন অ্যান্ড নিউট্রালাইজেশন অব দি চার্জ অব কোলাইডস্' সম্পর্কে এক গবেষণাপত্র পড়ে খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৪ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর তার সম্পাদক ছিলেন তিনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা হলে তিনি শিক্ষক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ক্যালকাটা স্কুল অব সয়েল সায়েন্স তাঁর হাতে গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ খ্রিঃ তাঁর সভাপতিত্বে দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির স্রষ্টা এবং ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। ইউরোপ আমেরিকা ও কানাডা-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক বহু কমিটির মধ্যমণি ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধি প্রদান করে। মৃত্তিকা বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বিজলীবিহারী সরকার : ১৮৯৩-১৯৭২

জন্ম কলকাতায়। ১৯১২ খ্রিঃ দার্জিলিং স্কুল থেকে ম্যাট্রিক। ১৯১৫ খ্রিঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিজিওলজিতে বি এস সি এবং ১৯১৮ খ্রিঃ ফিজিওলজিতে এম এস সি পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছু দিন ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন। ১৯১৯ খ্রিঃ উচ্চশিক্ষা লাভে বিলাত গমন। ১৯২১ খ্রিঃ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস সি উপাধি পান। তাঁর গবেষণার ফল 'সরকারস্ গ্যাংলিয়ন' নামে পরিচিত হয়। ১৯২২ খ্রিঃ তিনি এফ আর এস ই ডিগ্রি লাভ করেন। ওই বছরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রথমে অনারারি লেকচারার পদে যোগ দেন এবং ক্রমে ১৯৩৯ খ্রিঃ এই বিভাগের প্রধান হয়ে ১৯৫৯ খ্রিঃ অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ খ্রিঃ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে শরীরতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি হন। ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটি, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও ভারতের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং সিটি কলেজ ট্রাস্ট, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট প্রভৃতি বহু সংস্থার সম্মানিত সদস্য ছিলেন। নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে লাইট হর্স রেজিমেন্টে যোগদান করেছিলেন। হকি খেলায় উৎকর্ষ লাভ করে মোহনবাগান দলের হয়ে প্রথম বিভাগে বেটন কাপ প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বিমলচন্দ্র দাস : ১৩০০-১৩৭৬ ব.

ভারতের সর্বপ্রথম সিরাম উৎপাদক এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও বেঙ্গল ইমিউনিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিমলচন্দ্র দাস ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের একজন প্রবীণ সদস্য ও সয়াবিন চাষের পথিকৃৎ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (বাদলবাবু) : ১৮৯৩-১৯৬৯

জনদরদী চিকিৎসক। ১৯২২ খ্রিঃ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এম বি পাশ করেন। ১৯২৩ খ্রিঃ সরকারি চাকরি ছেড়ে গ্রামে গিয়ে দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথম চিকিৎসক যিনি বর্ধমানের গ্রামাঞ্চল থেকে সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে কালাজ্বর রোগ নির্মূল করার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং বহুলাংশে সফল হন। তিনি দক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্রের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

রাজনীতিবিদ

সূর্য সেন ১৮৯৩-১৯৩৪

জন্ম নোয়াপাড়া-চট্টগ্রামে। সাধারণভাবে মাস্টারদা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রি. বহরমপুর কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। কলেজে পাঠরত অবস্থায়ই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে গুপ্ত দলের সদস্য হন। পড়া শেষে চট্টগ্রাম ফিরে এসে উমাতারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সময়ই অম্বিকা চক্রবর্তী, জুলু সেন ও নির্মল সেনের সহযোগে সংগঠন গড়তে থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনে আস্থা হারিয়ে তিনি বিপ্লবী তৎপরতা শুরু করেন। বাংলা ও ভারতের বহু স্থানে বিপ্লবের কাজে হাতে-কলমে অংশ নেন। অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি তৎকালীন বহু নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সূর্য সেন চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে একটি অসাধারণ যুবদলকে বিপ্লবী সংগঠনে আনতে পেরেছিলেন। এই দলের প্রথম উদ্যোগ চট্টগ্রাম শহরের এক প্রান্তে সরকারি রেলের টাকা লুণ্ঠন (১৯২৩)। ১৯২৪ খ্রি. টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার পর গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রি. মুক্তি পান। ১৮-৪-১৯৩০ খ্রি. সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার নেতৃত্বে ৬৫ জন অসমসাহসী যুবক চট্টগ্রামের ২টি অস্ত্রাগার ও পুলিশ লাইন এবং ডাক ও তার অফিস একযোগে আক্রমণ করে দখল করে নেন। সামান্য সময়ের জন্য হলেও তাঁদের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম ৪৮ ঘণ্টার জন্য ইংরেজ শাসনমুক্ত ও স্বাধীন ছিল। ১৬-২-১৯৩৩ খ্রি. গৈরালা গ্রামে সূর্য সেন গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁকে প্রাণদণ্ড প্রদান করে ইংরেজ সরকার। তাঁর মৃত্যুর আগেই গ্রেপ্তারকারী পুলিশ ও বিশ্বাসঘাতক সংবাদদাতা-বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। চট্টগ্রামে মাস্টারদার বিপ্লবী বাহিনীই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউনিফর্ম পরে যুদ্ধ করেছিলেন। এই দলের অন্যতমা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারই প্রথম মহিলা যিনি সশস্ত্র বিপ্লব কর্মে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়ে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। এই দলের পরিকল্পনা ছিল ব্রিটিশ শক্তিকে যথাসম্ভব কঠিন আঘাত হেনে মৃত্যুবরণ এবং দেশবাসীর মনে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো। তাঁদের সফল প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিপ্লবতীর্থ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। যার প্রাণ-পুরুষ ছিলেন সূর্য সেন।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত : ১৮৯৪-১৯৭৯

জন্ম যশোহরের ঠাকুরপুকুরে। যুগান্তর বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পনের বছর বয়সে স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রি. স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়েন। ছাত্রনেতা হিসাবে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং জার্মান অস্ত্র সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যে প্রস্তুতি যুগান্তর দল গ্রহণ করেছিল তাতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। খুলনা এবং যশোহর কেন্দ্রটির ভার তাঁর উপর ছিল। এ ছাড়া দলের আরও যে সব দায়িত্বপূর্ণ কাজ আত্মগোপন অবস্থায় করতে হত, তা তিনি বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও চালিয়ে যান। ১৯১৭ খ্রি. তিনি গ্রেপ্তার হন। এ সময় ৭৮ দিন অনশন করেন। ১৯২০ খ্রি. ছাড়া পেয়ে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার পরে গণসংযোগের উদ্দেশ্যে যুগান্তর দলসহ তিনি কংগ্রেসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টি সংগঠনে সহায়তা করেন। ১৯২৩ খ্রি. গ্রেপ্তার হয়ে ব্রহ্মদেশের জেলে আটক থাকেন। জেলের মধ্যেই তিনি ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহ সংগঠনে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৮ খ্রি. মুক্তি পেয়ে অস্ত্র সংগ্রহ বোমা তৈরি ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩০ খ্রি. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'ধন্য চট্টগ্রাম' প্রবন্ধ লিখলে সরকার সেই পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে এবং তিনি গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। ৮ বছর আটক থাকেন। ১৯৪১ খ্রি. পুনরায় গ্রেপ্তারের আগে পর্যন্ত তিনি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দেশ বিভাগের পরেও পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন এবং পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৬২ খ্রি. তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ :—'বিপ্লবের পদচিহ্ন' Revolution and the Constructive Programme'. এ ছাড়া বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনী প্রণেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী : ১৮৯৩-১৯৭৩

জন্ম ঢাকা জেলার মাধবদি। ঢাকার সাটিরপাড়া হাই স্কুল থেকে ১৯১১ খ্রি. ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে ১৯০৮ খ্রি. মাত্র ১৪ বছর বয়সে গুপ্ত বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১১ খ্রি. অস্ত্র আইনে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯১৭ খ্রি. ঢাকায় পুলিশি দমন নীতি প্রবল হলে নলিনী বাগচী ও কয়েকজন সহকর্মী সহ তিনি গৌহাটিতে সমিতির কেন্দ্রে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে তাঁরা সারা বাংলাদেশে সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। ওই সময় একবার পুলিশ তাঁদের গোপন আস্তানা ঘিরে ফেললে তাঁরা ৭ জন নিকটবর্তী পাহাড়ে পালিয়ে যান এবং রিভলবার ও পিস্তল নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে ৫ জন বিপ্লবী ধরা পড়েন। তিনি ও নলিনী বাগচী সকলের অলক্ষে সরে পড়েন এবং হেঁটে কলকাতায় আসেন। ১৯২৯ খ্রি. মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ খ্রি. থেকে ৬ বছর আন্দামান জেলে আটক থাকেন। এই সময় তিনি কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী হন এবং কারামুক্তির পর ১৯৩৮ খ্রি. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬৪ খ্রি. কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে থাকেন এবং পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের মধ্যে ৩২ বছর কারাবাসে কেটেছে। ১১ বছর আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর লেখা 'অগ্নিযুগের কথা', গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। তা ছাড়া 'স্বাধীনতা' এবং 'অনুশীলন' পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ শহিদ প্রীতি সমিতির সভাপতি ছিলেন।

সতীন্দ্রনাথ সেন : ১৮৯৪-১৯৫৫

জন্ম কোটালিপাড়া–ফরিদপুরে। পিতা পটুয়াখালির (বরিশাল) মোক্তার ছিলেন। এখানে জুবিলী হাইস্কুলে সতীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হয়। এই সময় চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গান শুনে তিনি গৃহত্যাগ করে পথ নির্দেশের জন্য মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে হাজির হন। অশ্বিনীকুমার ১০ বছরের এই বালককে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তখন সহাধ্যায়ী সুধীরকুমার দাশগুপ্তের প্রভাবে বিপ্লবী জীবনের নিষ্ঠা পালন ও অভ্যাস করতে থাকেন। পরে বরিশালে শঙ্কর মঠে প্রজ্ঞানানন্দের সংস্পর্শে এসে যুগান্তর বৈপ্লবিক দলের সংগে যুক্ত হন। ১৯১২ খ্রি. পটুয়াখালি জুবিলী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কিছুদিন হাজারিবাগ কলেজে ও পরে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে পড়েন। বিপ্লবী কাজের জন্য চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী থেকে পড়া ছেড়ে দেন। ১৯১৫ খ্রি. তিনি কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী শিবপুরে নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। এই ডাকাতি মামলায় ৪ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। এর পর তিনি অহিংস সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২০) তিনি একটি যুব বাহিনী গড়ে তোলেন এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে অংশ নেন, ফলে গ্রেপ্তার হয়ে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯২৩ খ্রি. কারা মুক্তির পর পটুয়াখালিতে এক খণ্ড জমি কিনে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এইখানে শিক্ষকতা করেন। ১৯২৪ খ্রি. ফিরোজপুর সম্মেলনে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের ভার তাঁকে দেওয়া হয়। বরিশালে যে সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত হয়, তিনি পদব্রজে সারা জেলা পর্যটন করে এর মোকাবিলা করেন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২৬) তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই সকল অহিংস সংগ্রামে তিনি জয়ী হন। ১৯২৯ খ্রি. আবার গ্রেপ্তার হন। কারারুদ্ধ হয়ে ১০৮ দিন ধরে অনশন ও সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন।

প্রিয় নেতার মুক্তির দাবিতে বরিশালের শত শত যুবক কারাবরণ আরম্ভ করে। ফলে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৩২ খ্রি. দ্বিতীয় বারের আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বেই তিনি গ্রপ্তার হন এবং ১৯৩৭ খ্রি. পর্যন্ত বন্দি জীবনে দেউলি বন্দি শিবিরে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি কিছুদিন কলকাতা দৈনিক পত্র 'কেশরী' পরিচালনা করেন। ১৩ আগস্ট ১৯৪২ খ্রি. আবার কলকাতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৫ খ্রি. মুক্তি পান। ১৯৪৬ খ্রি. যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে যুক্তবঙ্গের বিধানসভায় নির্বাচত হন। সতীন্দ্রনাথ দেশ বিভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৫০ খ্রি. পূর্ববঙ্গের বিধ্বংসী দাঙ্গার সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ডেকে জেলার শান্তি বজায় আছে এই মর্মে এক বিবৃতিতে সই করতে বলেন। তাতে অস্বীকার করায় গ্রেপ্তার হন। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এক বছর পর মুক্তি দেওয়া হয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১-৭-১৯৫৪ খ্রি. পুনরায় গ্রেপ্তার হন। জেলেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্ষীরোদচন্দ্র দেব : ১৮৯৩-১৯৩৭

কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ ও বি এল পাশ করে শ্রীহট্টে ওকালতি শুরু করেন (১৯২০)। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। সুরমা উপত্যকায় নেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৩ খ্রি. স্বরাজ্য দলের সদস্য হিসাবে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। অসহযোগ আন্দোলনে ১৯৩০ খ্রি. মণিপুরী কৃষকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দেড় বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। এর পরে কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ খ্রি. আসাম ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। শ্রীহট্ট এম সি কলেজ স্থাপনে তাঁর অবদান রয়েছে। কালাজ্বর প্রপীড়িত এ জেলার মানুষের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র দেব। 'জনশক্তি', 'শ্রীভূমি', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন।

লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র : ১৮৯৩-১৯৫৩

জন্ম শান্তিপুর-নদিয়ায়। এম এ ও বি এল পাশ করে কৃষ্ণনগরে ওকালতি শুরু করেন। বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৪ খ্রি. প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে কংগ্রেসে জাতীয় দলের নেতা ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রি. গণপরিষদের সদস্য হয়ে নতুন সংবিধান প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পার্লামেন্টে সুবক্তা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী : ১৮৯৩-১৯৭৭

আদি নিবাস ফরিদপুর। স্বদেশী যুগে স্থাপিত জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মীদের উপর ভার পড়ে নোয়াখালি জেলার হাতিয়া দ্বীপে জার্মান যুদ্ধ জাহাজ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতার বিভিন্ন বিপ্লবী কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। নদিয়ার শিবপুর ডাকাতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে যশোহরে তিন বছর অন্তরীণ থাকেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ছাত্রদের সংগঠনে যুক্ত থাকেন। ১৯২৪-১৯২৭ খ্রি. তিনি কংগ্রেসের সম্পাদক,কর্মী ও নেতা সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিরুদ্ধে প্রবক্তা,হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সাধক। সাপ্তাহিক 'দেশের বাণী' পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক, কৃষক আন্দোলনের সহায়ক ও মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৩০-১৯৩১ খ্রি. আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর ১৯৩২ খ্রি. ধৃত হয়ে ১৯৩৮ খ্রি. পর্যন্ত বক্সা ও দেউলি বন্দিনিবাসে কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভের পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রি. কলকাতার ও নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগ নেন। দেশ ভাগের পর নোয়াখালিতে থেকে যান। ১৯৭৭ খ্রি. কলকাতায় চিকিৎসারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী সর্দার : ১৮৯৩-১৯৮০

জন্ম ফরিদপুরে। ১৩ বছর বয়সে বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে লবণের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন। ময়মনসিং সিটি স্কুলে ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতি ও সাধনা সমিতির কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন। যদুগোপাল মুখার্জীর সঙ্গে চীনের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার আশায় সীমান্ত অঞ্চলে ২/৩ বছর অত্যন্ত ক্লেশে দিন কাটান। ১৯১৮ খ্রি. দেশে ফেরার পর কিছুদিন জেলেও অন্তরীণ থাকেন। ১৯২১ খ্রি. গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডাকে তারকেশ্বর ও নাগপুর সত্যাগ্রহে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯২৪-২৮ খ্রি. পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩০ খ্রি. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ঘটনার পর ময়মনসিংয়ে ধরা পড়ে ১৯৩৮ খ্রি. ছাড়া পান। ১৯৪২ খ্রি. পুনরায় ধরা পড়ে স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত আটক থাকেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা উচ্চমানের। ময়মনসিংয়ে বিপ্লবী মেয়েদের তিনিই সংগঠিত করেছিলেন। 'বিপ্লবী নিকেতন' প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি।

প্রিয়রঞ্জন সেন : ১৮৯৩-১৯৬৭

কলিকাতা। ১৯১৩ খ্রি. চাইবাসা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কটক র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে আই এ ও বি এ ১৯১৯ খ্রি. ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে এবং ১৯২০ খ্রি. বাংলা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম এ পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯২৫ খ্রি. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯২০-২৩ খ্রি. পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২৩ খ্রি. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকরূপে অবসর নেন। ১৯৫৪ খ্রি. শান্তিনিকেতনে 'লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক ও পরে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতী ইনস্টিটিউট অফ রুর‍্যাল হায়ার এডুকেশনের সঞ্চালকরূপে কাজ করেন (১৯৫৭-৬০)। ১৯২১ খ্রি. অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪২-৪৩ খ্রি. 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে দমদম জেলে বন্দি ছিলেন। ১৯৪৪-৬৪ খ্রি. 'হরিজন সেবক সঙ্ঘের' বঙ্গীয় শাখার অবৈতনিক কর্ম সচিব, ১৯৪৬ খ্রি. ভারতীয় গণ-পরিষদের এবং ১৯৫২-৫৭ খ্রি. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রি. 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী :—'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' : 'ওড়িয়া সাহিত্য' 'Western Influence in Bengali Literature', 'Western Influence in Bengal Novels'. 'Modern Oria Literature'. প্রভৃতি। এ ছাড়াও প্রেমচন্দ্রের 'গোদান', র‍্যালফ্ ওয়াল্ডের 'In Tune with the Infinite' (অনন্তের সুরে) এবং হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্টের আত্মকথা' প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করেন।

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী : ১৮৯৩-১৯৭৪

জন্ম আরানী—রাজশাহীতে। গ্রামের ছাত্র-বৃত্তি স্কুলে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। নাটোর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় স্বর্ণপদক লাভ করেন। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সান্নিধ্যে এসে তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সংগঠক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বিখ্যাত ধরাইল ডাকাতিতে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী সংগঠনগুলির ওপর সরকারি দমননীতি চরমে উঠলে তিনি দলের নেতার নির্দেশে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন এবং সংগঠনের কাজ চালাতে থাকেন। এখানেও প্রকাশ্যে কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় আত্মগোপন করে আসামের গৌহাটিতে স্থানান্তরিত সমিতির প্রধান কেন্দ্রে চলে যান। সেখানে পুলিশবাহিনী কর্তৃক সমিতির বাড়ি 'আটগাঁ হাউস' আক্রান্ত হলে তিনি অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সেই 'গৌহাটি সংগ্রামে' অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে ১০-১-১৯১৮ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩০ খ্রি. আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। জীবনে ২২ বছর জেলে ও পলাতক অবস্থায় কাটিয়েছেন। ১৯৪৬ খ্রি. মুক্তিলাভের পর বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গে থাকেন এবং ১৯৫২ খ্রি. সেখানে আইনসভার সদস্যপদ লাভ করেন। পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিসভায় তিনি দু-বার জেল ও অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রি. বিপ্লবী ভ্রাতা জিতেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলকাতা আসেন এবং ভারতে থেকে যান। সুলেখক ছিলেন। রচিত গ্রন্থ: 'বিপ্লবী জীবন', 'India Partitioned and Minorities in Pakistan', 'পাক-ভারতের রূপরেখা', 'মুক্তি সৈনিকের ডায়েরী' প্রভৃতি।

সতীশচন্দ্র দে : ১৮৯৪-১৯৭২

কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের ব্যাপারে জড়িত থাকায় কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা আত্মোন্নতি সমিতির সদস্য রূপে বড়া পিস্তল মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্যে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কার্স, বেঙ্গল বেল্টিং ওয়ার্কার্স এবং সূর্য ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতির সদস্য ছিলেন।

কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৮৯৪-১৯৭২

জন্ম খালিয়া মাদারিপুরে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীনের সঙ্গী যে তিন বীর বিপ্লবী আত্মদান করেন তিনি তাঁদের মন্ত্রগুরু ছিলেন। ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বিভিন্ন কারাগারে ২২ বছর বন্দি জীবন কাটান।

আবুহোসেন সরকার : ১৮৯৪-১৯৬৯

জন্ম রংপুরে। ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় ১৯১১ খ্রি. গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ খ্রি. বি এল পাশ করে রংপুরে ওকালতি শুরু করেন। বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৩৫ খ্রি. ফজলুল হকের সহকর্মী হিসাবে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা হন এবং ১৯৩৬ খ্রি. ওই পার্টির প্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান ভাগ হলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৫৪ খ্রি. তিনি প্রাদেশিক নির্বাচনে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানি ও সুহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় যুক্তফ্রন্টের টিকিটে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হন। ১৯৫৫ খ্রি. কয়েক দিনের জন্য পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী এবং জুন ১৯৫৫ থেকে আগস্ট ১৯৫৬ খ্রি. পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা ছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ শেঠ : ১৮৯৪-১৯৭১

জন্ম কলকাতায়। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য এবং ভারতীয় দর্শনিক সমিতি ও রোমক লিপি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী : ১৮৯৪-১৯৫৭

চাঁদপুরের নিকটবর্তী চালতাবাড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। অনুশীলন সমিতির নারায়ণগঞ্জ শাখায় ছাত্রকর্মী হিসাবে বিপ্লবী জীবন শুরু করে নিষ্ঠা ও কর্ম তৎপরতার জোরে নেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০৮-০৯ খ্রি. বিপ্লব-প্রয়াসকে ব্যাপক করবার জন্য গৃহত্যাগ করেন এবং ১৯১৪ খ্রি. ধরা পড়ে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভের পর ১৯২৪ খ্রি. পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ খ্রি. পর্যন্ত রাজবন্দি রূপে থাকেন এবং ১৯২৭ খ্রি. ব্রহ্মদেশের ইনসিন জেলে প্রেরিত হন। ১৯২৯ খ্রি. ঢাকা শহর থেকে এম এল সি নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রি. রাজশাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে ১৯৩৮ খ্রি. পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৩৯ খ্রি. পূর্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এম এল এ নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রি. পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা আইনে বন্দি হন। এই সময় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জেলে অনশন করে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই মুক্তি পান। এরপর সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ খ্রি. পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক থাকেন। ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রি. দেশবিভাগের পর তিনি কলকাতায় বসবাস করেন।

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী : ১৮৯৪-১৯১৫

জন্ম মাদারিপুর-ফরিদপুরে। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য এবং ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাসের সহকর্মী ছিলেন। ১৯১৩ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে প্রথম ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ মাস জেল খাটেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫-তে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন দিবসে রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে কয়েকজন সহকর্মীর সাহায্যে হত্যা করেন। বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সহকর্মী হিসাবে জার্মানি, জাপান, আমেরিকা ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। বাঘা যতীন পরিচালিত বুড়ী বালামের যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় : ১৮৯৪-১৯১৬

টেগরা-তারকেশ্বর-হুগলিতে জন্ম। অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। দেশ সেবার ব্রত নিয়ে চোদ্দ বছর বয়সে দলনেতার নির্দেশে পেনাং যান। সেখানে গিয়ে চাষী-মজুরদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাদের সঙ্গে মিশে কারখানায় মিস্ত্রীর কাজে যোগ দেন। অল্প কিছু টাকা নিজে রেখে বাকি টাকা পার্টিতে জমা দিতেন। পেনাং ও শ্যামের বিভিন্ন অঞ্চলে অক্লান্ত চেষ্টায় কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে তিনি নভেম্বর ১৯১৪ খ্রি. কলকাতায় আসেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব-আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ও ভারতে মালপত্র প্রেরণের কাজে যুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রি. বাঘা যতীনের আদেশে মার্টিনের (মানবেন্দ্রনাথ) খবর নিতে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ায় যান (১৭-১২-১৯১৫) এবং সেখানে গিয়ে মার্টিনকে টেলিগ্রাম করেন। গোয়ায় তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী বিনয়ভূষণ দত্তও গিয়েছিলেন। এই সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দার নির্দেশে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৮১৮ খ্রি. ৩ আইন অনুসারে তাঁকে পুণা জেলে আটক রাখা হয়। তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। ফলে তিনি জেলেই মারা যান।

শিক্ষাবিদ

নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত : ১৩০০-১৩৬৮ ব.

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২২ খ্রি. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২৩ খ্রি. রিডার হিসাবে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৫১ খ্রি. পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং শেষ ১৮ বছর ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের ডিন ছিলেন। ১৯৫৫-৬০ খ্রি. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী : ১৮৯৩-১৯৬৮

জন্ম ময়মনসিংহে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স-সহ বি এ (১৯১১) এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ (১৯১৩) করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রি. বি এল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে কর্মজীবনের শুরু ১৯১৭ খ্রি.। ১৯২৮ খ্রি. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান। ১৯৩৫ খ্রি. মিন্টো প্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ খ্রি. অবসর গ্রহণের পর এমিরিটাস প্রফেসর পদে বৃত হন। অধ্যাপনাকালে আর্টস বিভাগের ডিন এবং ১৯৪০ খ্রি. থেকে ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'The Co-operative Movement in Bengal', 'The Evolution of Indian Income Tax' তিনি অনেক প্রবন্ধের প্রণেতা। তিনি তাঁর বাড়ি ঘর ও সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান।

তেজেশচন্দ্র সেন : ১৮৯৩-১৯৬০

জন্ম ঢাকায়। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় ১৯০৯ খ্রি. শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ে চলে আসেন। পরে দেশে ফিরে এন্ট্রান্স পাশ করে আবার শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। তিনি শিশুদের বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত পড়িয়েছেন, গান ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং বাগানের কাজও শিখিয়েছেন। শিশুদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনে তথা সমগ্র বাংলাদেশে তাঁকে একজন পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তিনি 'শান্তিনিকেতন পত্রে' এবং ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মুকুল'-এ লিখতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'হারানো ছেলে' (অনুবাদ) 'কুড়ানো ফুল', 'সূর্যচন্দ্রের কথা'।

হংসেশ্বর রায় : ১৮৯৩-১৯৭৭

জন্ম বোলপুর বীরভূমে। বি এল পাশ করার পর কয়েক বছর ওকালতি ও পরে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য ছিল। গান্ধীজির ডাকে ১৯২২ খ্রি. সবরমতী আশ্রমে চলে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণে গিয়ে ১৯২৩ খ্রি. খাদি কেন্দ্র খোলেন, অসুস্থতার জন্য আবার বোলপুরে ফিরে এসে প্রধান শিক্ষকের কাজে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রি. চাকরি ছেড়ে শিক্ষার সংগঠনের কাজে যুক্ত হন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ খ্রি. বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৫৩ খ্রি. বোলপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও তিনি অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও সংগঠক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বোলপুরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মন্দির তার পরিচালনায় গঠিত হয়। ১৯৫২ খ্রি. তিনি আইন সভার সদস্য হন।

অনুকূলচন্দ্র জ্যোতিঃব্যাকরণ তীর্থ : ১৩০১- ব. ?

জন্ম বরিশালে। বেদান্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারি ছিলেন। কর্মজীবনের শুরুতে বরিশাল টাউনস্কুলে ও বাখরগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। বরিশাল 'ধর্মরক্ষিণী সভা'-র অধ্যাপক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন। কয়েকবছর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার জ্যোতিষ সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। আকাশবাণীতে গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাখ্যা করতেন। দেশ ভাগের পর কলকাতা টালিগঞ্জে 'আদর্শ চতুষ্পাঠী' স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকার জ্যোতিষী নিযুক্ত হন। 'কাশীপুর নিবাসী' পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'ফলিত জ্যোতিষের গ্রহ-বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়। তিনি চারখানি তন্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদকে প্রদান করেন।

জ্ঞানেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ১৮৯৪-১৯৭১

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেন। ১৯১৮ খ্রি. কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেন্টাল অ্যান্ড মরাল

সায়েন্সে প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৬ খ্রি. পঞ্জাবের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রি. থেকে ১৯৪৯ খ্রি. পঞ্জাব সরকারের শিক্ষা বিভাগে ডি পি আই ও সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ইস্ট পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছিলেন। ১৯৬২ খ্রি. 'পদ্মভূষণ' উপাধি পান তাঁর রচিত গ্রন্থ—'Common sense Empiricism' ও 'British Empiricism'। তাঁর বহু প্রবন্ধ ভারতীয় এবং ব্রিটিশ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

যোগীশচন্দ্র সিংহ : ১৮৯৩-১৯৫৩

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক এবং সুপণ্ডিত যোগীশচন্দ্র ছিলেন ঐতিহাসিক ডঃ যদুনাথ সরকারের ভাগিনেয়। ১৮৯৩ সালে ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখের জন্মের একই বছরে যোগীশচন্দ্রের জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজ তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র যুগপৎ ঈশান ও প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত যোগীশচন্দ্র—স্বরচিত 'বাঙলার অর্থনৈতিক ইতিহাস' (১৯২৭) বা 'ইকনমিক অ্যানালস অব বেঙ্গল' গ্রন্থটির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর ছিল সুগভীর ঔৎসুক্য এবং পাণ্ডিত্য। তাঁর 'ইন্ডিয়ান কারেন্সি প্রবলেমস' গ্রন্থটিও এ দিক দিয়ে একটি দিগদর্শনমূলক কাজরূপে পরিসংখ্যান তত্ত্ব এবং পরিকল্পনা বিষয়েও তিনি ছিলেন সর্মাধিক আগ্রহী এবং ওয়াকিবহাল। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি কালো টাকার কুফল প্রসঙ্গে বহুমূল্যবান মতামত ব্যক্ত করে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্যক্তিজীবনে নিরহংকারী, বিশিষ্ট শিক্ষক ছাত্রবৎসল ও বহুমুখী গুণের অধিকারি যোগীশচন্দ্র বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন শাখাতেও গুরুত্বপূর্ণ নানা পদে অধিষ্ঠিত থেকে যোগ্যতার সঙ্গে একাধিক দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজসেবী

চারু মাস্টার : ১৮৯৩-১৯৭২

খুব ছোটবেলা থেকে পাহাড়ি এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পড়াশুনা করেন। ১৬ বছর বয়স থেকে জনসেবায় যুক্ত হন। পার্বতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। ১৯ বছর বয়সে ত্রিপুরা চলে আসেন এবং এখানেও পার্বতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কুটির শিল্পে আত্মনির্ভরশীলতার প্রেরণা দিতে থাকেন। তিনি পার্বতীয়দের সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে কয়েকটি যাত্রা দল গঠন করেন। নিজে ভালো অভিনয় করতেন। বেহালা ও তবলা বাজাতে পারতেন। তিনি বিভিন্ন পার্বতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ভারতীপ্রাণা, প্রব্রাজিকা : ১৮৯৪-১৯৭৩

জন্ম গুপ্তিপাড়া-হুগলিতে। কলকাতায় বাগবাজারের বোসপাড়ায় মাতামহের গৃহে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে। মিশনারি স্কুলে বিদ্যাচর্চার আরম্ভ। ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খ্রি. বোসপাড়া লেনে বিদ্যালয় খুললে তিনি সেখানে ভর্তি হন। ব্রাহ্মণ—কন্যা বাল্যেই বিবাহ হয়। কিন্তু ১৭ বছর বয়সে শ্রীমা সারদামণির কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে সংসার ত্যাগ করেন। নিবেদিতার সহকর্মিণী ভগিনী সুধীরা দেবী তাঁর নতুন নাম দিলেন সরলা। ১৯১৪-১৭ খ্রি. পর্যন্ত তিনি লেডি ডাফরিন হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা ও শুশ্রূষাকাজে শিক্ষা নেন এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের পর প্রায় ৩০ বছর কাশীতে সাধন ভজনে কাটান। ১৯৫৯ খ্রি. স্বামী শঙ্করানন্দ বেলুড় মঠে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়ে নাম রাখেন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা পুরী। ওই বছর আগস্ট মাসে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন গঠিত হলে তিনি সারদা মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষা হন। কলকাতা, দক্ষিণ ভারত ও দিল্লি মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি তিনি পরিদর্শন করতেন। তিনি শঙ্করানন্দের নির্দেশে দীক্ষা দানে ব্রতী হন এবং শত শত ভক্তের অধ্যাত্মজীবনের ভার নেন।

ক্রীড়াবিদ্

অভিলাষ ঘোষ : ১৮৯৪-১৯৬৩

জন্ম ঢাকা শহরের বিক্রমপুরে। ১৯১১ খ্রি. আই এফ এ-র শিল্ড জয়ের প্রধান স্তম্ভ। ময়মনসিংহ স্কুলে পাঠরত অবস্থায় খেলোয়াড় হিসাবে নাম করেন। ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনের সাহায্যে মোহনবাগান ক্লাবের সদস্য হন। তিনি নিয়মিত মোহনবাগানের সেন্টার হাফে খেলেছেন। ১৯২০-২২ খ্রি. এই ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন। অভিলাষ ঘোষ ব্রিটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্রুকবন্ড টি কোম্পানির পদস্থ আধিকারিক ছিলেন।

তুলসী দত্ত : ১৮৯৪-১৯৭৯

জন্ম কলকাতায়। 'আয়রন ওয়াল' নামে পরিচিত কুমারটুলির প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। ব্যাকে খেলতেন। ১৯১০-১৯৩৫ খ্রি. পর্যন্ত কুমারটুলি দলেই ছিলেন। ১৯১০ খ্রি. মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখাবার পর থেকে কুমারটুলির সদস্য হন। স্কুল ও কলেজ জীবনেই বিশেষ দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হন। প্রধানত তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যে কুমারটুলি দল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালে উঠেছিল। তিনি ক্রিকেটও ভালো খেলতেন। তিনি ক্রিকেটে বেঙ্গল স্কুল দল ও বেঙ্গল জিমখানার মিলিত দলে স্থান পেয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি মোহনবাগান ক্রিকেট দলের সঙ্গে মাদ্রাজ সফর করেন। ১৯২৫ খ্রি. ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে সিমলাতে ডুরান্ড কাপে খেলেছেন।

দুলে দে : ১৮৯৪- ?

প্রখ্যাত হকি খেলোয়াড়। প্রকৃত নাম ধীরেন্দ্রনাথ দে। প্রথমে মাতুল কেরো বসুর সাহায্যে গ্রিয়ার ক্লাবে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার সুযোগ পান। হকি খেলায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। প্রধানত তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যেই ১৯২১ ও ১৯২৩ খ্রি. গ্রিয়ার ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। ১৯১৪-২৫ খ্রি. পর্যন্ত তিনি একটানা হকি খেলেছেন।
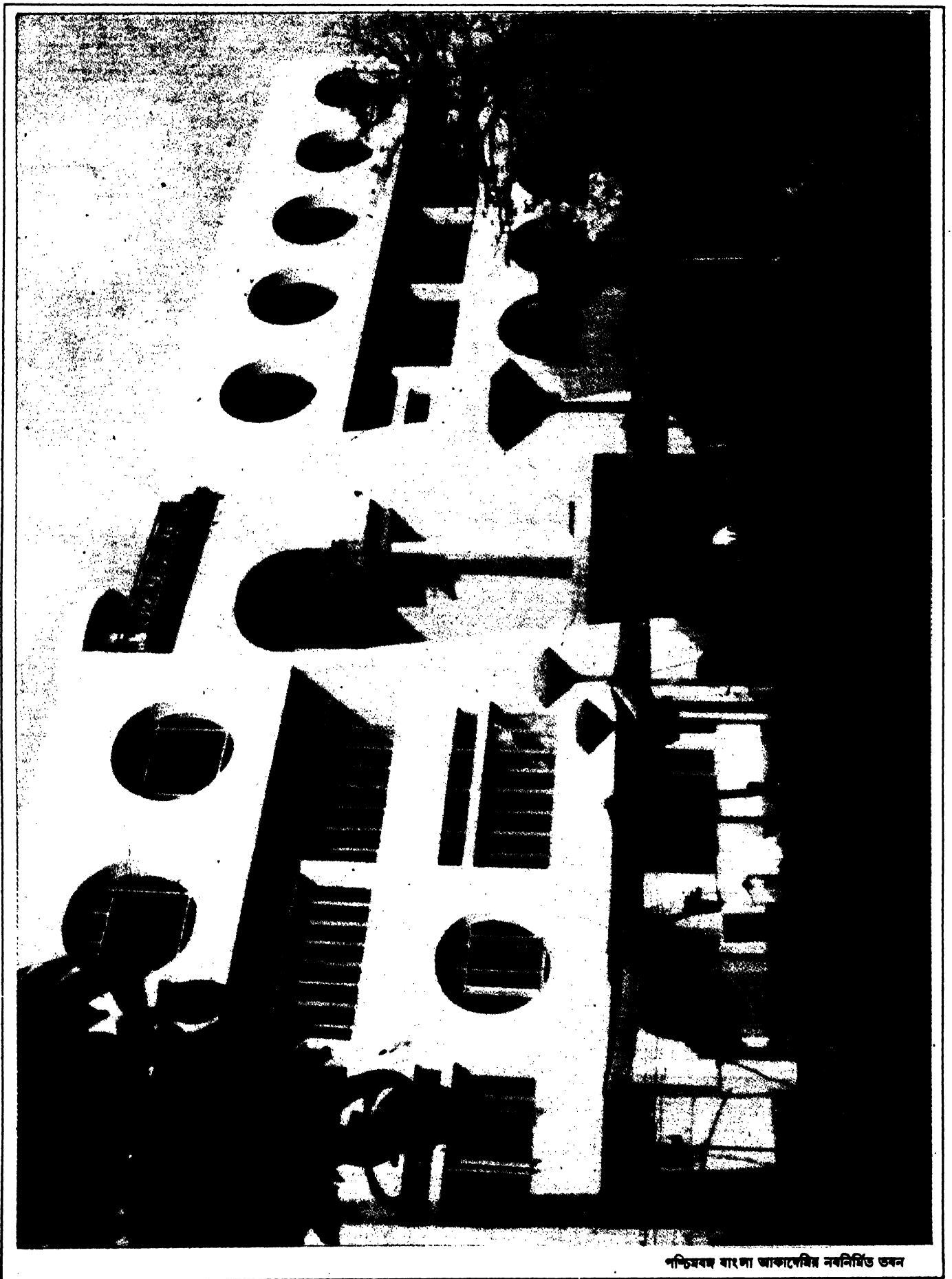
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নবনির্মিত ভবন

স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

১৮৯৩ খ্রি. ২৩ জুলাই কলকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ২/২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার নামে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এক দিকে ইংরেজি সাহিত্যের এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এই অ্যাকাডেমি অব লিটারেচারের কার্যকলাপে ইংরেজি বহুলতা বর্জন করার উদ্দেশ্যে কতিপয় সভ্যের আপত্তির ভিত্তিতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবানুসারে অ্যাকাদেমি অব লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম গৃহীত হয়। দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য মিস্টার এল লিওটার্ড এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী বিশেষ উদ্যোগ শুরু করেন। ১৩০১ সালের ১৭ বৈশাখ(বাংলার)অপরাহ্ণে বেঙ্গল অ্যাকাদেমি অব লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বলে অভিহিত করা হয়। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যালয় বিনয়কৃষ্ণ দেবের ২৯ নং গ্রে স্ট্রিটের ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং পরিষদের অধিবেশনাদি তাঁর ১০৬/১নং গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে হতে থাকে। ১৩০৬ সালে সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪৮ জন।

১৩০৬ সালের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এই ১১ জন সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্রের সুপারিশ অনুযায়ী পরিষদের কার্যালয় ১৩৭/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে কাজের পরিধি ও সভ্য সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। বৃহত্তর পরিসরে নতুন ভবন গঠন খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। চারুচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও নরেন্দ্রনাথ বসু কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট কিছু জমি প্রদানের আবেদন জানান। মহারাজ হালশীবাগান আপার সার্কুলার রোডের উপর ৫ কাঠা জমি দান করেন। কিছু দিন পরে আরও কিছু জমি বাড়াবার জন্য মহারাজার কাছে হেমচন্দ্র মল্লিক, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আবেদন করেন। তিনি এই আবেদনও মঞ্জুর করে ২ কাঠা জমি বাড়িয়ে দেন। ওই জমিতেই ১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কার্যালয় নবনির্মিত বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় এবং ২১ অগ্রহায়ণ গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠে ইতিহাসনন্দিত এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্মারক ভবন। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যে কোনও এক জায়গায় উল্লেখ করেন— 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে আমি দেশমাতার এই রূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে—তাহার এক নিত্য প্রসারিত জিজ্ঞাসাসূত্রের দ্বারা আজকার বাঙালির চিত্তের সহিত দূরকালের বাঙালি- চিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে—দেশের সঙ্গে দেশের কালের সঙ্গে কালের যোগ সাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে।' অন্য অংশে 'ইহা ভোজবাজির খেলার মত অকস্মাৎ কোন খামখেয়ালির শ্রদ্ধাহীন টাকার জোরে এক রাত্রে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হৃদসঞ্চারিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হইয়া তাহার জীবন হইতে জীবন লাভ করিয়া তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মে পরিষদের শারীরিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে।' সমাপ্তিতে কবি বলেন— 'অদাকার উৎসবে এই নবদেহ প্রাপ্ত সাহিত্য পরিষদের মুখ দেখিয়া সমস্ত দেশের স্নেহ ও আশীর্বাদ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এই আমরা আশা করিয়া আছি।'

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথের সেই প্রত্যাশার দাবি অনেকাংশেই পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

সাহিত্য পরিষদ বাংলা ভাষার চর্চা ও অনুশীলনে বিভিন্নভাবে লেখকদের উৎসাহিত করার জন্য প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপী ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বক্তৃতামালা, সেমিনার, আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে চলেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বহু লেখককে পদক ও পুরস্কার প্রদান করে তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে উৎসাহিত করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩১১ সালের পরবর্তী পর্যায়ে রংপুর, ভাগলপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদে একই উদ্দেশ্যে শাখা পরিষদ স্থাপন করেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সুদীর্ঘ কাল ধরে বহু প্রাচীন গ্রন্থের সমাবেশে পাঠগৃহ পরিষেবার সুযোগ প্রদান করে চলেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিচালিত সাহিত্য পত্র 'পরিষৎ পত্রিকা' আজও বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

ফেডারেশন হল

১৯০৫ খ্রি.-র ১৬ অক্টোবর আনন্দমোহন বসু এই হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে—এই প্রতিষ্ঠানটি ইতিহাসের বহু ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে এই হলটি বিপ্লবী আন্দোলনের মিলনকেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে সব নেতা ও কর্মী সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন—তাঁরা প্রত্যেকে এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যেমন—আনন্দমোহন বসু, বিপিন পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯০৬ খ্রি. ১ জুন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ রেজেস্ট্রিকৃত হয়। এর উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয় ১৯০৬ খ্রি. ১৬ আগস্ট। ওইদিন কলিকাতার টাউন হলে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয় যার সভাপতি ছিলেন ড. রাসবিহারী ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস চ্যান্সেলার ড. স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন। যে তিনজন প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে এই পরিষৎ গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী। এ ছাড়াও অনেকেই আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।

অরবিন্দ ঘোষ নামমাত্র বেতনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ছাত্রসমাজ যখন দলে দলে সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে, তখন তাদের জাতীয় আদর্শ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের জন্যই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সূচনা ঘটে।

এই উদ্দেশ্যে প্রথম যে কমিটি গঠিত হয় তাতে যুক্ত ছিলেন ড. রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল (রাজা), সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ড. প্রমথকুমার রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সিস্টার নিবেদিতা প্রমুখ। সম্পাদক ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী ও ড. নীলরতন সরকার। স্কুল-কলেজের গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয় এখানে। জাতীয় কলেজ ও স্কুলের কার্যারম্ভ হয় ১৬৬, বৌবাজার বর্তমান বসুমতী সাহিত্য মন্দির ভবনে।

১৯১২ খ্রি. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠানগুলি মানিকতলা মুরারিপুকুরে 'পঞ্চবটী ভিলা' নামক স্থানে উঠে আসে। মফস্বলের জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাসবিহারী ঘোষের আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পরে ১৯২২ খ্রি. কলকাতা কর্পোরেশন যাদবপুর এলাকায় নিরানব্বই বিঘা জমি প্রদান করলে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ভবন' ও ছাত্রাবাসসহ মূল বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

১৯২৯ খ্রি. বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের নাম বদল করে 'কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বেঙ্গল' করা হয়। এখানে জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে যথাক্রমে ৩ বছর ও ৫ বছর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হয়। এ ছাড়া পরীক্ষা ও নকশা অঙ্কনের জন্যও দুই বছরের একটা কোর্স চালু হয়। সিনিয়র বিভাগে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনটি উপবিভাগে শিক্ষাক্রম শুরু হয়।

সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হয়েছে—যেখানে এখন বিজ্ঞান, কলা, দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বহুমুখী কর্মশিক্ষার আয়োজন শুরু হয়েছে। উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রয়েছে।

এ ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য, শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্স, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিভাগও চালু হয়েছে।

ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি

১৯০৭ খ্রি.-এ বাংলা রেনেসাঁর প্রাণকেন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রীতিতে শিল্পকলার ক্ষেত্রে নিজস্ব আঙ্গিকের প্রবর্তন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তৎকালীন প্রায় সমস্ত বড় শিল্পীই যুক্ত ছিলেন—বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকেই ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এখানে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত। এই প্রতিষ্ঠান এখন পার্ক স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়েছে—বর্তমানেও এখানে বাৎসরিক প্রদর্শনী হয় এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও চালু আছে যেখানে ভারতীয় রীতিতে প্রশিক্ষণ চলে। বর্তমান সময়ের অনেক নামী শিল্পীই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন।

বেলুড় মঠ

কলকাতা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সদর কার্যালয়। ১৮৯৯ সালে স্বামী বিবেকানন্দ এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

মূল মন্দিরটির স্থাপত্য অত্যন্ত সুন্দর। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই মঠের নকশা করেন। নির্মাণকাজের দায়িত্বে ছিলেন মার্টিন বার্ন কোম্পানি। মূল মন্দির রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উদ্দেশে নিবেদিত। বিবেকানন্দ মন্দির স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিতে নির্মিত।

স্থাপত্যশৈলীতে দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের গঠনশৈলী, বাংলার সনাতন চারচালা মন্দির স্থাপত্যরীতির যেমন ছাপ রয়েছে, তেমনই রয়েছে বৌদ্ধ 'চৈত্যের' গঠনরীতির প্রভাব।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সভা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সভা (Indian Sc. Congress Association) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন দুজন ব্রিটিশ রসায়ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে এস সিমোসন ও অধ্যাপক পি এস ম্যাকমোহন। তাঁরা ১১ জন দেশি ও বিদেশি (ইংরেজ) বৈজ্ঞানিককে একটি সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবার জন্য চিঠি দেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। ভারতের বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ২ নভেম্বর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে—বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি ব্যবস্থা করবে প্রতি বছর বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠানের।

বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ভারতে জ্ঞান প্রসারে তখন এই প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট ছিল। তাঁরা উপরোক্ত প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন। প্রথম বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১০-১৭ জানুয়ারি ১৯১৪, কলকাতার ১ নং পার্ক স্ট্রিট রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে, টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেল অব স্টারলিং (বাংলার গভর্নর)-এর পৃষ্ঠপোষক এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম মূল সভাপতি। এতে পাঠ করা হয়েছিল ৩৫টি গবেষণাপত্র। ৬টি বিভাগ ছিল—রসায়ন, ভূ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও জীববিদ্যা ও জাতি বিজ্ঞান (ethrography)। ৫ জন বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন ইংরেজ, শুধু জাতি বিজ্ঞানের সভাপতি ছিলেন একজন ভারতীয় এল কে এ কৃষ্ণআয়ার (কোচিন)।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

বাংলা দৈনিক পত্রগুলির মধ্যে বসুমতী বর্তমানে সবচেয়ে প্রাচীন। রামকৃষ্ণের অন্যতম মানসপুত্র উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্তিত দৈনিক বসুমতী প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক। ১৯১৪ সালের ৪ আগস্ট প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সংবাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দু-দিনের মধ্যে ৬ আগস্ট এটি দৈনিক বসুমতীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে দৈনিক বসুমতী একটি বিশেষ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। পত্রিকার মতো বসুমতী ভবনের ইতিহাসও বিশেষ তাৎপর্যময়। এককালে এটি ছিল ডাচদের সম্পত্তি। বসুমতী ভবনের পিছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটি বিরাট নিমগাছ ছিল। ওই গাছের তলায় ছিল ডাচদের কারখানা। ডাচেরা এই স্থান এবং বাড়িটি ছেড়ে চলে যাবার পর এখানে গড়ে উঠেছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুল। এর কর্ণধার ছিলেন রিগো নামে এক ফরাসি শিল্পী। পরে ১৮৬৪ সালে বাংলা সরকার এই স্কুলটির ভার নিলে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন বিশিষ্ট শিল্পবিশারদ লুক। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিল্পগুরু বলে কথিত ইতালিয়ান শিল্পী অধ্যাপক গিলার্ডি এই বাড়িতেই বসবাস করতেন। আর্ট স্কুলের পর এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল কলেজ, যার প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এরপর বাড়িটি ক্রয় করেন বসুমতী পত্রিকার প্রাণপুরুষ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র সপরিবারে এখানেই থাকতেন এবং তাঁর সময়েই বাড়িটি দোতলা থেকে তিনতলা হয়।

বই প্রেমিকদের কাছে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'ও একটি পরিচিত নাম। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই এর জয়যাত্রা শুরু যার ফলশ্রুতি বিভিন্ন লেখক-লেখিকার রচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী সিরিজ। এ ছাড়া বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-উপনিষদ-তন্ত্র, রাজনীতি-দর্শন-জ্যোতিষ, আইন,

সঙ্গীত, পরলোক রহস্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক বই বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের ছাপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। লেখক-লেখিকার তালিকাও উল্লেখযোগ্য।

সায়েন্স কলেজ

১৯১২ খ্রি. কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত প্রদত্ত কলকাতার প..শীবাগান লেন এলাকায় ১২ বিঘা জমি বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা-সংবলিত একটি পত্রে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করার পরে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। তিনি যে আর্থিক সাহায্য বিজ্ঞান শিক্ষাকল্পে প্রদান করেন—সেই টাকার বিনিময়েই গড়ে ওঠে এই বিজ্ঞানচর্চার প্রচেষ্টা। এই প্রতিষ্ঠান কর্মসাধনাকে বহুমুখী শাখায় প্রসারিত করতে পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার প্রখ্যাত বহু বিজ্ঞানসাধকও আর্থিক সহায়তা দান করেন। গোটা পৃথিবীতে ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে—সায়েন্স কলেজের অবদান অবিস্মরণীয়। এখানে বিজ্ঞান গবেষণার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষীই তার কর্মসাধনার প্রশ্নে ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ

১৯১৬ খ্রি. কতিপয় সংস্কৃত পণ্ডিত গবেষকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গড়ে ওঠে। সংস্কৃত ভাষার এবং সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্যের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই প্রতিষ্ঠান গড়ার মূল কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিল তা হচ্ছে— (১) মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করা (২) গ্রন্থ প্রকাশ, (৩) পত্রিকা প্রকাশ, (৪) চতুষ্পাঠী স্থাপন ও (৫) সংস্কৃত নাট্যের অভিনয়। এখানকার পুস্তক সংখ্যা দশ হাজারের উপর। পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির

জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনায় যুক্ত অবস্থায়ই পরবর্তী পর্যায়ে যাতে গবেষণার কাজ অব্যাহত রাখতে পারেন তার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯১৭ খ্রি. ৯৩ নং আপার সার্কুলার রোডে নিজের বাড়ির উত্তর দিকের সংলগ্ন জায়গায় বসু বিজ্ঞান মন্দির নির্মাণ করেন। জগদীশ বসুর নিজস্ব অর্থ ছাড়াও অন্যান্য স্থান এবং সরকারও এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করেছে। এ ব্যাপারে বাংলা সরকার একটি অনুদানও মঞ্জুর করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে যা ভারত সরকারের অনুদানে রূপান্তরিত হয়। ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বার উদঘাটিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন করেছিলেন। এই গবেষণা কেন্দ্রে জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে একদল ছাত্রও যুক্ত হন। জগদীশ বসুর এই গবেষণা কেন্দ্রে তাঁর নির্মিত ও উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকারের ক্রেস্কোগ্রাফ, স্ফিগমোগ্রাফ প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত যন্ত্রপাতির সাহায্যে গবেষকরা গবেষণা করতে থাকেন। গবেষণা মন্দিরে একটি বৃহৎ বক্তৃতা গৃহও নির্মিত হয়। এই সব বক্তৃতা প্রকাশের জন্য একটি পত্রিকা (ট্রানজ্যাকশন অফ বোস ইনস্টিটিউট) প্রকাশিত হয়। বসুর নিজস্ব গবেষণা ছাড়াও পরবর্তী কালে সেখানে তাত্ত্বিক ও ফলিত পদার্থতত্ত্ব, কৃষি ও উদ্ভিদ রসায়ন এবং নৃতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণাও স্থান পায়। ১৯৩৭ খ্রি. জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রমোহন বসু অধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৬৭ খ্রি. পর্যন্ত কাজ করেন।

বর্তমানে এখানে ফিজিক্স, বায়ো-ফিজিক্স, প্ল্যান্ট কেমিস্ট্রি, বায়ো কেমিস্ট্রি, প্রোটিন কেমিস্ট্রি, তাত্ত্বিক ও ফলিত উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মাইক্রো বায়োলজি প্রভৃতি বিষয়ে ৪টি বিভাগের অধীনে গবেষণা চলে। এ ছাড়াও প্রাণীশরীরতত্ত্ব বিভাগও রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ফলে কৃষিশিল্প ও রোগ নিরাময়ের অনেক নতুন পথ উদ্ঘাটিত হয়েছে। দার্জিলিং, ফলতা ও শ্যামনগরে বিজ্ঞান মন্দিরের শাখা রয়েছে।

স্টুডেন্টস হল

কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে ১৯১৮ সালে গড়ে ওঠে এই হলটি। এর পাশাপাশি সামান্য কিছু আগে আরও বেশ কয়েকটি হল ও গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে—যেমন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট (১৮৯১) মহাবোধি সোসাইটি (১৮৯১), ইত্যাদি। ভারতবর্ষের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় আন্দোলন ও গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশের কেন্দ্র হিসাবে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে হলগুলি সভা-সমাবেশ সাংস্কৃতিক, ক্রিয়া-কলাপের জন্য ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি কিছু সামাজিক কল্যাণ কাজেও যুক্ত রয়েছে। যেমন, স্টুডেন্টস হলে—বর্তমানে ১৫টি দুঃস্থ ছাত্রকে হলের দায়িত্বে রাখা ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হল-সংলগ্ন একটি প্রার্থনা সভাগৃহও বহুদিন বন্ধ থাকার পরে সম্প্রতি আবার চালু হয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের বহু মূল্যবান এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রক্ষিত আছে মহারানি ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত শ্বেতপাথরের এই স্মৃতিসৌধের আর্ট গ্যালারি এবং প্রদর্শশালায়।

১৯০৬ সালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেই সময়ের যুবরাজ পঞ্চম জর্জ। স্মৃতিসৌধ সম্পূর্ণ তৈরি হতে সময় লেগে যায় প্রায় পনেরো বছর। ২৮ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে এই স্মৃতিসৌধের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন পরবর্তী যুবরাজ।

এই স্মৃতিসৌধের স্থাপত্যরীতিতে রেনেসাঁসশৈলীর প্রাধান্য থাকলেও কিছুটা মারাসেনিক স্থাপত্যশৈলীরও প্রভাব দেখা যায়। এর স্থপতি ছিলেন সার উইলিয়াম এমার্সন। নির্মাণকাজের দায়িত্বে ছিল মার্টিন বার্ন কোম্পানি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহে আছে তৈলচিত্র, দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, লিথোগ্রাফ, পাণ্ডুলিপি এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। এখানে আছে মহারানি ভিক্টোরিয়ার পিয়ানো। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈলচিত্র (২৭৪" × ১৯৬") (রুশ চিত্রকর Verestchagin-এর আঁকা) রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহে। পুরনো কলকাতার জনজীবন নিয়ে একটি নতুন গ্যালারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সাম্প্রতিক সংযোজন।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার বহু আগে রবীন্দ্রনাথের ৪০ বছর বয়সে বোলপুরের নিকটে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম আরম্ভ করেন ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ (ব.)।

'বিশ্বভারতী' শব্দ তার কাছে এসেছিল একটি আইডিয়া হিসাবে।

১৯১৬ খ্রি. কবি আমেরিকা থেকে রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে একটি পত্র লেখেন তাতে বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রথম আভাস মেলে। কবি তাতে লেখেন—"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ওইখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ওই বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।"

আশ্রমের তরুণ শিক্ষক সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখেন, —"ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন।"

১৯১৮ খ্রি. ২৩ ডিসেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পটভূমিতে শান্তিবাদ ও বিশ্বমৈত্রীর প্রতীক বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার আদর্শ ঘোষিত হল "To seek to realise is a common fellowship of study the meeting of the East and the West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace through the establishment of free communication of ideas between the two hemispheres"—যথা—যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীকে সাধারণের জন্য উৎসর্গ করে সভার সভাপতি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতীর মর্মার্থ বিশ্লেষণ করে বলেন—"আক্ষরিক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ধ্বনিগত অর্থ আছে—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেইভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।" এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও বিশ্বমানবতার মিলনকেন্দ্র হিসাবে বিশ্বভারতী আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত-নাটক-নৃত্যকলা-চারু-কারু-শিল্প-শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ সহ মানবিক শাখার পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষা-শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। উচ্চতর গবেষণার সুযোগও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। এ ছাড়া রবীন্দ্র ভাব ও দর্শন প্রচারে বিশ্বভারতী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে তার প্রকাশন সংস্থার মাধ্যমে।

শ্রীনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ খ্রি. লেনার্ড এলমহার্স্ট শান্তিনিকেতনে আসার পর শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করেন। এর আগে পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তার নাম ছিল 'সুরুল সমিতি'। বলা যেতে পারে, গ্রামোন্নয়নের কাজে গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে এলমহার্স্টের সহযোগিতায় নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। শ্রীনিকেতনে গ্রাম উন্নয়নে যে কর্মধারা গৃহীত হয় তার মধ্যে ছিল—(১) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব সম্প্রসারণ। (২) সালিশির মাধ্যমে গ্রামাবিবাদের মীমাংসা (৩) স্থানীয় শিল্পের উন্নতি ও স্বদেশি জিনিসের প্রচলন (৪) বিজ্ঞান ও ইতিহাস চর্চা (৫) বিধিমুক্ত প্রকৃতি ধারার শিক্ষা বিস্তার (৬) চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন (৭) পানীয় জল, নদী-নালা পথঘাট সংস্কার ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান (৮) আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও খামার স্থাপন (৯) দুর্ভিক্ষ নিবারণী ধর্মগোলা (১০) শিল্পকর্মে স্ত্রীলোকদের প্রশিক্ষণ (১১) মাদকদ্রব্য বর্জনের উদ্যোগ (১২) পল্লীর ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহ (১৩) জেলা সমিতি, পঞ্চায়েত সমিতি ও সভাসমিতির কাজের সমন্বয় সাধন, সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা (১৪) ব্রতীবালক সংঘ গঠন ইত্যাদি। এ ছাড়া শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে যে চাররকমের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তা হল—(১) শিক্ষাসহ বিদ্যালয়। (২) গ্রামের কিশোরদের জন্য 'লোক শিক্ষা সংসদ'। (৩) গৃহস্থদের জন্য 'শিক্ষাচর্চা ভবন'। (৪) প্রাইমারি শিক্ষকদের জন্যে এবং পল্লী সংগঠন প্রণালীতে পাঠক্রম চালু করা ইত্যাদি। শ্রীনিকেতন মূলকেন্দ্র হিসাবে তার কাজের বিস্তার ঘটিয়েছিল বিভিন্ন সমবায় আন্দোলন ও সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় ৩৫ বর্গমাইল জুড়ে যার অধিকাংশ মানুষই ছিল নিম্নবিত্ত খেটে-খাওয়া সম্প্রদায়ের। প্রায় একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ মানুষের সার্বিক কল্যাণে স্বাবলম্বী করে তুলতে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন—শ্রীনিকেতন ছিল তারই কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রভূমি।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট

রাশিবিজ্ঞানের অগ্রগমনের উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খ্রি.-র ১৭ ডিসেম্বর কলিকাতায় একটি সভা হয়। সেখানে এই উদ্দেশ্য সফল করার তাগিদে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৩২ খ্রি. এপ্রিল মাসে এ সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য গড়ে তোলা হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট নামের এই প্রতিষ্ঠানটি। পরবর্তী পর্যায়ে যার আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন রাশিবিজ্ঞানের জনক স্যার রোনাল্ড ফিসার। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিকভাবে গড়ে তোলেন। এখানে যে সব নমুনা-সমীক্ষা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। অধ্যাপক মহলানবীশের জীবনে এটি একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি—এই বিরাট সংস্থার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার ছিলেন। সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনায় এবং গবেষণা কাজে এ দেশে এই প্রতিষ্ঠানটি পথিকৃৎ এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংখ্যাতত্ত্ব গবেষণাগারের মধ্যে অন্যতম হিসাবে স্বীকৃত।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় ১৯৩৩ খ্রি.-র ১৫ আগস্ট একটি বিশেষ অধিবেশনে—যার আহ্বায়ক ছিলেন প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এবং সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে এর অফিস ছিল ২৭ নম্বর চৌরঙ্গীর ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে।

প্রথম প্রদর্শনী শুরু হয় ১৯৩৩ খ্রি.-র ২৩ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে 'অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস বাৎসরিক প্রদর্শনীর' মাধ্যমে যার উদ্বোধক ছিলেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর জন আন্ডারসন। এই প্রদর্শনীতে যাঁদের চিত্র স্থান পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জে পি গাঙ্গুলী, ভবানীচরণ লাহা, যামিনী রায়, অতুল বোস, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, নন্দলাল বসু, সারদাচরণ উকিল, ডি কে দেববর্মণ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জি এস হালদার, এস এম পিথাওয়ালা, পার্সী ব্রাউন, রিচার্ড হাওয়ার্থ, ভ্যান ডাইক, স্যার এড্‌ওয়ার্ড, বার্ণ জোনস্ প্রমুখ বিশিষ্ট দেশি-বিদেশি শিল্পী।

১৯৪২ খ্রি. প্রদ্যোৎকুমারের মৃত্যুর পরে আব্দুল হালিম গাজনভী সভাপতি হন। ১৯৪৬ খ্রি. লেডী রাণু মুখার্জী এই সংস্থার সহ-সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৪৭ খ্রি.-র তিনি সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রি.-র এই সংস্থা একটা আদর্শ পরিকল্পনা গ্রহণ করে যেখানে উল্লেখ থাকে (১) সংস্থার একটা স্থায়ী আবাস থাকবে (২) একটি জাতীয় সংগ্রহশালা থাকবে (৩) গ্রন্থাগার থাকবে (৪) সমসাময়িক বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকবে (৫) চারুকলা বিষয়ে পত্রিকা প্রকাশ পাবে। (৬) স্টুডিও ব্যবস্থা এবং উচ্চ পর্যায়ের দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিময় প্রদর্শনীর সুযোগ থাকবে।

এই সিদ্ধান্তের সূত্র ধরেই ১৯৬০ খ্রি.-র ১১ সেপ্টেম্বর নন্দলাল বসুর ৫০ খানা চিত্রের প্রদর্শনীর মাধ্যমে ২নং ক্যাথিড্রাল রোডে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নতুন ভবন যাত্রা শুরু করে যেখানে ১৯৬২ খ্রি.-র রবীন্দ্র গ্যালারি তৈরি হয়। রাণু মুখার্জী এই গ্যালারিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ছবি, কবির ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী এবং কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দান করে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। এর পরে একের পর এক নতুন নতুন গ্যালারি সংযোজিত হয় এই শিল্প ভবনে, যেমন—মিনিয়েচার গ্যালারি, কার্পেট গ্যালারি, প্রাচীন মসি অঙ্কন গ্যালারি, লাইন ড্রয়িং গ্যালারি

ইত্যাদি। এর সংলগ্ন একটি প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে নাট্যচর্চারও সুযোগ রয়েছে এখানে। একটি গ্রন্থাগার আছে। 'আর্ট অ্যান্ড দি আর্টিস্ট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ পায়। ১৯৯০ সাল থেকে ফাইন আর্টস এবং কর্মাসিয়াল আর্টে দুটি ডিপ্লোমা কোর্স পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। সোমবার বাদে প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী গ্যালারি খোলা থাকে। এখানে বহু ভারতীয় খ্যাতনামা শিল্পী থেকে-একেবারে সাময়িককালের বহু নতুন শিল্পীরাও চিত্র প্রদর্শনীর সুযোগ পেয়ে থাকে।

মহাজাতি সদন

১৯৩৮ খ্রি.-র সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি Nation Lecture Hall বা জাতীয় বক্তৃতা ভবন গঠনের উদ্দেশ্যে মধ্য কলকাতার উপর ১ বিঘা ১৮ কাঠা জমির জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত নামেই আবেদন জানান। প্রস্তাবিত এই ভবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র তাঁর এই আবেদনপত্রে পরিষ্কার লেখেন—"The Hall shall be used for holding public meeting and lectures to educate and enlighten the members of the Public and Particularly the citizens of Calcutta in the present day civic municipal, social, cultural and political problems as also for holding such others lectures and discourses as may be benificial to the mental and moral outlook of the citizens of Culcutta.

এই আবেদনপত্রে এই ভবনের একাংশে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন এবং ভবন-সংলগ্ন জমিতে স্বাস্থ্য ও শরীর-চর্চার জন্য কোন ক্লাবকে ব্যবহার করতে দেওয়ার কথা ছিল।

১৯৩৮ খ্রি.-র ৩ আগস্ট কর্পোরেশন সভায় সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব নিয়ে বহু বিতর্ক হয় এবং অবশেষে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে (৩৮—১৪ ভোটে) গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ওই জমি ৯৯ বছরের জন্য বার্ষিক ১ টাকা খাজনায় সুভাষচন্দ্রের নামে মঞ্জুর হয় যেখানে বলা হয় ৩ বছরের মধ্যে প্রস্তাবিত ভবনটি সম্পূর্ণ করতে হবে এবং বর্ণিত উদ্দেশ্য ছাড়া ওই ভবন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলবে না। একটি বোর্ড অব ট্রাস্টির হাতেই (যার মধ্যে সাময়িকভাবে কলকাতার মেয়রকে থাকবার অনুরোধ জানানো হয়েছিল) নিয়ন্ত্রণাধিকার তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল।

১৯৩৯ খ্রি.-র ১৯ আগস্ট, অপরাহ্ণে মহাসমারোহে এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আনুষ্ঠানিকভাবে মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আহ্বান জানাতে গিয়ে ভবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেন তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়: "গুরুদেব। আজিকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তিস্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তি ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক। এই আশীর্বাদ আপনি করুন এবং আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সদনকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করলেন— 'বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নব যুগের নব প্রভাতের দিকে চলছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালীকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক—এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে.....।' বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক চেতনা বিকাশে এই প্রতিষ্ঠানটি আজও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার

১৮৩৫ সালে স্থাপিত ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি থেকে ধীরে ধীরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এবং তার থেকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের বিকাশ।

১৮৩৫ সালে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ছিল এসপ্ল্যানেড রো-র এক বাড়িতে। ১৮৪১-এ এই লাইব্রেরি উঠে আসে তখনকার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (এখনকার রাইটার্স বিল্ডিংস) একাংশে। আবার ১৮৪৪ সালের জুন মাসে হেয়ার স্ট্রিট আর স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগস্থলের মেটকাফ বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত হয় এই লাইব্রেরি।

পরে ১৯০২ সালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি অ্যাক্ট অনুসারে পুনর্গঠিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ১৯০৩ সালের ৩০ জানুয়ারি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৯২২ অবধি মেটকাফ হলই ছিল এর ঠিকানা। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা লর্ড কার্জন।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার হিসেবে আলিপুরে বেলভেডিয়ারে উঠে আসে। সুরম্য এই বিশাল বাড়ির এক সময়ের মালিক ছিলেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। এই বাড়িই ছিল বৃটিশ শাসনকালে বাংলার ছোটলাট (লেঃ গভর্নর)-এর সরকারি বাসস্থল।

জাতীয় গ্রন্থাগারে ভারতীয় এবং বিদেশি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে ১৬ লাখেরও বেশি বই আছে, ১৪৮১ সালে ছাপা প্লিনির ন্যাচারালিস হিস্টোরিয়াক (Naturalis Hystoriac) গ্রন্থটি এই গ্রন্থাগারের প্রাচীনতম সংগ্রহ।

সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স

ভারতে পরমাণু বিদ্যাচর্চার প্রথম প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ খ্রি.-এ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের অন্তর্ভুক্ত জমিতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। উদ্বোধকরূপে আমন্ত্রিত বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরি তনয়া—আইরিন কুরি। এ প্রতিষ্ঠানের অবিসংবাদী রূপকার ডঃ মেঘনাদ সাহা। যিনি এই প্রতিষ্ঠানকে কখনই বিষাক্ত কোনও মারণাস্ত্র-সংক্রান্ত গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে দেখেননি। ইনস্টিটিউটের ঘোষিত নীতি হিসেবে 'advancement of learning'- এর লক্ষ্যটিকে তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৫৬ সালে ডঃ সাহার মৃত্যুর পর তারই নামে নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পরমাণু বিভাগের অন্তর্গত, স্বয়ংশাসিত এক সর্বভারতীয় সংস্থারূপে স্বীকৃত।

সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

জাতীয় গবেষণাগারগুলির অন্যতম সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটটি কলকাতায় অবস্থিত ভারত সরকারের কাউন্সিল অফ

সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ দপ্তরের অধীন আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। এই গবেষণা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫০ সালে। এখানে কাচ, পটারি, এনামেল, মাইকা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। খুব পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে এখানে মৌলিক গবেষণাও পরিচালিত হয়। এ ব্যাপারে ভারত এখন অগ্রগণ্য ৬টি দেশের অন্যতম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানে যে উন্নতমানের অপটিক্যাল গ্লাস ও চশমার কাচ তৈরি হয় তার গুণগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। এই সংস্থা এখন এ ব্যাপারে গোটা ভারতবর্ষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুর

১৮৫১, ২৪ নভেম্বর কলেজ শুরু হয়েছিল—ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি খড়গপুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধপরবর্তী যে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল, তাকে ত্বরান্বিত করতে দরকার ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার বিস্তার। স্যার আর্ডেসির দালাল তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সদস্যের উদ্যোগে একটি কমিটি গঠিত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। শিক্ষাবিদ নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে। তাঁরা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রসারের। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়, প্রথম দলে ছাত্র নেওয়া হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে।

মেদিনীপুরে খড়গপুরের হিজলীর কাছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ১৪০০ একর জমির উপর। এ জমি রাজ্য সরকার দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬০ সালে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রবীন্দ্র জন্মগৃহে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'আদর্শ ও চিন্তাধারা' প্রচারের জন্যই গড়ে তোলা হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির জমিতে রথীন্দ্র মঞ্চের পাশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। প্রতিষ্ঠাকালের পরবর্তী পর্যায়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও পরিকাঠামো অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শাখায়—কণ্ঠ সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত,যন্ত্র সংগীত, নাটক, নৃত্য এবং চিত্রকলা শাখায় পেন্টিং, গ্রাফিকস্, স্কাল্পচার, হিস্ট্রি অব আর্ট ও অ্যালায়েড আর্ট বিভাগ ছাড়াও মানবিক শাখায় বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রবীন্দ্র-সাহিত্য, শিক্ষক-শিক্ষণ, গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ রয়েছে। ডিপ্লোমাসহ প্রাক্-স্নাতক, স্নাতকোত্তর তথা এম এ থেকে এম ফিল পর্যন্ত নিয়মিত শিক্ষাদান করা হয়। এ ছাড়া রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প।

১৯৭৭ সালে মানবিক বিদ্যা তথা কলা বিভাগসহ প্রশাসনিক কাজের একটা বড় অংশ স্থানান্তরিত হয়েছে বি টি রোডের এমারেল্ড বাওয়ার বা মরকতকুঞ্জে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্র প্রদর্শশালা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিত্র প্রদর্শশাখা খোলা হয়েছে। সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়—এই শতাব্দীর অন্যতম পীঠস্থান।

নন্দন

১৯৮৫ খ্রি.-র ২ সেপ্টেম্বর বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কেন্দ্র হিসেবে নন্দনের উদ্বোধন করেন। রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণও করেন তিনি। এতে ৪টি ছোট-বড় প্রেক্ষাগৃহসহ রয়েছে গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র লেখ্যাগার, স্টাডি সেন্টার এবং প্রদর্শনাগৃহ।

এখানে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের চলচ্চিত্র নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। বহু বিখ্যাত চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও পাঠক্রমের সুযোগও রয়েছে এই কেন্দ্রে। এখানে মাঝে-মধ্যেই বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকদের রেট্রোসপেকটিভ দেখানো হয়। পৃথক ভাবে—এক-একটি দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। কলকাতার চলচ্চিত্র ক্লাবগুলি তাদের নিজস্ব উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসবেরও আয়োজন করে থাকে। এখানে চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা-সেমিনার নানা ধরনের প্রকাশনা—এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশনারও ব্যবস্থা করা হয়। অল্পদিন প্রতিষ্ঠিত হলেও ইতিমধ্যে নন্দন চলচ্চিত্র-চর্চা কেন্দ্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে চলেছে। এই কেন্দ্রটিকে ঘিরে বাংলা দেশের চলচ্চিত্র পরিচালক, গবেষক ও দর্শকদের মধ্যে একটা শিক্ষা সংযোগ ও ভাব-বিনিময়ের যোগসূত্র গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা ও গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গঠিত হয়েছে ১৯৮৬ খ্রি.-র ২০ মে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সাধন এবং তার ঐতিহ্য রক্ষার বিভিন্ন দিকে সবরকম দায়িত্ব পালন করাই এই আকাদেমির প্রধান লক্ষ্য। সম্প্রতি আকাদেমির একটি নিজস্ব ভবন তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের একটি অঙ্গস্বরূপ হলেও এটি স্বশাসিত মর্যাদায় কর্মসূচি রূপায়ণ করার স্বীকৃতি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এমন একটি শীর্ষ সংস্থা যেখানে রাজ্যের সকল অংশের বিদ্বজ্জন ও সাহিত্যিকের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তার কাজকর্ম রূপায়ণ করে চলেছে। একদিকে যেমন বিভিন্ন বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে একযোগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, তেমনি বাংলা আকাদেমির প্রকল্পগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের এবং এই রাজ্যের বাইরের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যোগ দিয়ে থাকেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্বভারতী, সাহিত্য অকাদেমি প্রভৃতিসহ রাজ্যের নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা বাংলা একাডেমীর সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে থাকে। কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ভাষা-সাহিত্য নিয়েও বাংলা আকাদেমি পঠন-পাঠন গবেষণামূলক আলোচনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। বাংলা আকাদেমির নিজস্ব পত্রিকা রয়েছে। ভাষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ইতিমধ্যে বাংলা আকাদেমি প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পরিচালিত নাট্য ও সংগীত চর্চার যাবতীয় দিকের উৎকর্ষ ও প্রসার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথকভাবে ১৯৮৭ খ্রি.-র ২৬ সেপ্টেম্বর 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৯৮২ খ্রি.-র ২০ মার্চ গঠিত হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ সংগীত আকাদেমি'—যার সভাপতি যথাক্রমে দেবনারায়ণ গুপ্ত এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

সম্পাদনা ও সংকলন : মুকুলেশ বিশ্বাস

মা যশোদা ॥ কালীঘাটের পট ॥ শিল্পী শ্রীশচন্দ্র চিত্রকর

কাজের অবসরে ॥ শিল্পী যামিনী রায়

॥ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালকেতু ॥ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেলার পথে ।। শিল্পী হরেন দাস

দুই ভাই ॥ শিল্পী সোমনাথ হোড়

মাতৃত্ব ॥ শিল্পী রামকিংকর বেইজ

নিসর্গ চিত্র ॥ শিল্পী গোপাল ঘোষ

প্রসাধন ।। শিল্পী শৈলজ মুখোপাধ্যায়

চুল বাঁধা ॥ শিল্পী জয়নুল আবেদিন

গায়ক ॥ শিল্পী সুনয়নী দেবী

মা ও শিশু ॥ শিল্পী নন্দলাল বসু

।। শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

।। শিল্পী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিসর্গ চিত্র ॥ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়